দেশান্তর

বুদ্ধদেব বসু

দেশান্তর

দেশান্তর

হুমায়ুন কবির

সুহৃদ্বরেষু

আমি প্রথম ভারতের বাইরে ভ্রমণ করেছিলুম ১৯৫৩-৫৪ সালে; দ্বিতীয়বার ১৯৬১-তে। 'দেশান্তর'-এ এই দুই যাত্রার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি সংকলিত হ'লো। পরে আরো একবার দুই বৎসর কাল (১৯৬৩-৬৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছিলাম; কিন্তু আমার এই সাম্প্রতিক প্রবাসের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু ২২৫-২২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাদটীকায়।

'আকাশ-যাত্রী' খণ্ডটি লিখেছিলাম পিটসবার্গে ব'সে; অন্যান্য খণ্ড কলকাতায় ফিরে বিভিন্ন সময়ে লিখেছি। প্রতি খণ্ডের শেষে তার রচনাকাল উল্লিখিত হ'লো।

নানা পত্রিকায়— প্রধানত 'দেশ' ও 'অমৃতে'— বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি ইতিপূর্বে বেরিয়েছিলো, গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে সবই পরিশোধন করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডের জাপান-সম্পৃক্ত অংশটুকু 'জাপানি জর্নাল' নামে একটি স্বতন্ত্র ও সচিত্র পুস্তকরূপেও প্রকাশিত আছে।

আমারই অনবধানবশত 'দেশান্তর'-এ কিছু ছাপার ভুল থেকে গেলো; সহৃদয় পাঠক নিজ গুণে সেগুলি সংশোধন ক'রে নিলে কৃতজ্ঞ হবো।

কলকাতা
মার্চ, ১৯৬৬

বু. ব.

প্র থ ম খ ণ্ড

আকাশ-যাত্রী

১

বেলা দুপুর। ভাদ্র মাসের মেঘলা রোদে আকাশ থমথমে। কখনো কালো হ'য়ে বৃষ্টি, কখনো ফাঁকে-ফাঁকে আলো— এরই মধ্য দিয়ে পথ চলেছে আমাদের। রইলো পিছনে প'ড়ে চিরকালের কলকাতা, বাস্ থামলো দমদম এয়ারপোর্টে। যাত্রী আমি একা, কিন্তু এখন পর্যন্ত বহুবচনের অস্তিত্ব আছে, কাছাকাছি কয়েকটি মানুষ দিয়ে ছোটো একটি দল আমরা। আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়ায় সকলের মুখ মলিন, মুখে কথা কম— এমনকি দলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম যে-মানুষটি, যে এখন পর্যন্ত পাপুন নামেই পরিচিত, যার চঞ্চল কৌতূহলের দাবি মেটাতে-মেটাতে আমি এক-এক সময় অস্থির হ'য়ে উঠি, সেও তার বালকস্বভাবের আনন্দময় চিন্তাহীনতা হারিয়ে থেকে-থেকে উন্মন হ'য়ে পড়ছে। শ্রান্তও ছিলো সবাই, আমি ছাড়া অন্য কারো আহার হয়নি, ঈষৎ উজ্জীবনের আশায় আমি সকলকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় এলাম। চা এবং কিঞ্চিৎ খাদ্য নিয়ে সবেমাত্র ঘন হ'য়ে বসা গেছে, এমন সময় এরোপ্লেনের প্রতিনিধি এসে আমাকে তাড়া দিয়ে গেলো। পরে আবিষ্কার করলুম তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিলো না, প্লেন আজ বিলম্বিত, কিন্তু তখনকার মতো কর্ণধারের আদেশ অমান্য করা গেলো না, অসমাপ্ত চা ফেলে উঠে পড়লুম। কাস্টমস, পুলিশ, স্বাস্থ্যবিভাগ, একে-একে সব বেড়া টপকে আমরা সেখানটায় এসে দাঁড়ালাম, যার পর অযাত্রীদের আর যাওয়া নিষেধ। সরু বারান্দা একটা, কৃপণ কয়েকটা বেঞ্চি পাতা আছে, পাখা নেই। ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ মানুষকেই অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সামনে বেড়া, বেড়ার ওপারে বিশাল শান-বাঁধানো প্রাঙ্গণ, সেখানে দিগন্তের দশ দিক থেকে নানা দেশের বায়ুযান এসে নামে, আবার উড়ে চ'লে যায়। এখানটায় অত্যন্ত অব্যবস্থিতভাবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আকাশের পুব দিক থেকে একটি অতিকায় যান্ত্রিক বোয়াল মাছকে অবতীর্ণ হ'তে দেখা গেলো। ইনিই আমার প্লেন, চলেছেন শিঙাপুর থেকে লণ্ডন। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেনের চলমান যাত্রীরা এসে সরু বারান্দার ভিড় আরো বাড়িয়ে দিলে, কথাবার্তার চটপটি ফুটলো, গেলাশ-ভরা পানীয় ঘুরলো হাতে-হাতে ;— এমনি ক'রে কতক্ষণ কাটলো জানি না, তারপর হঠাৎ কেউ যেন বিশৃঙ্খল মানুষগুলোকে এক গোছা তাসের মতো গুটিয়ে নিলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দুটি বাস্ এসে অমোঘ

দূতের মতো দাঁড়িয়ে গেলো পর-পর। একটিতে চলমান যাত্রীরা, অন্যটিতে আমরা যারা কলকাতা থেকে ছাড়ছি। একবার চোখ তুলে চাওয়া, হয়তো একটু থমকে দাঁড়ানো, একটুখানি পেছিয়ে পড়া হয়তো— তারপরেই একটানে 'আমরা' থেকে নিছক 'আমি'তে পরিণত হলুম। বাস্ এসে প্লেনের সামনে দাঁড়ালো, প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ফিরে-ফিরে পিছনে তাকালুম— কিছুই দেখা গেলো না। বেড়ার গা ঘেঁষে ছোটো-ছোটো মানুষের সারি, মানুষের আকার ছাড়া কিছুই তাদের চেনা যায় না— আমার পক্ষে যারা বিশেষ, তারা ভিড়ের সাধারণের মধ্যে মিশে গেছে, আর সেই সাধারণও ইতিমধ্যেই কত যেন দূর, কত অস্পষ্ট।

এরোপ্লেনে ভ্রমণের ব্যবস্থা সব এমন নিখুঁতরকম যান্ত্রিক যে তার মধ্যে ভ্রমণের রসটুকু ঠিক যেন পাওয়া যায় না। যাদের ছেড়ে যাচ্ছি তাদের জন্য বেদনাবোধ, যে চ'লে যাচ্ছে তার প্রতি দূর-প্রসারিত মঙ্গলদৃষ্টি— এগুলো মানুষের আদিম ক্ষুধার অন্যতম, এর তৃপ্তি না-হ'লে তার মানবস্বভাব ব্যাহত হয়। এবং এর তৃপ্তির জন্য বিদায়বেলাটি দীর্ঘায়িত হওয়া প্রয়োজন, থাকা এবং চলার মধ্যে খানিকটা অনির্ণীত অবকাশের প্রয়োজন। ডাক এলে যেতেই হয় মানুষকে, কিন্তু সেই যাওয়ার পথেও অপস্রিয়মাণ তীরের সঙ্গে একটুখানি সেতুবন্ধ রচনা করার আকাঙ্ক্ষা গৃহস্থ মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনে করা যাক বাংলাদেশের গ্রাম থেকে নৌকোতে কেউ যাচ্ছে, তীরে দাঁড়িয়ে আছে স্বজনেরা ; দড়ির টান, জলের গান, পাটাতনের গোঙানি, দাঁড়ের ঝপাঝপ শব্দে গলুই ঘুরে গেলো, তীরের সঙ্গে তরীর ব্যবধান আঁকা হ'তে লাগলো। ছোটো-ছোটো কোঁকড়া ঢেউয়ের রেখায়-রেখায় অতিশয় ধীরে, দুই দিক জুড়ে পরস্পরের দৃষ্টির মায়া জেগে রইলো— অনেকক্ষণ। তারপর যখন নদীর বুকে ছোট্ট ফোঁটা হ'য়ে নৌকো মিলিয়ে গেলো, চেনা তীর আর চোখে পড়ে না, তখন কান্না-ধোয়া চোখ তুলে তাকিয়ে বড়ো করুণ, বড়ো সুন্দর মনে হয় এই পৃথিবীকে, গাছপালা আকাশ জল সব যেন নতুন হ'য়ে দেখা দেয়। 'কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ!' —কিন্তু দুঃখ তো নয়, সুখ, বিদায়ের বেদনার পথ ধ'রে আমরা যেন বিশ্বজীবনের বুকের মধ্যে পৌঁছই, আমাদের ব্যক্তিগত ছোটো দুঃখ কোন এক অন্তহীন বিশাল বেদনার মধ্যে গ'লে গিয়ে অদ্ভুত শান্ত আনন্দে রূপান্তরিত

হয়। কিংবা যখন গোরুর গাড়িতে রওনা হ'তো কেউ, তখনো সেই যানের অনুপাতেই বিদায়ের পালাটা মন্থর ছিলো, ক্রমিক ছিলো; যে যাচ্ছে এবং যারা থাকছে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের আঘাত অত্যন্ত বেশি উগ্র কিংবা আকস্মিক ছিলো না; বন্ধুরা পায়ে হেঁটে-হেঁটে পথিকের সঙ্গ নিতে পেরেছে কিছুক্ষণের জন্য, হয়তো পারুলডাঙা, হয়তো আর-একটু দূরে কাজলতলার দিঘি অবধি এগিয়ে দিয়ে বেদনার অস্তরাগের মধ্যে ফিরে এসেছে। এই একটুখানি এগিয়ে দেয়াটা আমাদের মানসিক প্রকৃতির পক্ষে কল্যাণকর, এতে উভয় পক্ষই দুঃখটাকে হজম ক'রে নেবার অবকাশ পায়। রাম যখন বনবাসে গেলেন, ভরত তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সঙ্গে এলেন রাজধানী ছাড়িয়ে, তারপর ভরদ্বাজ মুনির আতিথ্যে বিদায়ের অনুষ্ঠান রীতিমতো একটি উৎসবে পরিণত হ'লো— তার মধ্যে পথিক এবং গৃহস্থ উভয়েরই জন্য নিহিত থাকলো মঙ্গল-কামনা; আমরা বুঝলাম রাম এবার নিষ্কুণ্ঠ পায়ে গহন অদৃষ্টের মধ্যে এগিয়ে যাবেন, ভরতও সংবৃত চিত্তে ফিরে যাবেন তাঁর রাজত্বে। আর যখন শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলেন— 'শকুন্তলা' নাটকের সেই শ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্যভাবে বিখ্যাত অংশ— তখন কণ্বমুনি যে তাঁর দুহিতার সঙ্গে আশ্রম পরিক্রমণ করলেন, এই বিলম্বিত ধীরমধুর বিদায়দৃশ্যে সব কথাই বলা হ'য়ে গেলো— যাত্রাকালে যা-কিছু আমরা বলতে চাই এবং বলতে পারি না— সব। যাকে ছেড়ে যাচ্ছি তার অচ্ছেদ্য স্মৃতিবন্ধন, যেখানে যাচ্ছি তার প্রতিও সমর্পণের উৎসুকতা, পরিণীতার হৃদয়ের এই দুঃখস্নাত কম্পমান আবেগের মধ্য দিয়ে আমাদেরই যাত্রাকালীন দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা হ'লো— শুধু দ্বন্দ্ব নয়, তার সমাধানেরও ছবি। এমন সুন্দর, সুসম্পূর্ণ কোনো বিদায়ের দৃশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না, এবং বলাই বাহুল্য, পুরাকালে চলার বেগ অত্বর ছিলো ব'লেই এই অলংকৃত, কোমল এবং বাস্তব ছবিটি ব্যক্ত হ'তে পেরেছিলো। মৃগয়াকালে রথের গতির বর্ণনা দিতে গিয়ে কালিদাস যদি অতিরঞ্জন নাও ক'রে থাকেন, তবু আধুনিক মোটর-রথের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার তুলনা হয় না, তার উপর আশ্রমের মধ্যে রথের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো ব'লেও অবকাশের অভাব ঘটেনি। যদি হাল-আমলের নিয়মমতো এমন হ'তো যে দুষ্মন্তর রোলস রয়স একেবারে পোর্টিকোয় এসে দাঁড়ালো এবং শকুন্তলা তাতে উঠে বসামাত্র ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ধাবিত হ'লো, তাহ'লে ঐ দৃশ্যটির

অর্থময়তা অনেক ক'মে যেতো— আর-কোনো কারণে নয়, সময় হ'তো না ব'লে।

কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা কিছু কাজের কথা নয়; যখন মোটরগাড়ির যুগেই বেঁচে আছি, তখন এই ত্বরান্বিত পরিবেশ থেকেই যতটা সম্ভব রস নিংড়ে নেয়া আমাদের কর্তব্য। আর রস যে কোথাও নেই তাও তো নয়, মানুষের সৃষ্টিশীলতা কালক্রমে সকল পরিবর্তনকেই আত্মসাৎ ক'রে আপন মনের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়; যেটা নেহাৎই যন্ত্র, সেটাও অভ্যাসের বলে আবেগের বাহন হ'য়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে যে রেলগাড়িটাকে এতদিনে আমরা পরিপাক করতে পেরেছি; যদিও সে ঘড়ির কাঁটায় ছাড়ে এবং প্রায় চলামাত্রই অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তবু আমাদের যাত্রাকালীন আকৃতি তাতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয় না, বরং দৈহিক মানসিক উভয় অর্থেই খানিকটা পদচারণার জায়গা পাওয়া যায়। কামরায় উঠে গুছিয়ে বসলুম, শিয়রে বই, কোণে জলের কুঁজো— ছোটো হাতব্যাগটা ঠিক আছে তো?— তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে বন্ধুদের সঙ্গে কিছু কথা, সিগারেট, একটু পাইচারি, বইয়ের স্টলটার সামনে একবার দাঁড়ানো, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখা— যাওয়ার মুখে এই একটু বিচিত্র সময়, তখনকার মতো গন্তব্যটাকে প্রায় ভুলে গিয়ে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো; হয়তো প্রায় এমন ভান করা যে আমরা যাচ্ছি না, যতক্ষণ না ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাই, আর প্ল্যাটফর্মের বড়ো ঘড়িটা আলো-জ্বলা গম্ভীর মুখে জানিয়ে দেয় যে আর মাত্র দু-মিনিট সময় আছে। তবু তার পরেও কিছু বাকি থাকে, দুটি-একটি ছোটো অনুষ্ঠান: সবুজ নিশেন, হুইসিলের শব্দ, আস্তে রওনা হলাম, দূরে-দূরে স'রে যেতে লাগলো হাত নাড়া, মুখ, ভিড়, উঁচু-ক'রে-ধরা ছোট্ট একটি সর্বশেষ সাহসী রুমাল— তারপর হঠাৎ চ'লে এলাম রৌদ্র-জ্বলা পুরোনো পৃথিবীর মধ্যে, কিংবা চিরকালের নক্ষত্র-জ্বলা আকাশের তলায়। আর সেখানেই, ঐ খোলা মাঠে, ঐ ঢালু আকাশে, চলতি ট্রেনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেলো আমাদের বেদনা।

কিন্তু এরোপ্লেনে এ-রকম কোনো সুযোগ নেই: আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে সে একটুও প্রশ্রয় দেয় না; আমাদের কুড়েমির ইচ্ছাকে, পথে বেরিয়েও ফিরে তাকাবার দুর্বলতাকে নির্মমভাবে অস্বীকার করে। ভিতরে এবং বাইরে, চলায় এবং থামায়, তার সমস্ত ব্যবস্থাই কাটাছাঁটা, নিক্তি-মাপা, অ-মানুষিক।

সিঁড়ি দিয়ে একে-একে যাত্রীরা উঠলো, শেষ যাত্রীটি যেই উঠে বসলো, অমনি আর এক সেকেণ্ডও দেরি না, তক্ষুনি বন্ধ হ'লো দরজা, গ'র্জে উঠলো এঞ্জিন। প্রথমে একটুক্ষণ মাটির উপর শান-বাঁধানো শড়ক দিয়ে দৌড়ে চললো, থামলো কোনো-একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে, যেন ওড়ার আগে দম নেবার জন্য। দূন থেকে চৌদূনে পৌঁছলো এঞ্জিনের শব্দ, যেন প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টায় যন্ত্রটা তার চরম বল প্রয়োগ করছে। এত অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গর্জন করলো (অন্তত তা-ই মনে হয়) যে মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো ওটা যেন ব্যর্থতার ক্রুদ্ধ স্বর, মাটির টান কাটাতে পারবে না বুঝি, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখতে পেলাম গাছপালা ছাড়িয়ে উঠে গেছি, মেঘ ছাড়িয়ে উঠে গেছি, এতক্ষণে কোথায় উঠে গেছি কে জানে। 'নো স্মোকিং' নিশানা নিবে গেলো, যাত্রীরা— অনেকে আবার কানুনমাফিক বেল্ট বেঁধে নিয়েছিলো —সহজ হ'য়ে ব'সে সিগারেট ধরালো, বই খুললো, পরিচারিকা সামনে এসে দাঁড়ালো লজঞ্চুষের ট্রে হাতে নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপান-যাত্রী'তে লিখেছেন যে মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চিত হ'য়ে উঠলে পরে অপেক্ষা করতে হওয়াটা দুঃসহ। যেমন কিনা, রাত্রিবেলা জাহাজে উঠে ব'সে তার পর যদি ভোরের আগে জাহাজ না ছাড়ে, সেই অনভিপ্রেত স্থিতিটা আমাদের পক্ষে উপভোগ্য হয় না। সে-কথা সত্য, কিন্তু অত্যন্ত বেশি অনবকাশেও পথিকের মনের তৃপ্তি নেই। এরোপ্লেন উল্টো দিকের চরমে পৌঁচেছে ; সে গতিসর্বস্ব, যথাসম্ভব অল্প সময়ে দেশ, মহাদেশ, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য, আশে-পাশে অন্য কিছুরই সে অস্তিত্ব রাখেনি। ছোঁ মেরে আমাদের তুলে নিয়েই উড়ে চললো, চললো একেবারে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে— আমরা যে শুধু আমাদের অভ্যস্ত গৃহকোণ ছেড়ে এলাম তা নয়, যার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কখনো আমরা ক্লান্ত হই না, বলতে গেলে সেই পৃথিবীটাকেও ছাড়িয়ে এলাম। যেন এক নিরালম্ব নিরঞ্জন নিখিলের মধ্য দিয়ে চলেছি ; বাইরে কোনো দৃশ্য নেই, প্রতিতুলনা নেই, আলো-ছায়ার সম্পাত নেই, স্মৃতি-জাগানো মন-কেমন-করানো কিছুই নেই ; একটা সরু, লম্বাটে, ঢালু পেটিকার মধ্যে, একটা ইস্পাতে তৈরি বোয়ালমাছের উদরের মধ্যে, পরস্পরের পক্ষে অর্থহীন নানা দেশের কতগুলো মানুষ তাদের সমস্ত পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার মধ্যে বন্দী

হ'য়ে যাত্রা করেছে। যাঁদের মন বৈরাগ্যের দিকে উন্মুখ, এ-অবস্থা তাঁদের পক্ষে বরণীয় হ'তে পারে, অতীতে যাঁরা সংসার ছেড়ে মহানিষ্ক্রমণ করেছিলেন, তাঁদের মনের পক্ষে এই বায়ুযান উপযোগী হ'তো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমরা যারা রূপে-রসে লালিত এবং তার জন্য সতৃষ্ণ, আমাদের পক্ষে প্রয়োজন আরো একটু ধীরগামী পার্থিব যান, চলতে-চলতেও আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি থাকতে চাই। প্লেনে যাঁরা সাধারণত যাওয়া-আসা ক'রে থাকেন, তাঁরাও মহাজন-সম্প্রদায়ভুক্ত, অর্থাৎ রাজপুরুষ অথবা বণিক; যেহেতু প্রত্যেকটা মিনিটকে তাঁরা মনে-মনে উপযোগের অঙ্কে তর্জমা ক'রে নিয়েছেন, সেইজন্য সময় বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনো-দিকে মন দেবার সময় নেই তাঁদের— তাঁরাও একরকমের সন্ন্যাসী বইকি। আজকের এই প্লেনে যাঁরা চলেছেন মনে হচ্ছে তাঁরা অনেকেই পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের বা আসামের প্ল্যাণ্টার, কিংবা হয়তো গঙ্গাতীরবর্তী ইংরেজ ব্যবসায়ী— প্রাচ্যদেশের বন-জঙ্গল এবং তথাকথিত 'রোমান্স'-জড়িত যে-সব সচিত্র মলাটের নভেল তাঁদের হাতে দেখতে পাচ্ছি, তা থেকেই তাঁদের পেশা এবং চরিত্র অনুমান করা সম্ভব— আমি নেহাৎই দৈবক্রমে এঁদের মধ্যে ছিটকে পড়েছি।

এর আগে বার দুই দেশের মধ্যে এরোপ্লেনে ভ্রমণ করেছিলাম। প্রথম বার ঢাকায়;— ছোটো প্লেন, ধূমপান বারণ, কিন্তু যেন খেলাচ্ছলে মিনিট চল্লিশে যখন পৌঁছিয়ে দিলো, মনে-মনে তারিফ না-ক'রে পারিনি। ট্রেন, স্টীমার, কুলি, দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানা রকম আইন-কানুনের হাঙ্গামা— ভূমিলগ্ন সমস্ত বাধা এক দমকে অতিক্রম ক'রে কী সহজে হাওয়ায় ভেসে চ'লে এলো। অথচ সেই যাওয়াটাও অত্যন্ত বেশি উদ্ধত নয়; নিচে তাকিয়ে সজল সবুজ মাটি দেখা যাচ্ছিলো, শুপুরির ঝাড়, স্মৃতিময়ী পদ্মানদীর সরু রেখা— যার বুকের উপর দিয়ে কত বার পারাপার করেছি; কখনো শীতের কুয়াশায় ভোরবেলায়, কখনো বর্ষার সূর্যাস্তের সমরোহ সঙ্গে নিয়ে; যেতে-যেতে স্টীমারের ধীর-গামিতায় বিরক্তও হয়েছি; যদিও আজ দুঃখ করি অমনি ক'রে বাংলাদেশের প্রাণের পথে যেতে-যেতে অবসরের প্রসারে বিরক্ত হবার আর কখনো সুযোগ পাবো না ব'লে। যা-ই হোক, ছোটো প্লেনে ছোটো পথ পেরোনো তেমন অ-মানুষিক মনে হয়নি, কিন্তু পরের বছর যখন বম্বাইতে যাবার নিমন্ত্রণ পেলুম, তখনও আমারই কোনো কাল্পনিক ব্যস্ততার জন্য, কিংবা ঘর ছেড়ে বেরোতেই

আমার মৌলিক অনিচ্ছার ফলে, যাওয়া-আসা দুটোই এরোপ্লেনে ধার্য হ'লো। ফিরে এসেই বুঝলুম কত বড়ো ভুল হ'য়ে গেলো। পুব থেকে পশ্চিমে ভারত-ভূমির বিশাল বিস্তার পার হ'য়ে গেলাম, পার হ'য়ে এলাম— কিন্তু কিছুই দেখলাম না, শুনলাম না, জানলাম না; কোনো নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেতন পদার্থের মতো বাহিত হলাম শুধু, শুধু উপনীত হলাম। সেবারে ছিলো বড়ো প্লেন, সে এতটাই উঁচু দিয়ে যায় যে কৃপণ ঘুলঘুলি দিয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়েও কিছুই চোখে পড়ে না— শুধু ছায়ার মতো অস্পষ্ট ঝাপসা পাটল রঙের একটা বিস্তার— ধ'রে নিতে হবে ওটাই মাটি, ওটাই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ— হয়তো মধ্য-ভারত, যেখানে আছে বিন্ধ্য পর্বত, নর্মদা নদী, দুর্ভেদ্য বন— কিন্তু আছে ব'লে কে বলবে, কোথাও কোনো অবয়ব নেই, রেখা নেই, গাঢ়তা নেই— কোনো নির্মম সমীকরণের ন্যাতা বুলিয়ে-বুলিয়ে কেউ যেন সব বৈচিত্র্য মুছে দিয়েছে, পাহাড় নদী অরণ্য নগর সব এক একায়তনিক ধূসর ম্লানিমার মধ্যে অবলুপ্ত। যদি অন্তত একটা পথেও রেলগাড়ি নিতাম, তাহ'লে সারা দেশের সঙ্গে চোখের চেনাটা হ'য়ে থাকতো, কিছু দৃশ্য-স্মৃতির সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারতাম— হাতে-হাতে খুচরো কিছু ঘণ্টা-মিনিট বাঁচাতে গিয়ে ভবিষ্যতের স্মৃতির সোনা বিসর্জন দিলাম। কথাটা ভাবতে এখনো আমার অনুশোচনা হয়।

সেবারে মনে হয়েছিলো এরোপ্লেনে ভ্রমণের মতো এমন ব্যর্থ আর-কিছু নেই। মনে হয়েছিলো, এরোপ্লেনে সত্যি বলতে ভ্রমণটাই নেই, আছে শুধু পৌঁছনো; ওর গতিবেগের ভিতরকার কথাটা যাওয়া নয়, চলা নয়, বস্তাবাঁধা মালের মতো ন্যূনতম সময়ে চালান হওয়া। আমরা চালান হই, এক-একটি নিষ্ক্রিয় পার্সেল, দৃষ্টিহীন, অনুভূতিবর্জিত, যেন কোনো তপস্বীর গুহার মধ্যে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন— দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমায়। কিন্তু দৌড় যতই লম্বা হোক, একে ভ্রমণ বলে না। আমাদের দেশে তীর্থযাত্রাকে পুণ্য বলেছে, তার আসল কারণটা দেবদেবীর অলৌকিক মহিমা নয়, পথে-পথে নতুন দৃশ্য, নতুন মানুষ, নতুন ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় এবং প্রাণের বিনিময়ের লৌকিক সার্থকতাই তার কারণ। গন্তব্যটাকে সর্বস্ব ক'রে তুলে পথটাকে তুচ্ছ করা হয়নি, বরং সেই মন্থর এবং

ক্লেশকর চলাফেরার দিনে এই কথাটাই স্পষ্ট ছিলো যে সতীর ছিন্নভিন্ন প্রত্যঙ্গ-গুলোতেই সকল পুণ্য গচ্ছিত হ'য়ে নেই, তা ছড়িয়ে আছে পথেরই হাওয়ায়, লিপ্ত হ'য়ে আছে পথিকেরই পায়ের কাহিনীময় চেতন ধুলোয়। এই সপ্রাণ, সক্রিয় ভাবটির এরোপ্লেন কোনো অস্তিত্ব রাখেনি ; মানুষের চলার মধ্যে তার নিজের ইচ্ছা এবং চেষ্টাজড়িত যে-একটি উৎসুকতা স্বভাবতই জেগে ওঠে, বায়ুপথে তার একতিল প্রশ্রয় নেই কোথাও ; আমাদের প্রাণের বেগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে শুধু যানের বেগেই এ-পথে চলতে হয়। ভ্রমণের দ্রুত এবং আরাম-দায়ক উপায়গুলিকে মানুষ দুই হাত তুলে সোল্লাসে অভ্যর্থনা করেছে, কিন্তু বেগের লোভ যখন অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠে পথটাকে একদম বরবাদ ক'রে দিলে, তখন তার বঞ্চনাটাও ধরা পড়তে বাকি থাকলো না।

জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে তাকালেই দেখতে পাই, অত্যন্ত বেশি ত্বরা আমরা সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেহ, মন, প্রাণের একটি স্বাভাবিক ছন্দ আছে , কিছুদূর পর্যন্ত তার সম্প্রসারণ চলতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃতিদ্বারা নির্দিষ্ট সীমাটা পেরিয়ে গেলে সেই বেগ মর্মান্তিক হ'য়ে ওঠে। আস্তে-আস্তে খেতে হয়, খাবার সময় অন্যমনস্ক থাকতে নেই, এই কথাগুলো অত্যন্ত প্রাচীন ব'লেই অশ্রদ্ধেয় নয় ; বস্তুত, যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে সেখানেই স্বাস্থ্য টেঁকে না। হাত, মুখ এবং কণ্ঠনালীকে অসামান্য ক্ষিপ্র বেগে চালিয়ে ভোজের থালাকে এক মিনিটে শূন্য ক'রে দেয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে তার স্বাদ গন্ধের সরস সম্ভোগে শূন্যপাত হয়, পরিপাকেও বিঘ্ন ঘটে। অর্থাৎ, আহারের যেটা উদ্দেশ্য, সেই তৃপ্তি এবং পুষ্টি কোনোটাই তাতে পাওয়া যায় না। আসলে এই উদ্দেশ্যটাও উপায়নির্ভর ; শুধু যথোচিত উপাদান জুটলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সেই উপাদানের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীও অনুসরণ করা চাই। শুনেছি, বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে এমন বড়ি তৈরি হয়েছে যার মাত্র দুটি-একটি সেবন ক'রে মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে ঐ পারিভাষিক, শাস্ত্রসম্মত 'স্বাস্থ্য' নিয়ে মানুষ সুখী হ'তে পারে না, খাদ্যসারময় বটিকা থেকে আইনমাফিক পুষ্টি পেলেও খিদের কামড়ে সে ছটফট করে। এতে বোঝা গেলো, যে-কোনো প্রকারে নিছক নগ্ন উদ্দেশ্যটুকু সাধন করতে গেলে সেই মিতব্যয়িতার কার্পণ্যে উদ্দেশ্যেরই পরাভব ঘটে। আহারের উদ্দেশ্য প্রাণধারণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা তাতে

সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উপায়টাকে মানুষ বহু যুগ ধ'রে নানা রকম কারুকার্যে পুষ্পিত ক'রে তুলেছে, সেই অলংকারকে বাহুল্য ব'লে বর্জন করলে সময় বাঁচলেও প্রাণ বাঁচে না, খিদে মেটে না। আর এই খিদেটাও শুধু পেটের খিদে নয়, মনেরও খিদে। সত্যি তো, শুধু বেঁচে থাকাই তো উদ্দেশ্য, কত স্থূল এবং অনায়াসলভ্য উপায়েই তা সাধিত হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ তা নিয়ে কত বড়ো কাণ্ডটাই বাধিয়ে তুলেছে— তার সুপক্ব অন্ন চাই, বিচিত্র আস্বাদ এবং আঘ্রাণ চাই, আলো, ফুল, সুন্দর পাত্র, আত্মীয়-বন্ধুর সাহচর্য, হাস্যালাপ, এতগুলো বাহুল্যের সমাবেশ ঘটলে তবেই আহার নামক ব্যাপারটি থেকে সে সম্পূর্ণরকম মানবিক তৃপ্তি লাভ করে। শুধু উদরের বা রসনার নয়, নাকের, চোখের তৃপ্তি, সৌন্দর্যবোধের, সৌহার্দ্যবোধের, বুদ্ধিবৃত্তির— সব একসঙ্গে— এবং এই সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তির ফলে তার অন্নেরও প্রাণপদার্থ বেড়ে যায়, আর অন্ন থেকে তেজ নিংড়ে নিতেও দেহযন্ত্র উৎসাহী হ'য়ে ওঠে। তেমনি, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মূলে যে প্রাকৃত তথ্যটা আছে সেটা অত্যন্ত জরুরি হ'লেও শুধু তার দ্বারাই এই সম্বন্ধটিকে মাপা যায় না, মানুষের ব্যবহার তাতে বহু দূরে অতিক্রম ক'রে এসেছে। এই মিলনের উদ্দেশ্য বলতে যেটা বোঝায় সেটা নিশ্চয়ই বংশরক্ষা, জীবসৃষ্টি, কিন্তু সংক্ষিপ্ততম উপায়ে প্রজননকর্মটি সম্পন্ন ক'রেই তো মানুষ থামেনি, এর চারদিকে ঘিরে-ঘিরে সে সৃষ্টি করেছে এক বিশাল ভাবলোক, সৃষ্টি করেছে প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য ; সেই পরিমণ্ডলের পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে কত সুর, কত বাণী, কত রূপকর্ম, সভ্যতার কত অমূল্য উপঢৌকন। এই যুগ-যুগান্তের মানস সঞ্চয়কে অস্বীকার ক'রে উলঙ্গভাবে উদ্দেশ্যটাকেই প্রয়োগ করতে মানুষ তখনই উদ্যত হয়, যখন সে আর প্রকৃতিস্থ থাকে না। কিন্তু সংবিৎ ফিরে এলেই সে দেখতে পায় যে তার দেহমনের সকল বৃত্তির সার্থকতা ঐ দূরপথেই, ঘুরপথেই, ঐ সময়সাপেক্ষ, প্রতীক্ষাজড়িত, আবেগমণ্ডিত বিলম্বই তার স্বধর্ম। আর সেই জগতে, যেখানে কল্পনার আলো-ছায়ার খেলা চলছে, যেখানে বাস্তব রূপান্তরিত হ'য়ে হৃদয়ের সত্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে প্রকৃতির সমস্ত দাবি মিটে গিয়েও অনেক-কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত অংশটা এতই বড়ো যে তার মধ্যে জৈব উদ্দেশ্যটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা যখন সবান্ধবে সুসজ্জিতভাবে ভোজের সভায় উপস্থিত হই, তখন আমরা কখনো ভাবি না যে নেহাৎই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কিছু বনজ এবং

জান্তব পদার্থ গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। বাসরশয্যার বেপথুমান বর-বধূর মনেও এমন চিন্তার কদাচ উদয় হয় না যে তারা আজ পরস্পরের মধ্যে দ্রব হ'য়ে যাচ্ছে একটি সন্তানের জন্ম হবে ব'লেই। অর্থাৎ, যাকে উদ্দেশ্য বলছি, সেটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে সার্থক হ'তে পারে তখনই, যখন মানুষ সেটাকে ভুলে যায়।

কিন্তু এরোপ্লেন মুহূর্তের জন্যও তার উদ্দেশ্য ভোলে না, ভুলতে দেয় না সে মূর্তিমান এফিশিয়েন্সি, কর্মপটুতা; তার উপায় নিরাকার, পথ শূন্যময়, তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে শুধু পৌঁছবার প্রকাণ্ড একটা একটানা প্রতিজ্ঞা। উদ্দেশ্যসিদ্ধির এই অত্যধিক গরজটাকে মানুষ তার কাজের ক্ষেত্রে বাহবা দিতে পারে, এতে তার হিশেবের খাতায় মুনফার অঙ্কের চক্রবৃদ্ধি সম্ভব, কিন্তু তার আনন্দের ক্ষেত্রে কুড়েমি করাই তার স্বভাব, যেখানে তার ভালো লাগে সেখানেই সে দেরি করে, ধীরে-সুস্থে, চেখে-চেখে, রসিয়ে-রসিয়ে ভোগ করতে চায়। খবর-কাগজের হেড-লাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগে না, কিন্তু কবিতার লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে অদৃশ্য লিপি প'ড়ে নেবার জন্য সারা জীবনও যথেষ্ট কিনা কে জানে। আপিশে ব'সে কাজের কথাবার্তা কাঁটায়-কাঁটায় মিনিটের মাপে চলতে পারে, কিন্তু বাড়িতে যখন বন্ধুদের আহ্বান করি তখন ঘড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে অবসরের বারান্দাটাতেই বসতে হয়। পথে বেরিয়ে পথটাকেও আমরা এমনি ক'রে উপভোগ করতে চাই; খুঁটে-খুঁটে খেতে চাই একটু-একটু ক'রে; থেমে, তাকিয়ে, জিরিয়ে, জুড়িয়ে, আস্তে-আস্তে অভ্যস্ত থেকে নতুনের মধ্যে অগ্রসর হ'তে চাই, আর এই অনুক্রমিক প্রক্রিয়ার ফলেই নতুনকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। কেননা, যদিও আমরা মুখে ব'লে থাকি যে মনের চেয়ে দ্রুতগামী আর-কিছু নেই, তবু আসলে আমাদের মনের ছন্দ আমাদের রক্তেরই ছন্দ— সেই রক্ত, যে এখনো সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির বশ মানেনি, অমিতভাবে মুকুলের অপব্যয় না-ক'রে যে এখন পর্যন্ত একটি ফলও ফলাতে পারে না। মনের স্বভাবটা বিলাসী, লয়টা ঢিমে, ছন্দ মন্দাক্রান্তা। তার অভিজ্ঞতার ধারা দীর্ঘসূত্রী, খুশির পথ আঁকাবাঁকা এবং বিশ্রামবহুল, যে-কোনো নতুন দিকে যাত্রা করার জন্য সে সৈনিকের মতো এক পায়ে খাড়া থাকতে পারে না, বিলাসীর মতো তৈরি হ'তে সময় নেয়। এরোপ্লেন আমাদের মনের এই

স্বাভাবিক ছন্দটাকে লঙ্ঘন ক'রে চলে, তাই তার সঙ্গে আমাদের কোনো মানবিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। আমরা তার বিবরে ব'সেও দূরে থাকি— দূর, বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত; পথটাকে সে এমনতর গোগ্রাসে গিলে নেয় যে আমাদের পক্ষে সেটা প্রায় উপবাসেরই শামিল, হাজার-হাজার মাইল পেরিয়ে চলেছি ব'লেই মনে হয় না। ভূমিকা নেই, পূর্বাভাস নেই, প্রস্তুতির অবসর নেই, প্রাসঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বা প্রক্ষিপ্ত কিছু নেই, এক ফোঁটা বাহুল্য নেই কোথাও— আমাদের সব ক-টা সুস্থ প্রবৃত্তি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

বাহুল্য নেই, এই কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য। শুধু যে বাইরে তাকিয়ে দ্রষ্টব্য কিছু নেই তা নয়, ভিতরেও এমন কিছু নেই যেটা মনের পক্ষে আকর্ষণযোগ্য। এঞ্জিনের গর্জন এবং বসবার সারবাঁধা ব্যবস্থার জন্য সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ অত্যন্ত পরিমিত; দৈবাৎ আপনি যার পাশে আসন পেয়েছেন বড়ো জোর তার সঙ্গে দু-একটা মামুলি কথার বিনিময়— যদি অবশ্য তার ভাষা আপনার জানা থাকে। কিন্তু ভাষার বাধা না-থাকলেও আলাপ-পরিচয়ে কোনো পক্ষই তেমন উৎসাহিত হয় না, কেননা এই পথের মেয়াদ বড়োই ক্ষণস্থায়ী, বলতে গেলে এক্ষুনি তো নেমে যাবো, আর তার পরেই এই মানুষগুলো কে কোথায়। জাহাজে, যেখানে অনেকগুলো দীর্ঘ দিন কাটাতে হয়, সেখানে পারস্পরিক মানসিক বিনিময়ের দিকে স্বভাবতই আগ্রহ জাগে, বন্ধুতা, প্রীতিস্থাপন, হয়তো বা কোনো নাটকীয় বা হার্দ্য ঘটনার পক্ষেও যথেষ্ট অবসর মেলে সেখানে। রেলগাড়িতেও তা-ই; তার মেয়াদ খুব দীর্ঘ না-হ'লেও নানা রকম উপকরণে সমৃদ্ধ— স্টেশনে থামা, যাত্রীদের ওঠা-নামা, সকালে-সন্ধ্যায় আলো-ছায়ার আবর্তন— ধাবমান বিচিত্র ঘণ্টাগুলি ভ'রে সহযাত্রীরা পরস্পরের প্রতি একেবারেই উদাসীন হ'য়ে ব'সে থাকে না; কোনো প্রয়োজনে, নয়তো সৌজন্য অথবা কৌতূহলবশত, কিংবা নেহাৎই হয়তো পথের শ্রান্তি দূর করার চেষ্টায়, কেউ-না-কেউ কারো-না-কারো সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হ'য়েই থাকে। কিন্তু এরোপ্লেনে সে-রকম কোনো পরিবেশ নেই, আবহাওয়া নেই। যাত্রীরা শারীরিক অর্থেই একে অন্যের দিকে পিঠ ফেরানো; কুঁজোর জল, টিফিন-কেরিয়ারের খাবার, এই সব সামাজিকতার সূত্রগুলিও অনুপস্থিত, যেহেতু সকলের জন্য সব রকম পানাহারের ব্যবস্থা প্লেন-কোম্পানির কর্তারাই ক'রে রেখেছেন। অতএব এই বায়ুযানের বাইরেটা

যেমন চোখের পক্ষে শূন্য, ভিতরটাও মনের পক্ষে তা-ই। এমনকি এর অবয়ব সুষ্ঠু জ্যামিতিক চিত্রের মতো বাহুল্যহীন; ওজন বাঁচাতে হবে ব'লে এর সমস্ত মাপজোক যথাসম্ভব ছোটো, স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে প্রচুরতম সেবার ব্যবস্থা ধরাতে গিয়ে মানুষের উদ্ভাবনীপ্রতিভা একে কাজ-চালানো কৃপণ ইকনমির আদর্শ ক'রে তুলেছে। দু-সার চেয়ারের মাঝখানকার গলি-পথ দিয়ে দু-জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না, অথচ ওরই একপ্রান্তে পানীয় জলের কল পাবেন, পাশে দেয়াল-তাকে সারি-সারি সচিত্র পত্রিকা, আর-এক প্রান্তে অতিশয় ক্ষুদ্র একটি বাথরুম, সেখানে একই কলে ঠাণ্ডা আর গরম জল বেরোচ্ছে, হাত ধোবার সাবান থেকে দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক ক্ষুর পর্যন্ত প্রসাধনের সরঞ্জাম আছে সাজানো; কিন্তু প্রকোষ্ঠটি এতই ছোটো যে ভিতরে যাওয়ামাত্রই বেরোবার জন্যে ছটফট ক'রে উঠতে হয়। আর বেরিয়ে এসে আপনাকে অবশ্য আবার সেই নির্দিষ্ট আসনটিতেই বসতে হবে, তার হাতলেই অ্যাশ-ট্রে বসানো আছে, গেলাশ রাখার গর্ত, খাবার ট্রে বসাবার খাঁজ, মাথার উপরে বই পড়ার ছোটো আলো, হাত বাড়ালে তাকের উপর পশমি ওড়না, শীতবোধ হ'লে পেড়ে নেবেন। সামনের চেয়ারটার পিঠের দিকে যে-থলিটা আছে সেটা আপনার প্রাপ্য; তাতে আপনার খাবার-ট্রে অপেক্ষা করছে, হাতের বইপত্র থাকতে পারে। মোটের উপর, যাকে সুবিধে বলা হয় তার আয়োজনে কোথাও এতটুকু ত্রুটি বা উদাসীনতা নেই, পানাহারের আতিথ্যও দরাজ— খুব সম্ভব বায়ুপথের অন্যবিধ সমস্ত বঞ্চনার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আহারে এবং উপাহারে আহ্বান আসে অত্যন্ত ঘন-ঘন। এই ব্যবস্থাটি না-থাকলে যাত্রীদের অবস্থা প্রায় দুঃসহ হ'তো তাতে সন্দেহ নেই— অন্তত এটা শ্রান্তিনিবারক, ব্যাহত তন্দ্রায় পুনরুজ্জীবক, দিনরাত্রির যে-কোনো সময়ে মানচিত্রের যে-কোনো একটি বিন্দুর উপর অচিরভাবে ভাসমান হবার পক্ষে কথঞ্চিৎ উৎসাহজনক— আর তাছাড়া যখন নাস্তিমান ব্যোমমার্গে কৃ-ধাতুটি প্রায় অবলুপ্ত, তখন কিছু-একটা করতে পেলেই মনটা একটু সজীব হ'য়ে ওঠে। তবে কথাটা এই যে মানুষ তো শুধু ক্ষুৎ-পিপাসার বাণ্ডিল নয়, তা ছাড়াও তার দু-চারটে যা চাহিদা আছে— অনুগ্র, অপেক্ষমাণ কিন্তু অপ্রতিরোধ্য চাহিদা— সেগুলোকে মাটির কোলে পরিত্যাগ ক'রেই বিমান তার জয়যাত্রায় বেরিয়েছে। কোনো রঙের চমক, কোনো প্রাণের দোলা, কোনো বৈচিত্র্যের

আভাস— দৈবাৎ জুটে যায় তো ভালো, কিন্তু কেউ যেন আশা না করে। এরোপ্লেনে যে-মুহূর্তে উঠে বসলেন, সে-মুহূর্তে আপনার নিছক দৈহিক অস্তিত্ব-টুকুর মধ্যে সীমিত হ'য়ে গেলেন আপনি, তার বাইরে আর কিছুই নেই— একটা পাখি চোখে পড়বে না, কচিৎ কখনো অনেক নিচে একটুখানি প্রেতের মতো মেঘের ধোঁয়া—এমন কি ঐ কৌশলময় নীরন্ধ্র যন্ত্রটার মধ্যে দিনরাত্রির প্রভেদও যেন লুপ্ত হ'য়ে যায়। এই শেষের কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেলো; আসল কথাটা এই যে বিমানের মধ্যে দিন আর রাত্রি এই দুটো স্থূল বিভাগেরই অস্তিত্ব আছে, সকাল, বিকেল, দুপুর প্রভৃতি উপবিভাগগুলোর স্পষ্ট কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, আর তাদের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যে-সব শ্রুতি, মীড়, ঝংকার নিয়ে শাশ্বতভাবে আমরা বসবাস ক'রে আসছি, তারা তো কোন দূরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে। বাইরে তাকালে রোদ্দুর বোঝা যায়, সন্ধে হ'লে বাতিও জ্বলে, কিন্তু প্লেনের মধ্যে দিনের আলো সর্বদাই ম্লান, তাপের মাত্রাও নিয়ন্ত্রিত, তাই পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের আলোছায়ার সম্পাত এখানে ভালো ক'রে পৌঁছতে পারে না। দুপুরবেলার তুলনায় দুপুর-রাত্তিরে শীত একটু বেশি করবে, বিকেলের চাইতে সকালের আলো একটু হয়তো কড়া লাগবে চোখে, কিন্তু এই ভিন্ন-ভিন্ন সময়গুলোর মধ্যে যে-বিশেষ এক-একটি মানসিক ভাব জড়িত আছে, এই পর্দানশিন, শীলমোহর-করা অন্তঃপুরে তাদের প্রবেশের কোনো পথ নেই।

সবচেয়ে অদ্ভুত কথাটা এই যে এরোপ্লেনের গতির বেগ আমাদের অনুভূতির কাছে প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের তৈরি এই যন্ত্র বেগের শক্তিতে বিধাতার অনেক সৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে গেছে; কোনো তুফান এত জোরে ছোটে না, কোনো বন্যার জল এমন বেগে জনপদ ভাসিয়ে নেয় না, যেমন এই পুষ্পক রথ নীলিমাকে দীর্ণ ক'রে চ'লে যায়। কিন্তু হ'লে হবে কী— এই বেগ আছে শুধু তথ্যে, শুধু গণিতে, আমার চেতনায় তার অণুমাত্র ইঙ্গিত নেই। ঘণ্টায় দু-শো, তিনশো, পাঁচশো মাইল বেগে চলেছি, কিন্তু বাইরে কোনো চলমান দৃশ্যের প্রমাণপত্র নেই ব'লে, আর প্লেনের গতি নিরতিশয় মসৃণ ব'লে, আমাদের মনে হয় যেন থেমেই আছি, শূন্যে ঝুলে আছি স্থির হ'য়ে, যেন এরোপ্লেনটা কোনো অতিকায় ভ্রমর-দানবের মতো আকাশের বুকের মধ্যে নিশ্চল হ'য়ে লৌহশব্দে গুঞ্জিত হচ্ছে। দূরকে জয় করবে ব'লে যে-মানুষ সমুদ্রে প্রথম ভেলা ভাসিয়ে-

ছিলো, লাফিয়ে উঠে বসেছিলো বুনো ঘোড়ার পিঠের উপর, তার শক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হ'তে-হ'তে নিজেরই মধ্যে এই অদ্ভুত বিরোধ জাগিয়ে তুলেছে : যখন সে সত্যি-সত্যি রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়াটার সওয়ার হ'য়ে বসতে পারলো, তখনই তার চেতনার কাছে সেই গতির কোনো অর্থ থাকলো না।

এ-কথা মানতেই হবে যে গতির একটি নিজস্ব এবং বিশুদ্ধ আনন্দ আছে, সেটা প্রায় নেশারই মতো। কাজে লাগছে ব'লে নয়, সময় বাঁচানো যাচ্ছে ব'লে নয়, নিজের বা জগতের কোনো উপকার করা যাচ্ছে ব'লে নয়— চলছি ব'লেই ভালো লাগে আমাদের, চলছি ব'লে অনুভব করতে ভালো লাগে, সেই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে আমাদের রক্তে, স্নায়ুতন্ত্রীতে, কোনো উদ্দীপক সুরার মতো মনটাকে আবিষ্ট ক'রে তোলে। শিশুরা যে-কোনো চাকাওলা খেলনা নিয়ে মেতে ওঠে, সেটাকে ঠেলতে পারলেও তারা খুশি, চড়তে পারলে তো কথাই নেই। শিশু নয় এমন মানুষও নাগরদোলা ভালোবাসে, সমুদ্রের ঢেউ খেতে ভালোবাসে, গাড়ি চড়তে ভালোবাসে। কিন্তু— অল্ডাস হাক্সলি অনেক আগেই এ-কথাটা বলেছিলেন— এই বৈজ্ঞানিক যুগে যান যত উন্নত হচ্ছে, গতির সত্যিকার অনুভূতিটাও ক্ষীণ হ'য়ে আসছে ঠিক সেই অনুপাতে। ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘণ্টায় বারো মাইল ছোটার যে উন্মাদনা, রেলগাড়িতে তিরিশ মাইলও সে-তুলনায় ক্ষীণ, আবার রেলগাড়িতে যাট মাইলে যে-তীব্র রস পাওয়া যায়, মসৃণ মোটরগাড়িতে তা পেতে হ'লে আইন এবং সুবুদ্ধির শাসন অমান্য করতে হবে। যত দামি, যত বড়ো, যত নিখুঁত-নির্মিত হয় মোটরগাড়ি, তার গতিটা আমরা ততই কম অনুভব করি ; আর এই গতির প্রগতির সর্বাধুনিক ধাপটিতে, এক-এক ঘণ্টায় এক-এক দেশ পেরিয়ে-যাওয়া হাওয়াই জাহাজে, এই অনুভূতি একেবারেই শূন্যে এসে ঠেকলো। কিছুই না ; চুপ ক'রে ব'সে আছেন শুধু, চুপ, স্তব্ধ— শুধু একটা একঘেয়ে গুঞ্জন শুনছেন, তা ছাড়া সব স্তব্ধ, মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় থেমে আছেন— অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে আপনার। আর যা আমাদের মনে হয় সেটা দিয়েই তো কথা, আমাদের চৈতন্যের কাছে সেটাই তো মূল্যবান।

অবশ্য এ-রকম না-হ'য়েও উপায় ছিলো না, কেননা এরোপ্লেনের গতির অনুভূতি সহ্য করা মানুষের রক্তমাংসের পক্ষে সম্ভব নয়। শুনেছি, একবার

কোথায় একটি চলতি প্লেনের দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়, তাতে আর-কোনো বিপদ হয়নি, শুধু হাওয়ার প্রচণ্ড ঝাপটেই অনেক মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে যায়, একজন হার্টফেল ক'রে মারা পড়ে। অতএব যাতে মুহূর্তের জন্যও গতিটা আমাদের বোধগম্য না হয়, সেই রকমের ব্যবস্থা করাই যুক্তিসংগত হয়েছে। যুক্তিসংগত— নিশ্চয়ই, তবু এই কথাটা থেকেই গেলো যে অভিজ্ঞতা হিশেবে পুষ্পক-বিহার ব্যর্থ; এর মধ্যে এমন কিছুই স্থান পায়নি, যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রশ্রয় দেয়, ব্যক্তিস্বরূপকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক এই যাত্রা, নৈসর্গিক বা মানবিক সঙ্গরহিত, আলোছায়ার বৈচিত্র্যবর্জিত; বিবর্ণ, ধূসর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকি আমরা, ব'সে-ব'সে কখনো চেয়ারটাকে উঁচু ক'রে বাইরে তাকাই বা বই খুলি, কখনো নামিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজি, কখনো পা দুটোকে সম্ভবমতো ছড়িয়ে দিই, কখনো বা গুটিয়ে নিয়ে বসি, কখনো হাঁটুর উপর ছড়িয়ে দিই ওভারকোট, কখনো বা তাকে তুলে রাখি সেটাকে— এটুকু, এইটুকুমাত্র বৈচিত্র্যসাধন, যা আমাদের হাতে আছে। এবং এই কারণেই— যদিও এরোপ্লেন এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান, তবু মানুষের হৃদয়ের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে সে এখনো স্থান পেলো না। যুদ্ধের প্রয়োজনেই এর আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে, এর গড়ন, চলন, বলন ইত্যাদিও সৈনিকের মনোভাবের সঙ্গেই মানিয়ে যায়, গৃহী মানুষ এর জবরদস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। সৈনিক নিজেও একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, সে একটা অন্ধ বধির বিরাট যন্ত্রশক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তার কাছে ট্রেন ট্যাঙ্ক জাহাজ বিমান সবই সমান। কিন্তু যে-মানুষের মন এবং হৃদয় নামক উপসর্গ দুটো এখনো সজাগ, তার সঙ্গে এরোপ্লেনের সহজ ব্যবহারের পথ খোলা নেই। তুলনায় কত বেশি আশ্চর্য এবং সজীব মনে হয় রেলগাড়িকে; যখন বিশাল নামহীন প্রান্তরের উপর করুণ হ'য়ে সন্ধ্যা নামে, কিংবা যখন রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে দোল খেতে-খেতে তার গতির মত্ত আলোড়ন সমস্ত সত্তা দিয়ে শোষণ ক'রে নিই, কিংবা হয়তো নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকি ঘুরে-চলা দিগন্তের উপর স'রে-স'রে-যাওয়া তারাদের দিকে। কত বেশি সুন্দর এবং বাস্তব মনে হয় জাহাজটাকে, ভিতরে যার নাচ, গান, আলো, উৎসব আর বাইরে অকূল সমুদ্রের উপর অসীম অন্ধকার, হয়তো বা পরিত্যক্ত ডেকের নির্জনে একলা কোনো দুঃখী মানুষ— যার একদিকে নিঃসঙ্গ চাঁদ যেন আত্মহত্যা

ক'রে ডুবে মরে, আর-একদিকে সদ্যস্নাত সূর্য উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকায়; একদিকে জলরাশির রহস্যময় গম্ভীর বিস্তার, আর-একদিকে বন্দরের বর্ণ, গন্ধ, শব্দের ঐশ্বর্য। স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণের মধ্যে এই যেগুলো উপরি-পাওনা, এগুলোকেই মানুষ সত্যি-সত্যি পেয়েছে, এগুলো তার ভাবের তাপে জীর্ণ হয়েছে, মনের তাঁতে বোনা হ'য়ে গেছে— সেই সঞ্চয় এতই বড়ো যে তার তুলনায় পৌঁছনোটা গৌণ ঘটনা ব'লে মনে হয়। সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার বুনোনের মধ্যে এরোপ্লেন কিছু যোগ করতে পারেনি, মানুষের চিন্ময় সম্পদ যেখানে যুগে-যুগে জমা হচ্ছে এবং বদলে যাচ্ছে, সভ্যতার সেই উপরতলায় কোনো দান নেই তার। আজকের দিনের কথাসাহিত্যে জাহাজ কিংবা রেলগাড়ির পটভূমিকা অসংখ্যবার পাওয়া যাবে, কিন্তু এরোপ্লেনকে ঘটনাস্থল ক'রে কোনো আধুনিক সমার্সেট মম গল্প লেখেননি।—কিন্তু এই সমস্ত উক্তিগুলোর পরে একটা 'এখনো' যোগ করা উচিত; হাজার হোক, এরোপ্লেনটা আনকোরা নতুন, আমাদের পুত্র কিংবা পৌত্রদের সময়ে লেখকরা যে এটাকেও তাদের মূলধনের মধ্যে পুরে নেবে না সে-কথা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? ততদিনে এই যন্ত্রটারও চেহারা ঠিক এই রকমই থাকবে ব'লে ভাবা যায় না— তবে সেটা কি আরো কঠোর, আরো নিপুণ, আরো নির্ভুল, আরো নির্মম হবে, না কি হঠাৎ কোনো দুর্বল মুহূর্তে একটুখানি রক্তমাংসকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলবে, সে-কথা আজকের দিনে উদ্ভাবকদেরও অজ্ঞাত। কিন্তু যা-ই হোক না, এ-রকম একটা সম্ভাবনাকে মেনে নেয়াই ভালো মনে করি, কেননা ইতিহাস বিবর্তনপ্রবণ, মানবস্বভাব আশ্চর্যরকম স্থিতিস্থাপক, এবং অভ্যাসের মতো রাজবৈদ্য আর নেই।

২

তিনটের সময় প্লেন ছাড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে জানতে পারলাম যে আমরা উঠে এসেছি তেত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে, চলেছি ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে-চারশো মাইল। জানতে পারলাম— তার মানে, খবর হিশেবে জানলাম, এই খবরটা অন্য কারো সম্বন্ধে হ'লেও ক্ষতি ছিলো না। যেমন আমরা কাগজে পড়ি যে অমুক বৈজ্ঞানিক পার্থিব বায়ুমণ্ডল অতিক্রম ক'রে বহু ঊর্ধ্বে বিহার ক'রে এসেছেন, এও প্রায় সেই রকমেরই জানা। 'তেত্রিশ হাজার', 'সাড়ে-চারশো', এই অঙ্কগুলো আমাদের বুদ্ধির খাতায় নিস্তাপভাবে টুকে নিলাম শুধু, উদাসভাবে তথ্যের ঝুলিতে পুরে নিলাম, তার রোমাঞ্চ, তার উত্তেজনা, তার ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি— সমস্তই বাদ গেলো, এবং বাদ গেলো ব'লেই সম্ভব হ'লো ঘটনাটা। এভারেস্টের চূড়োর চেয়েও উঁচুতে উঠে এসে আমরা যে সুস্থ শরীরে টিঁকে আছি, স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিচ্ছি, এতেই বোঝা যায় কোথাও একটা ফাঁকি আছে। সেটা এই যে এরোপ্লেনের ভিতরকার আবহাওয়া সযত্নে নিয়ন্ত্রিত ; বাইরে যদিও নির্বাত হিমলোক, তবু এই মস্ত ফাঁপা নিরেট মাছটার পেটের মধ্যে ঠিক ততটাই তাপ আছে, হাওয়া আছে, যতটা পাওয়া যায় সাড়ে-সাত হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে। অর্থাৎ, ঐ তেত্রিশ হাজারটাই ফাঁকি, কথার কথা, আমরা আবহাওয়ার হিশেবে— যদিও আর-কোনো হিশেবেই নয়— আছি মাত্র উটকামণ্ডে, কোনো শৈলশৃঙ্গে প্রথম পৌঁছবার মতোই হঠাৎ শীতের সুখকর স্পর্শটুকু পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি, ঐ সাড়ে-চারশো মাইলটাও আছে শুধু খাতায়-পত্রে, পাইলটের পঞ্জিকায়, আসলে আমরা স্পন্দমান, শব্দায়মান নিঃস্রোত একটা গতিহীনতার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে আছি।

যে-প্লেনটায় চলেছি সেটা বিমানবিজ্ঞানের ইদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে কথিত, 'কমেট'-উপাধিধারী ব্যোমযান। এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হবার পর থেকে, বিশেষত কলকাতার কাছেই সম্প্রতি একটি বিরাট অপঘাত ঘ'টে যাওয়ায়, এইটে নিয়ে কাগজে এবং লোকমুখে বিস্তর আলোচনার প্রচার হয়েছে। বোধহয় ঐ অপঘাতের পর থেকে লোকেরা একটু বাঁকা চোখে এর দিকে তাকিয়ে থাকে, তাই এর গৌরবের কথা আরো বেশি চেঁচিয়ে বলার প্রয়োজন হ'লো। অন্তত কলকাতায় আমার ভ্রমণের ব্যবস্থার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত

ছিলো, তাঁরা, নিজেরা মার্কিন হওয়া সত্ত্বেও, এই ইংরেজ তরণীর প্রশংসায় সুপ্রচুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মুখে শুনেছিলুম যে এই যান্ত্রিক ধূমকেতুর গতি নিঃশব্দ এবং স্পন্দনহীন, আভ্যন্তরীণ আরাম বিষয়েও নাকি অন্য কোনো নভোচারীর সঙ্গে তুলনাই হয় না। শুনে ভেবেছিলুম কী জানি কী ব্যাপার, দেখে নিরাশ হ'তে হ'লো। দেখতে-শুনতে (শুনতেও) অন্য যে-কোনো প্লেনেরই মতো, গড়নে এবং কলকব্জায় কিছু তফাৎ থাকলেও যাত্রীদের জন্য তেমনি আঁটোসাঁটো নিক্তি-মাপা ব্যবস্থা, সংকীর্ণ পরিসর, স্তম্ভিত সময়। আওয়াজ এবং আন্দোলন একটু হয়তো কম হয়, কিন্তু হয় না বললে সত্যের অপলাপ ঘটে। অবশ্য ইনি একাধিক অর্থেই সবচেয়ে উন্নত তাতে সন্দেহ নেই, এত উঁচুতে আর-কোনো প্লেন উঠতে পারে না, এমন বেগও অন্য কোনোটার নেই, কিন্তু আগেই বলেছি— আপনার আমার তাতে কিছুই এসে যায় না। প্লেনে উঠে বসার পর সেটা ঘণ্টায় দু-শো মাইলই চলুক আর পাঁচশো মাইলই চলুক, আমাদের পক্ষে তা একই কথা, আমাদের অনুভূতি, অর্থাৎ অনুভূতির অভাবটা ঠিক একই রকম। যখন তিরিশ-হাজারি ঊর্ধ্বলোকে ইন্দ্রসভার গা ঘেঁষে চলেছি, আর যখন মাত্র পনেরো কিংবা কুড়ি হাজার ফুটে কিন্নরলোকে বিরাজ করছি, এ-দুটো অবস্থার মধ্যেও কোনোরকম প্রভেদ বোঝার উপায় নেই। অতএব, যা-ই বলুক না বিজ্ঞাপনে, আপনি কোনদিক থেকে জিতলেন সেটা ঠাহর করা খুব শক্ত। এক, কলকাতা-লণ্ডন পাড়ি দিতে গিয়ে আপনার জীবনের সাত-সাতটি মহামূল্য ঘণ্টা আপনি বাঁচাতে পারলেন, এই অদৃশ্য এবং নির্বস্তুক লাভের থলিটাকে আঁকড়ে নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ সুখী হবার চেষ্টা করা যেতে পারে— তবে ঐ সাত ঘণ্টা সময় কোন কারণে মহামূল্য, সেটা বাঁচিয়েই বা আপনার কী সার্থকতা হ'লো, তাতে কোন সুকৃতি সাধন করলেন বা কোন আনন্দ উপভোগ করলেন, এ-সব অবশ্য আলাদা কথা।

অবশ্য আরো একটা লাভ এতে আছে ; সেটা বলতে পারার সুখ, গল্প করতে পারার সুখ, সর্বাধুনিকের আস্বাদ নেবার সামাজিক এবং সবিশ কণ্ডূয়নের তৃপ্তি। যারা সামাজিক জীবনে ধোপদুরস্ত হ'য়ে চলতে চায়, তারাই নব্যতমের প্রধানতম খদ্দের ; খাওয়া, পরা, পড়া (অন্তত বইয়ের নাম শোনা), চড়া, সমস্ত বিষয়েই নতুন থেকে নতুনতরর পশ্চাদ্ধাবান ক'রে এরা যে কখনো ক্লান্ত হয় না, তার কারণ এগুলো সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবান, আর এদের কাছে

সামাজিক মূল্যটাই চরম। বন্ধুমহলে ক্ষণিক গৌরবলাভের জন্য, কথাবার্তার ফুটন্ত কেটলিতে হঠাৎ কয়েকটা বিস্ময়চিহ্নের বুদ্বুদ তোলার জন্য, কিংবা নেহাৎই প্রতিযোগিতায় অন্য কারো কাছে হেরে না-যাবার জন্য— শুধু এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম, প্রভূত অর্থব্যয় করে এরা, দেহে-মনে নানারকম কষ্ট সহ্য করে, বেড়াতে যায় (মনে-মনে বিরক্ত হ'য়ে) রোম অথেন্স ইস্তাম্বুলে, ক্লান্তিকর উপন্যাসের পাতা ওল্টায়, অন্তঃসারশূন্য সিনেমা ছাখে ব'সে-ব'সে, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে হালফ্যাশনের মহামূল্য চিকিৎসা করায়, তথাকথিত ভাইটামিনে ভরা বিস্বাদ খাবার চিবোয়, আতস কাচের চশমা প'রে মনের আয়না চোখ ছুটোকে ঢেকে দেয়, দৃষ্টিশক্তিরও সর্বনাশ করে। আমি যদি এই ফ্যাশনজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতুম, তাহ'লে এই কমেটে চ'ড়ে নগদ কিছু পাওনা জুটতো আমার— আর-কোনো কারণে নয়, এটা নতুনতম ব'লেই। আমেরিকাতে এসেও দেখেছি, আমি কমেটযাত্রী ছিলুম শুনে লোকেরা কৌতূহলী হ'য়ে, এমনকি একটু ঈর্ষুক চোখে, আমার দিকে তাকিয়েছে; এতে বোঝা যায় যে আজকের দিনে, অর্থাৎ এই বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে, এই ব্যোমযান বিস্ময়কর ব'লে বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সত্যি কি বিস্ময়কর?

এই কথাটাই— বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে হয়তো বিহার, হয়তো উত্তরপ্রদেশের উপর দিয়ে যেতে-যেতে, কোলে বই, চিঠি লেখার কাগজ, হাতে ঈষদুষ্ণ নিস্বাদ চায়ের পেয়ালা— এই কথাটাই ভাবছিলুম মনে-মনে। এই তো ভোগ করছি আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ একটি উপহার, মানুষের শক্তির একটা অবিশ্বাস্য অথচ অনস্বীকার্য প্রমাণের মধ্যে ব'সে আছি, কিন্তু, কিন্তু— তাতে হয়েছে কী? ভেবে দেখতে গেলে ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর যে মানুষের প্রায় পাগল হ'য়ে যাবার কথা— কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিস্ময়ের শিহরন কি অনুভব করলাম? কই, না তো। সবচেয়ে আশ্চর্য এইটেই যে একটুও আশ্চর্যের ভাব লাগলো না; যে-রকম শুনেছি, ভেবেছি, এ তো ঠিক সেই রকমই, বরং কোনো-কোনো বিষয়ে একটু নৈরাশ্যজনক— এতে অবাক হবার কী আছে? এ যে অনেক, অনেক উঁচুতে উঠবে, অনেক, অনেক দ্রুতবেগে চলবে, এ-সব তো জানা কথাই, প্রথম থেকেই তা মেনে নিয়েছি আমরা, ধ'রে নিয়েছি স্বীকৃত ব'লে— এর মধ্যে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

আসল কথাটা এই যে ম্যালথস-বর্ণিত কৃষিক্ষেত্রের মতো, এ-যুগের বিস্ময়ের ফসলেও প্রগতিশীল ক্ষীয়মাণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কথাটা হঠাৎ একটু অদ্ভুত শোনাবে, কেননা গত একশো-দেড়শো বছরের মধ্যে ফলিত বিজ্ঞান যত অসংখ্য এবং বিচিত্র রকমের বিস্ময়কর বস্তুর আমদানি করেছে, সভ্যতার ইতিহাসে এমন কখনো আগে ঘটেনি। কিন্তু সেইজন্যই— যেহেতু বিস্ময়ের বস্তু মানুষের সামনে বিপুল পরিমাণে পুঞ্জিত হ'য়ে উঠছে, ঠিক সেই-জন্যই তার বিস্ময়ের বোধ কমতে-কমতে অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকলো। যখন প্রত্যেক দশ বছর, পাঁচ বছর, দু-বছর পর-পর কোনো-না-কোনো 'যুগান্তরকারী' আবিষ্কারের উদ্গম হ'তে থাকে, এবং বছর-বছর, মাসে-মাসে, সপ্তাহে-সপ্তাহে নতুন থেকে আরো নতুনের, অদ্ভুত ছেড়ে আরো অদ্ভুতের প্রাচুর্যে মানুষের দম আটকে আসার দশা হয়, তখন তার অবাক হবার শক্তি আর থাকে না, আত্মরক্ষারই জৈব প্রয়োজনে মন তার নিজের চারদিকে অভ্যাসের শক্ত খোলশ গ'ড়ে তোলে। রোজ-রোজ উৎসব হ'লে মানুষ তাতে আনন্দ পায় না, রোজ-রোজ চেঁচিয়ে উঠে লম্ফ দেবার কারণ ঘটলে মানুষ শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রেই ব'সে থাকে। আজকের দিনে হয়েছে ঠিক তা-ই; বিজ্ঞানের 'মির্যাকল' যতই হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ছে, একটার প্রতিধ্বনি না-মিলোতেই আর-একটার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, যতই জমকালোভাবে পরবর্তীটা টেক্কা দিচ্ছে আগেরটার উপর, ততই আমরা উদাসভাবে, নিঃসাড়-ভাবে গ্রহণ করছি সেগুলোকে— যদি-না অবশ্য মনের মধ্যে সঙ্গে-সঙ্গে এই চিন্তার উদয় হয় যে এটার জন্য আগামী যুদ্ধ না জানি আরো কত বীভৎস হ'য়ে উঠবে। জুল ভের্নের, এমনকি এইচ. জি. ওয়েলস-এর সময়েও যে-কথা কল্পনা ক'রেও লোমহর্ষণ হ'তো, সেগুলো যখন বাস্তব হ'য়ে দেখা দিলো, তখন দেখতে-না-দেখতেই তাদের স্থান হ'লো দৈনন্দিনের মলিন তালিকায়— 'in the dull catalogue of common things.'

অবশ্য এ-ক্ষেত্রে দেবদূতের পাখা যে কেটে দিয়েছে সে 'ফিলজফি' বা বিজ্ঞান নয়— সেটা আতিশয্য, বাহুল্য, আশাতীত এবং অনেক সময় অনাবশ্যক প্রাচুর্য। যখন মনের মধ্যে কোনো বিষয়ে অভাববোধ জেগে ওঠে, কিংবা কোনো দুর্লভ ইচ্ছা বহুযুগের সঞ্চিত তাপে ছটফট করে, তখন বিজ্ঞানের বলে তার তৃপ্তি ঘটলে মানুষ তা থেকে সত্যি-সত্যি আনন্দ পায়, বিস্ময়টাকে পুরো-

পুরি উপলব্ধি করতে পারে। এই রকম অনেক দুরাশা, অনেক অসম্ভবের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ ক'রেই নবীন বিজ্ঞান মন পেয়েছিলো মানুষের, সনাতন ধর্মবিশ্বাসের উপর জয়ী হয়েছিলো। কিন্তু এই জয়ের অধ্যায় অতীত হ'য়ে গেছে, বিজ্ঞান তার মনোহরণ যৌবন হারিয়ে বৈশ্যবৃত্তির সেবা করছে আজকাল, কান দুটোকে উৎসুক রেখেছে সামরিক হুকুমজারির দিকে। নিত্য-নতুন সামগ্রী উদ্ভাবনে আজকের দিনে এই যে তার দুরন্ত ক্ষিপ্রতা দেখছি, তার পিছনে মানবসমাজের কোনো সত্যিকার চাহিদা নেই, আছে ব্যবসাবুদ্ধি, ধনের লোভ, যুদ্ধে জয়ী হবার প্রস্তুতি, বণিকের সঙ্গে বণিকের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ। তাই খিদে না-জাগতেই খাবার এসে হাজির হচ্ছে, আর সেই ভোজও এমন বিপুল যে কোনটা ফেলে কোনটার দিকে তাকাবে, সে কথা কেউ ভেবে পাচ্ছে না। ফলত, মানুষ আজকাল কোনোটার দিকেই তাকাচ্ছে না, যেটা সবচেয়ে সহজে হাতের কাছে এসে পড়ছে সেটাকেই কোনোরকমে মুখে তুলে চিবিয়ে-চিবিয়ে ফেলে দিচ্ছে। অবস্থাটা ধনীর দুলালের মতো, অত্যন্ত বেশি উপচারের ভারে মনটা যার ম'রে গেছে, রাশি-রাশি দুর্মূল্য খেলনাকে যে তার সম্পত্তি ব'লে ভাবতে শিখেছে, কিন্তু কোনোটা থেকেই এক ফোঁটা আনন্দ পাবার শক্তি যার নেই। আগে প্রয়োজনবোধ জেগে ওঠে, তারপর সেটা মেটাবার ব্যবস্থা হয়, এই হ'লো স্বাভাবিক নিয়ম ; কিন্তু আধুনিক বৈশ্যবিধানে আগে সামগ্রীটাকে উপস্থিত করা হয়, তারপর তার চাহিদা জাগিয়ে তোলা হয় অবিরাম বিজ্ঞাপনের চাবুক মেরে-মেরে। আজকালকার ছোটো-বড়ো যান্ত্রিক উদ্ভাবন কোনোটাই এই অধৈর্যপ্রসূত হীনতা থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞানের যেটা সাধনার দিক, জ্ঞানের দিক, সেটাকে মানুষ তেমন স্পষ্ট ক'রে আর দেখতে পাচ্ছে না, বিজ্ঞান বলতে তার মনে পড়ছে সুবিধে, সুযোগ, আয়াসের লাঘব, ব্যসনের বৃদ্ধি, কিংবা কোনো অর্থকরী প্রস্তাব, আর নয়তো কোনো আণবিকতর অস্ত্রের আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ ধ'রেই নিয়েছে যে বিজ্ঞানীর কাজই হ'লো— যতক্ষণ তিনি হনন-যজ্ঞের সমিধসংগ্রহে ব্যস্ত না আছেন— তার জন্য সময়-বাঁচানো, খাটুনি-বাঁচানো, আরাম-বাড়ানো, আমোদ-জোগানো রাশি-রাশি খেলনা তৈরি করা। খেলনা, নেহাৎই খেলনা, কেননা ওগুলো না-পেয়ে সে যে দুঃখে ছিলো তা নয়, আর পেয়ে যে কোন সুখ হ'লো, তাও সে ঠিক জানে না। যন্ত্রের মতোই

যন্ত্রগুলোকে সে ব্যবহার করে, ওগুলো থেকে তার শ্রদ্ধা চ'লে গিয়েছে, কোনোটাতেই আর মনোযোগ নেই। যখন আজকের নতুন কালকের দিনেই বাসি হ'য়ে যাবে, তখন আর নিবিষ্ট হ'য়ে শক্তিক্ষয় করে কে।

একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ঘরে ব'সে দূরকে দেখবো, এই বায়না ক্যামেরার ছবির সাহায্যে প্রথম যেদিন মিটলো সেদিন ভারি খুশি হয়েছিলো মানুষ। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার আরো আবদার : যে কাছে নেই তার সঙ্গে কথা বলবো, যে-কথা বলা হ'য়ে গেছে সেটা আবার শুনবো। তাও সম্ভব হ'লো : শব্দের ঢেউ বাঁধা পড়লো মোমের থালায়, চলাচল করলো তারের মধ্য দিয়ে দূরে। মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে এই যন্ত্রগুলোকে অভ্যর্থনা করলে, আর সেই উচ্ছ্বাস থামতে-না-থামতেই ক্যামেরার ছবি চলন্ত হ'লো, তারপর সেই ছবির সঙ্গে একসূত্রে ধ্বনিও বাঁধা পড়লো একদিন। কিন্তু এতেও কুলোচ্ছে না, রেডিওটা এখন প্রায় প্রাগৈতিহাসিক, ঘরে-ঘরে টেলিভিশন চাই ; আর সিনেমার ছবিতে নায়িকার লজ্জা-পাওয়া গালের রংটুকু পর্যন্ত যখন দেখানো গেলো, তখন তৃতীয় আয়তনটাই বা বাকি থাকে কেন। আমরা যারা প্রাচ্যদেশে পেছিয়ে আছি, আমাদের উপর নতুনের এই দৌরাত্ম্য তেমন দুঃসহ নয়, য়োরোপের চালচলনও কিছুটা রাশভারি, কিন্তু আমেরিকায় শোনা যাচ্ছে তিন-আয়তনের সিনেমায় এরই মধ্যে অরুচি ধ'রে গেছে লোকের—ওটা 'চলবে' কিনা, সে-বিষয়ে ব্যবসায়ী মহল সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠছেন। আর এই নব্যতমকে নিয়ে কোথাও তেমন হুলুস্থুলও উঠলো না, এটাও লক্ষ করার বিষয়। প্রথম যখন রেডিও দেখা দিলো, কথা-বলা সিনেমা বেরোলো, তখন যেমন পৃথিবী ভ'রে উত্তেজনার ঢেউ দিয়েছিলো, সে-তুলনায় টেলিভিশন কিংবা তিন-আয়তনের আমদানিটাকে কেউ যেন তেমন ক'রে লক্ষই করলে না। আসল কথাটা এই যে এগুলোর জন্য মানুষের মনের মধ্যে কোনো ইচ্ছে জেগে ওঠেনি ; রেডিওতে গান শোনার সঙ্গে-সঙ্গে গায়ককে চোখে দেখার জন্য অতিশয় কাতর হ'য়ে পড়েনি কেউ, এমন কথাও কখনো কারো মনে হয়নি যে সরব এবং রঞ্জিত সিনেমায় মানুষগুলোর তৃতীয় আয়তনটা নেই ব'লেই সব ব্যর্থ হ'য়ে গেলো। ছবিতে ঐ অভাবটা আমরা অনুভব করি না— সেটাই ছবির মায়া— যেমন আমরা আশা করি না ভাস্করের গড়া মূর্তির গায়ে বর্ণপ্রলেপ। আধুনিক যুগে মূর্তির ধর্মই বর্ণহীনতা, ছবিও তার দুটোমাত্র আয়তনের মধ্যেই সুসম্পূর্ণ— তা সে অচল চঞ্চল যা-ই

হোক না— বাস্তবের কোনো-একটা অঙ্গ বাদ দিয়েই বাস্তবকে সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়, কোনো শিল্পই মাছি-মারা নকলনবিশি করে না। যেটা বাদ পড়লো, সেটাকে নিজের মন থেকে ভ'রে তোলা মানুষের আবহমান অভ্যাস, তার উপভোগের জন্যই ঐ অবকাশটুকু প্রয়োজন। এই-যে তিন আয়তনের আজব সিনেমা, এটার উৎপত্তি হয়েছে দর্শকদের আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে নয়, বাণিজ্যের সম্প্রসারণের তাগিদে— উদ্ভাবকের আজ্ঞাবহ উর্বর মস্তিষ্কে। যে ভোগ করবে তার দিক থেকে চাহিদা ছিলো না, যে বেচবে তার গরজটাই বড়ো ; তারই তাড়ায় যন্ত্রশিল্পীর এক দণ্ড ছুটি নেবার উপায় নেই। যে-শক্তি মানুষ আজ পেয়েছে— প্রচণ্ড শক্তি— সেটাকে নিয়ে সে কী করবে, তা যেন ভেবে উঠতে পারছে না ; এলোমেলো, অস্থির, উদ্‌ভ্রান্তভাবে শুধু বানিয়ে যাচ্ছে, বাড়িয়ে যাচ্ছে ; সবুর সয় না, ভাববার সময় নেই ; 'কেন', 'কিসের জন্য', এই প্রশ্নগুলো নেহাৎ অবান্তর হ'য়ে গেলো, যে-কোনো উপায়ে শক্তির ব্যবহার করতে না-পারলে সে যেন দম ফেটে ম'রে যাবে। ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগবান এরোপ্লেন পাঁচশো মাইল যাচ্ছে না কেন, তার জন্য কোনো সুস্থ মানুষের আক্ষেপ ছিলো না, আর যখন পাঁচশো মাইলও সম্ভবপর হ'লো, তখনও সেটা লোকেরা যেন প্রাপ্য ব'লেই মেনে নিলে— বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করলে না। কেননা, যখন শোনা যাচ্ছে যে এই বেগ অচিরেই সাতশো কিংবা আটশোর কোঠায় পৌঁছবে, তখন মাত্র পাঁচশোতেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে কেউ বোকা ব'নে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সাতশোতেই কি বিস্ময়ের ধুম প'ড়ে যাবে চারদিকে? ঠিক উল্টো ; সাতশো, আটশো, হাজার হবে, আমাদের মনে চমক লাগবে আরো কম, কেননা যন্ত্র যতই আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর হচ্ছে, আমরা ততই নিঃসাড় থেকে নিঃসাড়তর হচ্ছি। তারপর— হয়তো তার খুব বেশি দেরিও আর নেই— মানুষ একদিন চাঁদে যাবে ; কিন্তু, তার আগে এমন আরো অনেক ঘটনা ঘ'টে যাবে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যন্ত্রের তেজ এমন আরো বিচিত্র উপায়ে বিচ্ছুরিত হবে যে ততদিনে মানুষের মনের বিস্ময়ের তারে আর সাড়া জাগবে না ; এবং যেদিন চাঁদের বরফে পা রেখে যাত্রীর দল বাড়ি ফিরে আসবে, সেদিন পৃথিবীসুদ্ধ খবর-কাগজ রেডিও সিনেমা টেলিভিশন এবং না-জানি-আরো-কত-কিছুর সমবেত চীৎকার সত্ত্বেও আমরা সকালবেলার চায়ের পেয়ালায় আড়মোড়া ভেঙে শুধু বলবো— 'তাই নাকি?'

তাছাড়া, যন্ত্র জিনিশটার নিয়মই এই যে তার চতুরতম চেহারা নিয়েও তার বিস্ময় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যায় কোনো মেজাজ নেই, মরজি নেই, ভুল নেই, অনুপ্রেরণা নেই, বৈচিত্র্য নেই, তারতম্য নেই, তাকেই বলে যন্ত্র। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেহেতু একটা প্রাণপদার্থ ধুকধুক করছে, সেইজন্য সে এমন জিনিশই ভালোবাসে যেটা একেবারেই নামতা প'ড়ে চলে না, যার মধ্যে সে কোনো-একটা রহস্যের আভাস দেখতে পায়। আমরা যে কোনো যন্ত্র দেখে তারিফ করি, প্রথম-প্রথম অবাকও হই, তার মধ্যে অনেকটাই আমাদের ছেলে-মানুষি আছে, শৈশবের উদ্বৃত্ত কিছু ঠুনকো কৌতূহল। সেই কৌতূহল মিটে যেতে দেরি হয় না, আর তারপরেই আমাদের উৎসাহের দম ফুরোয়। প্রথম রেডিও কেনার পর ওটাকে প্রায় জীবন উৎসর্গ ক'রে দেয়া গেছে, এ-রকম অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই ঘ'টে থাকবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চালিয়ে দিয়েছি, বিকেলে কাজ থেকে ফিরেই ব'সে গেছি ওটার কাছে, নিশুতি রাতে আর সবাই যখন শুতে গেছে, অন্ধকারে ভূতের মতো ব'সে থেকেছি ওর আলো-জ্বলা মুখের সামনে, চুল-পরিমাণ কাঁটা সরিয়ে-সরিয়ে কান পেতে শুনেছি পৃথিবীর নানা দেশের ভাষা, গান, খবর, এবং ফাঁকে-ফাঁকে বোমার শব্দ, শেয়ালের ডাক, শাঁকচুন্নির কান্না— যা-কিছু ঐ যন্ত্রটা থেকে অযাচিতভাবে নিঃসৃত হ'য়ে থাকে। সত্যি, মনে-মনে বলেছি, ঐটুকু একটা যন্ত্রের মধ্যে সারাটা পৃথিবী ধরিয়ে দিয়েছে— কী বুদ্ধি মানুষের! কিন্তু যখন সবগুলো চাবি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মুখস্থ হ'য়ে গেলো, বার-বার শোনা হ'য়ে গেলো রোম, বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, মস্কো, টোকিও, সাইগন, শোনা হ'লো বি. বি. সি.-র নাটক, জর্মানির বাজনা, ইটালিয়ান গান, তখন, তারপর— কেমন ক'রে বুঝলাম না, কিন্তু একদিন দেখা গেলো ওদিকে আর মন নেই আমাদের, রেডিওর গায়ে ধুলো জমছে, কিংবা সেটাকে দখল ক'রে নিয়েছে বাড়ির নাবালকেরা; তারাও যে ঠিক শুনছে তা নয়, চালিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্প করছে, এমনকি স্কুলের বই খুলে পড়তে ব'সে যাচ্ছে। রেডিওর মনোযোগী শ্রোতা কেউ কোথাও আছেন কিনা জানি না, ওটা দোকানিরা রাখে তাদের শূন্য সময় যে-কোনো একটা গোলমাল দিয়ে ভ'রে তোলার জন্য, আবার অনেক বাড়িতে দেখেছি রেডিওটাকে দিন-রাত্তির চালিয়ে রাখা হয়েছে— অবশ্য নিচু গলায়, রীতিমতো বিনীতভাবে, যাতে ওটার অস্তিত্ব বোঝা যায় অথচ বড্ড বেশি শ্রুতিগোচরও

হ'য়ে না পড়ে— আর বাড়ির লোকের কাজকর্ম কথাবার্তা সবই চলছে সেই সঙ্গে— এমনি সারাক্ষণ ; আপনি অভ্যাগত গিয়ে বসলেন, তখনও কেউ ওটাকে বন্ধ করবে না ; যেন মাইনে-করা চাকর রেখেছে আমোদ পরিবেষণের জন্য ; কেউ লক্ষ করুক আর না-ই করুক, তাকে খাটিয়ে তো নিতে হবে। সেই হান্স আণ্ডারসেনের কলের পাখি আর আসল পাখির গল্প আরকি— আসল পাখির গান শুনতে হ'লে রাজপুরীতে ব'সে থাকা চলবে না, যেতে হবে শহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে, ছোট্ট আঁকাবাঁকা নদীটির ধারে, যেখানে জেলেরা মাছ ধরে, কাঠুরের মেয়ে বুনো ফল খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর যেখানে বাঁশগাছের উপর দিয়ে চাঁদ ওঠে, আর সেই গাছেরই পলকা একটি ডালে ব'সে ছোট্ট নরম একলা পাখিটি সারা আকাশ গানে ভ'রে দেয়। জেলেরা কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, গান শুনবে ব'লে ; কাঠুরে মেয়ে বনের পথে থমকে দাঁড়ায়, গান শুনবে ব'লে ; পূর্ণিমা-চাঁদ পৃথিবীর উপর গভীর একটি স্তব্ধতা বিছিয়ে দেয়, গান শুনবে ব'লে। ততক্ষণে রাজপুরীতে কলের পাখির কালোয়াতির বৈঠক বসেছে, মন্ত্রীরা ঘিরে বসেছেন চারদিকে, প্রোফেসর, এঞ্জিনিয়র, পাব্লিসিটি অফিসার, কেউ বাকি নেই। অনেক মাথা নাড়া, অনেক হাততালি, এন্তার বকশিশ ; কিন্তু তারপর রাজা যখন রোগশয্যায়, আর কলের পাখি পুরোনো হ'য়ে প'ড়ে আছে, তখন ফিরে এলো বনের পাখি— সেই যাকে একদিন বিদেয় ক'রে দেয়া হয়েছিলো— এসে রাজার জানলায় ব'সে গান গাইলো সারা রাত, আর ভোরবেলা প্রসন্ন দেহ-মন নিয়ে রাজা উঠে বসলেন। এই অসুখটা শুধু গল্পের রাজার নয়, আমাদের সকলেরই, আধুনিক সভ্যতারই ব্যাধি এটা। ব্যাধি যখন কঠিন হ'য়ে ওঠে তখন তার আরোগ্যের জন্য আমাদের আদিম স্বভাবই জেগে ওঠে আবার ; আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি অনেকবার, বিধ্বস্ত করতে চেয়েছি নানাভাবে, কিন্তু আমরা নিজেরাও জানিনি যে সে অবিচলভাবে অপেক্ষা করেছে আমাদের জন্য— অক্ষত, অম্লান, অনাক্রমণীয়— আমাদের স্বাস্থ্যের, শুশ্রূষার, কল্যাণের সঞ্চয় নিয়ে, সংকটের দিনে আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে, ধ্বংস থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সেই যেখানে পথের ধারে বেগনি রঙের ফুল ফুটে থাকে, ছোটো ছেলে ছাগল-ছানার গলা জড়িয়ে খেলা করে, দুপুরবেলায় বারান্দায় ব'সে চাল বাছে মেয়েরা, উঠোনে রোদ্দুর হেলে পড়ে, হঠাৎ একটু ঝিরিঝিরি

হাওয়ায় কবেকার কোন কথা যেন মনে প'ড়ে যায়— যেখানে সাধারণ, যেখানে জীবন, যেখানে আমাদের প্রাণের মূল, যেখানে আমাদের বিস্ময়, আমাদের আনন্দ, আমাদের প্রেম।

বিস্ময়, আনন্দ, প্রেম : মানুষের এই তিনটে বৃত্তি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একই উৎস থেকে উৎসারিত এরা, একই বৃন্তের অমৃতফল। আনন্দেরই একটা লক্ষণ বা গুণ হ'লো বিস্ময়, আর প্রেমের আস্বাদেরই নাম হ'লো আনন্দ। যখনই আমরা বিস্ময় বোধ করি তখনই আমরা আনন্দিত হই, আর আমাদের সকল আনন্দ সঞ্চিত হ'য়ে আছে— আর কোথাও নয়, শুধু প্রেমে, তাকে যখন যে-নামেই ডাকি না কেন। অপ্রত্যাশিত খারাপ খবরে, কিংবা কোথাও নির্ভর ক'রে নিরাশ হ'লে আমাদের মনে যে-ভাবটা জাগে সেটা বিস্ময়ের নয়, সেটা একটা আঘাত, চলতে-চলতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ার মতো একটা অপ্রস্তুত হওয়ার বেদনাদায়ক অনুভূতি। এইরকম ঘটনাকে ইংরেজিতে unpleasant surprise ব'লে থাকে, কিন্তু যেটা surprise মাত্র নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো এবং মহার্ঘ wonder, সেটা অবিচ্ছেদ্যভাবে আনন্দবোধের সঙ্গে জড়িত ; এমন কোনো বিস্ময় নেই যেটা আনন্দের দূত হ'য়ে আসে না, এমন কোনো আনন্দ নেই যাতে বিস্ময়ের অংশ না আছে। এই বিস্ময়— এটা কী ? কোথায় এর জন্ম, এর লালন, এর অলক্ষিত, অপ্রতিরোধ্য সঞ্চার ? যেটা অদ্ভুত কিংবা অভাবনীয় সেটাতে বিস্ময় নেই, যেটা আজগুবি সেটাতেও না, যেটা অলৌকিক, অপ্রাকৃত, কিংবা যেটা বিমূঢ় ক'রে দেয়, সেটাও আমাদের বিস্ময়বোধের পরপারে। বিস্ময় আছে সাধারণের মধ্যে, স্বাভাবিকের পরিমণ্ডলে ; যা জানি, যেটাকে দেখেছি, যেটা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রত্যাশিত, সেটাকেই হঠাৎ কখনো নতুন ক'রে, তীব্র ক'রে, সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করি যখন, তখনই আমরা বিস্মিত হই, নন্দিত হই, ভালোবাসি। ঘোমটা স'রে যায়, মুহূর্তের মৃণালের উপর চিরন্তনের পদ্ম ফুটে ওঠে। যাকে আমরা সাংসারিক অর্থে সৌভাগ্য ব'লে থাকি তার সাধ্য নেই এই অভিজ্ঞতার ক্ষীণতম, সুদূরতম আভাস দেয়। লটারিতে হঠাৎ লক্ষ টাকা পেয়ে গেলে মানুষ উল্লসিত, উদ্‌ভ্রান্ত, অসুস্থ, নিশ্চিন্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সবই হ'তে পারে, কিন্তু আনন্দিত হয় না, কেননা আনন্দের আসন আমাদের হৃদয়ে, আর এই আকস্মিক, অনুপার্জিত, শ্রমহীন, প্রেমহীন সম্পদের হৃদয়ের রত্নে রূপান্তরিত

হবার ক্ষমতা নেই। আর এই আনন্দের স্বাদ, তা কি কোনো যন্ত্র আমাদের দিতে পারে, না কি কোনো উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারাই সেটা সম্ভব? যন্ত্র, তা আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়, থ বনিয়ে দেয়, একেবারে ছেলেমানুষের মতো হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকার দশা করে হয়তো; কিন্তু এমনিতর তাক লাগাবার চরম পরিণতিটা কোথায় সেটা বোঝা যায় চ্যাপলিনের ফিল্মে খাওয়ার কলের দৃশ্যটি মনে করলেই। তাক-লাগানো আরো অনেক ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে ব'লে শোনা যায়: দাড়িওলা মেয়ে, দু-মাথা-ওলা জন্তু, পেরেক-খেকো সন্ন্যাসী, কিন্তু মানুষের চিত্ত বিকৃত হ'লেই এ-সব দেখার জন্য সে ভিড় করে, তার বিস্ময়বোধে উৎকটের স্থান নেই। শুধু উৎকট কেন, খুব নৈপুণ্যময় অস্বাভাবিকতাও বেশিক্ষণ সহ্য হয় না আমাদের, চমকপ্রদের আবেদন বড়ো ক্ষণিক। সার্কাসের কসরৎ বা ম্যাজিকের কারসাজি আশ্চর্য হিশেবে তো কিছু কম যায় না, অথচ সেগুলো উপভোগ করার শক্তি আমরা অনেকেই যে লজঞ্চুষ আর নিকার-বোকারের সঙ্গেই জন্মের মতো পরিত্যাগ ক'রে আসি, তার কারণ ওতে শুধু চমক আছে, বিস্ময় নেই। যেটা কখনো হয় না সেটা হওয়া যত আশ্চর্য, তার চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য যেটা নিত্য হ'য়ে থাকে সেটাকেই আশ্চর্য ব'লে অনুভব করা। আর প্রত্যেক মানুষ, জেনে কিংবা না-জেনে, এইরকম কোনো শুভক্ষণেরই প্রতীক্ষা ক'রে থাকে, যখন তার অভ্যস্ত, পুরোনো, গতানুগতিক জীবনের মধ্য থেকে ডিমের খোলা ভেঙে পাখির মতো বেরিয়ে আসে চিরকালের নতুন, যখন তার মুগ্ধ আত্মা ব'লে ওঠে— 'আবার জাগিনু আমি / রাত্রি হ'লো ক্ষয় / পাপড়ি মেলিল বিশ্ব / এই তো বিস্ময় / অন্তহীন।' সকলে বলতে পারে না, কিন্তু সকলের মধ্যেই এমনি ক'রে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা অন্তত না-থাকলে কি একজনও এ-কথা বলতে পারতো? হয়তো অজ্ঞাত, হয়তো অচেতন, কিন্তু অনতিক্রম্য আমাদের এই তৃষ্ণা, আর ক্বচিৎ কখনো সেটা মেটে ব'লেই আমরা তার অস্তিত্বটা জানতে পারি।

মানুষ সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে নিজের কারাগার থেকে মুক্তি। দিনের পর দিন নিজের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে সে, তার দেহের প্রয়োজনের মধ্যে, তার প্রয়োজনগত ভয়, লোভ, উৎকণ্ঠা আর উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়ের মধ্যে, বর্তমানের স্বেচ্ছাচারিতা আর ভবিষ্যতের বিশ্বাসঘাতকতার সংশয়ের মধ্যে। 'আমার অসুখ করবে না তো?' 'একটা বাড়ি কেনা যায় না কোনোরকমে?'

'হঠাৎ আয় ক'মে গেলে কী উপায় হবে?'— এই সব ভাবনা, যা ভাঙিয়ে এই পৃথিবীর দালাল, কুসীদজীবী আর বিজ্ঞাপন-লেখকেরা তাদের বিরাট ব্যাবসা জমিয়ে তোলে, তার অবরোধ থেকে মুক্তি চায় না এমন মানুষ কে আছে? এ থেকে যিনি নিতান্তই মনের জোরে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁকে আমরা মহাত্মা বলি, বলি মুক্ত পুরুষ। আবার কোনো-কোনো প্রবল মানুষ এর ক্ষুদ্রতা আর সইতে না-পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে— বেরিয়ে পড়ে ত্যাগের, দুঃখের, ব্যভিচারের পথে, ঝাঁপ দেয় বিপদের মধ্যে, তান্ত্রিকের মত্ততায়, আত্মবলিদানের যূপকাষ্ঠে। কিন্তু সাধারণত মানুষের নিজের মধ্যে এমন শক্তি থাকে না, যাতে এই বন্ধন সে ঘোচাতে পারে, এর জন্য বাইরের কোনো প্রভাব তার প্রয়োজন হয়, এমন একটি আবেগের তরঙ্গ, যা তাকে তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক থেকে ছিন্ন ক'রে তুলে নিয়ে যাবে জীবনের বিশুদ্ধ আস্বাদের কুমারীবেলাভূমিতে— যেখানে কোনো দ্বিধা নেই, বাধা নেই, ভয় নেই, সব সহজ হ'য়ে গেছে। মানুষের যেটা যৌন কামনা, সেটা এই মুক্তিরই একটা উপায় ব'লে তার মন্থন থেকে প্রেম নামক অমৃত উঠে এলো। মানুষের অন্যান্য কামনার সঙ্গে এই কামনার মস্ত তফাৎ এই যে অন্যগুলিতে সে নিজেকে শুধু বাড়িয়ে তুলতে চায়, আর এটাতে বেরিয়ে আসতে চায় নিজের ভিতর থেকে, বলতে গেলে উৎসর্জন করে নিজেকে। কৃপণ তার জেলখানাটাকেই আরো বেশি মজবুত ক'রে তোলে, সে একেবারেই আত্মময়, আত্মসর্বস্ব; কিন্তু কামুক তার দুষ্ক্রিয়ার মধ্যেও অন্য একজন মানুষের কাছে আত্মাহুতি না-দিয়ে পারে না। আমরা যে সাহিত্য পড়ি, গান শুনি, চিত্রকলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তাও এই মুক্তির আশায়; আমরা যাকে সাধারণ জীবন ব'লে জানি— যার দিকে আমরা কখনো তাকিয়ে দেখি না, শুধু তার উপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে প'ড়ে যাই— তা যে কত আশ্চর্য, কত রহস্যময়, কত ঐশ্বর্যে ভরা, সেই কথাটা ক্ষণিকের জন্য অনুভব করাই শিল্পকলার পুণ্যফল। সৌন্দর্য, তা নারীর হোক বা প্রকৃতির হোক, আমাদের মনের উপর তারও এই প্রভাব— এই বন্ধনছেদ, সত্তার বিস্তার; আর প্রকৃতির রূপ যেখানে অসীমের, চিরন্তনের আভাস এনে দেয়— যেমন সমুদ্র বা তুষারশৃঙ্গের সামনে— সেখানে আমরা যে মুগ্ধ হ'য়ে থাকিয়ে থাকি, তাও নিজেকে অতিক্রম করারই আনন্দে, কোনো-এক রহস্যের মন্দিরে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারার সার্থকতায়। অবশ্য এর জন্য

যে পুরীতে বা দারজিলিঙে যেতেই হবে তাও নয়, তেমন মন থাকলে ঘরে ব'সেই সব পাওয়া যায়, 'একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির-বিন্দু' দেখেই সর্বশরীরে রোমাঞ্চিত হওয়া সম্ভব হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে যন্ত্রের সত্যতম, আশ্চর্যতম কারসাজিও কত সহজে বাসি হ'য়ে যায়, কিন্তু মানুষের ঘরে বার-বার যে-শিশু জন্মায়, সে তো আকারে-প্রকারে একই রকম, অথচ বারে-বারেই অপরূপ। ভাবতে অবাক লাগে যে চাঁদ জিনিশটা অত্যন্ত পুরোনো, আর আমিও জীবন ভ'রে কতবার দেখেছি তার অন্ত নেই, তবু তাতে ক্লান্তি এলো না কোনোদিন, তবু অমাবস্যার পর পশ্চিমের আকাশে চাঁদের ক্ষীণ, করুণ রেখাটি চোখে পড়লেই মনে হয় যেন কত বড়ো ঐশ্বর্য ফিরে পেলাম। ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথের গান, সেই কোন ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, অথচ বার-বার, হাজার বার নতুন ক'রে আবিষ্কার করছি কোনো-না-কোনো ইঙ্গিত, পংক্তি, কথা— এমন কথা, এমন সুর, যা এমনকি কানে শোনবারও প্রয়োজন হয় না আর, চিন্তা করতেই বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়েই মনে প'ড়ে যায় আরো কত অফুরন্ত আশ্চর্য জিনিশ আছে এই পৃথিবীতে: ভোরের হাওয়া, সন্ধ্যার আভা, দুপুর-রাতের বৃষ্টি, দুপুরবেলার বৃষ্টি ;— দমদম ছেড়ে প্রথম যখন উঠলাম, তখন বাংলার দূরায়মান নিম্ন আকাশে নীল-কালো মেঘের কথা ভেবেও এখন অবাক লাগছে।...কিন্তু আপাতত আর বেশি অবাক হবার সময় নেই, প্লেন নামছে, দিল্লি এসে পড়লো, চিঠিটা শেষ ক'রে ফেলতে হয়।

৩

এয়ার-হস্টেসের হাতে ডাকের চিঠি সমর্পণ ক'রে বাইরে নেমে এলাম। আকাশ ভ'রে জ্বলজ্বল করছে বিকেল : প্লেনের ভিতরকার হারেম-শোভন আবছায়ার পরে পশ্চিম ভারতের শুকনো কড়কড়ে রোদ্দুর যেন চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। পড়ন্ত রোদ হলদে, হাওয়া ঠাণ্ডা, মাইল জুড়ে মস্ত প্রান্তর গা এলিয়ে প'ড়ে আছে। গাছ কম, সবুজের চেয়ে ধূসর বেশি, ধূসরের মধ্যে ব্রাউনের আমেজ, লোক নেই। একটু উৎসাহ নিয়েই নেমেছিলুম ; এই সেদিন দিল্লিতে থেকে গেছি, সেই সুবাদে দিল্লিকে প্রায় আপন ব'লে দাবি করেছিলুম মনে-মনে— আমার এক-আধ টুকরো ভাঙাচোরা জীবন ওর পথের ধুলোয় কি প'ড়ে নেই, আমাকে চিনতে পারবে না ? কিন্তু মাটিতে পা দিয়েই নিরাশ হ'তে হ'লো। যে-দিল্লিতে আমি থেকেছি, যেখানে মানুষ থাকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়, এ তো সে নয়। সংসারের সীমান্তের বাইরে ঘণ্টাখানেকের একটা সরাইখানা এটা, শূন্যপথে পাড়ি দিতে-দিতে দাঁড়াবার এবং জিরোবার একটা বিবর্ণ ইস্টেশন। দিল্লি নয়, পালাম এয়ারপোর্ট। আর এয়ারপোর্ট মানেই— সেটা কোনো শহর নয়, কোনো দেশেরও নয়, সেটা পৃথিবীর। সেটা সকলের, হয়তো সেইজন্যে কারোরই নয়। সর্বত্রই এক— যে-কোনো দেশের যে-কোনো শহরের সংলগ্ন হোক না— কোনোটা বড়ো, কোনোটা ছোটো, ভিড় কোথাও বেশি বা কম, কোথাও খুব জমকালো আর কোথাও একটু বেচারিগোছের, কোথাও নৈসর্গিক বা নাগরিক শোভা মনোহর, আর কোথাও শুধু শূন্য মাঠ ধু-ধু করছে— কিন্তু একবার ভিতরে ঢুকলে সেই একই রকম নকশা, আপিশ রেস্তোরাঁ স্নানের ঘর, য়ুনিফর্মপরা কর্মচারী, একই রকম নিপুণ নিষ্প্রাণ অভ্যর্থনা, ব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা, শৃঙ্খলার শৃঙ্খল। দু-একটা বিষয় বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে রেল-স্টেশনও তা-ই, কিন্তু ভারতবর্ষে যিনি পাঁচশো মাইলও রেল-ভ্রমণ করেছেন তিনিই জানেন যে অবয়বগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও স্টেশনগুলোর আবহাওয়া কী-রকম বদলে যায়— আর-কোনো কারণে নয়, তারা মাটির বুকে অধিষ্ঠিত ব'লেই। জলবায়ুর অর্থে আবহাওয়ার কথা বলছি না ;— দৃশ্যেরও বদল হয় ; কোনো স্টেশন হয়তো নদীর উপর ব্রিজ পেরিয়েই, কোনোটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কোনোটি শান-বাঁধানো রাশভারি গোছের, কোনোটি গাছের ছায়ায় কুয়োতলায় অন্তরঙ্গ। মাটির ধর্মই ঘনিষ্ঠতা, তাই স্টেশন থেকেও দেশটার আর শহরটার

কিছু-না-কিছু চোখেই পড়ে ; হয়তো বাড়ি, হয়তো দোকান, টাঙা কিংবা সাইকেল-রিকশ, রাস্তার লোক, প্ল্যাটফর্মের ভিড়। কিন্তু এয়ারপোর্ট শহর থেকে দূরে, শহরের জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন, উপরন্ত সেখানে নেমে আপনি কোথায় দাঁড়াবেন কোথায় বসবেন কোনদিকে যাবেন বা যাবেন না, এই সব-কিছু কঠিন নিয়মের অধীন ব'লে জায়গাটার নেহাৎ ভৌগোলিক প্রকৃতিও ভালো ক'রে লক্ষ করার সুযোগ হয় না। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে কোনো দেশেরই স্থানীয় চরিত্র ফুটতে পারে না। যেমন য়ুনিফর্ম পরলে মানুষের নিজের ব্যক্তিত্বটি চাপা পড়ে, তেমনি যেটা প্রকাণ্ড প্রয়োজনসাধনের প্রকাণ্ড যান্ত্রিক ছাঁচে তৈরি হয়েছে, সেটাতেও কোনো দেশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। মানুষের বসবাসের বাড়ি এক-এক দেশে এক-এক রকম (অন্তত এখন পর্যন্ত অনেক অংশেই তা-ই), কিন্তু কোবে থেকে কেণ্টাকি পর্যন্ত কারখানার সেই একই রকম চেহারা। এয়ারপোর্টেও তা-ই, একটা থেকে আর-একটাকে চিনে নেয়া শক্ত ; এমনকি, স্থানীয় শৌখিন সামগ্রীর যে-সব নমুনা কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখে, সেগুলি পর্যন্ত একই রকম মনে হয়— মনে হয় এটা না এই আগের বন্দরে দেখে এলাম? হয়তো সেই জিনিশই শহরের মধ্যে দোকানে দেখলে উজ্জ্বল হ'য়ে চোখে পড়বে, কিন্তু মানুষের প্রাণের সংসর্গ থেকে অপসারিত হ'য়ে সবই যেন শুকিয়ে যায় ; মনে হয় এই যাওয়া, আসা, থামা, চলার ফুটন্ত কড়াইটার মধ্যে কোনো-কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে না, একটা রক্তমাংসহীন আন্তর্জাতিকতার পাংশু ধোঁয়া উদ্গীর্ণ হ'য়ে জিনিশের প্রাকৃত রূপ মুছে দিচ্ছে— শুধু জিনিশের নয়, মানুষেরও।

অতএব দিল্লিতে নেমেও দিল্লির স্বাদ কিছুই পাওয়া গেলো না। বাইরের ঘরে পাসপোর্ট জমা দিয়ে ভিতরে আসা, দুই খণ্ড বিস্কুটের সঙ্গে চা-পান, একজন বন্ধুকে টেলিফোনে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা, তারপর সেই নির্দিষ্ট পথ দিয়ে লাইন বেঁধে এগিয়ে যাওয়া, পাসপোর্ট সংগ্রহ, আকাশের তলায় বাইরে এসে দাঁড়ানো। আরো একটু দাঁড়াতে পারলে সুখী হতাম— কিন্তু সময় নেই, প্লেনে ফেরার হুকুম জারি হ'য়ে গেছে। প্লেন উড়লো, দেখতে-দেখতে দিনের আলো মিলিয়ে গেলো, রাত্রি নামলো আকাশে। দীর্ঘ হবে এই রাত্রি, দীর্ঘায়িত, ষোলো কিংবা সতেরো ঘণ্টা পর আবার ভোর হবে। চলেছি পশ্চিমে, যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, যত যাবো, ততই রাত বেড়ে চলবে, পথে-পথে

অনেক সূর্যোদয় হেলায় হারিয়ে কালকের দিনটাকে আমরা ধরতে পারবো একেবারে রোম পেরিয়ে লণ্ডনের পথে—অন্তত টাইমটেবিলে এই রকম বলছে। অর্থাৎ পঞ্জিকার একটা তারিখের মধ্যেই অনেকগুলো বাড়তি ঘণ্টা কেটে যাবে আমাদের— কিংবা হয়তো কোনো তারিখেই নয়; যেমন এই আকাশ-পথে বলতে গেলে স্থানের বাইরে চ'লে এসেছি তেমনি প্রায় কালের বাইরেও ছিটকে পড়বো, এমন একটা অনিশ্চিত অস্পষ্টতার মধ্যে ডুবে যাবো যেখানে 'আজ' এবং 'কালে'র কোনো অভ্যস্ত ধারণা আর টেঁকে না। যদি মিনিটে-মিনিটে সময় কেবল পেছিয়ে যায়, যদি ভোরবেলার নাগাল পেতে অপেক্ষা করতে হয় আমাদের হিশেবে তুপুরবেলা পর্যন্ত, তাহ'লে কোনটা 'আজ' আর কোনটা 'কাল' সেটা তর্কসাপেক্ষ হ'য়ে পড়ে। সময়টা যে মায়া, এ-কথা পুরাকালের ঋষি থেকে হাল আমলের বিজ্ঞানী পর্যন্ত অনেকেই বলেছেন; বলা বাহুল্য, আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের মূল্যবান সাধারণ বুদ্ধির জোরে তা কখনো বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তার অল্পস্বল্প প্রমাণ— ঠিক এলিয়ট বা টোমাস মান্-এর অর্থে না হোক, তবু ভাবিয়ে তোলার মতো প্রমাণ পাওয়া যায় দেশান্তরী এরোপ্লেনে উঠলে।

অবশ্য সময় নিয়ে তুশ্চিন্তা করার মতো আপাতত কারো সময় আছে ব'লে মনে হচ্ছে না; সান্ধ্য প্লেন পানে-ভোজনে চঞ্চল। দ্বিতীয়টার চেয়ে প্রথমটাই বেশি: শুকনো নোন্তা যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে ককটেলের গ্লাশ। সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে পরিবেষণের নৈপুণ্য লক্ষ করছি; যারা খাচ্ছে তাদেরও তৎপরতা কিছু কম নয়। দৃশ্যটি ভালোরকম জ'মে উঠলো করাচি ছেড়ে যাবার পর যখন ডিনার দিলে: ট্রের উপর প্লাস্টিকের বাসনে খোপে-সাজানো আছে সব, সূপ থেকে চীজ পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি; বেপথুমান প্লেনের অত্যন্ত সরু গলির উপর দিয়ে সুদর্শনভাবে টাল সামলে-সামলে চলেছে পরিচারক এবং পরিচারিকা— গায়ে তাদের শাদা কোর্তা, হাতে কফির পট, তুধের জগ, সুরার পাত্র; কফির পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে আপনার যদি বা জামার হাতায় ছলকে পড়ে, তাদের হাতে একটি ফোঁটা নড়চড় হবার জো নেই। আমরা যাঁরা প্রাচ্যদেশীয়, আমাদের চোখে এই ভোজনকাণ্ড একটুখানি চমকপ্রদ ব'লে বোধ হয়। তার কারণ, আহার-বিষয়ে আমরা এখনো গার্হস্থ্যধর্মী, বেশ ধীরে-সুস্থে নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসা আমাদের অভ্যাস; ওর

মূল কথাটা যদিও পরিশ্রমের জন্য বলসঞ্চয়, আমরা ওটাকে আরাম এবং বিশ্রামেরই অংশ ব'লে ধরি। তাই তার পরিবেশের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বদল ঘটলে আহারের জন্য দাবিও আমাদের ক্ষীণ হ'য়ে আসে। অচেনা বিছানায় অনেকের ভালো ঘুম হয় না ; আকস্মিক রকম নতুন জায়গায় ভালো ক'রে খেতে পারে না এমন মানুষেরও অভাব নেই আমাদের মধ্যে। যারা জাত যাবার ভয়ে কিংবা রোগের বীজাণুর ভয়ে (ও-দুটো প্রায় একই শ্রেণীর বিভীষিকা) পথে বেরিয়ে উপোস করে কাটায়, তাদের বিষয়ে কিছু বলতে চাই না ; কিন্তু তারা ছাড়াও অনেকে আছে যারা পথে-ঘাটে এক-আধবেলা না-খাওয়াটাকে কোনো অসুবিধে ব'লে গণ্য করে না, কিংবা যাদের ভ্রমণজনিত উৎকণ্ঠা পানাহারের সকল ইচ্ছা হরণ ক'রে নেয়, কিংবা যারা অচেনা লোকের সামনে ব'সে মুখব্যাদন এবং চর্বণ করতে সংকোচ বোধ করে, কিংবা যারা মনে-মনে ভাবে : 'এই তো বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছে যাবো, একেবারে স্নান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তখনই খাওয়া যাবে।' অর্থাৎ খাওয়ার যেটা শারীরিক প্রয়োজন সেটাকে মানসিক তৃপ্তির জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখতে আমাদের আপত্তি নেই। এইটে হ'লো গৃহী মানুষের মনের ভাব। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে আজ অনেকদিন হ'লো, পৃথিবীটাকে লুঠ ক'রে নেবার প্রচণ্ড উদ্যমে তারা নিরন্তর ধাবমান, এই রকমের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র তাদের পোষায় না, মনের এ-সব 'বাবুগিরি' ছেঁটে না-ফেললে তাদের কর্মকুশলতা ব্যাহত হয়। এইজন্য তারা যে-কোনো অবস্থায় একই রকম মনোযোগপূর্বক আহার করার কৌশলটি আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে ; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, চলতে-চলতে, মোটরে ব'সে, পার্কের বেঞ্চিতে— কিছুতেই তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে হানি হয় না, এমনকি ফুটপাতে হেঁটে যেতে-যেতে আইসক্রীম-ভক্ষণও আমেরিকায় শুধু নাবালক-মহলে আবদ্ধ নয়। যারা অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত এবং চঞ্চল, তাদের দৈহিক দাবিগুলো একেবারে তখন-তখনই হাতে-হাতে মিটিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়, কোনো অবসরের অপেক্ষায় তারা থাকতে পারে না ; হোক না মাঝ-নদীতে, চলতি ট্রেনে, কিংবা তেত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে, আইনমাফিক খিদের সময়ে আইনমাফিক খাওয়া তাদের চাই— এবং আইনমাফিক সন্তোষ-সহকারে তার সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতারও তাদের অভাব ঘটে না। এই দাবিটা পশ্চিমি মানুষের, আমরা ফাঁকে তার ফলটুকুমাত্র পেয়ে যাচ্ছি ; বোধহয় সেইজন্যেই

ভালো ক'রে ভোগ করতে পারি না— মজ্জাগত প্রাচ্যদেশীয় দুর্বলতাবশত থেকে-থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই।

ঘণ্টা দুই পরে বাহ্‌রেন নামক একটা জায়গায় আমরা অবতীর্ণ হলাম। কোনো জন্মে আগে এর নাম শুনিনি। পারস্যসাগরে একটা দ্বীপ, আরব মরু অদূরবর্তী। নেমে দেখি, তপ্ত হাওয়ার হলকা বইছে যেন দান্তের নরকের দুর্ভাগাদের দীর্ঘশ্বাস। রাত্রেই এই, দিনের বেলায় না জানি কী। চেহারাও ছন্নছাড়া গোছের, লোকজন কম, যাত্রীদের ওঠা-নামা নেই, প্লেন নেহাৎ তেল নেবার জন্যই নামে এখানে। ভিতরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ইংলণ্ডের নতুন রানী এলিজ়াবেথের ছবি। একজন লোককে ধ'রে দু-একটা বাক্যবিনিময়ে কৃতকার্য হলাম। দ্বীপে আর-কিছুই নেই, মানুষ বড়ো থাকে না, কিন্তু পেট্রলের খনি আছে প্রচুর। এলিজ়াবেথের ছবির অর্থটা তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান হ'লো। শাবাশ বলতে হয় ইংরেজকে, পৃথিবীর কোন অখ্যাত কোণে কোন রত্ন লুকিয়ে আছে কিছুই তাদের চোখ এড়ায় না, তখনই সেখানে রাজত্বের জাল ছড়িয়ে দেয়— যত দুর্গম, অস্বাস্থ্যকর কিংবা বসবাসের অযোগ্য হোক না জায়গাটা। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আদ্যি কাল থেকেই চা জন্মেছে, অথচ এই সঞ্জীবনী পত্রিকার অস্তিত্বসুদ্ধু আমরা জানতুম না, যতদিন না ইংরেজ এসে আবিষ্কার করলে। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি, কিন্তু এই একটা বিষয়ে পূর্বপুরুষের উদাসীনতাও ক্ষমা করতে পারি না। পাণ্ডবেরা তো বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছেন, দ্রৌপদীর শ্রান্তি দূর করতে ভীমেরও চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিলো না, এই উজ্জীবনী সরস পাতাটির দৈবাৎ তাঁরা খোঁজ পেলেন না কোনোরকমে? কিন্তু হায়, তাঁরা বঙ্গদেশকে বর্জন করেছিলেন, পুণ্ড্র পেরিয়ে উত্তরে আসেননি, আর চিত্রাঙ্গদার মণিপুরও নাকি (অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সম্প্রতি অবগত হওয়া গেলো) পূর্ব সীমান্তের মণিপুর নয়। অতএব অনার্যভূমির স্যাঁৎসেঁতে উপত্যকায় চা-দেবী প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন; জাভার রবারের মতো, বর্মার কেরোসিনের মতো, এই বাহ্‌রেন-দ্বীপের পেট্রলের মতো— শ্বেতাঙ্গ মানুষের লোভের হাতে, শক্তির হাতে, বীরত্ব আর দস্যুতার আঘাতে জেগে ওঠার জন্য।

বাহ্‌রেনে চোখের কিংবা মনের পক্ষে তৃপ্তিকর কিছুই পাওয়া গেলো না। ঘরের মধ্যে গরম, বাইরে কাঁকরের মতো হাওয়া, ধুলোর কিংবা বালির ভারে

আকাশ আচ্ছন্ন— পৃথিবীর এই শূন্য নিঃশব্দ প্রান্তে কোনো প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মতো মস্ত উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ব্যোমযান। লাল সবুজ আলো জ্বলছে তার চোখে, অতি গভীর সমুদ্রবাসী মাছের গায়ের মতো জ্বলজ্বল করছে ঘুলঘুলিগুলো। অন্ধকারে এই আলো-জ্বলা প্লেনের একটি নতুন রূপ যেন দেখতে পেলাম— রাত্রির সমুদ্রের বুকে উজ্জ্বল জাহাজটিকে যে-রকম কল্পনা করি এও যেন সেই রকম— হঠাৎ বোঝা গেলো, ওর মধ্যে মানুষের কত বড়ো দুর্জয় শক্তি সংহত হ'য়ে আছে, ওর এঞ্জিনের ধ্বকধ্বকানিতে কত বড়ো নির্ভয় ঘোষণা। অচেনা দেশের নির্জন রুক্ষ রাত্রিতে এরোপ্লেনটাকেই বন্ধুর মতো মনে হ'লো আমার, আস্তে-আস্তে ওর অন্তঃপুরে ফিরে গেলাম। রাত ভারি হয়েছে, যাত্রীরা একে-একে ঘুমের জন্য তৈরি হ'লো, প্লেন চললো আরবদেশের উপর দিয়ে।

যাঁরা খুব ব্যস্ত মানুষ, উঁচুদরের রাজপুরুষ কিংবা কোনো বৃহৎ বাণিজ্যের কর্ণধার, তাঁদের কারো-কারো মুখে শুনেছি যে তাঁরা সত্যি-সত্যি বিশ্রামের সময় পান একমাত্র যখন ভ্রমণ করেন। ভ্রমণটা যদি কর্মসূত্রেও হয়, তবু একদিকের ঘূর্ণি থেকে আর-একদিকের আবর্তে গিয়ে পড়বার আগে মাঝখানে কিছু সরল স্রোত পাওয়া যায়— কিছু শূন্য সময়, বিশ্রামের প্রহর। একবার ট্রেনে উঠে বসলে এক রাত্রি বা এক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত, এদিকে-ওদিকে যা-ই হোক বা না-ই হোক তাতে আপাতত কিছুই এসে যাচ্ছে না, মনটাকে বেশ শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়া যায় চটিজুতো আর পাজামা-পরা অবস্থার মধ্যে। আমি অবশ্য কর্মবীর নই; কিন্তু সম্প্রতি আমারও এটা অনুভব করার সুযোগ ঘটেছে যে ভ্রমণ ব্যাপারটা শরীরের পক্ষে ক্লান্তিকর হ'লেও মনের পক্ষে বিশ্রামদায়ক। আবশ্যিক বিশ্রাম, কিছু করার উপায় নেই ব'লেই বিশ্রাম— কিন্তু এই নিরুপায় অবস্থাটা যথাস্থানে উপস্থিত থাকলে ঘটতে পারে না, ঘটলেও সেটাকে মেনে নিতে পারে না কোনো মানুষ। আমার ভাগ্যতারকা যখন ঊর্ধ্বাকাশে ছিলো, যখন যৌবনের নির্ভার দিনে সপরিবারে সবান্ধবে ভ্রমণ করেছি, তখন সেই ভ্রমণে ছিলো খুশির নেশা, ছুটির হাওয়া, প্রাণের উল্লাস। আর এখন মধ্যবয়সে নিঃসঙ্গভাবে জীবিকার জন্য ভ্রমণ করতে হচ্ছে, এখন এই চলার আস্বাদে আমার আনন্দ আর নেই,

শুধু একটা বিষাদজড়িত বিশ্রাম আছে। বাড়ি থেকে যখন বেরোলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকলের জন্য কত ভাবনা, যত রকম দায়িত্বের সুতোয় জড়িয়ে আছি সবগুলোতে যেন একসঙ্গে টান পড়লো ; ট্রেন ছেড়ে দেবার পরেও মন ফিরে-ফিরে ছুটতে লাগলো পিছন দিকে— ঠিক তো ? হবে তো ? কিন্তু এমনি ভাবতে-ভাবতেই বোঝা যায় যে হাজার ভেবেও আমি আর-কিছু করতে পারবো না, কিছুই করবার নেই আমার, জানবার নেই, বলবার নেই, যতক্ষণ না গন্তব্যস্থলে পৌঁছে চিঠিপত্র পাচ্ছি ততক্ষণ আমার আমিত্বময় পরিমণ্ডল থেকে আমার অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকবে, আমি সেটা ইচ্ছা করি আর না-ই করি ;— এই কথাটা যখন বোঝা যায় তখন মন সব ভাবনা সরিয়ে ফেলে উপস্থিতের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় নিজেকে— তখন বেঞ্চির কোণে হেলান দিয়ে বসি, বই খুলি, জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গাছপালার দিকে। এই উপলব্ধির একদিকে যেমন অসহায় লাগে নিজেকে, তেমনি সেই অসহায়তা থেকেই অন্য দিকে একটা অযাচিত এবং অনুপার্জিত মুক্তির ভাব জেগে ওঠে ; ভিতরে-ভিতরে অনেকটা যেন রবিনসন ক্রুসোর মতো অবস্থা— তেমনি নিঃসঙ্গ, তেমনি স্বাবলম্বী, তেমনি বন্দী আর পরম স্বাধীন। অবস্থাটা সুখের তা বলতে পারি না, কিন্তু বাধ্য হ'য়েই নির্ভাবনা হ'য়ে মন যেন সেই সুযোগে মস্ত বড়ো বিশ্রামের ফালি আদায় ক'রে নেয়— কেমন একরকম ঝিম-ধরা আলস্যের মধ্যে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এরোপ্লেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ব'লে তার বিবরে এই অনুভূতিটা আরো প্রবল। দিনে তবু নানারকম বিক্ষেপ ঘটে, পৌনঃপুনিক আহার প্রভৃতি কিছু-কিছু দৈহিক প্রক্রিয়া বাদ দেয়া যায় না— কিন্তু রাত্রিটা একেবারেই নিবিড়, অখণ্ড, অনবচ্ছিন্ন। আর এই রকম রাত্রি, যা মুহূর্তে-মুহূর্তে দীর্ঘতর হচ্ছে, যেন এই প্লেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে কেবল, যেন সুরলোকের কোনো লজ্জাহীন দম্পতির তৃপ্তিহীন আলিঙ্গনের উপর অন্ধকারের আস্তরণটাকে অফুরন্তভাবে টেনে-টেনে দিচ্ছে। এই রাত্রির মধ্যে আর যেনা কিছুই নেই, শুধু মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি, স্তব্ধতা, অন্ধকার, আর সেই পুনরাবৃত্তির শৃঙ্খলের গোঙানির মতো এঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন। ঐ আওয়াজটা শুনতে-শুনতে পরে আর শোনাই যায় না— রেলগাড়ির শব্দের মতো পদ্য বলানো যায় না তাকে দিয়ে, খেলানো যায় না মগজের মধ্যে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ; অমন

একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, বিরতিহীন ব'লেই আমাদের বুদ্ধিকে তা যেন নেশার মতো অবশ ক'রে দেয়, ছড়িয়ে পড়ে আমাদের চেতনার পরতে-পরতে— সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, অপ্রতিরোধ্য কোনো সম্মোহনের মতো। বিশেষত রাত যখন ঘন হয়, রাত আর ফুরোয় না, না-জেগে না-ঘুমিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে কাটতে থাকে, তখন আর আওয়াজটাকে যেন আলাদা ক'রে অনুভব করা যায় না; তা মিশে যায় আমাদের তন্দ্রায়, ভাবনায়, ভাবনাহীনতায়, ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে অনবরত আমাদের অবচেতনে, আমরা তার মধ্যে ডুবে যাই।

বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, শুধু চাপা আলো গলি-পথের উপর, আর তারই আভায় আবছা দেখা যাচ্ছে মানুষগুলোকে। হেলানো চেয়ারে যে যার মতো আরামের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে; উলের ওড়নাটি কেউ জড়িয়ে নিয়েছে মাথায়, কারো বা পিঠের উপর ফেলা, কেউ হাঁটু মুড়ে কাৎ হ'য়ে রয়েছে, কারো মাথা ঢুলে পড়েছে কাঁধের উপর। লক্ষ করলাম, মেয়েরা প্রায় সকলেই বেশ গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু পুরুষদের উশখুশ ভাব, মাঝে-মাঝে কাশির শব্দ, দেশলাইয়ের শব্দ, কখনো বা মাথার উপরকার রাত-আলো জেলে নিচ্ছে, বই খুলেই খানিক বাদে রেখে দিচ্ছে আবার। আমিও তা-ই ;— যদিও কোনো-এক সময়ে নিশ্চয়ই এতটা ঘুমিয়েছিলুম যে বেইরুট কখন পেরিয়ে গেলো জানতেই পেলুম না, অন্তত এখন আর তার কিছুই মনে নেই। আমি জানলার ধারে আসন পাইনি, কিন্তু এক প্রান্তে পেয়েছি; আমার সামনে আর আসন নেই ব'লে পা দুটোকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি আমার হাত-ব্যাগটার উপর, হাঁটুর উপর বিছিয়ে নিয়েছি ওভারকোট; কোটের উষ্ণতায়, চোখের তন্দ্রায়, আর হঠাৎ-হঠাৎ প্লেনের ডুবসাঁতার দেবার মতো দুলুনিতে বেশ আরাম লাগছে। কিন্তু এই আরামটা শুধুই শারীরিক নয়। 'আমি আছি' আর 'আমি নেই', এই দুটোকে একই সঙ্গে অনুভব করার দুর্লভ বিলাসিতা এটা। 'আমি নেই', সেটাকে অনুভব করা ভাষাগত বিরোধের মতো শোনায়, কেননা, আমিই যদি না রইলাম তাহ'লে অনুভব করবে কে। কিন্তু যেমন ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে, এও সেই রকম। যেমন লিখতে-লিখতে রাত দুটোর সময়, কিংবা কোনো পার্টিতে বারোটা বাজলে, আমাদের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে অথচ আমাদের চেতনা একেবারে পরাস্ত হয় না, আমরা জানি যে এখনো আরো খানিকক্ষণ আমরা

উজান ঠেলে চলতে পারবো ; কিংবা যেমন সকালবেলা ঘুম ভেঙেও ঘুমের কুয়াশায় লীন হ'য়ে থাকি, একটু-একটু স্বপ্নও দেখি আবার বাইরের শব্দও শুনি, আমাদের মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নটা যে স্বপ্নই সে-কথা ভেবে শান্তি পাই, তবু সেটাকে আরো একটুক্ষণ দেখার ইচ্ছেটাও কাটাতে পারি না, হঠাৎ হয়তো মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে তলিয়ে যাই অথচ তখনো মনে-মনে জানি যে একটু পরেই উঠতে হবে— এও সেই রকম, হুবহু সেই রকম। তফাৎ শুধু এই— আর মস্ত তফাৎ এটা— যে এই ডুবে যাবার, ভেসে থাকার বিলাসিতায় এখানে কোনো বাধা নেই, বিরোধ নেই, একটু পরেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে নতুনতর কোনো মন্তব্য করতে হবে না, কিংবা দুটো শব্দকে জিভের ডগায় নেড়ে-নেড়ে ওজন ক'রে তার মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে বসাতে হবে না কাগজের উপর ; এ একেবারেই মসৃণ, দায়িত্বহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ; সামনে প'ড়ে নেই সারাদিনের পরিশ্রম, নেই কোনো কর্তব্য না-করার অস্বস্তি ; বিবেক থেকে, উদ্বেগ থেকে, প্রয়াসের অপরিহার্য নিপীড়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে এক উষ্ণ, কোমল, মায়াময় আত্মবিস্মৃতির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে আছি। আমার মতো জীবন যাদের, যারা অনেকের কাছে অনেক কথা রাখতে পারেনি, নিজের কাছে অনেক কথা রাখতে পারেনি, যাদের শেষ-না-করা, আরম্ভ-না-করা, সাহস-না-করা কাজ-গুলো যে-কোনো সময়ে সামনে দাঁড়িয়ে দিনগুলিকে অকথ্য অভিযোগে ভ'রে দেয়— তাদের পক্ষে এই রকমের বিস্মৃতি বিশেষভাবে আরামদায়ক, তাতে সন্দেহ নেই। বিস্মৃতি, কিন্তু চেতনার নিমজ্জন নয়। যদি প্লেনটায় শোবার ব্যবস্থা থাকতো তাহ'লে এই রাত্রিটাকে হত্যা ক'রে আমিও লুপ্ত হ'য়ে যেতে পারতুম— হয়তো। কিন্তু ব'সে-ব'সে ঠিক ঘুমোনো যায় না, অথচ একেবারে না-ঘুমিয়েও পারা যায় না ; এই দোটানার মধ্যে আমি যেন আমার সত্তার ক্ষীণতম উপচ্ছায়াতে পরিণত হয়েছি, এই নৈশ যানের নীলচে মৃদু আলোর উপর আমার অস্তিত্বটা পাৎলা একটু ফেনার মতো কোনো রকমে ভেসে আছে মাত্র— তবু ভেসে আছে, আর আমি সেটা জানতেও পারছি। আমার শারীরিক প্রকৃতি বিশ্রাম চাইছে, অথচ এতখানি প্রশ্রয় পাচ্ছে না যাতে সেই বিশ্রামের অনুভূতিটাও হারিয়ে যায়। ঘুমে যখন হাত-পা ঝিমঝিম করছে তখনো হাত তুলে সিগারেট ধরিয়ে একই সঙ্গে ঘুমের আর সিগারেটের স্বাদ

পাওয়া যাচ্ছে, আবার যখন মনে-মনে ভাবছি যে এখন নিশ্চয়ই ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে চলেছি তখনো ঐ সমুদ্রের বিখ্যাত নীলিমা চোখে দেখলুম না ব'লে উপযুক্তরকম দুঃখিত হ'তে পারলুম না, ঘুমের আমেজ ভাবনাটাকে ঘোলাটে ক'রে দিলে। একবার উঠে বাথরুমের দিকে গেলুম: যাত্রীদের বসবার ভঙ্গি নানারকম অদ্ভুতভাবে বেঁকে-চুরে গেছে, পাশাপাশি চেয়ারে কুঁকড়ে গোল হ'য়ে ঘুমোচ্ছে বাচ্চা ভাই-বোন— কলকাতায় মা-বাবার কাছে ছুটি কাটিয়ে স্কুলে ফিরে যাচ্ছে তারা— আর পিছনের দিকে এইটুকু একটা টেবিলের সামনে ছোট্ট বেঞ্চিতে সোজা হ'য়ে ব'সে-ব'সে ঢুলছে প্লেনের পরিচারক আর পরিচারিকা, হাঁটুর উপর হাত রেখেছে তারা, মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকে যাচ্ছে, সারাদিনের পেশাদারি হাসির পরে তাদের মুখ এখন ভারি সরল, ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে।…ক-টা বাজলো? কিন্তু থাক, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর কী হবে, আরো কতদূর রাত্রি আছে কে জানে, আর কলকাতায় এতক্ষণে বোধহয় ভোর হ'লো।

তবু শেষ পর্যন্ত রাত্রিটাকে অত্যন্ত বেশি দীর্ঘ মনে হ'লো না, মনে-মনে যে-রকম হিশেব করেছিলাম তার চেয়ে দ্রুতবেগেই সময় কেটে গেলো। হাতে কিছু কাজ না-থাকলে সময়ের ভারে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, এটাই আমাদের সাধারণ ধারণা, কিন্তু ভ্রমণের সময় এই নিয়মটা যেন উল্টে যায়। চলমান অবস্থার নিজেরই একটা সম্মোহন আছে, সেটা আমাদের সময়চেতনাকে ক্ষীণ ক'রে দেয়; যে-কর্মহীনতায় স্বস্থানে আমাদের ঘণ্টাগুলিকে গলায় বাঁধা পাথরের মতো মনে হয়, চলতি পথে তারই জন্য সময় হ'য়ে ওঠে অতিশয় সরল, মসৃণ, নিষ্কণ্টক। কাজের অভাব মানে বৈচিত্র্যেরও অভাব, ঘটনারও অভাব, সময়টাকে গাঁটে-গাঁটে মনে রাখবার মতো চিহ্নেরও অভাব। কিন্তু ভ্রমণকালে একটানা একভাবে চলতে-চলতে সময়ের ওজন যেন ক'মে যায়, প্রমাণ-সাইজের চেয়ে ছোটো হ'য়ে যায় সে; দিল্লি-কলকাতার ছাব্বিশ ঘণ্টা ভাবতে যতই লম্বা হোক, একবার ট্রেনে উঠে বসবার পর দেখতে-দেখতেই কেটে যায় যেন, অথচ দিল্লিতে পৌঁছে প্রথম দিনটা— যখন অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, ঘুরতে হয় নানান জায়গায়— সে-দিনটাকে মনে হয় যেন কতই লম্বা। আবার, কোনো নতুন জায়গায় প্রথম দু-একটা অব্যবস্থার দিন খুব বেশি ভরপুর এবং ভারি মনে হয়, কিন্তু একবার গুছিয়ে বসার পর অভ্যাসের চাপে

সময় আবার কুঁকড়ে যেতে থাকে, হু-হু ক'রে ক্যালেণ্ডারের পাতা খ'সে পড়ে; সময়টাকে খুব তীব্র ক'রে আমরা অনুভব করি, পুরোপুরি খাটিয়ে নিই তাকে, চরম খাজনা আদায় ক'রে নিই, যখন চলতে-চলতে কিছুক্ষণের জন্য থামতে হয় কোথাও। কলকাতা থেকে লণ্ডন, আর লণ্ডন থেকে ন্যুয়র্ক আসতে এরোপ্লেনে যে-ঘণ্টাগুলি আমার কেটেছিলো, এখন চিন্তা করলে মনে হয় সে যেন অল্প খানিকক্ষণ মাত্র, কিন্তু লণ্ডন এবং ন্যুয়র্ক শহরে যে-সময়টুকু কাটিয়ে এসেছি, মাপতে গেলে ওরই প্রায় সমান-সমান তার আয়তন, অথচ ঐ এক-একটা দিনই অনেকগুলো দিনের মতো ভিড় ক'রে আছে মনের মধ্যে। তার কারণ, সেখানে মানুষ ছিলো, ঘটনা ছিলো, ব্যস্ততা ছিলো। ঐ ব্যস্ততাটাই স্মৃতির পক্ষে খুঁটির কাজ করে, তার আতিশয্য যেমন পীড়াদায়ক, তেমনি তার একেবারে অভাব ঘটলেও আমাদের মন আঁকড়ে ধরার কোনো অবলম্বন পায় না।

যখন প্রায় অনন্ত রাত্রির হাতে আত্ম-সমর্পণ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে আছি, মনে-মনে যেন ধ'রেই নিয়েছি যে এই আকাশ-ভরা অন্ধকারের কোনো শেষ নেই, তখন আধো তন্দ্রার মধ্যে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের গলা শুনতে পেলাম—'Just look!' অলসভাবে তাকালাম বাইরে, তাকানোমাত্র তন্দ্রা ছুটে গেলো। অসংখ্য আলোর দেয়ালি জ্বলছে নিচে; হলদে, শাদা, সবুজ, আলোর মালা, আলোর গুচ্ছ, ফাঁকে-ফাঁকে কালো-কালো রাস্তাগুলো মনের মধ্যে হঠাৎ এক-একটা ভাবনার মতো দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, যদিও বাড়িগুলো এখনো নিদ্রামগ্ন ও ছায়াচ্ছন্ন। রোম? রোম। 'সুন্দর শহর,' ইংরেজের পক্ষে একটু বেশি আবেগ-ভরেই ভদ্রলোকটি বললেন। প্লেন ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগলো, অদৃশ্য রোম আলোর ঢেউ তুলে-তুলে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, তারপর দূরে মিলিয়ে চোখ থেকে হারিয়ে গেলো। আবার শূন্যতা, আবার অন্ধকার; মুহূর্তের জন্য প্রায় মনে হচ্ছিলো ঐ আলো বুঝি মরীচিকা— কিন্তু না, একটু পরেই মাটি ছোঁবার নরম ঝাঁকুনিটুকু অনুভব করা গেলো, প্লেন দৌড়ে চললো তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো, প্লেন থামলো।

সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদের দৌড় রেস্তোরাঁর দিকে। তারা কেউ-কেউ ব্যাগ হাতে নিয়েছে, ক্ষিপ্রবেগে ঢুকে পড়েছে বাথরুমে; কোট খুলে, শার্ট ছেড়ে, গেঞ্জি গায়ে দাড়ি কামাতে লেগে গেছে, প্রবলভাবে এক-একটি বেসিন অধিকার

ক'রে হাত-মুখ ধুচ্ছে কেউ-কেউ। এরা পয়লানম্বরি যাত্রী, ভ্রমণবিদ্যায় বিশারদ, যেখানে হোক, যেভাবে হোক, নিত্যকর্ম সেরেই নেবে, কুড়েমি কিংবা গড়িমসি ক'রে একটা সুযোগও হারাবে না। আমি অবশ্য ও-রকম উদ্যমের অধিকারী নই, অতখানি পারিপাট্যের উচ্চাভিলাষও নেই আমার; আমি আস্তে-আস্তে রেস্তোরাঁয় এসে প্রাতরাশের টেবিলে বসলুম। সেখানে খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে দ্রষ্টব্যও কিছু ছিলো। শাদা কোর্তা-পরা ইতালীয় পরিচারকেরা, পাৎলা চুল, চওড়া কপাল, ফোলা-ফোলা লালচে-ছিটেওলা চোখ, কালিদাসের নায়িকাদের মতো যব-পাণ্ডুর গায়ের রং, আর তেমনি শৌরসেনী প্রাকৃতের মতো আধো-আধো নরম আওয়াজের ইংরেজি বুলি। সুশ্রী দেখতে— শুধু সুশ্রী নয়, রাশভারি, গম্ভীর; যদিও ঘরের মধ্যে তারা ভিন্ন আর-কেউ বোধহয় ইটালিয়ান ছিলো না, তবু তাদেরই জন্য জায়গাটার একটু অন্য রকম স্বাদ পাওয়া গেলো। একটু আগে এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করেছি, তার সঙ্গে পাঠক দয়া ক'রে এটাকেও জুড়ে নেবেন; কোথাও-কোথাও, কখনো-কখনো এই তালগোল-পাকানো মনুষ্যতার পিণ্ডের ভিতর দিয়েও একটুখানি স্থানীয় আভা ফুটে বেরোয়— অন্তত রোমের এয়ারপোর্টে ব'সে আমার তা-ই মনে হ'লো।

এতক্ষণে রোমের ঘড়িতে ছ-টা বাজলো, আমার ঘড়িতে বেলা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতার মায়া কাটিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলুম। না-দিলেও চলতো, কেননা, এখনো কোনো নির্ভরযোগ্য সময়ের নাগাল পাইনি, লণ্ডনে গিয়েই আবার বদলাতে হবে। তবু কেমন দৃষ্টিকটু লাগলো আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, তার অগ্রগামিতা যেন স্পর্ধার মতো। তাছাড়া এমনি আমরা অভ্যাসের ফলে ঘড়ির দাস যে বহির্জগতের আচরণের সঙ্গে ঘড়ির ব্যবহার না-মিললে মানসিক আরাম পাই না। এই তো— এখনো রাত কাটেনি, ঘরে আলো জলছে, এখন ঘড়িতে যদি আপিশ যাবার বেলা দেখায় তাহ'লে লাগে কেমন?

কিন্তু বাইরে এসে দেখি— ভোর। হঠাৎ কেমন অবাক লাগলো আমার; এত শিগগির ভোরবেলাকে যেন আশা করিনি। 'এত শিগগির'— তার মানেই 'এত দেরিতে'; দেরিটাই প্রত্যাশিত ছিলো ব'লে আরো কিছু দেরি হ'লেও অবাক হতুম না, এই তিন-চার ঘণ্টার বিলম্ব আমার প্রতীক্ষার দীর্ঘতার তুলনায় 'শিগগির'-এ পরিণত হ'য়ে গেছে। সত্যি, অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করেছি এই ভোরের জন্য, কিন্তু— বাইরে পা দেয়ামাত্র আমার মনে হ'লো— সার্থক হয়েছে এই অপেক্ষা। প্লেন যদি সময়মতো চলতো তাহ'লে রোম পেরিয়ে যেতুম রাত থাকতে; ভাগ্যে দেরি ক'রে চলছে, তাই তো এই ভোরবেলাটিকে পেলুম— অস্পষ্ট, অনির্ণীত, আকারহীন আকাশ-পথে না, শরীরময়ী পৃথিবীর বুকে, স্পর্শময় মাটির বুকে দাঁড়িয়ে, সুন্দরী ইটালিয়ার মৃত্তিকায়। ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা এই দেশের প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য নমুনা না-হ'তে পারে, কিন্তু এ-ও সুন্দর। অবাধ প্রান্তর গড়িয়ে-গড়িয়ে মিশে গেছে আকাশে, মাঝে-মাঝে গাছপালার রেখা, দূরে আঁকাবাঁকা আবছা-নীল পাহাড়। অনায়াসে কল্পনা করা যায় যে দেশেই আছি— ঠিক বাংলাদেশে না হোক, উড়িষ্যা বা সাঁওতাল পরগনার কোথাও, আর বাংলাদেশের অঘ্রান মাসের প্রথম মধুর স্পর্শের মতোই বন্ধুতাময় ঠাণ্ডার শিরশিরানি, শান্ত হাওয়া, তেমনি নরম নীল নির্মেদ আকাশ, যে-আকাশ এখন যেন আসন্ন আলোর চাপে একটু-একটু কাঁপছে ব'লে মনে হয়। অন্ধকার ভাঁজে-ভাঁজে খ'সে পড়লো, ম্লানভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো দিগন্ত, কোমল সোনালি গোলাপি রোদ আস্তে-আস্তে ফুটে উঠলো এরোড্রোমের শান-বাঁধানো কঠিন মেঝেতে, এরোপ্লেনের পালিশ-করা পাখার উপর ঝিলিক দিলো। এইমাত্র আর-একটা প্লেন নামলো, তার যাত্রীরা তাদের নানা-রকম চেহারা আর পোশাক নিয়ে ভিতরে চলেছে, আমার সহযাত্রীরা বাইরে এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। তাদের ব্যস্ততাহীন ভাব থেকে অনুমান করলুম আমাদের ধূমকেতুটি এখনই আবার রওনা হচ্ছে না। তাহ'লে একটু ঘুরে বেড়ানো যায়? এলুম পিছনের দিকে, পূর্ব দিক সেটা। সেখানে শহরতলির রাস্তা, দূরে-দূরে গরিব চেহারার বাড়ি, গাছের সারি, টেলিগ্রাফের তার, দু-তিন মিনিট পর-পর লোকাল ট্রেন উজান-ভাটিতে ছুটে যাচ্ছে। এই সমস্ত— নতুন রোদে সোনালি-হ'য়ে-ওঠা প্রান্তরের মধ্যে, পায়রার বুকের মতো আকাশের তলায়। ভালো লাগলো আমার— ঐ ট্রেনগুলোকে বিশেষ ভালো লাগলো। পথিকের চোখে স্থায়ী জীবনের পরিচয় এনে দিলো এরা, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত, শিকড়-গজানো জীবনের ছবি— ঐ তো ট্রেনে চ'ড়ে কাজে বেরোচ্ছে লোকেরা, রোজ যেমন বেরোয়, এই কথাটা চিন্তা ক'রে আমার সাম্প্রতিক অস্থায়িতার মধ্যে সান্ত্বনার স্পর্শ পেলাম। ইচ্ছে হ'লো আরো কাছে গিয়ে

ট্রেনগুলোকে দেখি, কিন্তু আমার সে-সাধে বাদ সাধলো এয়ারপোর্টের একজন কর্মচারী। সে কী বললে আমি ঠিক বুঝলুম না, কিন্তু তার মুখের ভাবে সন্দেহ হ'লো আমি হয়তো অজান্তে কোনো নিয়ম-ভঙ্গ করছি। একটু পরে সে ফিরে এসে তার পক্ষে শ্রমসাপেক্ষ ইংরেজির সঙ্গে হাতের ভঙ্গি যোগ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমার কর্তব্য হচ্ছে সহযাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো— এখানে নয়। জানি না এই প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে আমি এইটুকু একটা মানুষ এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকলে কার কী ক্ষতি হ'তো, কিন্তু ঐ গড্ডলিকার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেও মন সরলো না— অগত্যা যথাসম্ভব শ্লথ চরণে প্লেনের দিকেই ফিরে গেলুম, প্লেনে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলুম চারদিকে, চোখে-মুখে ঈশ্বরের মুক্ত হাওয়ার স্পর্শ নিলুম। ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়েছে রোদ, দূরের পাহাড় নীল-ধূসর আকৃতি নিয়ে কাছে স'রে এসেছে যেন, নদীর ওপারের রেখার মতো ঝিলমিল করছে নগ্ন দিগন্ত— সেখানে উড়ন্ত আর নামন্ত প্লেনের নাচের ভঙ্গি আকাশের গায়ে জাফরি কেটে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। এই এখানে যখন আলোতে আর নীলিমায় মেশা লাটিন স্বচ্ছতা, প্রায় বাংলাদেশের হেমন্তের সকাল, প্রায় রবীন্দ্রনাথের শরতের গানের অশ্রুত গুঞ্জন, ঠিক এমনি সময়েই শোনা গেলো, টিউটনিক উত্তরাপথে গাম্ভীর্যের গুণ্ঠন নেমেছে, লণ্ডন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তারই ঘোর কাটবার জন্য অপেক্ষা করছে আমাদের প্লেন। এটাও ভাগ্যের কথা— অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো— ব্রাউনিঙের কাম্পানিয়াতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতে পেলুম 'this morn of Rome and May'।— যদিও মে মাস নয়, আর রোম নগরেরও আভাসমাত্র চোখে পড়লো না, তবু এই সুন্দর সকালবেলাটির মধ্যেই ইটালির মানসমূর্তিকে মনে-মনে নমস্কার জানালাম।

সুন্দর দিন, সত্যি। এখন প্লেন আবার চলছে, কিন্তু প্লেনের অবরোধের সংকীর্ণতাও এই উদীয়মান দিনের আভাকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না; আকাশটাকে ঠিক দেখা না-গেলেও অনুভব করা যাচ্ছে, ঘুলঘুলির মোটা কাচের ভিতর দিয়ে এক-এক ফালি রোদ এসে পড়ছে কখনো কোনো ভাগ্যবানের কোলের উপর। চলেছি উত্তর দিকে, যে-কোনো মুহূর্তে কুয়াশায় ঝাপসা হ'য়ে আসতে পারতো, কিন্তু হয়তো আমরা কুয়াশার চেয়েও উপরে

আছি ব'লে, কিংবা নেহাৎ ভাগ্য ভালো ব'লেই, আকাশের বদান্যতা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চললো একেবারে আল্পস পর্বতমালা পর্যন্ত। হঠাৎ এক সময় তাকিয়ে দেখি, নিচে ছড়িয়ে আছে রাশি-রাশি শুভ্রতার পুঞ্জ, রোদের প্লাবনে উজ্জ্বল, কোথাও হাতির দাঁতের মতো ঈষৎ-বাদামি, কোথাও শ্বেতপাথরের মতো ফিকে-ধূসর, আর কোথাও বা বিশুদ্ধ শাদা, তার অবিকল নির্মলতাকে যেন সূর্যের আলো থেকে আলাদা ক'রে চেনা যায় না। পাপড়ির পরে পাপড়ি খুলে গেলো আমার চোখের সামনে— কিংবা দৃষ্টির তলায়, ভাঁজে-ভাঁজে গড়িয়ে চললো চৈনিক দৃশ্যছবির মতো, কোনো অদ্ভুত স্থাপত্যের মতো রেখা, কোণ, বঙ্কিমা নিয়ে ফুটে উঠতে লাগলো— ভঙ্গির পর ভঙ্গিতে, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গে। পাহাড়ের গায়ে ধাপে-ধাপে আটকে আছে শাদা, ম্লান, পাঁশুটে মেঘ, যেন বাচ্চা-বাচ্চা ভেড়ার পাল প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোচ্ছে, কিংবা যেন অসংখ্য নধর শিশু পীনস্তনী, বিশাল কোনো মায়ের বুকে আঁকড়ে প'ড়ে আছে। রোদ, মেঘ আর তুষারে মেশা শুভ্রতার এক বিচিত্র বিস্তার দেখতে-দেখতে চললাম। এরোপ্লেনের অনেক নিন্দে করেছি এতক্ষণ, যেন তারই মহৎ প্রতিহিংসাস্বরূপ সে হঠাৎ তার ঝুলি থেকে এই তুষার-দৃশ্যটি বের ক'রে আমাকে দেখিয়ে দিলে। তখনকার মতো হার মানতে হলো।

কিন্তু এর মধ্যেও ফাঁকি আছে। এই যে দেখলুম, এর মানে কি দেখা হ'লো? আমি কি এর জোরে এ-কথা বলবার অধিকারী যে আল্পস পাহাড় আমি 'দেখেছি'? না। একে দেখা বলে না, এর নাম দৃষ্টিপাত— তাও যাকে বলে বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে, আক্ষরিক অর্থেও তা-ই, ভাবগত অর্থেও তা-ই। অল্পক্ষণের জন্য দেখলুম ব'লে খুঁত র'য়ে গেলো তাও নয়, প্লেন যতক্ষণ ধ'রে আল্পসের উপর দিয়ে চলছিলো, তার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশেও কখনো-কখনো সার্থক দেখার অভিজ্ঞতা ঘ'টে যায় আমাদের। পুরীতে প্রথম যখন সমুদ্র দেখেছিলাম, ভাবতে গেলে দেখার কাজটিতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু সেই এক মুহূর্তেই আমি অবিস্মরণীয়ভাবে অনুভব করেছিলাম— যাকে বলতে পারি সমুদ্রের সমুদ্রতা। তেমনি ক'রে আল্পস-এর স্বরূপ কি ধরা পড়লো আমার মনে? না— সে-রকম কোনো সম্ভাবনারও সমীপবর্তী হইনি। তার কারণ, পরিপ্রেক্ষিতের ভুল। পাহাড় দেখতে হয় মাটিতে দাঁড়িয়ে, উপরের দিকে চোখ তুলে দেখতে হয় কেমন ক'রে স্বর্গের দিকে উঠে গেছে তার চূড়া,

যাকে আমরা এতকাল বড়ো-বড়ো পাহাড় ব'লে জেনেছি সেগুলো কেমন কুঁকড়ে গিয়ে প'ড়ে আছে তলায়, প্রবল মেঘ দীন হ'য়ে তার জানুবেষ্টন ক'রে আছে; আমাদের ব্যস্ততাময় জীবনের দিকে অনেক, অনেক উঁচু থেকে অনির্বাণ উদাসীন দৃষ্টিতে চিরকাল ধ'রে তাকিয়ে আছে সে, অথচ তারও উপরে জেগে আছে অচঞ্চল, অপরিমাণ আর তারও চেয়ে ধ্বংসহীন আকাশ। কিন্তু সেই আকাশ আর পাহাড়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পথ দিয়ে যখন এরোপ্লেন চলে, আর সেই এরোপ্লেনে ব'সে মানুষ নিচের দিকে তাকিয়ে পাহাড় ছাখে, তখন সেই ঔদ্ধত্যের দ্বারা পর্বতের মহিমা আমরা ক্ষুণ্ণ করি। লিখতে-লিখতে আমার মনে পড়ছে যেবার দারজিলিঙের টাইগার হিল-এ সূর্যোদয় দেখতে গিয়াছিলাম। সূর্যোদয় তেমন জমেনি সেদিন, কিন্তু ভোরের আগে কনকনে ঠাণ্ডায় ঐ রকম একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারাটাই এত বড়ো চিত্তশুদ্ধিকর ঘটনা যে সূর্যোদয়ের রঙের খেলায় ভাগে কিছু কম পড়লো ব'লে আপশোশ করিনি। আশ্চর্য সেই মোটরের পথ, জিলিপির প্যাচের মতো অবিরাম বেঁকছে, এক পাশে অতল গহ্বর, আর-এক পাশে তরুশ্রেণীর নিবিড় অন্ধকার তীব্র হেডলাইটে বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। আরো আশ্চর্য সেই শেষ পথটুকু, যেখানে গাড়ি আর চলে না, শ্বাস-কেড়ে-নেয়া বুক-ভেঙে-দেয়া নিষ্ঠুর চড়াই বেয়ে অনেকক্ষণ চলতে হয়, তবে পৌছনো যায় সেই সমতল জায়গাটুকুতে, যেখানে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সূর্যের জন্য প্রতীক্ষা করে লোকেরা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য— সেই জায়গাটাই। যখন আলো ফুটলো, তাকাতে গিয়ে চোখের যেন পলক পড়ে না। চারদিকে তুষার, চিরন্তন, নিরঞ্জন তুষার, চূড়ার পর চূড়া, নিষেধের পর নিষেধ, আহ্বানের পর আহ্বান। অপ্রতিরোধ্য আহ্বান, অনস্বীকার্য মহিমা। হিমালয়ের স্বপ্নময়, ধ্যানমগ্ন রূপটিকে সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এই রূপটাই তার স্বরূপ, এর সামনে এলে মানুষ যেন মুহূর্তের জন্য চিরন্তনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মাথা নিচু হ'য়ে আসে, আত্মনিবেদনের উন্মুখতা জাগে মনের মধ্যে। চোখের আনন্দের সঙ্গে মনের এই নম্র ভাবটিকেও মূল্যবান উপার্জন ব'লে ধরতে হবে। মানুষ শক্তিশালী, মানুষ এই সৃষ্টির অধিনায়ক, এই কথাটা জানতে পারা যেমন জরুরি, তেমনি মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, দুর্বল ও অসম্পূর্ণ, এই কথাটাও মাঝে-মাঝে অনুভব করা প্রয়োজন— নয়তো জীবনের ভারসাম্য

বজায় থাকে না। আজকের দিনে সেই ভারসাম্য উল্টে যাবার অবস্থা হয়েছে, আল্পস-এর দৃষ্টি-অন্ধ-করা কৈলাসকে এরোপ্লেন একটা খেলাঘরে পরিণত ক'রে দিলে, বড়ো জোর একটু রমণীয় আমোদে ; তার কাছে আর ছোটো হ'তে হ'লো না আমাদের, বরং আমরাই তার অত বড়ো উঁচু মাথাটার উপর দিয়ে চ'লে এলাম— শক্তির পতাকা উড়িয়ে, সদর্পে।

আর তাছাড়া আল্পস-এর সঙ্গে আমার চোখের মিলন খুব যে সুসাধ্য হয়েছিলো তাও বলতে পারি না। পার্শ্ববর্তীর কাঁধের উপর দিয়ে ঘাড় বাড়িয়ে, কখনো উঠে দাঁড়িয়ে, কখনো অন্য কারো চেয়ারের পিঠে হাত রেখে অশোভন ভঙ্গিতে দেহটাকে ন্যুব্জ ক'রে— একসঙ্গে দুই দিকেই দেখার চেষ্টায় আমিই প্রায় দ্রষ্টব্য হ'য়ে পড়ছিলাম। যাত্রীদের মধ্যে এতখানি চাঞ্চল্য আর-কেউ প্রকাশ করেনি, যদিও একজন ক্যামেরায় ছবি তোলার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে উদ্বেল হ'য়ে উঠছিলো থেকে-থেকে। আমি মনের ক্যামেরাতেই অধিকতর বিশ্বাসী ব'লে চোখ দিয়ে যেটুকু পারি দেখে নিলুম, তারপর— পাহাড় যখন শেষ হ'য়ে গেলো— ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলুম যে একটু পরেই ফ্রান্স এসে পড়বে, তারপর ইংলিশ চ্যানেল— ঐ সমুদ্রের জল একটুখানি চোখে পড়বে কি ? এই রকম ভাবতে-ভাবতেই— অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো, যদিও আসলে নিশ্চয়ই বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছিলো এর মধ্যে— যেন ম্যাজিকের মতো মস্ত একটা শহর গজিয়ে উঠলো আমার চোখের তলায়— চারদিকের রাস্তা দিয়ে দাবার ছকের মতো ভাগ-ভাগ করা নিবিড় গৃহপুঞ্জ, ঢালু ছাদ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব— খুব নিচু দিয়ে যাচ্ছে। কোন শহর? যাত্রীদের ব্যবহারেই এর উত্তর পাওয়া গেলো : টুকিটাকি জিনিশ ভ'রে নিচ্ছে হাতব্যাগে, কোট প'রে নিচ্ছে, জুতোর অস্তিত্বহীন ধুলো ঝাড়ছে কেউ বা। এর মধ্যে এসে গেলো ! কখন শেষ হ'লো য়োরোপের মহাদেশ, আর সেই মহাদেশ আর বৃটিশ দ্বীপের মধ্যবর্তী খালটুকুই বা কখন পার হলাম—কিছুই বোঝা গেলো না। হ্যাঁ, লণ্ডন নিশ্চয়ই— ঐ তো লাল রঙের দোতলা বাস্ চলেছে, আর তার চিরাচরিত খ্যাতিরক্ষার জন্য আকাশ ঝাপসা হ'য়ে এলো, রোদ্দুর ম্লান, দক্ষিণের আলোর দাক্ষিণ্য উত্তরে অনধিকারপ্রবেশ করেনি, যেন কোনো নির্দিষ্ট সীমান্ত-রেখায় পারস্পরিক চুক্তি-অনুসারে বিদায় নিয়েছে। এ-কথা লণ্ডনের নিন্দার অর্থে বলছি না, বরং আমার লণ্ডনে নেমেই দেশটাকে বড়ো স্নিগ্ধ ব'লে মনে

হ'লো ; বাতাস মৃদু, আকাশ মেদুর, রোদ ঠাণ্ডা। ভালো লাগলো এয়ারপোর্টের আঙিনায় ঘনসবুজ ঘাস, ভালো লাগলো ইংরেজের নরম গলার পরিষ্কার উচ্চারণে ইংরেজি শুনতে। তখন স্থানীয় ঘড়িতে দশটা মাত্র বেজেছে, আমার হাতঘড়ির কাঁটা আর-একবার পেছিয়ে নিতে হ'লো। তারপর কাস্টমস সেরে, বাড়িতে টেলিগ্রাম ক'রে, প্লেন-কোম্পানির বাস্-এ চড়ে এয়ার-টার্মিনাসে যখন পৌছলাম, তখন বেলা প্রায় দুপুর। সেখান থেকে হোটেল। হোটেলের ঘরে এসেই লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুললাম। চেনা গলার আওয়াজের সঙ্গে বিছানার নরম স্পর্শে আরাম ছড়িয়ে পড়লো শরীরে—বোঝা গেলো শরীরটা অনেকক্ষণ ধ'রেই দিগন্তের সমান্তর হবার জন্য উৎসুক ছিলো ভিতরে-ভিতরে।—কিন্তু শুয়ে থাকার সময় নেই, এখনই বেরোতে হবে, স্নানটা সেরে নেয়া দরকার।

৪

আমার এক কলকাতাবাসী ইংরেজ বন্ধুকে আমি একবার জিগেস করেছিলাম যে চীন-জাপানের সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজের যে-রকম সশ্রদ্ধ অধ্যবসায় দেখা যায়, সে-তুলনায় ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তার আগ্রহ এত নিস্তেজ কেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যেটা দূর, অজানা এবং রহস্যময়, তারই আকর্ষণ প্রবল। চীন-জাপান আমাদের কাছে সেই দূরের প্রতিভূ। কিন্তু ভারতবর্ষকে আমরা বিদেশ ব'লে মনে করি না, ভারতবর্ষ আমাদের কাছে ইংলণ্ডেরই একটা সম্প্রসারণ।' এই বন্ধুর সঙ্গে লণ্ডনে যখন দেখা হ'লো, আর তিনি আমাকে জিগেস করলেন, কেমন লাগছে, আমি জবাব দিলাম, 'খুব ভালো। মনে হচ্ছে, কলকাতা ছেড়ে আরো বড়ো আর-একটা কলকাতায় এসেছি।' শুনে একটু গম্ভীর হলেন তিনি, ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁর ধারণা শুনেও আমার মুখে অমনি একটু ছায়া পড়েছিলো হয়তো। 'কলকাতার মতো? কিন্তু পুরোনো, ঐতিহাসিক লণ্ডন— সেটা একেবারেই আলাদা। তার আবহাওয়া অন্য কোথাও পাবে না তুমি।'

জানি, ভারতবর্ষকে 'ইংলণ্ডেরই সম্প্রসারণ' ব'লে ভাবলে যে-রকম ভুল হয়, লণ্ডন শহরটাকে অতিকায় একটা কলকাতারূপে কল্পনা করাও তেমনি। এই দুই দেশের ইতিহাসের মধ্যে যে-অংশটুকু সামান্য, তার আয়তন এদের সমগ্র ইতিহাসের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তার বাইরে, তাকে অতিক্রম এবং বেষ্টন ক'রে, বহুযুগব্যাপী বিবর্তনের ধারা র'য়ে গেছে; সেদিকে তাকালে পার্থক্যটাই বড়ো হ'য়ে চোখে পড়ে, আর সেই পার্থক্যের স্বীকৃতির দ্বারাই সত্য ক'রে দেখা হয়। কিন্তু এই দুই দেশের সংযোগ এবং সংঘাতের পরিচ্ছেদটা অতিশয় সাম্প্রতিক— সে-পরিচ্ছেদ একেবারে সমাপ্ত হ'য়ে গেছে তাও বলা যায় না, অন্তত তার চিহ্নগুলো আমাদের চোখের, কানের, মনের সামনে প্রচুর এবং প্রবলভাবে ছড়িয়ে আছে। এদিক থেকে চিন্তা করলে বোঝা যায়, ইংরেজ কেন ভারতবর্ষকে 'দূর' ব'লে ভাবতে পারে না। আমারও তো লণ্ডনে এসে মনে হ'লো না, এটা বিদেশ। আমার সঙ্গে এই নগরের ব্যবহারে কোথাও যেন আড়ষ্টতা নেই, সব স্বচ্ছন্দ; যা জেনেছি, ভেবেছি, আশা করেছি, হুবহু যেন তা-ই। বিস্ময়ের, উত্তেজনার অংশ একেবারেই বাদ পড়লো, তার বদলে পাওয়া গেলো প্রত্যাশিতের সংস্পর্শের

আরাম। সেই আরাম আরো নিবিড় হয়, যখন পথে বেরোলেই ভারতীয় চেহারা চোখে পড়ে, এবং সন্ধেবেলাটা বাঙালি লেখকের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটিয়ে, ফিরতি পথে ভূতলচারী ভুল গাড়িতে উঠে, রাত দশটায় বাঙালি মেয়ের হাতের রান্না আহার করা যায়। একে তো আমাদের স্বজাতিবর্গের সংখ্যা এখানে সর্বদাই সুপ্রচুর, তার উপর এই দ্বীপবাসীদের ধরন-ধারন সবই আমাদের নখদর্পণে ; এর মধ্যে বৈদেশিকের আস্বাদের সুযোগ নেই বললেই চলে। ইংরেজের সঙ্গে বহুকালের সংস্রব আমাদের ; অনেক তিক্ততায়, অনেক বৈরিতায়, কখনো-কখনো বন্ধুতায়, কখনো সহযোগে, কখনো সংগ্রামে, পার্থিব এবং মানসিক ক্ষেত্রে অনেক রকম বিনিময়ের ভিতর দিয়ে সেই সম্বন্ধ দিনে-দিনে পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। বিনিময় সমান হয়নি, সে-কথা সত্য ; ধনের ক্ষেত্রে শোষণ করেছে ইংরেজ, মনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি আমরা ;— শেষ পর্যন্ত আমরাই হয়তো জিতেছি, তবু এই অসাম্যের জন্যই এই সম্বন্ধের ভিতরে-ভিতরে একটা দুশ্চিকিৎস্য দুর্বলতা থেকে গেছে। কিন্তু হিশেবের খাতায় যোগ-বিয়োগ ক'রে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, সেটা নেহাৎই লাল কালির অঙ্ক নয়, কিংবা মোটের উপর যে-ছবিটা পাওয়া যায়, তাকেও অত্যন্ত কালো বলা যাবে না। জাতি হিশেবে না হোক, ব্যক্তি হিশেবে ইংরেজ তার হৃদয়ের দানও রেখে গেছে ভারতবর্ষে ; আর ইংলণ্ড থেকে ভারতীয় যারা আনন্দ আর উদ্দীপনার সম্পদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এতদিন ধ'রে এত লোকের যাওয়া-আসায়, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ এত বিচিত্র রকমের যোগাযোগে, আমাদের ভূতপূর্ব কর্তৃপক্ষের এই মাতৃভূমির সঙ্গে আমাদের মানসিক ব্যবধান প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঘুচে গেছে ; লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলা সাহিত্যে কলকাতার পরেই যে-শহরের উল্লেখ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তার নাম লণ্ডন। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত উপাদান আমাদের মনের মধ্যেই তৈরি হ'য়ে আছে, বাইরের তথ্যগুলো শুধু তার তলায় যেন পেন্সিল টেনে সমর্থন ক'রে যায়।

এই স্বাচ্ছন্দ্যবোধের গভীরতর একটা কারণ আছে। সেটা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। ভারতবর্ষ অত্যন্ত চেনা ব'লেই ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজ যদি নিঃসাড় হ'য়ে থাকে, আমাদের বেলায় ঘটেছে ঠিক উল্টো ; ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমরা তার সাহিত্যের প্রেমে প'ড়ে

গিয়েছিলাম। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয় ; ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ ছিলো স্থূলতম অর্থে সাংসারিক ; সেটা তার লাভের বস্তু, লোভের উপাদান ; সেই আসক্তির ঘোর-লাগা রক্তিম চোখ আত্মিক বিষয়ে অন্ধ থেকে গেছে। যাকে আমরা শুধু ব্যবহার করি, তাকে আমরা ঠিক চিনতে পারি না ; এই অন্তরায় জর্মানির ছিলো না ব'লে সেখানে হিন্দু শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটতে পেরেছিলো। এদিকে আমরা— ইংরেজের সঙ্গে সাংসারিক সম্বন্ধটা আমাদের পক্ষে মনোরম ছিলো না, কিন্তু সেই সূত্রেই তার মনের সত্যকে দেখতে পেয়েছি আমরা, যে-সত্যের অনস্বীকার্য দলিল তার সাহিত্য। 'দেখতে পেয়েছি' বললাম, কিন্তু বলা উচিত, 'দেখতে পেরেছি,' 'দেখতে চেয়েছি।' অর্থাৎ, এর পিছনে আমাদের আগ্রহ ছিলো, ইচ্ছার সক্রিয়তা ছিলো। চাইতে না-ও পারতাম ; অভিমান অথবা বিরুদ্ধতাবশত সন্তর্পণে স'রে থাকলে বলবার কিছু ছিলো না। কিন্তু আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকিনি, এগিয়ে গিয়েছি, আকাঙ্ক্ষার হাত বাড়িয়েছি— ভিক্ষার জন্য নয়, উপার্জন করবো ব'লে। ভাবতে গেলে এই ঘটনাটা কম আশ্চর্য নয়। ইংরেজের যে-সাম্রাজ্যে কোনো-এক কালে সূর্য কখনো ডুবতো না, তার যে-সব অংশে তারই স্বরক্তজাত জ্ঞাতিবর্গ ঘর বেঁধেছে, সেখানে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা থাকাটা বিস্ময়কর নয়, কিন্তু যে-দেশ অনাত্মীয়, ভিন্নভাষী ও ভিন্নধর্মী, সেখানে ইংরেজির বীজে সাহিত্যের যে-ফসল ফ'লে উঠলো সেটা একেবারেই বেহিশেবি, নিয়ম-ভাঙা, ইম্পীরিয়ল আইন-কানুনের বহির্ভূত ; যারা আমাদের কেরানি বানাবার জন্য ইংরেজি শিখিয়েছিলো, এ-রকম কোনো সম্ভাবনা তাদের কল্পনার মধ্যেও ছিলো না। ইংরেজ যা দিতে চায়নি, তা-ই আমরা নিতে পেরেছিলাম ; আর ইংরেজ যেটা জোর ক'রে গিলিয়েছে সেটা উদ্গীর্ণ ক'রে ফেলতেও আমাদের বিলম্ব হ'লো না। যে-সময়ে ইংরেজের হাতে দাসত্ব-দশায় নেমে গেলাম আমরা, সেই সময়েই— ভাবতে আশ্চর্য লাগে— ইংরেজি সাহিত্য মুক্তি দিলো আমাদের মন ও চিন্তাকে— তার মধ্যে আমরা যাকে চিনতে পারলাম ও অভ্যর্থনা জানালাম, সে তো শুধু ইংলণ্ড নয়, শুধু সাহিত্যও নয়, সেটা য়োরোপ, পাশ্চাত্ত্য পৃথিবী, আধুনিক কাল, ফরাশি বিপ্লবের পরবর্তী নতুন, উজ্জ্বল, ভবিতব্যময় য়োরোপীয় শতাব্দী। সেই শতাব্দী কেটে গেলো, বিশ শতকেরও মধ্যদিন অবসিত, য়োরোপের যৌবন আজ অতীতে, পৃথিবীর নানা স্থলে স্বস্তির নিশ্বাস নিঃসৃত

ক'রে সূর্যাস্তহীন সাম্রাজ্য আজ নিজেই ডুবন্ত। আর এই সমস্ত ভাঙা-গড়া উত্থান-পতনের আঘাত পেরিয়ে খাঁটি যেটুকু বাকি থাকলো, হাতে র'য়ে গেলো, সেই অম্লান উদ্বৃত্তের নামই সাহিত্য— মানুষের মনের সঙ্গে মনের সংযোগ।

তাই বলছিলুম, আমাদের মানস-ভূগোলে ইংলণ্ড অতি নিকটবর্তী দেশ। অন্তত আমি, আবাল্য ইংরেজি সাহিত্যের প্রেমিক, লণ্ডন বলতে আমার মনে আনন্দজড়িত স্মৃতির একটি স্বর্ণরেখা ব'য়ে যায়। এই অনুভূতিটা অনন্যনির্ভর, অর্থাৎ বাস্তব পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়, একান্তরূপে ভাবের দিক থেকেই এর সঞ্চার। যে-সব লেখক আমাদের মনের খুব কাছে এসে কথা বলেন, যাঁদের আমরা আপন জন ব'লে অনুভব করি, তাঁদের জন্মভূমির প্রতিও আমাদের একরকম নিষ্কাম ভালোবাসা জ'ন্মে যায়— তার উৎস বুদ্ধি নয়, আমাদের সহজ স্বজ্ঞা। শুধুমাত্র এই ভাবের আবেগে কখনো কোনো দূরের দেশে যাত্রা করেছেন কেউ-কেউ; জর্মান কবি রিলকে তাঁর যৌবনে গিয়েছিলেন রাশিয়াতে, টলস্টয়ের পুণ্যতীর্থে; সাহিত্য প'ড়ে রাশিয়ার যে-স্বপ্ন তাঁর মনে জেগেছিলো সেই স্বপ্নকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমারও ভাগ্যে এই ভ্রমণ যদি যৌবনকালে ঘটতো, তাহ'লে, নিশ্চিত জানি, এক মন্ময় মায়াবী আভায় রঙিন হ'য়ে উঠতো যেখানেই চোখ পড়তো আমার। এ-ই লণ্ডন— চসার, শেক্সপীয়র, ব্লেক, ডিকেন্স, চেস্টার্টনের লণ্ডন— এ-কথা চিন্তা করতেই আমার রোমাঞ্চ হ'তো তখন। এই মায়াটাকে মিথ্যা ব'লে অশ্রদ্ধা করা ভুল হবে; যে-মেয়ের চেহারায় অনেক খুঁত, সে যখন কোনো বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ-কোনো মানুষের চোখে মোহিনী হ'য়ে দেখা দেয়, সেটাই কি সত্য দৃষ্টি নয়? আবেগের সেই আকুল বয়স এখন আর নেই আমার, আলো থেকে ছায়ার দিকে চলেছি, শান্ত মনে, অনুদ্বেল দৃষ্টি নিয়ে; কিন্তু একদিন যে অঞ্জলি ভ'রে নিতে পারতো, আজকের দিনেও সে একেবারে বঞ্চিত হ'লো না; তার যৌবনের সত্তাসার সঞ্চিত হ'য়ে আছে তার অবচেতনে, তাই এই মহানগরীর মেঘলা হাওয়ায় একটি সহজ অভ্যর্থনার স্পর্শ পেলো সে।

অভ্যর্থনা— প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিদায়। লণ্ডনে আক্ষরিক অর্থেই ক্ষণিকের অতিথি আমি। শুধু পথ চলতে-চলতে তাকিয়ে দেখা, ট্যাক্সি থেকে, বাস্‌-এর দোতলা থেকে— জনবিরল শহরতলির দুপুর, দোকান-পাড়ায় ঘনবিপুল

নিঃশব্দচারী ভিড়, হাইড পার্কের সুবিস্তৃত সবুজ, মেঘলা রোদ, মেদুর আকাশ, যেন স্বচ্ছ একটা ছায়ার পরদা বায়ুমণ্ডলে। শুধু অনুভব করা হাওয়ার স্নিগ্ধতা, ঋতুর মৃদুতা, আর প্রাণযাত্রার বেগ ; শুধু কল্পনা করা মাটির তলায় দিগ্বিদিকে ধাবমান যানের গর্জন, আর মাটির উপরে বিশাল, জটিল, অক্ষৌহিণী জীবনপুঞ্জের অবিরল খরস্রোত। মস্ত একটা বই, অফুরন্ত কৌতূহলে ভরা, একটু থেমে দুটো-চারটে পাতা ওল্টাবার সময় হ'লো না, মলাটের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই তাড়াতাড়ি স'রে যেতে হ'লো।— কিন্তু এই বইয়ের সারাংশ কি অনেক আগেই আমার জানা হ'য়ে যায়নি ?

পরের দিন আবার যাত্রা করলাম। এবার দোতলা প্লেন, শোবার ব্যবস্থাও আছে। এটা শুনতে জমকালো, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা রমণীয় নয়। পাশাপাশি দু-জন দাঁড়াতে পারে না এমনি সরু কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে 'নিচের তলায়' এসে আপনি দেখবেন— আর-কিছু না, মদ্যপানের আসর সাজানো। সংকীর্ণ একটা খুপরি, দেয়াল জুড়ে বসবার বেঞ্চি পাতা আছে, সামনের দিকে বোতলপরিবৃত পরিচারকের কাউন্টার, আর পিছনের সারাটা দেয়ালে মস্ত একটা আয়না, তাতে পুরো কামরাটা প্রতিফলিত হ'য়ে আয়তনের মরীচিকা সৃষ্টি করছে। সেখানে এলে আপনি দেখবেন, বেঞ্চিতে ঘেঁষাঘেঁষি হ'য়ে ব'সে আছে পানার্থীরা, বিরস মুখে, নিঃশব্দে, যেন পান করছে নেহাৎই আর অন্য কিছু করার কিংবা ভাবার নেই ব'লে— আর সিগারেটের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন সেই আরামহীন ছোট্ট খুপরিতে আপনার এক মুহূর্তও দাঁড়াতে ইচ্ছে করবে না, যদি না আপনি নিজেই হঠাৎ প্রবলভাবে পানপ্রবণ হ'য়ে ওঠেন। আর শোবার ব্যবস্থাও এমন নয় যা দর্শন ক'রে চিত্ত ঠিক উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতে পারে। দিনের বেলায় গুটিয়ে-রাখা মাথার উপরকার বেঞ্চিগুলোকে রাত হ'লে আড় করে পেতে দেয়, তার উপর শয্যা বিছিয়ে ক্যানভাসের মোটা পরদা দিয়ে এক-একটাকে আলাদা ক'রে ঘিরে দেয় একেবারে ; সেই বিবরে অদৃশ্য হ'য়ে রাত কাটাতে হবে আপনাকে ; আরাম হোক আর না-ই হোক, শুয়ে যেতে পারছেন এ-কথা জানতে পারার বুদ্ধিগত তৃপ্তি অন্তত পাবেন। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে আমি অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত শোবার টিকিট নিইনি— এখন দেখা গেলো, আমার চিরাচরিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমি হঠাৎ একটা বুদ্ধিমানের কাজ ক'রে ফেলেছিলাম, যদিও সম্পূর্ণ নিজের

অজান্তে। চোখে দেখে বুঝলাম, ওতে যে শুধু টাকা বেঁচেছে তা নয়, বলতে গেলে প্রাণও বেঁচেছে। ঐ পরদা-ঘেরা পায়রা-খোপের মধ্যে তাকাতেই দম আটকে আসে; ওর মধ্যে বন্দী হ'য়ে রাত কাটাবার চাইতে অনেক, অনেক ভালো ব'সে থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে, মাথার উপর বই পড়ার আলো নিয়ে, আর জানলার বাইরে অতল, অকূল, নক্ষত্রহীন অন্ধকার নিয়ে।

প্লেন ছাড়লো সূর্যাস্তের সময়। সূর্যাস্তের দিকেই চলেছি আমরা, পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে, দেখতে-দেখতে মেঘের গায়ে গোলাপি দাগ মিলিয়ে গিয়ে আকাশটা ঠাণ্ডা, শাদা, নীলচে হ'য়ে গেলো। এবার আমি জানলার ধারে আসন পেয়েছি, বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রতি মুহূর্তে অন্ধকারের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কাটছে, রাত আর নামে না। বরং ক্রমশ যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো আবার, একটি সবুজ-হলুদ উষ্ণতার আভা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, পৃথিবীতে যেন নতুন ক'রে বিকেল হ'লো। একটু অবাক লাগলো আমার, কিন্তু এর পরে যে-দৃশ্য এগিয়ে এলো আমাদের দিকে, ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত আকাশে, যার মধ্য দিয়ে অনবরত চলতে লাগলাম আমরা, তা একেবারেই প্রত্যাশার বাইরে, বিশ্বাসের বাইরে, কল্পনার বাইরে। চোখে দেখেও মেনে নেয়া শক্ত, কিন্তু চোখে দেখে মানতেই হ'লো।

মেঘ। মেঘের প্রান্তর, মেঘের সমুদ্র, মেঘের মরুভূমি। হলদে বেগনি ব্রাউন রঙের মেঘ, ধোঁয়ার মতো নীল, ধোঁয়ার মতো ধূসর, ছাইয়ের মতো শাদা, ছাইয়ের মতো কালো, টাটকা-সেঁকা পাঁউরুটির মতো লালচে, নিবে-আসা কয়লার মতো একই সঙ্গে ফ্যাকাশে আর লাল। কোঁকড়া মেঘ, সরল মেঘ, লম্বা আর নিবিড় মেঘ, কোথাও ফাঁক নেই, কোথাও ঝুলে পড়েনি, একটু ঢিল হয়নি কোথাও— একটানা, অবিচ্ছেদ্য, অফুরন্ত, মাইলের পর মাইল। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে মেঘের বিস্তার, সে-মেঘ এমন ঘন, নীরন্ধ্র ও নিশ্চল যে তাকে মাটি কিংবা পাথরের মতো কোনো ঘন পদার্থ ব'লে মনে হয়, যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে চ'লে গেছে একেবারে দিগন্তরেখা পর্যন্ত। ঐ দিগন্তরেখাটা অলীক, আকাশ-পথে যেতে-যেতে কোনো দিগন্ত চোখে পড়া সম্ভব নয়, কিন্তু মেঘের কিংবা আলোর কিংবা প্রকৃতির কোনো কারসাজির ফলে মেঘের শেষে স্পষ্ট দিগন্তরেখা দেখতে পাচ্ছিলাম, যেন আকাশের উপর আর-একটা আকাশ, গোল নয়, সমতল, শূন্য নয়, ঘন,

কঠিন, স্পর্শসহ। আকাশের উপর আর-একটা আকাশ তাতে সন্দেহ কী, জ়ুল ভের্নের বেলুনবিহারীর গল্পকে বৃহত্তর বাস্তবে পরিণত ক'রে ঐ তো আবার সূর্য অস্ত যাচ্ছে, অন্য এক মেঘময়, মায়াময় দিগন্তে ডুবে যাচ্ছে অথচ ডুবছে না, প্লেন যেন প্রতিযোগিতা ক'রে কেবলই আরো উপরে উঠে যাচ্ছে, যাতে এই সূর্যাস্ত আমাদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে না যায়। নানা রঙে বোনা মেঘের গালিচার উপর প'ড়ে-থাকা নরম লাল জলজলে একটা বলের মতো সূর্যকে দেখলাম, আগুন-রঙা টুপির মতো, ঘটের মতো, ডিমের মতো, তারপর দুটি ঠোঁটের মতো বাঁকা একটা রেখা শুধু, আর তারও পরে, অনেক, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মস্ত বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা লেগে রইলো আকাশে— একভাবে লেগে রইলো তাও নয়, মাঝে-মাঝে মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিতে লাগলো আবার, কখনো এখানে, কখনো ওখানে, কখনো মেঘের ঘোমটায় অর্ধেক লুকোনো, আর কখনো বা হঠাৎ এক টুকরো নীলিমার বুকে উজ্জ্বল।

না— এরোপ্লেনের কাছে হার মানতে হ'লো শেষ পর্যন্ত ; তার বঞ্চনার যে-দীর্ঘ তালিকাটি তৈরি করেছিলাম, এই আশ্চর্য অস্তরাগের আবেশ তার অক্ষর-গুলিকে ঝাপসা ক'রে দিলে। বায়ুপথে যাত্রার ক্ষণটাকে চোখের আর মনের পক্ষে একাদশী আর বলতে পারবো না, কেননা দৈবাৎ কখনো এমন কিছু চোখে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে, আমাদের ভূচর জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে যা অতিক্রম ক'রে যায়। এই মেঘ, এই সূর্যাস্ত— এ একেবারেই আশ্চর্য, অলৌকিক, অতি-প্রাকৃত, যেন কোনো সুখী এবং বর্ণবিলাসী জাদুকরের হাতের ইঙ্গিতে উৎসারিত ; মাটিতে দাঁড়িয়ে যা-কিছু দেখতে পাই আমরা, কি দেখতে পাওয়া সম্ভব, তার কোনো-কিছুর সঙ্গেই মিল নেই এর। আমরা মেঘ দেখি আকাশের দিকে চোখ তুলে, কিংবা পাহাড়ে গেলে নিচের দিকে তাকিয়ে ; চারদিক ঝাপসা ক'রে দিয়ে অদেহী মেঘ আমাদের স্পর্শহীনভাবে স্পর্শ ক'রে চ'লে গেলো, এ-অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের ; কিন্তু মেঘ যদি বিশাল একটা প্রান্তরের মতো স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকে, আর তারই উপর দিয়ে অবাধ বেগে চলতে থাকি আমরা, তাহ'লে সেটা কি প্রায় সম্ভবপরতার সীমা পেরিয়ে যায় না ? কিন্তু ঠিক তা-ই মনে হচ্ছিলো আমার ; কিছুতেই আর ভাবতে পারছিলাম না যে এরোপ্লেনে চলেছি, আর চারদিকে মহাশূন্য ছাড়া কিছুই নেই ; মনে হচ্ছিলো— কখনো এক অচঞ্চল সান্ধ্য সমুদ্র ভেদ ক'রে পাগলের মতো নৌকো ছুটেছে,

আর কখনো বা অজানা দেশ, নামহীন, রহস্যময়, সকল মানচিত্রের অতীত, তার লালচে-ধূসর মাটি কিংবা বালুর উপর দিয়ে উদ্দাম যানে চলেছি ; চারদিক নিষ্প্রাণ, নিষ্পাদপ, নিস্তব্ধ, যেন এক চিরন্তন প্রদোষের ছায়ায় আচ্ছন্ন— কিন্তু কে জানে হঠাৎ জেগে উঠবে কিনা আমাদের অজ্ঞাত কোনো নতুনতর প্রাণের রূপ, ফুটে উঠবে কিনা ছায়ার বুক থেকে অন্য কোনো আলো, আমরা যা কল্পনা করতেও পারি না ? এই মেঘের দৃশ্য যদি অল্পক্ষণ পরেই মিলিয়ে যেতো, তাহ'লে একে বলতে পারতুম মনোহর, বেশ নির্লিপ্তভাবে উপভোগ করতে পারতুম— কিন্তু চলেছে তো চলেইছে, শেষ নেই যেন, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, মন সম্মোহন থেকে বিশ্রাম চায় ; আর এই রকম কোনো মুহূর্তে হঠাৎ যদি মেঘের দিগন্তে দেখা দিতো রূপকথার রাজ-পুত্রের প্রাসাদ, কিংবা বালু-রঙের ধুলো উড়িয়ে হাজার ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে আসতো— তাহ'লে আমি একটুও অবাক হতুম না, সেটাকে এই মায়াবী দৃশ্যের সংলগ্ন ব'লে সহজেই মেনে নিতুম। ছেলেবেলায় ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসে অথচ নাটকের রঙ্গমঞ্চ থেকেও চোখ ফেরাতে পারি না, তখন সেই জোর ক'রে খুলে-রাখা আর মাঝে-মাঝে ঢুলে-পড়া দৃষ্টিতে অভিনয়ের বিস্ময়গুলো যেমন অনেক অতিরঞ্জিত হ'য়ে দেখা দেয়— পিছনের তুলিতে আঁকা দৃশ্যপটে নদী আর গাছপালা, অভিনেতার তলোয়ারের ঝিলিক, নায়িকার মর্মন্তুদ বিলাপ, সবই যেন এক স্বপ্নের মধ্যে গ'লে গিয়ে অলৌকিকের আভাস নিয়ে আসে ; যা আছে সেটাকে অত্যন্ত বড়ো ক'রে দেখি, যা নেই তাও হয়তো দেখতে পাই ; যে-কোনো অদ্ভুত আর রোমাঞ্চকর ঘটনার জন্য ইন্দ্রিয়-গুলো উন্মুখ হ'য়ে ওঠে— আমার অবস্থাটা খানিকটা যেন সেইরকম। এই অবস্থার আকর্ষণ যত তীব্রই হোক, মন ভিতরে-ভিতরে ছুটিও চায়, এত বেশি মনোযোগের চাপ আর যেন সইতে পারে না। ছোটো ছেলে ছুটি নেয় ঘুমিয়ে প'ড়ে, আর আমি, শেষ পর্যন্ত এই মেঘের পরে মেঘ যখন শেষ হ'লো, আমিও বিশ্রাম পেলাম আলো-জ্বলা এরোপ্লেনের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে জেগে উঠে। রাত নামলো, থেমে গেলো চোখের উপর বলাৎকার, অন্ধকার গিলে ফেললো আকাশটাকে। রইলো সহযাত্রীদের চেহারা, সিগারেটের ধোঁয়া, কথাবার্তার টুকরো। এতক্ষণ যেন পাৎলা হাওয়ার হাঁপ-ধরানো রাজত্বে ছিলুম, এইবার স্বাভাবিক এবং সাধারণের সুখকর শক্ত মাটির স্পর্শ পাওয়া গেলো। সত্যিকার

শক্ত মাটিতে নামতেও বেশি দেরি নেই— শোনা যাচ্ছে প্রেস্টউইক বন্দর অনতিদূরে।

প্রেস্টউইক মানে গ্লাসগো। শহরটা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান নয়, কিন্তু পারাতলান্তিক বায়ুযানের পথে পড়ে ব'লে এয়ারপোর্টটি মস্ত, জাঁকজমকও কিছু বেশি মনে হ'লো। ভোজনকক্ষে এসে দেখি, উজ্জ্বল কিন্তু অনুগ্র আলোয় লোভনীয়ভাবে টেবিল সাজানো— তাতে ছুরি-কাঁটার সংখ্যা দেখেই ভোজের আয়তন আন্দাজ করা যায়। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পরিচারকেরা, কড়কড়ে কঠিন-শাদা কামিজের উপর 'ল্যাজওয়ালা' কালো কোর্তা তাদের পরনে, প্রসাধনের পারিপাট্যে যেন দরজি-দোকানের পুতুল এক-একটি। কিন্তু যাত্রীরা উপবিষ্ট হওয়ামাত্র এই পুতুলগুলো প্রাণ পেয়ে ন'ড়ে উঠলো— ছুটে এলো, এগিয়ে দিলো, সরিয়ে নিলো, ললিত ছন্দে নিচু হ'লো, লীলায়িত ভঙ্গিতে পেছিয়ে গেলো, নানান আকারের পাত্র বহন ক'রে বিক্ষিপ্ত হ'লো নানান দিকে, ঘেঁষাঘেঁষি টেবিলের ফাঁক দিয়ে যেন হাওয়ায় ভেসে-ভেসে আবর্তিত হ'তে লাগলো— যদিও ঐ পাত্রগুলির অন্তঃস্থ সামগ্রী হাওয়ার চাইতে অনেক বেশি সারবান। স্কচ জাতির কৃপণ ব'লে একটা বহুকালের বদনাম আছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এই স্কটিশ বন্দরেই ঔদরিকতার ঔদার্য ব্যাপ্ত হ'তে দেখা গেলো— শেরি শ্যাম্পেন ইস্তক বাদ পড়লো না। অবশ্য বিলেতি খানার আমি ঠিক সমজদার নই, কিন্তু টেবিলে আমার প্রতিবেশীদের আহ্লাদিত মুখমণ্ডল দেখে অনুমান করা শক্ত হ'লো না যে এটাকে প্রায় আমিরি চাল বলা যায়। একজনের সঙ্গে কয়েকটা বাক্যবিনিময় করা গেলো ; তিনি চায়ের ব্যবসায়ী, ভারতবর্ষে গিয়েছেন, ব্যবসাসূত্রে প্রায়ই এঁকে আমেরিকায় যাওয়া-আসা করতে হয়। চায়ের কাছে আমাদের প্রাপ্য শুধু একটু স্নায়বিক উজ্জীবন, তার সোনালিতর রসটুকু নিংড়ে-নিংড়ে বের ক'রে নিচ্ছে এই স্কচ আর ইংরেজ জাতি, চায়ের স্রোত সাত সমুদ্র ঘুরে-ঘুরে আয়ের স্রোত হ'য়ে ফিরে আসছে এদেরই ভাণ্ডারে। সেই বিশ্ববাণিজ্যের ছবিটাও আমরা ভালো ক'রে দেখতে পাই না, কখনো একটু আভাস পেলে চমক লাগে।

কথা ছিলো, প্রেস্টউইক থেকেই আমেরিকার দিকে তরী ভাসবে। কিন্তু প্লেনে ফিরে এসে খবর পাওয়া গেলো, উত্তর আটলান্টিকে ঝড় উঠেছে, আমরা এখন যাচ্ছি আয়র্লণ্ডের শ্যানন বন্দরে, সেখান থেকে ঝড়ের পথ এড়িয়ে সাগর-

পাড়ি দেবে। অর্থাৎ লণ্ডন থেকে সাড়ে-তিনশো মাইল উত্তরে উঠে এসে, আবার প্রায় ততটাই নেমে যাচ্ছি; আর যতক্ষণে পশ্চিম সমুদ্র প্রায় অর্ধেক পেরিয়ে যাবার কথা, ততক্ষণ য়োরোপের মধ্যেই ঘুরঘুর করতে হ'লো। রেলপথে এইরকম বিলম্ব ঘটলে মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠতো সন্দেহ নেই; কিন্তু এরোপ্লেনে এতে কিছুই এসে যায় না। তার কারণ, আকাশ-যাত্রীরা সমস্ত রকম দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছে। রেল-পথে অনেক-কিছু ভাবার আছে;— ঠিক সময়ে খাবার ফরমাশ দেয়া চাই, অন্ততপক্ষে উঠে গিয়ে ভোজন-কামরায় বসতে হবে; প্রয়োজন হ'লে স্টেশনের শোবার ঘরে জায়গা মিলবে কিনা সে এক সমস্যা; টাইমটেবিলে দেখতে হবে কোনোরকমে অন্য ট্রেন ধ'রে যদি পৌছনো যায়। অর্থাৎ, রেলগাড়িতে চলার সময় আপনার সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা অনেকটা আপনার নিজেরই হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এরোপ্লেনে সেই বালাই নেই। কোনো-কিছুই করবার নেই আপনার— শুধু তা-ই নয়, কিছু না-করাটাই এখানে আপনার কর্তব্য, এমনকি কোনো ব্যবস্থা বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগসুদ্ধ অতীব যত্নে অপসারিত। প্লেন যে-পথেই যাক, যেখানেই নামুক, সময়মতো খাদ্য-পানীয় এগিয়ে আসবে আপনার দিকে— তার জন্য আসন ছেড়েও উঠতে হবে না; বন্দরে-বন্দরে অপেক্ষা করছে ক্লান্তি-নিবারক পেয়ালা; কোথাও হঠাৎ রাত কাটাতে হ'লেও তারাই আপনাকে হোটেলের ঘরে তুলে দেবে; যতক্ষণ-না গন্তব্য স্থলে পৌছলেন, ততক্ষণ আপনি একান্তরূপে পরিচালিত, পর-চালিত। কোনো-কোনা লেখক একনায়কাধীন রাষ্ট্রের যে-রকম বর্ণনা দিয়ে থাকেন, ভাবটা যেন অনেকটা সেই রকম: স্বকীয় উদ্যম, স্বাধীন চিন্তা, এবং বেছে নেবার সম্ভাবনাটাকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে শুধুমাত্র নির্দেশপালন ক'রে যাওয়ার মধ্যে যে-আরাম আছে, আধুনিক মানুষের বিড়ম্বিত ক্লান্ত মন সেই আরামের ক্ষণিক স্বাদ ভোগ করতে পারে এরোপ্লেনে দূরপথে ভ্রমণে বেরোলে। শুধু একটি বিষয়ে অবহিত হ'তে হবে আপনাকে: পাসপোর্টটি পকেটে রাখবেন, সম্ভব হ'লে হাতেই রাখবেন; আর অন্যান্য টুকরো কাগজপত্র যা জ'মে উঠবে তার একটিও যেন হস্তচ্যুত না হয়। তার কোনোটি আপনার রেস্তোরাঁয় আহারের টিকিট, কোনোটি আপনার প্লেনের নিশানা, কোনোটি বা অন্য কিছু;— কিন্তু প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়, কোনো-না-কোনো সময়ে দিতে কিংবা দেখাতে হবে, তৈরি রাখতে ভুলবেন না। প্লেন বন্দরে নামলো, সিঁড়ির

মুখেই খাবার টিকিট হাতে পাবেন ; আহার কিংবা উপাহার সেরে স্বাধীনভাবে একটু ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হ'তে পারে আপনার, কিন্তু সে-ইচ্ছেটাকে অবৈধ-জ্ঞানে বর্জন করবেন ; জানবেন যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া এখান থেকে বেরোবার পথও খুঁজে পাবেন না আপনি, কিংবা পথ খুঁজে পেলেও নিয়ম-কানুন মিটে না-যাওয়া পর্যন্ত বেরোবার অধিকার আপনার নেই। অতএব আপনি ধৈর্য ধ'রে আইন-মেনে-চলা প্রজার মতো অপেক্ষা করবেন, কান খাড়া রাখবেন মাইক্রোফোনের দিকে ; যথাসময়ে সেই অশরীরী কণ্ঠস্বরে নির্দেশ নির্গত হবে, আপনাকে ব'লে দেবে ঐ লাল কিংবা সবুজ আলোটাকে অনুসরণ করতে, কিংবা পাসপোর্ট দেখাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে। পাসপোর্ট, ভিসা, স্বাস্থ্যের পত্রিকা, ঘরের পর ঘর লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ; ঘরের পর ঘর পার হ'য়ে, কর্মচারীর পর কর্মচারীর ভাবলেশহীন মুখের সামনে দাঁড়িয়ে, অবশেষে একটা গলি-পথ দিয়ে যেতে-যেতে অকস্মাৎ বাইরে এসে পড়লেন। আপনি ভাবলেন, বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তা নয়, আপনাকে বের ক'রে নিয়ে আসা হ'লো, আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নেপথ্যবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই কিছুই, সবই ব'লে দেয়, অনেক কিছুই লেখা আছে দেয়ালে; তবু আপনি যদি আমার মতো চাতুর্যগুণে বঞ্চিত মানুষ হন, তাহ'লে আপনার কর্তব্য হবে সহযাত্রীদের মধ্যে কারো-কারো চেহারা চিনে রাখা, এবং সময়-মতো অন্ধভাবে সেই চেনা মুখের অনুসরণ করা। তাহ'লেই পথ হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হবার, কোনো আইন-ভঙ্গ ক'রে বিপর্যস্ত হবার, ভুল প্লেনে চ'ড়ে বসার, বা মাঝপথে প'ড়ে থাকার কোনো আশঙ্কা আপনার থাকবে না। অনুসরণ করো, আদিষ্ট হও— এ-ই হ'লো এখানকার নিয়ম।

এইভাবে চালিত হ'তে-হ'তে, বন্দরে-বন্দরে একই অনিবার্য রুটিনের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে নিষ্কাশিত হ'তে-হ'তে, শেষ পর্যন্ত মনের উপর একটা কুয়াশার পরদা নেমে আসে, কোনোরকম স্বাধীন চিন্তা বা চেষ্টার ইচ্ছেটাও আর থাকে না। আমার অন্তত শ্যাননে এসে তা-ই মনে হ'লো ; মনে হ'লো আমি একটা অর্ধ-জীবন্ত নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়েছি, এই যে চা খাচ্ছি তাও নিয়মরক্ষার জন্য, ব'সে আছি যেহেতু সেটাই আমার কাছে প্রত্যাশিত, নিশানা পেলেই ক্ষিপ্র বেগে উঠে দাঁড়াবো। এই বন্দরটিও প্রকাণ্ড, যাত্রীর ভিড় নিবিড় এখানে, য়োরোপ আর আমেরিকার মধ্যে বিপুলপরিমাণ রক্ত-চলাচলের

স্ফীত একটা শিরার মতো স্পন্দিত হচ্ছে। ব'সে, দাঁড়িয়ে, পাইচারি করতে-করতে নানা দেশের অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করছে ; মেয়ে, শিশু, পুরুষ ; কেউ ঝিমোচ্ছে, কেউ তাকিয়ে আছে শূন্য চোখে, কেউ ব'সে-ব'সেই উশখুশ করছে, কেউ মূর্তির মতো স্থাণু। মিনিটে-মিনিটে মাইক্রোফোন যে-নির্দেশ দিচ্ছে, সেই অনুসারে কল-টেপা পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠছে এক-এক দল, ব্যাগ, বাক্স, কোট নিয়ে লাইন বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে, আবার একটু পরেই তেমনি সারবন্দী হ'য়ে নতুন এক দল এসে ঢুকছে— আর-একটা প্লেন অবতীর্ণ হ'লো। প্রায় জগন্নাথের মেলার মতো ব্যাপার— যদিও প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুনিয়ন্ত্রিত— একটা ঘূর্ণ্যমান জনতার পিণ্ড, তার ভিন্ন-ভিন্ন উপাদানগুলোর বদল হ'লেও সমগ্র চেহারাটা একই থেকে যায়। আর আমি— আপাতত এই জনতারই একটা আণুবীক্ষণিক অংশ ছাড়া আমিও আর-কিছু নই, যা দেখছি তাও যেন ছায়ার মতো অস্পষ্ট, সিনেমার ছবির মতো নির্ভার।

শ্যানন থেকে যখন প্লেন ছাড়লো, তখন মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। পৃথিবীর মাটির সঙ্গে আপাতত সম্পর্ক চুকলো আমাদের ; চারদিকে আকাশ, আর নিচে, অনেক নিচে, অদৃশ্য, অবিচ্ছিন্ন জল। ম্যাপ খুলে তাকিয়ে দেখলাম একবার, দুই মহাদেশ বেষ্টন ক'রে বুক পেতে ছড়িয়ে আছে বিরাট আটলান্টিক। মুহূর্তের জন্য বুকের মধ্যে একটু কম্পন অনুভব করলাম। মনে হ'লো একটা আশ্রয় স'রে গেলো, এই শূন্যমার্গে কোনোরকম অবলম্বন আর রইলো না। এই ভাবটা একেবারেই অর্থহীন, যুক্তিবিরুদ্ধ, কেননা এরোপ্লেনের কোনোরকম স্খলন যদি ঘটেই, তাহ'লে তলায় জলই থাক আর মাটিই থাক, তাতে উল্লেখ-যোগ্য কোনো তফাৎ হবে না, খুব সম্ভব ধরণীবক্ষে প্রত্যর্পিত হবার অনেক আগেই সব দুশ্চিন্তার অবসান হ'য়ে যাবে। কিন্তু কখনো-কখনো বুদ্ধিকে ছাপিয়ে প্রবল হ'য়ে ওঠে যেগুলো আমাদের আদিম বৃত্তি, বংশানুক্রমিক অভ্যাস, যুগ-যুগান্তের সংস্কার। ডাঙার জীব আমরা, মাটির প্রতি এমনি আমাদের রক্তের টান যে এরোপ্লেনটাও যখন মাটির উপর দিয়ে চলে তখন একটু বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করি, তলায় জল ভাবতেই গোপন মনে কোথায় একটা নিঃসহায়তা জেগে ওঠে। বোধহয় এইজন্যেই বিমানবিদ্যার অপরিণত অবস্থায় যখন দুঃসাহসিকতার আহ্বান এসেছে, তখন এই আটলান্টিকের উপর দিয়েই প্রকৃতির

সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করেছে মানুষ। ভাবটা এই— দুই দিকেই আশ্রয়ের সম্ভাবনা ছেড়ে এলাম, এখন দেখা যাক কী হয়। অবশ্য আমরা যারা এই আধুনিক বিমানের টিকিট-কেনা যাত্রী মাত্র, আমাদের মনে এই চিন্তাটা ক্ষণিকের শিহরন তুলেই মিলিয়ে যায়; কিছুক্ষণ চলবার পরেই যন্ত্রের উপর বিচারহীন আস্থা ফিরে আসে। মিনিটের পর মিনিট কাটলো, শয্যার অধিকারী ও -কারিণীরা তাঁদের পিঞ্জরে ঢুকলেন, অন্যেরাও হেলান দিলেন চেয়ারে, নরম আলোয় ম্লান-ভাবে দেখা যেতে লাগলো তাঁদের মূর্তিগুলো— আর তারপর আর কিছুই রইলো না, সব ভাবনা ডুবে গেলো, আবার সেই বেড়ে-চলা রাত্রি, অফুরন্ত অন্ধকার, সময়ের হৃৎশব্দের মতো অবিরাম এঞ্জিনের স্পন্দন, আর ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি প্রান্তিক চেতনার আচ্ছন্নতা।

৫

সাড়ে-আট ঘণ্টায় আটলান্টিক পার হ'য়ে ভোরবেলা গ্যাণ্ডার। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপে এই বন্দর। রোদ্দুর-না-ওঠা, ছাল-ছাড়ানো কাঁচা ভোরবেলায় শীতে কাঁপতে-কাঁপতে যেখানে নামলাম, অমন একটা হতশ্রী জায়গা আগে কখনো দেখিনি। অপরিচ্ছন্ন পথ, অসুন্দর ঘর, চারদিকে একটা আতিথ্যহীন ঠাণ্ডা রুক্ষতা। অবস্থানগুণে বিমানবন্দরে পরিণত না-হ'লে এই জনপদের নাম স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া কখনো কারো কর্ণগোচর হবার কারণ ছিলো না। ভিতরের ব্যবস্থাও তেমনি সৌজন্যবর্জিত। বসবার জায়গা নেই; সুদীর্ঘ কাউণ্টারে খাদ্য-পানীয় পরিবেষণ করছে কতিপয় স্ত্রীলোক, তাদের সাধ্য অথবা ইচ্ছার তুলনায় অনেক অধিকসংখ্যক যাত্রী ভিন্ন-ভিন্ন সার বেঁধে অপেক্ষা করছে। আমি একবার এই সারিতে, একবার ঐ সারিতে দাঁড়ালাম, অন্যান্য অনতিস্পষ্ট উপায়েও পরিচারিকাদের লক্ষ্যগোচর হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সর্বদাই দেখা গেলো যে হয় আমি ভুল জায়গায় দাঁড়িয়েছি, নয় তারা ঠিক জায়গা থেকে অকস্মাৎ অন্যত্র স'রে যাচ্ছে। চা খাবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হ'য়ে আমি আমার চেষ্টায় কোনো শৈথিল্য ঘটতে দিলাম না, এবং অবশেষে ব্যূহভেদ ক'রে একজনের সম্মুখীন হ'তে পারলাম। চা দিলে; তাকিয়ে দেখি, এক পেয়ালা শাদা জল। একটু লক্ষ করতে বোঝা গেলো, কাগজে মোড়া চায়ের পুঁটলি ওরই মধ্যে মগ্ন রয়েছে, চামচে দিয়ে চাপ দিতেই ঈষৎ বাদামি বর্ণ ধারণ করলে। সময়-বাঁচানো, শ্রম-বাঁচানো মার্কিন সভ্যতার একটা প্রথম, নতুন পরিচয় পাওয়া গেলো। স্বাদ-গন্ধ প্রভৃতি বাহুল্যবর্জিত ঈষদুষ্ণ জলে ঠোঁট ভিজিয়ে জিগেস করলাম, খাবার কিছু আছে? এর উত্তরে যে-পদার্থটা এগিয়ে দিলে তার নাম ডো-নাট। সেটাকে একবার দংশন ক'রেই কৌতূহলের নিবৃত্তি হ'লো, আর এ-কথা বুঝতেও দেরি হ'লো না যে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তির জন্য অন্য কোনো শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করতে হবে।

গ্যাণ্ডার থেকে বস্টন ঘণ্টা তিনেকের পথ। যদি বা শহরটার কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেই আশায় আগ্রহ-ভরে তাকিয়ে আছি, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না। তীরলগ্ন সমুদ্রের উপর খামকা খানিকটা মাটি জেগে আছে, সেখানে বসতির পুঞ্জ, ম্লান জল হ্রদের মতো নিস্তরঙ্গ। সারাটা আটলান্টিক দৃষ্টিহীনভাবে পার হ'য়ে এসে এতক্ষণে যদি বা একটু জলের বিস্তার চোখে

পড়লো, তাতেও অবরুদ্ধ রইলো মহাসমুদ্রের মহিমা। লক্ষ করলাম, বস্টন এয়ারপোর্টের গড়ন অন্যরকম, অনেক বেশি কাটাছাঁটা, নৈর্ব্যক্তিক, তার লক্ষ অলংকরণের দিকে নয়, কর্মসাধনের দিকে। এশিয়ার পর য়োরোপ যেমন অন্য রকম, য়োরোপের পর আমেরিকাও তেমনি ; সেই প্রভেদ নানা বিষয়ে এত স্পষ্ট যে এ-দেশে পদার্পণ করামাত্র ধরা পড়ে।

ন্যুয়র্ক বন্দরে নেমে যাত্রীদের মধ্যে দুটো ভাগ হ'য়ে গেলো : যারা মার্কিন তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট পথ, কিন্তু বিদেশীর পক্ষে নির্গমনের ধারাটা অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট ব'লে মনে হ'লো না। এতক্ষণ প্লেন-কোম্পানির তত্ত্বাবধানের অধীন ছিলুম, নিজের জন্য কিছুই ভাবতে হয়নি, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছনো মাত্র সেই একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটলো— আর সেটা এতই অকস্মাৎ, আর এমন উদ্বেল ভিড়ের মধ্যে, যে কোনদিকে যাবো, বা কোনখানে দাঁড়াবো, সেইটে বুঝে নিতেই অনেকক্ষণ সময় কেটে গেলো। যেন একটা হাটের মধ্যে ছেড়ে দিলে আমাকে। বিরাট একটা গুদোমের মতো জায়গা, সেখানে A থেকে Z পর্যন্ত অক্ষরগুলো সারি-সারি মাথার উপর ঝুলছে, আর তার তলায় লম্বা এক-একটা টেবিলের উপর অসংখ্য যাত্রীর অসংখ্যতর মালপত্র পুঞ্জিত হ'য়ে পড়ে আছে। বসবার কোনো ব্যবস্থা নেই, দু-দুটো হাতব্যাগ আর ওভারকোটের ওজনের দ্বারা বিড়ম্বিত হ'য়ে আমি একবার এদিকে যাচ্ছি, একবার ওদিকে ফিরছি, আর কাউকে কিছু জিগেস করার আশায় ব্যর্থভাবে দৃষ্টিপাত করছি মাঝে-মাঝে। এদিকে আমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময়ে অপরাহ্ণ পেরিয়ে গেলো, এখানে বেলা দুপুর, রীতিমতো গরম। ঘড়ির কাঁটা আরো একবার পেছিয়ে দিয়ে ধৈর্য নামক মহাগুণের চর্চা করতে লাগলুম, তখনকার মতো আর-কিছুই করবার ছিলো না।

অবশেষে ইমিগ্রেশন অফিসারের ঘরে তলব পড়লো। সেখানকার কাজ দু-চার মিনিটে সেরে কাস্টমস-এর গোলকধাঁধায় প্রবেশের পথ খুঁজতে লাগলাম। নামের আদ্যক্ষর অনুসারে মাল খালাশের ব্যবস্থা, কিন্তু মুশকিল এই প্রত্যেক টেবিলেই একটা ক'রে 'B' ঝুলছে, কেমন ক'রে জানবো কোনটা আমার পক্ষে ঠিক? অনেকবার ভুল হ'লো, অনেকবার এগোতে এবং পেছোতে হ'লো ; হাতের ব্যাগ দুটো নামিয়ে রেখে কখনো টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে আরামের চেষ্টা, পুনশ্চ সেই ব্যাগ-যুগল উত্তোলন ক'রে নবীন উদ্যমে আক্রমণ— এমনি ক'রে-ক'রে এক জায়গায় এসে একটা নীল রঙের তোরঙ্গকে আমারই সহযাত্রী বলে

চিনতে পারা গেলো। যাক, এতক্ষণে এটুকু অন্তত জানা গেলো যে কোথায় আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমি তো দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু যিনি দয়া ক'রে ঐ তোরঙ্গের গায়ে একটা খড়ির দাগ কেটে আমাকে মুক্তি দেবেন, তাঁর কোথাও দেখা নেই। দেয়ালে ঘড়ির কাঁটা নিষ্ঠুরভাবে স'রে-স'রে যাচ্ছে, আমি ডান পা থেকে বাঁ পায়ে বদল করছি শরীরের ভার, একটু পাইচারি করছি, বিতৃষ্ণ-ভাবে সিগারেট ধরাচ্ছি, আর মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখছি সেই ছোট্ট কাগজ-টুকুর দিকে, যেটা, উৎসাহের আর আশার দূত হ'য়ে, একটু আগে আমার হাতে পৌঁচেছিলো। টেলিফোনের বার্তা : বানান ভুল সত্ত্বেও বোঝা গেলো যে অমিয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন আমি যেন কিংস ক্রাউন হোটেলে যাই, সন্ধ্যা নাগাদ তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এই কাগজটুকু ছাড়া চারদিকে আর-কিছুই উৎসাহজনক ছিলো না তখন। ততক্ষণে টেবিলের উপর আরো অনেক লটবহর জ'মে উঠেছে, আমার স্থটকেসটা পিরামিডের তলায় চাপা পড়লো, যাত্রীর সংখ্যা বিবর্ধমান— বলতে গেলে দাঁড়াবারও আর জায়গা নেই। তার মধ্যে কেউ জর্মন বলছে, কেউ স্প্যানিশ, হঠাৎ একবার বাংলা কথাও কানে এলো। তাকিয়ে দেখি, সস্ত্রীক সকন্যা এক বাঙালি ভদ্রলোক আমার চেয়েও উদ্‌ভ্রান্তভাবে মালপত্রের তদারক করছেন। চেনা-চেনা লাগলো, কিন্তু ভিড়ের আর ক্লান্তির চাপে, আর খানিকটা আমার স্বাভাবিক সংকোচবশত, এগিয়ে গিয়ে আলাপ করা হ'লো না। মোটের উপর ন্যুয়র্ক বন্দরে ব্যবস্থা কিংবা ব্যবস্থার অভাব যেটা দেখলাম, মার্কিনি কর্মকুশলতার প্রবাদের বিরুদ্ধে সেটাকে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ব'লে মনে হ'লো।

শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আবির্ভূত হলেন, একে-একে ডাক পড়লো যাত্রীদের, এবং কোনো-এক সময়ে আমার অপেক্ষার পালা শেষ হ'লো। বেরিয়ে এলাম অবরোধ থেকে রোদ্দুরে, তারপর বাস্‌-এ ক'রে ঘণ্টাখানেকে এয়ার-টার্মিনাস। এয়ার-টার্মিনাস মানে— আমরা যা জানি তা নয়, কোনো আপিশ-বাড়ি নয়, যেখানে আপনি খোঁজ-খবর নিতে পারেন বা একটু ব'সে জিরিয়েও নিতে পারেন— লম্বা, ন্যাড়া একটা গারাজ-ঘর শুধু, বাস্‌টা তার মধ্যে ঢুকে গেলো, বেশ একটু কসরৎ ক'রেই নেমে পড়লেন আপনি, যেখানে নামলেন সেটাই রাস্তা, আর রাস্তাতেই ট্যাক্সি। আপনি অভ্যাসদোষে গড়িমসি করবেন তার কোনো উপায় নেই, এক মিনিট সময় নষ্ট হ'তে পারবে না।

হোটেলে এসে প্রথমে স্নান, তারপর কিছু আহার্যের সন্ধানে বেরোতে হ'লো— আমেরিকার অনেক হোটেলেই ঐ প্রয়োজনীয় বস্তুটির কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এটা শহরতলি, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া ; পথে ভিড় নেই, আশে-পাশের বাড়িগুলোও আকাশের দিকে অত্যন্ত বেশি উদ্ধত নয়। খাবার দোকান কাছেই, কিন্তু সাড়ে-চারটের আগে খুলবে না। আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে নিরিবিলি একটা রাস্তা পাওয়া গেলো, সেখানে একটা বেঞ্চিতে ব'সে সাড়ে-চারটের অপেক্ষা করতে লাগলাম। নরম, রোদালো দিন, পশ্চিমে হেলে-পড়া সূর্য ম্লান উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমার পিছনের দিকে অনেকটা ফাঁকা, পশ্চিম সেটা— সেখানে মাটি হঠাৎ নিচু হ'য়ে নেমে গেছে ব'লে এক সঙ্গে অনেকখানি আকাশ চোখে পড়ে। চারদিক চুপচাপ, একটি-দুটি পাতা ঝরছে গাছের, মাঝে-মাঝে এক-একটা গাড়ি প্রখর বেগে ছুটে যাচ্ছে। এই নতুন শহরে, যেখানে আমি কিছুই জানি না, কাউকে চিনি না, যেখান থেকে কালকেই আবার চ'লে যেতে হবে, সেখানে এই একটু অবসরের মুহূর্তে অবেলায় ব'সে থাকতে আমার ভালো লাগলো। আরো বেশি ভালো লাগতো, যদি না জঠর ক্রমশ অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠে চোখটাকে ঘড়ির দিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিতো বার-বার। ঘড়ির কাঁটা বাঞ্ছিত স্থলে পৌঁছলো ; চা খেয়ে হোটেলে ফিরে আসার খানিক পরেই অমিয় চক্রবর্তী এলেন। বহুদিন পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'লো। এর আগে কিছুদিন যাবৎ তিনি ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় ছিলেন, সময়মতো আমার চিঠি পেয়ে তিনি যে ঠিক আজকের তারিখে ন্যুয়র্কে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন, এটা নেহাৎই আমার বরাতজোরে ঘ'টে গেছে। এইরকম কোনো ঘটনার কথা ভেবেই কোনো চৈনিক কবি লিখেছিলেন— 'বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হওয়াটা তেমনি বিরল, যেমন বিরল শুকতারার সঙ্গে সন্ধ্যাতারার চোখাচোখি।' বন্ধুতার মূল্য, পথের অনিশ্চয়তা, প্রবাসের দুঃখ— এই বিষয়গুলোকে পুরাকালের চীনে কবিরা যে-রকমভাবে বুঝেছিলেন, আজ পর্যন্ত তার কোনো তুলনা মেলে না।

অমিয়বাবুর সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে, প্রথমে তাঁর কন্যা-জামাতাকে সঙ্গে ক'রে একটি জমকালো কাফেটেরিয়ায় আহার করা হ'লো, তারপর কথা বলতে-বলতে ব্রডওয়ে-পাড়ায় ঘুরে-ঘুরে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। হোটেলে ফিরে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম। পরের দিন সকালটা কাটলো

আমার এই ভ্রমণের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশের ব্যবস্থায়, বিকেলবেলা আবার রওনা হলাম।

ন্যুয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন দুটো রেলপথে যাওয়া যায়; আমি যেটাতে চলেছি তার ইস্টেশন ন্যুয়র্ক শহরের মধ্যে নয়, হাডসন নদী পেরিয়ে নিউ জার্সিতে। রেল কোম্পানির বাস্-এ ক'রে স্টেশনে নিয়ে যায়। সেই বাস্-এ উঠে দেখি, আমিই একমাত্র যাত্রী। শুধু আমারই জন্যে এত বড়ো একটা বাস্ চলেছে নাকি? অস্বস্তি বোধ করলাম, নিজেকে প্রায় অপরাধী মনে হ'লো। কিন্তু আমার বিবেকদংশন প্রশমিত ক'রে পথে-পথে আরো যাত্রী উঠলো— বাস্‌টা ঠিক ভ'রে না-গেলেও একটা ভদ্রগোছের সংখ্যা দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত। অনেক পথ ঘুরে-ঘুরে নোংরা আর জীর্ণ একটা পাড়ায় এসে, মস্ত একটা গুদোম-ঘরের মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে, বাস্ হঠাৎ থেমে গেলো। শুনলাম, এখানে আমাদের নামতে হবে, ব্যাগ প্রভৃতি থাকতে পারে। নেমে দেখি, সামনেই নদী, ওপারে নিউ জার্সির কারখানার গায়ে বিজ্ঞাপনের বিরাট অক্ষরগুলো এপার থেকেও পড়া যাচ্ছে। যারা ধূমপায়ী এবং যারা নয়, সেই অনুসারে যাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়াবার জায়গা, আমি অজান্তেই আমার পক্ষে ঠিক জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু কেন দাঁড়িয়েছি, এর পর কী হবে, সেটা ঠিক ঠাহর করতে না-পেরে একজনকে জিগেস করলুম, ব্যাপারটা কী। সে হেসে বললে, 'এবার ছোট্ট একটু সমুদ্রযাত্রা করতে হবে যে!' একটু পরে দেখি, একটা মোটর-চালিত নৌকোর উপর মস্ত বাস্‌টা উত্তীর্ণ হ'লো, তারপর আমরাও সেই খেয়ায় এসে উঠলাম। পথের এই অংশটুকু অভিনব লাগলো। যেখান দিয়ে চলেছি সেটা ন্যুয়র্ক উপসাগরের মোহানা, ঘোলাটে রঙের জলের স্রোত তীব্র, ঢেউয়ের আন্দোলনে সমুদ্রের সঙ্গে এর আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। মাল-বোঝাই লঞ্চ চলেছে, দূরে কোনো বড়ো জাহাজের আভাস হয়তো, কিন্তু কলকাতার গঙ্গার মতো তরণীসংকুল নয় ব'লে নদীর নদীত্ব অবারিতভাবে উচ্ছল। আমাদের একদিকে ফ্যাকাশে রোদ কেঁপে-কেঁপে উঠছে জলের মধ্যে, আর-এক-দিক কুয়াশায় ধূসর— সমুদ্রের দিক সেটা। সেই আচ্ছাদনের ভিতর থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠলো স্বাধীনতার মূর্তি, আস্তে-আস্তে কুয়াশায় মিলিয়ে গেলো আবার, আমরা ওপারে এসে পৌঁছলাম। আবার বাস্, কিন্তু এবার প্রায়

চলবার সঙ্গে-সঙ্গেই থামলো এসে একেবারে রেলগাড়ির সামনে, এবং যাত্রীরা উঠে বসামাত্র (কিংবা ওঠামাত্র, কেননা অনেকে হয়তো তখন পর্যন্ত বসবার সময় পায়নি) ট্রেন ছেড়ে দিলে। অদ্ভুত ব্যবস্থা— বাস্ থেকে ট্রেনে ওঠার জন্য একটি পাটাতন পেতে দিলেই কোথাও আর-কোনো ত্রুটি থাকতো না।

মার্কিন রেলগাড়ির নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনে চলে, গতি প্রবল, আওয়াজ কম, ধোঁয়া নেই। বসবার ব্যবস্থা এরোপ্লেনের মতো চেয়ারে, অনেক গাড়িতেই একটা 'আরাম-কামরা' থাকে, সেখানে ছবিওলা পত্রিকা এবং রেডিও দুর্লভ নয়। সুবিধের মধ্যে খাবার জলের কল যত্র-তত্র, অসুবিধের মধ্যে ধূমপানের কামরা স্বতন্ত্র। এই কামরাটি খুজে বের করতে আমাকে বিলক্ষণ বেগ পেতে হ'লো। অনেকেই জানেন, আমেরিকান ট্রেনে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত অবধি হেঁটে-হেঁটে চ'লে যাওয়া যায়। যাওয়া যায়, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যাওয়া সহজ, এমন কথা যদি কেউ ভেবে থাকেন, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল করেছেন। কামরার দরজাগুলো কিসের তৈরি জানি না, কিংবা তাদের যন্ত্রগত কৌশল বিষয়েও কিছু বলতে পারবো না আমি, কিন্তু ওজনে তারা এক-একটি যেন কেল্লার সিংহদ্বার, রীতিমতো প্রবল পেশীর পরিচয় দিতে পারলে তবে তারা পথ ছেড়ে দেয়। আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই অনুমান করতে পেরেছিলুম যে আমেরিকায় বসবাস করতে হ'লে বলবান হওয়াটা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়; এই ভৃত্যহীন দেশে, যেখানে পেশী-শ্রমের আর্থিক মূল্য অনেক সময়ে মস্তিষ্কচালনার চাইতে বেশি, যেখানে এক-একটি মাল বইবার জন্য পাঁচসিকে পয়সা মজুরি দিতে হয়, এবং সেই বহনকারীও সদাসর্বদা জোটে না, সেখানে বাহুবল জিনিশটা প্রায় একটা সামাজিক এবং নৈতিক গুণের পর্যায়ে পড়ে। আমার এই অনুমান যে মিথ্যে নয়, তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেলো রেলগাড়ির দরজা ঠেলতে গিয়ে— যাকে বলে হাতে-হাতে প্রমাণ। নিশ্বসিত এবং দোলায়িত হ'তে-হ'তে একটার পর একটা দরজা ঠেলে-ঠেলে সব ক-টা কামরা চ'ষে ফেললাম, তারপর ব্যর্থ হ'য়ে যখন ফিরে এসে যে-কোনো একটা আসনে ব'সে পড়েছি, তখন ট্রেনের পরিচারক বললে যে বাথরুমের সংলগ্ন ছোটো কামরায় ধূমপান চলতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে অনভ্যস্ত ব্যায়ামের ফলে আমার অবস্থা এমন যে সিগারেটের চাইতে বিশ্রামেরই প্রয়োজন বেশি।

ট্রেনে চলার প্রধান সুখ বাইরের দৃশ্যের দিকে চেয়ে দেখা, আর সেই দৃশ্যের মধ্যে স্টেশনগুলো অপ্রধান নয়। অন্তত আমাদের ভারতীয় অভিজ্ঞতায় তা-ই বলে। আমাদের দেশের বড়ো-বড়ো স্টেশনগুলো সুন্দর, ছোটো-ছোটো স্টেশনগুলো আরো সুন্দর। যে-স্টেশনে নেমেছিলাম সেটা মনে থেকে যায়, যে-স্টেশনে নামিনি সেটা আরো তীক্ষ্ণ হ'য়ে মনে পড়ে। এমনি কত রঙিন সুতো স্মৃতির তাঁতে বোনা হ'য়ে গেলো— রূপ আর শব্দ, প্রবল আর কোমল অনুভূতি, সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায়; যেখানে পাহাড় ঘেঁষে লাইন বেঁকেছে সেই ছবি, যেখানে অনেক আঁকিবুঁকি লাইন পেরিয়ে ঐ দূরে অন্য একটা নির্জন লাইন চ'লে গেছে কোন সন্ধ্যার দিগন্তের দিকে, মধ্যরাত্রে আধো-ঘুম থেকে জেগে উঠে গমগমে জমজমাট কানপুর, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আসানসোল, দুপুরবেলার ছোট্ট স্টেশনের কুয়োতলা, মৃদু হাওয়া, শিরীষ গাছের ঝিরিঝিরি ছায়ায় ঘুমন্ত একটা কালো কুকুর। সেই চোখ নিয়ে বাইরের দিকে দেখতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলাম। জানি, নিজের দেশের পরিবেশের অন্তরঙ্গতা এখানে আশা করা যাবে না, এই নিউ জার্সি অথবা পেনসিলভ্যানিয়ার প্রান্তরে আমার ব্যক্তিগত বা বংশগত জীবনের কোনো অনুষঙ্গ জড়িত হ'য়ে নেই, কিন্তু তেমনি, নতুনের মধ্যেই অকস্মাৎ আঘাত করার শক্তি আছে, অনভ্যস্তের পক্ষেই চমক লাগানো সহজ। আর তাছাড়া, যাকে সুন্দর বলি তার স্বদেশ তো পৃথিবীর সর্বত্র, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণতা তার, সে বিশুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাক দেয়, স্পর্শ করে মুহূর্তের জন্য, তারপর স্মৃতির কুহকে রূপান্তরিত হয়। এ-কথা না-বললেও চলে যে আমেরিকার বিচিত্র ভূগোলে দৃশ্যের কোনো অভাব নেই, কিন্তু এই ট্রেনে যেতে-যেতে তার সঙ্গে তেমন পরিচয় ঘটলো না। তার প্রথম কারণ, শীতের দেশে জানলা থেকে কাচ কখনো নামে না, আর কাচ জিনিশটা স্বচ্ছ হ'লেও মন তাতে বাধা পায়, চোখের দেখাও ব্যাহত হয় সেইজন্য। দ্বিতীয় কথা, স্টেশনের সঙ্গে ট্রেনের সম্বন্ধ আমাদের অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈদ্যুতিক ট্রেন, এঞ্জিনে জল নিতে হয় না, যে-কোনো দুটো বড়ো শহরের মধ্যে প্রায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ট্রেন আছে, আমরা ভিড় বলতে যা বুঝি তার কোনো চিহ্ন নেই; এই সব কারণে অত্যন্ত অল্পক্ষণ স্টেশনে দাঁড়ায়— ভালো ক'রে বোঝাই যায় না। আমরা মাঝে-মাঝে ট্রেন থেকে নামি, দাঁড়িয়ে থাকি, তাকিয়ে

দেখি, পাইচারি করি— কিন্তু সে-সব এখানে কল্পনাও করে না কেউ, গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন কোনো সিঁড়ি পর্যন্ত নেই, যাত্রীদের নামা-ওঠা হ'য়ে যাওয়া মাত্র আলগা সিঁড়ি তুলে নিলো, ট্রেন ছুটলো আবার।

অর্থাৎ, সমস্ত-কিছুর লক্ষ্যই হ'লো বেগের দিকে, ত্বরান্বিত অতিক্রমণের দিকে। সেটা না-হয় বোঝা গেলো, কিন্তু স্টেশনগুলোর চেহারা এমন রিক্ত, এমন যান্ত্রিক, ধূসর, বর্ণহীন, যে তাতে আমার ভ্রমণের সুখ অনেকখানি ম্লান হ'য়ে গেলো। দেখে অবাক হয়েছিলাম যে এ-দেশে চিঠির বাক্সের রং ধূসর, চিঠি-নিয়ে-যাওয়া গাড়ির রং ধূসর, আর পোস্টাপিশের বাইরের চেহারাও তা-ই। রেল-স্টেশন দেখে বোঝা গেলো, এগুলো একই সামগ্রিক পরিকল্পনার বিভিন্ন অঙ্গ, অলোভনীয় লৌহ-ধূসরের কঠিন রেখাই এ-দেশে যান এবং বার্তা বিভাগের অভিজ্ঞান। সুবিধে বলতে যা বোঝায় তার অবশ্য অভাব নেই ; মাল রাখার জন্য চাবিওলা লোহার দেরাজ আছে, আছে সারি-সারি টেলিফোন, সিগারেটের, চকোলেটের, আইসক্রীমের যন্ত্র। নেই শুধু সেই গুণ, যাকে বলতে পারি ব্যক্তিত্ব, নেই প্রাণের জন্য কোনো আহ্বান, মনের পক্ষে পরিচয়ের কোনো চিহ্ন। ছোটো স্টেশনের শান্ত শোভা নেই, বড়ো স্টেশনের প্রাণচঞ্চল গাম্ভীর্যেরও অভাব। ফেরিওলা নেই, লোকজন কম, কোথাও কোনো সাড়াশব্দই যেন পাওয়া যায় না। ভিড় জিনিশটাকে আমাদের দেশে আমরা যতই নিন্দে করি না কেন, এ-কথা মানতেই হয় যে এই ভিড় মানুষের দ্বারাই গঠিত, আর মানুষের পক্ষে মানুষের মতো হৃদয়গ্রাহী আর-কিছুই নয়। ভারতবর্ষে রেলপথে বেরোলে স্টেশনগুলোই জীবন্ত দেশটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে, কিন্তু এখানে তার সব রাস্তা বন্ধ। মস্ত শহর ফিলাডেলফিয়া, কিন্তু স্টেশনে তার কিছুমাত্র আভাস নেই— কিংবা যদি বা থাকে, কাচের শার্সি ভেদ ক'রে তা পৌঁছতে পারে না, কিংবা হয়তো স্টেশনের আসল অংশ নিচের তলায় প্রচ্ছন্ন থাকে। সন্ধের পরে ওয়াশিংটনে যখন পৌঁছনো গেলো, মনে হ'লো এই মস্ত ট্রেনটা থেকে আমিই একমাত্র যাত্রী নামলুম ; সেই জনবিরল, স্বল্পালোকিত স্টেশনের শূন্য আঙিনা দেখে ধারণা করা শক্ত হ'লো যে এটাই এই প্রকাণ্ড দেশের প্রখ্যাত রাজধানী।

ওয়াশিংটন শহরটি মনোরম, কিছু দক্ষিণে ব'লে আলো অনেক পরিষ্কার, বসতির ঘেঁষাঘেঁষি নেই, সবুজের প্রাচুর্য আছে। এখানে এজ্‌রা পাউণ্ডের

সঙ্গে দেখা ক'রে, ম্যুজিয়ম আর চিত্রশালা দেখে, বাঙালি অধ্যাপকের উপাদেয় আতিথ্যের আশ্রয়ে দিন তিনেক কাটিয়ে দেয়া গেলো। তারপর পুনশ্চ রেলপথ। এবার রাতের ট্রেন, পুলম্যান গাড়ি। এই গাড়ির প্রভূত প্রশংসা আবাল্য শুনে আসছি, কিন্তু দেখে মনটা প্রসন্ন হ'তে পারলো না। মলিন আলো জ্বলছে গলি-পথে, ছ-দিকে নির্জীব রঙের মোটা পরদা দিয়ে ভাগ-ভাগ করা খুপরি, পরদার উপর নিঃশব্দতার নির্দেশ জানিয়ে বিরাট অক্ষরে বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে, আর সেই নির্দেশকে লঙ্ঘন এবং সমর্থন ক'রে কোনো-কোনোটির অভ্যন্তর থেকে নিঃসৃত হচ্ছে নাসিকাধ্বনি। সেই এরোপ্লেনের শোবার ব্যবস্থারই পরিবর্ধিত সংস্করণ আরকি, এর মধ্যে বিলাসিতার নামগন্ধ নেই, বরং আবহাওয়াটা যেন হাসপাতালের মতো মন-মরা, নিগ্রো পরিচারকের মখমলের মতো গভীর কোমল কণ্ঠস্বর ছাড়া আর-কিছুই রমণীয় ব'লে বোধ হ'লো না। আমাকে ঐ রকম একটা খুপরির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে পরদার বোতাম এঁটে দিলে, আজকের রাত্তিরের মতো আমার যেন জ্যান্ত কবর হ'য়ে গেলো। এই লেখাটার গোড়ার দিকে এরোপ্লেন আর রেল-ভ্রমণের তুলনা ক'রে যে-সব মন্তব্য করেছি, তার অনেক কথাই উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না; মার্কিন রেলগাড়ি আমাদের হিশেবে ঠিক রেলগাড়ি নয়, একে বলা যেতে পারে ভূচর এরোপ্লেন।

নরম বিছানা, জোড়া-বালিশ, শিয়রে আলো, তবু শুয়ে যেন কিছুতেই আরাম পাচ্ছি না। হাঁপিয়ে উঠছি, গরম লাগছে, মনে হচ্ছে উঠে গিয়ে অন্য কোথাও ব'সে থাকি। অভ্যাসের দোষ, সন্দেহ নেই। আমাদের জীবনে অনেকটা অংশেই আকাশের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে না, এই রকম সংকীর্ণ অবরোধ আমাদের পক্ষে দুঃসহ। বিষুবরেখা থেকে দূরত্ব অনুসারে বহিঃপ্রকৃতির যে-বদল ঘটে, সেই অনুসারে মানসপ্রকৃতিতেও অনেকটা তফাৎ হ'য়ে যায়। শীতের দেশের মানুষ স্বভাবতই আচ্ছাদনপ্রিয়। তাদের বাড়ির দরজা, ঘরের দরজা সর্বদাই বন্ধ রাখতে হয়, জানলায় থাকে কাচের উপর পরদা, মেঝের উপর কার্পেট, তারা কাপড় পরে আঁটোসাঁটো, শুতে এসে উপরে নিচে ছটো চাদরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকে, এমনকি মৃত্যুতেও কফিনের মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে মাটির তলার অন্ধকারে তাদের সমাপন। আর আমরা গরমের দেশে শরীরটাকে অনেকখানি মুক্ত রাখতে ভালোবাসি; আমাদের ঘর, কাপড়, শোওয়া-

বসা ইত্যাদি সব ব্যবস্থার মধ্যেই আকাশ এবং হাওয়ার জন্য অবিরল অবকাশ রাখতে হয়; আকাশের তলায় বিবাহের অনুষ্ঠান আমাদের, মৃত্যুর পরেও আকাশের তলা দিয়ে যাত্রা, সূর্য অথবা তারার আলোয় অবসান। এই প্রভেদের কারণ যে-প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহারের ধারাতেও অনিবার্য তফাৎ ঘ'টে গেছে। শীতের দেশের প্রকৃতিপ্রেম অনেকখানি আয়োজনসাপেক্ষ, তার জন্য মনস্থির ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়, যেতে হয় পার্কে, পিকনিকে, পল্লীতে, গড়তে হয় 'খোলা-হাওয়া' সমিতি, তরুণ-তরুণীর 'বাউলবিহঙ্গ' সম্প্রদায়। তার কারণ, শীতের দেশে ঘর মানেই আবদ্ধতা, বাইরেটাকে কঠিনভাবে বাইরে রেখেই ঘর সেখানে সার্থক হয়। কিন্তু গরমের দেশে ঘর জিনিশটা অত্যন্ত বেশি ঘর হ'য়ে উঠতে পারে না, সেখানে আঙিনা চাই, বারান্দা চাই, ছাদ চাই, ঘরে ব'সেই বাইরেটাকে ভোগ করার দিকে লক্ষ থাকে সেখানে। বস্তুত, 'ঘর' আর 'বাহির' এই বিষয় দুটোর মূল ধারণাই পৃথিবীর এই দুই অংশে দুই রকম। পশ্চিমী দেশে দেয়ালের মধ্যে রুদ্ধ হওয়াটাই আরামদায়ক, সেই আরামের ব্যবস্থায় দিন-রাত্রির তফাৎটুকু পর্যন্ত ঘুচে গেলেও কারো মনে তেমন আপত্তি ওঠে না। আবার, সেখানে রোদ নিস্তাপ আর বৃষ্টি প্রায় অনুভূতির অগম্য ব'লে বছরের চারটের মধ্যে তিনটে ঋতুতেই আকাশের তলায় স্বচ্ছন্দবিহার সম্ভব, এমনকি চরম শীতেও বাইরের দিকে আমন্ত্রণ রাখার জন্য তুষার-ক্রীড়ার উদ্ভাবন হয়েছে। অর্থাৎ, ঘরে তোমার সংসার, আর বাইরে তোমার প্রকৃতিসম্ভোগ, এই সুস্পষ্ট বিভাগের মধ্য দিয়ে শীতের দেশের জীবনযাত্রা। এদিকে আমাদের দেশে সূর্যের তেজ আর বৃষ্টির প্লাবন কোনোটাই ঠিক বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে অনুকূল নয়; তাই তাদের আলো, স্পর্শ, রূপ, রস, বৈচিত্র্যের দিকে আমরা আমাদের ঘরটাকেই উন্মুক্ত ক'রে রেখেছি, কিংবা কখনো-কখনো দেয়াল-হীন উঠোন অথবা বারান্দাটুকুতেই ঘরের প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে আমাদের। 'ঘরেও আছি, বাইরেও আছি,' মোটের উপর আমাদের ভাবটা হ'লো এই, ও-দুয়ের মধ্যে কোনো কঠিন ব্যবধান আমরা স্বীকার করতে চাই না। আমাদের জানলা দিয়ে আকাশ ঝ'রে পড়ে, টেবিলের কাগজ উড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার ঢেউ ব'য়ে যায়, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে আমরা তারার সঙ্গে চোখোচোখি করি। প্রকৃতির সঙ্গে এই সহজ এবং ঘরোয়া সম্বন্ধ শীতের দেশে সম্ভব হয় না।

এই তফাৎ সাহিত্যের দিক থেকেও দেখানো যেতে পারে। মনে করা যাক ইংরেজি ভাষার প্রকৃতির কাব্য— আমরা কি তার মধ্যে একটু পোশাকি ভাব দেখতে পাই না, একটু আত্মসচেতন ভঙ্গিমা? 'Outdoor' বা 'Nature' নামক কাব্যের একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ইংরেজিতে প্রচলিত আছে; আমাদের কাছে ঐ অভিধা অর্থহীন। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে জড়িয়ে থাকি আমরা; আমাদের সব কাজ ও ভাবনার চিরন্তন পটভূমিকা ঐ আকাশ; ঐ আলো, হাওয়া, আর বৃষ্টির স্বর আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমনভাবে লীন হ'য়ে আছে যে সেগুলিকে আলাদা ক'রে উল্লেখ করাটা— শুধু বাহুল্য নয়, অশোভন ব'লে মনে হ'তে পারে। 'প্রকৃতির কবি' কথাটাও আমরা ইংরেজি থেকে আমদানি করেছি, 'মেঘদূতে'র কবিকে কোনো মল্লিনাথ ও-রকম কোনো আখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি, আর রবীন্দ্রনাথকে 'প্রকৃতির কবি' বলতে গেলে সেটা প্রায় পরিহাসের মতো শোনায়। ঐ পদবিটা ওঅর্ডস্বার্থের পক্ষেই নির্ভুল; প্রকৃতির জন্য পরিশ্রম করেছেন তিনি, তাকে সন্ধান করেছেন বনে, পাহাড়ে, হ্রদে, প্রান্তরে, তার প্রেরণার মধ্যে মানুষের মঙ্গলের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-সব কিছুই করেননি, প্রকৃতিকে বিশেষভাবে আরাধ্য ব'লেও ঘোষণা করেননি কখনো, কোনো ভক্তিপ্রসূত সচেষ্টতার ভাব নেই তাঁর মধ্যে— তিনি যেখানে আছেন, সেখানেই আছেন, আর প্রকৃতি যেন তাঁর কণ্ঠে কথা ক'য়ে— গান গেয়ে— উঠেছে, অসংখ্য অফুরন্ত সুরের হিল্লোলে। যে-মানুষ বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তার কবিতা ওঅর্ডস্বার্থের; যে-মানুষ ব'সে থাকে, ব'সে-ব'সে চেয়ে ছাখে, তার কবিতা রবীন্দ্রনাথের। 'I wandered lonely as a cloud'-এর পাশেই আমাদের মনে পড়বে, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে, আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে।' 'Walk', 'stray', 'roam' প্রভৃতি গতিবাচক ক্রিয়াপদ থেকে ওঅর্ডস্বার্থের কবিতা বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারে না, আর রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম এবং সর্বাধিক-ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ হ'লো 'বসা' আর 'দেখা'। 'দি প্রিলিউড' কাব্যটা ভ্রাম্যমাণের আত্মজীবনী, আর 'গীতবিতান' সেই দ্বিতীয় পাখির সৃষ্টি, যে পাখি কিছু করে না, শুধু ছাখে। 'আমার মন চেয়ে রয় মনে-মনে/হেরে মাধুরী।' ওঅর্ডস্বার্থকে বলা যায় প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, এবং তার উপাসক,

আর রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অন্তরঙ্গ, সহকর্মী। ওঅর্ডস্বার্থের কাব্যের বিষয় প্রকৃতির দিকে মানুষের যাত্রা, আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিষয়— প্রায় ব'লে ফেলেছিলুম মানুষের দিকে প্রকৃতির অভিসার, কিন্তু না, তাও নয়। অভিসার মানে উল্টো দিক থেকে যাত্রা, আর যাত্রা মানেই দূরত্ব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই দূরত্ববোধটাই নেই, তিনি যেখানে আছেন সেখানেই আছে প্রকৃতি। ওঅর্ডস্বার্থকে ভাবলেই যে-ছবিটা আমাদের মনে জাগে, সেটা পথিকের, এমনকি পথশ্রমের ; রবীন্দ্রনাথকে ভাবলেই মনে পড়ে বিশ্রামের বারান্দা বা জানলা, সেই বারান্দার পাশ দিয়েই অন্তহীন পথ চ'লে গেছে, সেই জানলার বাইরেই ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত আকাশ আর পৃথিবী। আর আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি, সেই জানলা আর বারান্দার চাহিদা আমাদেরও জীবনের মধ্যে বদ্ধমূল ; রেলগাড়িতে ভদ্রলোকের যখন আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, তখনো আমরা চাই উঠে বসতে, চেয়ে থাকতে, বাইরে অন্ধকারের পর অন্ধকারের মধ্যে মনের ভাবনাগুলোকে চলতি ট্রেনের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু পুলম্যান গাড়ির বিবিধ-সুবিধে-সংবলিত কামরার মধ্যে আমি যেন পরের বাড়িতে আশ্রয়-পাওয়া ছেলের মতো শুয়ে আছি, কখনো একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেই স্বাস্থ্য-সতর্ক অভিভাবকের ধমক শুনতে হচ্ছে— 'চুপ! শুয়ে পড়ো! ঘুমোও!' শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে ঘুমিয়ে প'ড়ে এই জবরদস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেলাম, আর জেগে উঠেই প্রথম কথা মনে হ'লো— 'যাক, এই খাঁচা থেকে এখন বেরোতে পারবো, বাঁচা গেলো।'

ভদ্র বেশ ধারণ ক'রে জানলার ধারে একটি আসনে এসে বসলাম। তখনো রাত কাটেনি, পাছে স্টেশন পেরিয়ে যাই, সেই ভয় ছিলো ব'লে কিছু আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। ভালোই ; শুয়ে থাকার চাইতে ব'সে থাকাটা অনেক বেশি স্বাধীন। অবশ্য এই স্বাধীনতার কোনো ব্যবহার করা যাচ্ছে না আপাতত, পরদা-ঘেরা ঘুমে বোঝাই ট্রেন, প্রাণহীন স্টেশন, জানলা দিয়ে তাকাতে গেলে ঠাণ্ডা কাচ আমারই ছায়া আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আস্তে-আস্তে স্বচ্ছ হ'য়ে এলো কাচ, ধূসর আলো ফুটলো বাইরে, ভেসে উঠলো এবড়োখেবড়ো মাটি, কারখানার চোঙা, কারখানার আগুন। পরিচারক এসে জানিয়ে গেলো, পিটসবার্গের আর দেরি নেই ; ফ্যাক্টরির বহর দেখেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলাম।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই নদী— রূপসী নদী নয়, যন্ত্রের প্রয়োজনে বাঁধা, লাবণ্যহীন। সাঁকোর উপর দিয়ে যখন ট্যাক্সি চলেছে, কুয়াশার পরদা ছিঁড়ে ঘোলাটে-লাল সূর্য উঠলো। অনেক পথ পেরিয়ে, অনেকবার ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকে, ট্যাক্সি আমাকে নিয়ে এলো সেই মহিলা-কলেজে, যেটা বর্তমানে আমার বাসস্থল এবং কর্মস্থল। কোথায় আমাকে উঠতে হবে তা জানি না ; এখানে একমাত্র যাঁকে চিনি তাঁর বাড়িতেই উপস্থিত হ'তে হ'লো। তিনিই কলেজের কর্ণধার, মার্কিনী ভাষায় প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে তাঁরই গাড়িতে আমার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থলে পৌঁছলাম। তেতলায় ঘর। আমার হাতল-ছেঁড়া স্যুটকেসটা কেমন ক'রে তেতলায় পৌঁছলো তার একটু বিবরণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা বাহুল্য, আমাকেই যদি সেটা তুলতে হ'তো, তাহ'লে ঐ প্রয়োজনীয় বস্তুটার সঙ্গে ওখানেই বিচ্ছেদ ঘ'টে যেতো আমার ; সেই দুর্ঘটনা এড়ানো গেলো প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সৌজন্যে। তিনিই সেটাকে ঘাড়ের উপর তুলে এক দমে তেতলায় নিয়ে এলেন— মৌখিকতম ভদ্রতা ক'রেও কোনোরকম প্রতিবাদের আভাসমাত্র প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না আমার পক্ষে ; নিয়ে আসার পর তাঁর একটু ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো তা সত্য, কিন্তু মুখের হাসিও মিলিয়ে গেলো না, ঠোঁটে চেপে-ধরা পাইপ থেকেও ধোঁয়া বেরোতে লাগলো। দেখা গেলো, আমার বাসস্থলের সংস্কার তখনো সম্পূর্ণ হয়নি, বাথরুমে দুই শালপ্রাংশু নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষ মাজা-ঘষা করছে ; অতএব মালপত্র রেখে তখনই বেরিয়ে পড়লাম আবার, নানারকম কর্তব্য সেরে দুপুর পেরিয়ে ফিরে এলাম। ঢালু আর নিচু ছাদওলা তেতলার দু-খানা ঘর : এই আমার নতুন বাসা। একদিকের জানলা দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি শহর চোখে পড়ে, গির্জের চূড়ো, চিমনির সারি, পঁচিশ-তলা বাড়ি, উঁচু-নিচু ধূসর আর ব্রাউন রঙের ঢালু ছাদ, দূরে পাহাড়ের রেখা। আর-এক দিকে শুকনো ঘাসের জমি, উঁচু হ'য়ে রাস্তা উঠে গেছে, তার দু-দিকের গাছগুলো থেকে হেমন্তের পাতা ঝ'রে পড়ছে এরই মধ্যে। এবার তাহ'লে গুছিয়ে বসতে হয়। বাক্স খুলে কাপড় বের করলাম, তালতলার চটি, বই, লেখার কাগজ। টেবিলটি একটু সরিয়ে নিলাম জানলার দিকে, দেরাজে দু-একটা জিনিশ রেখে ঘরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা গেলো। আর তারপর হঠাৎ যেন আর-কিছুই করবার থাকলো না। ব'সে-ব'সে সময় কেটে গেলো, সূর্য হেলে পড়লো পশ্চিমে,

একটি হালকা, নরম গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়লো আকাশে, আর সেই আকাশের গায়ে কঠিন হ'য়ে ফুটে রইলো পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁটে, কালো স্কাইক্রেপারটা, যেন কোনো দৈত্যের তর্জনীর অপ্রতিহত সংকেত। সেই দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম যে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই সূর্য কলকাতার আকাশে দেখা দেবে।

১৯৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড

জাপান ও হনলুলু

হ্বের্নার ফ্রীডরিশ

বন্ধুবরেষু

১৩ জানুয়ারি, ১৯৬১

শীত, সন্ধ্যা, ওসাকা বন্দর। ভিড় নেই; প্রায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই মাল এসে পৌঁছলো, প্রায় আমরা দাঁড়ানোমাত্র কাস্টমস তাঁদের খড়ির দাগ এঁকে দিলেন, আধ মিনিটে টাকা ভাঙিয়েই ছুটি! কোনো নতুন দেশে প্রথম এসে এত সহজে এয়ারপোর্টের বেড়া ডিঙোতে পারিনি, হয় ভাগ্য আমাদের আজকের তারিখে দয়া করেছেন, নয় এখানকার ব্যবস্থাই উত্তম। আমরা লাউঞ্জে পৌঁছবার আগেই কাচের দরজা ঠেলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর চলন দেখে মনে হ'লো তিনি আমাদের আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুশ্রী আধা-বয়সী ভদ্রলোক, আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থামলেন, কোমর থেকে দেহের ঊর্ধ্বাংশ নত ক'রে বললেন, 'আমার নাম কেনিচিরো হায়াশি, আপনাদের অভ্যর্থনা জানাই, আমরা কয়েকজন অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য। আসুন।' আমরা ভিতরে যেতেই আরো কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন; কেউ যুবক, কারো চুল কানের কাছে রুপোলি, সকলেই অধ্যাপনা করেন ওসাকা অথবা কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে। হায়াশি তাঁদের নাম ও পদবিগুলো ব'লে গেলেন; বিনতি, করমর্দন, পুনশ্চ বিনতির বিনিময় হ'লো। তারপর তাঁরা সাতজন আধো চাঁদের আকারে ঘিরে দাঁড়ালেন আমাদের, গম্ভীর মুখে, প্রায় আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে; সকলের প্রতিনিধি হ'য়ে কথা বললেন একজন মাত্র। ইনি য়ুটাকা ওজিহারা, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক, ছিপছিপে লম্বা, চোখে-মুখে উৎসাহ খেলা করছে। অনেকবার কেশে, অনেকবার থেমে, তিনি তাঁর অনভ্যস্ত ইংরেজি ভাষায় ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করলেন। প্রথম কথা: আমাদের উদ্দেশে তাঁদের সকলের প্রীতি ও আনন্দজ্ঞাপন; দ্বিতীয়: আমাদের আগামী তিন দিনের কর্মসূচি। তাঁর উপস্থাপনায় কোনো অনুপুঙ্খ বাদ গেলো না; পাছে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়, প্রতিটি তথ্য দু-বার ক'রে বলা হ'লো। বক্তৃতার শেষে আবার বিনতি, সকলে ধীরে-ধীরে বসলেন, পেশী শিথিল হ'লো, মুখ সহাস্য, সিগারেটের ধোঁয়া উঠলো শাদা-কালো চুলের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে।

এ-রকম ছবির মতো অভ্যর্থনা আর কোথাও দেখিনি। যখন আমরা মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠছি, তখনও এঁরা ছবির মতো বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে, কাল সকালের কর্তব্য আরো একবার মনে করিয়ে

দিলেন। আমি বুঝে নিলুম, জাপানি শিষ্টাচার অতিশয় সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত; সেই উচ্চগ্রামে পৌঁছতে হ'লে— শুধু আমরা কেন, অন্য যে-কোনো মানবসম্প্রদায় হাঁপিয়ে পড়বে।

কারখানা, আবাসিক পল্লী, প্রত্যেক ল্যাম্পোস্টে সচিত্র বিজ্ঞাপন ঝুলছে, হঠাৎ এক-এক জায়গায় গাছপালার ফাঁকে তারার ঝিকিমিকি— এই সব পেরিয়ে কিয়োটোর দিকে চললুম। হায়াশি আমাদের সঙ্গে আছেন, সঙ্গেই থাকলেন রাত্তির প্রায় এগারোটা পর্যন্ত। আমরা যতক্ষণে আহারের জন্য তৈরি হ'লুম ততক্ষণে কিয়োটো হোটেলের বড়ো ভোজনালয় বন্ধ হ'য়ে গেছে; বেসমেণ্টে, রান্নাঘরের সংলগ্ন একটি ছোটো কামরায় কোণের টেবিলে ব'সে একসঙ্গে অন্তরঙ্গ আহার করলুম আমরা। ঘরটিতে জাঁক-জমক নেই, কিন্তু আপ্যায়ন ত্রুটিহীন, সুগম্ভীর পরিচারকের বদলে এখানে আছে বেতসকান্তি পরিচারিকারা, তাদের গাত্রবাস মালার্মের কবিতার মতো ধবল হ'লেও মুখের ভাব কাঠিন্যহীন। বিশ্রান্ত মনে হ'লো নিজেকে— দ্রুত ভ্রমণের পথে-পথে এই ভাবটি সুলভ নয়— নিশ্চয়ই তার একটি কারণ হায়াশির স্নিগ্ধ সংস্রব। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছি, আর হায়াশি জবাব দিচ্ছেন ধীরে, মৃদু গলায়, শব্দগুলোকে সুচিন্তিতভাবে সন্ধান ক'রে-ক'রে। পারস্পরিক সঙ্গলোভ আমাদের ভোজনকে দীর্ঘায়িত করলে; যতক্ষণ না দরজা বন্ধ করার সময় হ'লো, ততক্ষণ আমরা উঠলুম না। যখন শুতে গেলুম, মনে হ'লো জাপান আমাদের অনেকদিনের চেনা।

১৪ জানুয়ারি

আমি মানুষটা কিছু দীর্ঘসূত্রী, আর তা আমার অজানা নেই, তাই কোনো নিয়োগের জন্য অনেক আগে থেকে তৈরি হ'তে আরম্ভ করি। কিন্তু আজ সকালে কী বিভ্রাট হ'লো জানি না, ঘরে যখন টেলিফোন বাজলো তখনও আমাদের প্রাতরাশ হয়নি। আমাদেরই দোষ: ওজিহারার ন-টার সময় আসার কথা, ঘড়ির কাঁটায় ন-টাতেই তিনি এসেছেন। ছুটলুম নিচে; ট্যাক্সি— রেল-স্টেশন— পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ট্রেন ছাড়বে। 'এটা ছেড়ে দেয়া কি সত্যি অসম্ভব?' অনুনয় না-ক'রে পারলুম না আমি,

'কোনোরকমে এক পেয়ালা চা যদি…আপনার কি মনে হয় না পরের ট্রেনে গেলেও সময় থাকবে?' 'তা থাকবে,' ওজিহারা ঘড়ির দিকে চোখ ফেললেন, 'কিন্তু এই ট্রেনেই আমাদের যাবার কথা কিনা— আচ্ছা, চলুন— ঐ দোতলায় রেস্তোরাঁ— পনেরো মিনিট বাদে পরের ট্রেন।' আমি প্রভূতভাবে ধন্যবাদ জানালুম তাঁকে, প্রভূতভাবে উপভোগ করলুম ঝকঝকে পরিষ্কার ঘরে ঝকঝকে সুন্দর বাসনে ত্বরান্বিত প্রাতরাশ। আসন্ন কর্মসূচির জন্য অনেক বেশি প্রস্তুত মনে হ'লো নিজেকে।

আধ ঘণ্টা পরে।

ওসাকা স্টেশনে ট্রেন ছেড়ে সাব-ওয়ে ধরেছি, দুটি যুবক— বিশ্ববিদ্যালয়ের দূত— এখান থেকে আমাদের সহযাত্রী। ভিড় গাড়িতে; আমার পাশে দাঁড়ানো যুবকটির ফিশফিশে গলা মাঝে-মাঝে কানে শুনছি, কিন্তু একটা কথাও ধরতে পারছি না— হঠাৎ চমকে উঠে আবিষ্কার করলুম তিনি বাংলা বলছেন। সাবওয়ের পরে ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে এঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। আমরা এখন যেখানে চলেছি সেটা ওসাকার বৈদেশিক ভাষা-বিদ্যালয়, ইনি সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, নাম নরিহিকো উচিদা। 'সেখানেই বাংলা শিখেছেন?' 'না, সেখানে হিন্দি পড়ানো হয়, কিন্তু বাংলার জন্য ব্যবস্থা নেই।' 'তবে?' উত্তরে শুনলুম, তিনি বাংলা শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বই প'ড়ে-প'ড়ে, কোবের একজন জাপানি-জানা বাঙালি বাসিন্দার কাছে মাঝে-মাঝে সাহায্য নিয়ে। 'আশ্চর্য!'— আমার মন সবিস্ময় প্রশংসায় ভ'রে গেলো। তাঁর আকাশের তিন তারার নাম শরৎচন্দ্র, সত্যজিৎ রায় ও লতা মুঙ্গেশকার, একবার বাংলাদেশ চোখে দেখা তাঁর গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। 'আপনাদের দেশে— এখন কি— প্রেম-বিবাহ— হয়?' উচিদার এই প্রশ্ন শুনে আমি বুঝতে পারলুম শরৎচন্দ্র রমা-রমেশের বিয়ে না-দিয়ে কত ভালো করেছিলেন; 'প্রেম-বিবাহ' হোক, এই ইচ্ছেটা সকলের মনে জ্বলতে লাগলো, এমনকি এই ষাট দশকের জাপানি যুবকও তার টান এড়াতে পারলেন না। 'তা কিছু-কিছু হয় বইকি। আর আপনাদের দেশে?' 'হ্যাঁ— না— মানে—' যা বলতে চাচ্ছেন তা প্রকাশ করার মতো ভাষা জুটলো না উচিদার, কিন্তু ম্লান হাসি দেখে আমি বুঝলাম এঁর সাধু অধ্যবসায় ভাষাশিক্ষায় সার্থক হ'লেও হার্দ্য ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সিদ্ধিসাপেক্ষ।

গন্তব্যে পৌঁছনো গেলো। কাল সন্ধ্যায় এয়ারপোর্টে যেমন, এখানেও তেমনি। ভাষা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন অপেক্ষায়, একে-একে অভিবাদন ক'রে অতি যত্নে ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের, আধ মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকে পূর্বনির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। এঁদের চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি সূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপ— সব ঠিক ছবির মতো। উপমার এই পুনরুক্তি পাঠককে মার্জনা করতে হবে, কেননা আর-কোনো উপমা নেই। 'যন্ত্রের মতো'ও বলা যেতো, কিন্তু তাতে এইটুকু ভুল হয় যে প্রাশিয়ানদের সঙ্গে জাপানিদের তফাৎটা ধরা পড়ে না। পাশ্চাত্ত্য জাতির যে-সব সামরিক অভ্যাস এখন সামাজিক গুণে পরিণত হয়েছে (শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, ইত্যাদি) সেগুলো সবই জাপানিদের আয়ত্ত, এমনকি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক (কেননা তারাও এক সামরিক ঐতিহ্যে লালিত), কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচ্য লাবণ্য এদের সহজাত, এবং এ-দুয়ের মিশ্রণের জন্যই বিদেশীর কাছে জাপান এমন মনোমুগ্ধকর। একটি সামাজিক অভিবাদনে কতখানি শ্রী ও সৌষ্ঠব ব্যক্ত হ'তে পারে, তা বুঝতে হ'লে জাপানে আসা ভিন্ন উপায় নেই।

আমরা বসেছি বড়ো-বড়ো আরামকেদারায়, প্রত্যেকের সামনে একটি ক'রে নিচু টেবিল রাখা আছে, হাতের কাছে ছাইদান, কাচ-আঁটা জানলার বাইরে শীতের ফুল মাথা নাড়ছে বাগানে। কেন্দ্রীয় তাপ নেই, তার বদলে কয়েকটা লোহার চুল্লিতে কাঠকয়লার আগুন জ্বলছে, সেগুলো ঘরের মধ্যে এমনভাবে ছড়ানো যাতে সকলেই কিছু-না-কিছু উষ্ণতা পায়। একটি মেয়ে ঘরে এসে বিনতি করলে, টেবিলে-টেবিলে একটি ক'রে পেয়ালা রেখে চ'লে গেলো। চা, কিন্তু জাপানি চা— চেখে দেখি, গরম জলেরই নামান্তর, অন্তত বাঙালির পক্ষে তা-ই। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো যে অতিথি এসে পৌঁছনোমাত্র এঁরা কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা রেখেছেন ; এই জিনিশটিকে প্রাচ্য ব'লে চিনে নিতে আমাদের দেরি হয় না।

এর পর আমার বক্তৃতা। এগারোটায় আরম্ভ ক'রে, বারোটার দু-এক মিনিট আগে শেষ করলুম ; অধ্যক্ষের ঘরে ফিরে এসে বসামাত্র লাঞ্চ পরিবেশিত হ'লো। সেই আরামকেদারায় ব'সে, আলাদা-আলাদা নিচু টেবিলেই খাওয়া। ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে এনে দিলে ভাত, কিছু শাকসব্জি, মাংস, ফল, সবশেষে আবার চা। আহারে একটু দেরি হ'লে আমার আপত্তি ছিলো না, যাকে বলে

গা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারলে বরং ভালোই লাগতো, কিন্তু ব্যবস্থার নড়চড় হবার উপায় নেই, আর আমাদেরও তাড়া আছে একটু, অপরাহ্নে কুড়ি মাইল দূরে কোবেতে কিছু বলতে হবে আমাকে।

কোবের পথে দৃশ্য বদলে গেলো। সারি-সারি পাহাড়, রোদে তাদের নীল রং বেগনি দেখাচ্ছে, ধাপে-ধাপে কাঠের, কংক্রীটের বাড়ি, চলতি চোখেও বোঝা যায় অধিবাসীদের অবস্থা সচ্ছল। শুনলুম— যা আগে জানতুম না— যে কোবেতে বেশ কিছু ভারতীয় বণিক স্থায়ীভাবে বাস করছেন, এবং ঐ গিরিলগ্ন ভবনগুলির কোনো-কোনোটির তাঁরাই মালিক। 'ভারতীয়' কথাটাকে আমি তৎক্ষণাৎ 'সিন্ধি গুজরাটি ভাটিয়া'তে তর্জমা ক'রে নিলুম (বাঙালিরা সাহিত্য ও রাজনীতি ছেড়ে হঠাৎ এত দূর দেশে বাণিজ্য করতে আসবে, এটা প্রায় কল্পনাতীত) ; আর সভাস্থলে পৌঁছে দেখলুম আমার অনুমান মিথ্যে নয়, কয়েকজন সিন্ধি বণিক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শুনতে এসেছেন।

জাপান-ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, এই সভার আহ্বায়ক তাঁরাই। নানা বয়সের স্ত্রীপুরুষ জন পঞ্চাশ জড়ো হয়েছেন। সভা আরম্ভ হবার আগে নাকামুরা নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো ; তাঁর মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে আমি কিছুটা অবাক হলাম। পরে শুনলাম, ইনি নিসী-জাপানি, অর্থাৎ, ছেলেবেলা থেকে আমেরিকায় পড়াশুনো করেছেন। 'এখানে সবাই ইংরেজি বোঝেন না,' নাকামুরা বললেন আমাকে, 'আমি আপনার দোভাষীর কাজ করবো। আপনি একটু ধীরে বলবেন।' আমি এক-এক দমকে তিন-চার মিনিট ক'রে ব'লে থামছি, আর তিনি সঙ্গে-সঙ্গে জাপানিতে তর্জমা ক'রে যাচ্ছেন— এইভাবে বক্তৃতা সাঙ্গ হ'লো। মনের সঙ্গে মনের যোজনার আদর্শ উপায় এটাকে বলা চলে না, কিন্তু তবু যে একটা রাস্তা খোলা আছে সেটাই বাঁচোয়া।*

সন্ধ্যার পরে স্থকিয়াকি— অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জাপানি প্রথায় ভোজন। স্থান— কোবে শহরের একটি ক্লাব ; অতিথিরা জন কুড়ি হবেন। ছোটো নিচু একতলা

---

* পরে টোকিওতে আমার কোনো-কোনো বক্তৃতা এইভাবে হয়েছে : আমি এক-একটি বাক্য ব'লে থামছি, আমার অধ্যাপক বন্ধু তা অনুবাদ করছেন, কোনো-কোনো বাক্য দু-বার ক'রে বলতে হচ্ছে। যখনই কেনো ভারতীয় নাম উচ্চারণ করছি, রোমান হরফে তার বানান লিখে দিচ্ছি ব্ল্যাকবোর্ডে।

বাড়ি— ভিতরে-বাইরে, যাকে বলে স্থচারু ঠিক তা-ই। লাল টালির ঢালু ছাদ যেন এগিয়ে এসে আশ্রয় দিচ্ছে। আমরা কাছে আসতেই টানা দরজা খুলে গেলো। দুটি সুন্দরী পরিচারিকা হাঁটু ভেঙে ব'সে অভ্যর্থনা জানালে, ঢেউ-খেলানো ভঙ্গিতে ঘাসের চটি এগিয়ে দিলে সকলকে। খাশ জাপানি ঘরে রাস্তার জুতো পায়ে কেউ ঢোকে না; টুপি ওভারকোটের মতো চর্মপাদুকাও বাইরে ত্যাজ্য। দুটো ছোটো কামরা পেরিয়ে খাবার ঘরে এলাম। বাঁশ আর কাঠ মিলিয়ে দেয়াল, কাঠের মেঝে সূক্ষ্ম মাদুরে আবৃত। দেয়ালে ঝুলছে জাপানি চিত্রকলার নমুনা, টবে রাখা বেঁটে গাছের ভঙ্গিমায় এদের উদ্ভিদ-বিত্মার প্রমাণ দাঁড়িয়ে। আসবাবের মধ্যে কয়েকটি নিচু ও চৌকো টেবিল (নিচু মানে আমাদের জলচৌকির মতো), তাদের ঘিরে ধবধবে শাদা কুশান পাতা, পিছনে একটি ক'রে লোহার চুল্লি তাপ বিলোচ্ছে। এক-এক টেবিলে চারজন ক'রে বসা হ'লো। টেবিলের মধ্যস্থলে গোল ক'রে খাঁজ কাটা, তাতে রক্তবর্ণ গালার পাত্র বসানো। আমরা বুঝতে পারিনি ওটার কী ব্যবহার, কিন্তু একটু পরে দেখা গেলো তারই তলায় কাঠকয়লার উনুন জলছে— ঐ পাত্রেই রান্না হবে। পরিচারিকারা দিয়ে গেলো প্রতিজনকে দুটি ক'রে ফল, এক চামচে সয়া বীনের চাটনি, সামনে রাখলে একটি ক'রে বাটি ও ভোজন-শলাকা (আমরা কাঁটা-চামচে নিলুম), আর ডান দিকে কুঁজো আর গেলাশ। কুঁজোতে আছে সাকে, শীতের জন্য তাতিয়ে আনা হয়েছে। ফরাশিদের যেমন 'ভঁ্যা', জর্মানদের বিয়ার, জাপানিদের তেমনি সাকে; এই অন্নজাত লঘু ও বর্ণহীন সুরা এদের খাদ্যের সঙ্গে নিত্যপেয়। কিন্তু সেবনের পদ্ধতিতে তফাৎ অনেক। সাকের গেলাশে আঙুল ডোবালে এক কড়ের বেশি ভেজে না, আর পেট-মোটা সরু-গলা কুঁজোটি ছ-ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু। প্রথমে একবার গলা ভিজিয়ে নিলেন সবাই, তারপর রান্না আরম্ভ হ'লো।

প্রতি টেবিলে একজন ক'রে পুরুষ রান্না করছেন— আমাদেরটায় নাকামুরাই সূপকার। তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে আমার বিশ্বাস হ'লো যে আমেরিকায় দীর্ঘ প্রবাস তাঁর জাপানিত্বে চিড় ধরাতে পারেনি। হাতের কাছে কাঠের ট্রেতে সাজানো আছে মাংস, চর্বি, নানা রকম আনাজ; নাকামুরা দক্ষ আঙুলে সেগুলো খণ্ডিত করছেন, চর্বির সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছেন সেই গালার বাটিতে, এক-এক পাত্র স্থকিয়াকি তিন মিনিটে রান্না হ'য়ে যাচ্ছে, ভোক্তারা ইচ্ছেমতো

তুলে-তুলে নিচ্ছেন। এমনি 'উন্থুন-থেকে-মুখে' বার-বার একই ব্যঞ্জন খাওয়া হ'তে লাগলো। মাংসটা বৈদিক ঋষির ভোগে লেগে থাকলেও মধ্যযুগে অভিজাত হিন্দুর ভক্ষ্য ছিলো না, কিন্তু স্থকিয়াকির পক্ষে সেটি অপরিহার্য উপাদান। (শুনলুম, কোবের গোমাংস আর ওসাকার ভূতলযান 'পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ', আমার রসনাকে মানতে হ'লো যে এই দাবির প্রথম অংশ সমর্থন-যোগ্য হ'তেও পারে।) আলাদা পাত্রে অন্য এক জিনিশ পরিবেষিত হয়েছে: টুকরো-করা অরুণবর্ণ কাঁচা মাছ;— এই বস্তুটির খ্যাতি দেশে-বিদেশে বহুদিন ধ'রে শুনছিলুম; এবার জানা গেলো তার স্বাদ অনেকটা কুমড়ো, লাউ, অথবা কাঁচা ছানার মতো— এমন মসৃণ আর এত সহজে গলা দিয়ে নেমে যায় যে নিরামিষ ব'লে ভুল হওয়া সম্ভব। পশ্চিমী দেশে রান্না-করা মাছও এক-এক সময় গন্ধের দাপটে দুঃসহ— আর এরা কী ক'রে কাঁচা মাছকে এমন নির্বাস ও স্নিগ্ধ ক'রে তোলে, এটা আমার কাছে এক সমস্যা হ'য়ে রইলো। হয়তো মাছটা কোনো বিশেষ জাতের, যা শুধু জাপানি জলেই পাওয়া যায়; অন্ততপক্ষে অভিজ্ঞদের মুখে শুনেছি যে জাপানের বাইরে অপক্ক মৎস্য সুখাদ্য নয়— জাপানি রেস্তোরাঁতেও না।

এই স্থকিয়াকিতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমার মনে হচ্ছে যে ভোগের বিষয়ে জাপানিদের উৎসাহ যেমন মিতাচারও তেমনি, আর এদের বিখ্যাত 'সৌন্দর্য-বোধে'রও মূল কথাটা বোধহয় এই। এদের আছে ইহলোকের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা (যা আমাদের নেই), আর সেই সঙ্গে এক ব্যবহারিক অণিমাসিদ্ধি (যা ভারতীয়, পাশ্চাত্ত্য বা এমনকি চৈনিক সভ্যতায় অভাবনীয়)। ভূষণের বিরলতার জন্যই এদের ঘর সুন্দর, এদের তানকা কবিতা ক্ষমাহীনভাবে একত্রিশ অক্ষরে সীমিত, এদের ছবিতে বস্তুর তুলনায় হিল্লোল বেশি, নো নাট্যের মেয়াদ আধ ঘণ্টা, আর এদের ভোজন স্বাদু, সুদৃশ্য, স্বাস্থ্যকর ও স্বল্পমাত্রিক। খৃষ্টান শাস্ত্রে (আমাদের মহাভারতেও) অতিভোজন মহাপাপের অন্যতম, কিন্তু জাপানি সমাজে তার যেন সুযোগই নেই; তাদের পাত্রগুলির ক্ষুদ্রতাই সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই রকম ছোটো-ছোটো পাত্রে চীনেরাও পরিবেষণ করে, একসঙ্গে অধিক পরিমাণ সামনে আনে না, কিন্তু এই প্রথার পরিপূরক হিশেবে তাদের ব্যঞ্জনসংখ্যা অগুনতি। রেঙ্গুনে দু-একবার পূর্ণাঙ্গ চৈনিক ভোজে আহূত হ'য়ে দেখেছি, ব্যাপারটা ক্রমশই দশাননের যোগ্য হ'য়ে উঠছে,

বাহিনীর শেষ দেখা যাচ্ছে না, ঘর্ম ও ঘণ্টার ক্ষরণ অনিবার্য ও অভিপ্রেত। জাপানি সভ্যতায় চীনের অবদানের কথা কারোরই অজানা নেই; অনেক বিষয়ে প্রতীচীর আক্ষরিক অনুকরণও এখানে বদ্ধমূল; কিন্তু 'জাপান' বলতে আবহমানভাবে যা-কিছু আমাদের মনে পড়ে— চারুতা, সৌকুমার্য, নির্ভার ন্যূনোক্তি— তারই একটি প্রতিরূপ আমি স্থকিয়াকিতে দেখতে পেলাম।

শুধু একটা জিনিশ ভালো লাগলো না; আমরা যাকে এঁটো বলি সে-বিষয়ে এরা একেবারেই অবহিত নয়; একই শলাকা দিয়ে সূপকার নিজেও খাচ্ছেন, রান্নাও নাড়ছেন, অন্যদেরও তুলে দিচ্ছেন মাঝে-মাঝে। (এই 'এঁটো' ব্যাপারটা কি তথাকথিত আর্যজাতিরই সংস্কার— অন্য কারো নয়?)

মাস্থ, আমাদের সন্ত-আলাপিতা জাপানি তরুণী, তাঁর সঙ্গে প্র. ব.-র বন্ধুতা নিবিড় হ'য়ে উঠছে। যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রণয়, এ হ'লো তা-ই। মেয়েটি যেন উনিশ-শো-কুড়ির বাংলা উপন্যাসের নায়িকা, 'একগুচ্ছ রজনী-গন্ধার মতো', ছাঁটা চুল ও পশ্চিমী বেশ তাঁর সহজ লাবণ্যের ক্ষতি করতে পারেনি; তাঁর হাত নাড়া, ঘাড় ফিরিয়ে তাকানো, আহার ও আলাপের সময় ঠোঁটের নড়াচড়া— এর প্রতিটি জিনিশ পর্যবেক্ষণের যোগ্য। ইনি কথা বলেন বাতাসের মতো গলায়, যে-কোনো তুচ্ছ মন্তব্য শুনে এঁর বুকের ভিতর থেকে যে-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে, তা একই সঙ্গে বিনয়, বিস্ময় ও সমর্থনের পরিচয় দেয়। 'তুমি গান গাইতে পারো?' ভোজনের মধ্যপথে প্র. ব. জিগেস করলেন এঁকে। মাস্থ তখনই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন: আমাদের দেশে গায়িকাদের যেমন অনেকবার সাধ্য-সাধনা করতে হয়; ওজর, আপত্তি, ছল, ছুতো, সর্দি, গলা-খুশখুশ, সখীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি, হাত তুলে খোঁপার অবস্থা পরীক্ষা, নানা দিকে কপটকাতর চাহনি-নিক্ষেপ— এই সব স্নায়ুপীড়ক সিঁড়ি পেরিয়ে তবে তাঁদের হাঁ করানো সম্ভব হয়— এখানে সে-রকম কিছুই ঘটলো না, পরবর্তী কুড়ি মিনিটের মধ্যে বিনা বিরামে তিনখানা গান গাইলেন মাস্থ। খুব হালকা গলা, উঁচু পর্দায় ওঠে না, গানের স্থরে বিলেতি মিশোল স্পষ্ট, করুণ রসের প্রাধান্য নেই। শেষের গান দুটিতে অন্যেরাও যোগ দিলেন— সিনেমার চলতি গান সে-দুটি— আবহাওয়া প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো। এমন স্বচ্ছন্দভাবে পুরুষদের গান গাইতে শুনে আমি কিছুটা অবাক হলাম। রান্না জানেন, আবার

যৌথ গীতেও যোগ দিতে পারেন, এমন পুরুষ আমাদের দেশে ক-জন? অনেক বিষয়ে জাপানিদের সঙ্গে প্রতীচ্যদের সাদৃশ্য বেশি।

১৫ জানুয়ারি

আজ সকালে একটি পুরোনো জেন মঠ দেখতে এসেছি; আমাদের সঙ্গী হায়াশি-দম্পতি আর মাস্থ।

দীর্ঘ বীথিকা উঁচু হ'য়ে উঠে গেছে, তার প্রান্তে মঠের দ্বার। বীথিকার দুই দিক চেরি গাছে নিবিড়, মঠের উদ্যানেও তার প্রাচুর্য। চেরি, কিন্তু শীতে পুষ্পহীন ও পিঙ্গলবর্ণ; গাছগুলোর উচ্চতা এমন যে 'তরু' না-ব'লে 'বৃক্ষ' বললে শোভা পায়; আমেরিকায় এদের জ্ঞাতি যাদের দেখেছি তারা আকারে আরো ছোটো ব'লে মনে পড়ে। মঠের উদ্যানটি বিস্তীর্ণ, বন্ধুর ও আপাত-দৃষ্টিতে এলোমেলো, অর্থাৎ এক সযত্ন যত্নহীনতার দ্বারা শিল্পিত ও প্রাকৃতের মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে; য়োরোপে যাকে বলা হয় 'ভূদৃশ্য-কানন' আর য়োরোপে যার উদ্ভব আঠারো শতকে, জাপানে তার চর্চা বহু-কালের। কাঠের তৈরি মঠ, স্থাপত্য প্যাগোডাধর্মী, পরম্পর ত্রিকোণ ছাদ-গুলির প্রান্তভাগ বাঁকানো। ঢুকেই যেখানে বিবিধ স্মরণিক বিক্রয় হচ্ছে, সেখানে আমাদের চর্মপাদুকা পরিহার ক'রে ভিতরে এলাম। একটি যুবক ভিক্ষু আমাদের প্রদর্শক।

ভিতরটা ঠাণ্ডা, নিরাভরণ* ও নিরানন্দ— অক্সফোর্ডের কোনো প্রাচীন ছাত্রাবাসের মতো। এই তুলনা অন্য দিক থেকেও সার্থক, কেননা 'ধর্ম' বলতে হিন্দুর মনে যে-সব অনুষঙ্গ জেগে ওঠে এখানে তার প্রায় কিছুই নেই (থাকতেও পারে না); আমাদের হিশেবে এটি একটি শিক্ষায়তন, এবং শিক্ষণীয় বিষয়টিও 'ব্রহ্মবিদ্যা'র অনুরূপ নয়। অনেকগুলো ঘর ঘুরে-ঘুরে পিছন দিকের একটি বারান্দায় এলাম, সেখানে রোদের তাপ মধুর মনে হ'লো আর ভালো লাগলো সবুজ বনবেষ্টিত পুরোনো পুকুর, যেন বহুযুগের স্মৃতির চাপে

* অর্থাৎ, হিন্দু বা রোমান ক্যাথলিক মন্দিরের তুলনায়। দেয়ালের কোনো-কোনো অংশ সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত, প্রাচীরচিত্রে বুদ্ধজীবনীও দেখা গেলো, কিন্তু আমরা যাকে 'রস' বলি তার কোনো আয়োজন নেই। আর তা নেই ব'লেই জেন এখন প্রতীচীর একটি উৎসাহের বিষয়।

নিথর হ'য়ে আছে। এই মঠের শিক্ষাপ্রণালী চাক্ষুষ দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিলো, কিন্তু আজ শুনলুম কোনো অধিবেশন নেই ; একটি বৃহৎ ও শূন্য কক্ষে একজন আচার্য আমাদের সম্ভাষণ করলেন ; সেখানে কতগুলো কাষ্ঠদণ্ড দাঁড় করানো আছে— তা দিয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা পরস্পরকে প্রহার ক'রে থাকেন, জ়েন তন্ত্রের এটি একটি অঙ্গ।

বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ঐতিহ্যের 'প্রটেস্টান্ট' শাখা বলা যেতে পারে ; অন্তত এ-কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদই প্রথম, মহত্তম, ও সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে কেন টিকলো না তার কারণ আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই ; কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে ভারতীয় হিন্দুর মনে একদিকে যেমন পৌত্তলিকতা বদ্ধমূল, তেমনি অন্যদিকে, জগৎকে 'মায়া' ব'লে জেনেও, দূরকল্পনার মায়া সে কাটাতে পারে না ; আর বৌদ্ধ ধর্মে এই দুয়েরই সুযোগ স্বল্প। আমাদের মানতেই হবে যে মঙ্গোলীয় মানসতা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবনিষ্ঠ ও সংসারবিশ্বাসী ; ঋজু ও কঠিন কনফ্যুশীয় নীতি যেখানে উৎপন্ন ও ব্যাপ্ত হয়েছে সেই জমিতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও বৈচিত্র্যলাভ স্বাভাবিক। জাপানি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায় ছয়টি (তাদের উপশাখা অসংখ্য), তার মধ্যে জ়েন প্রাচীনতম না-হ'য়েও অধুনা সবচেয়ে বিখ্যাত। বোধিধর্ম, এক ভারতীয় বৌদ্ধ, ছয় শতকের প্রারম্ভে চীনে এসে ছয় বৎসরকাল এক নিরঞ্জন দেয়ালের দিকে বদ্ধনেত্র হ'য়ে নিঃশব্দে ও অনবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করেছিলেন*— অন্তত তাঁর বিষয়ে এটাই কিংবদন্তী। ইনিই জ়েন-এর ঐতিহাসিক জনক ; একে পরবর্তী কালে জাপানে নিয়ে আসেন কনফ্যুশীয় চৈনিক পরিব্রাজকেরা ; স্থানীয় শিণ্টো (দেবমার্গ) ও বুশিডো (যোদ্ধমার্গ)-র সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে এই বুপ্পো (বুদ্ধ-মার্গ) এখানে এমন একটি নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকের মতে জাপানের আত্মা নিষ্কলভাবে বিধৃত।

হয়তো খুব ভুল হবে না, যদি বলি বৌদ্ধমার্গে জ়েন সম্প্রদায় চরম 'প্রটেস্টান্ট'। তত্ত্ব, শাস্ত্র, আচার, উপদেশ, মন্ত্র, পূজা, অনুশাসন— যা-কিছু অবলম্বন ক'রে কোনো ধর্ম তার কলেবর লাভ করে— সব বর্জন করেছেন

* জ়েন শব্দটি 'ধ্যান'-এর অপভ্রংশ।

এঁরা ; শাক্যমুনিকে দৃষ্টান্ত হিশেবে মানলেও গুরু অথবা অবতারে এঁরা আস্থাহীন ; অন্যেরা যাকে জ্ঞান বলে— যা বুদ্ধি ও সচেতন প্রয়াসের দ্বারা লভ্য— এঁদের মতে সেটাই ভ্রান্তি। স্বজ্ঞা ছাড়া আশ্রয় নেই এঁদের ; ধ্যান ভিন্ন পদ্ধতি নেই, এবং জগতের যে-কোনো বস্তু এঁদের ধ্যানের বিষয় হ'তে পারে— একটি ফুল, কুমড়ো, এক বস্তা আলু, কিছুই উপেক্ষণীয় নয়, কেননা 'আসলে' সব-কিছুর মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। একটি ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দ্রষ্টা যখন নিজেকেই ফুল ব'লে উপলব্ধি করেন (অর্থাৎ, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদ যখন লুপ্ত হ'য়ে যায়), তখনই তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ হ'লো— খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা হ'লো এই। না-বললেও চলে, এই অবস্থায় পৌছনো সহজ নয়, তা বহুবৎসরব্যাপী প্রযত্নসাপেক্ষ ; আর আচার্যের উপদেশ না হোক উপস্থিতির প্রয়োজন আছে (সেইজন্যেই মঠ)। আচার্যের কাজ হ'লো— প্রশ্নের কূট উত্তর দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে (যষ্টির দ্বারা আঘাত, আসন থেকে অতর্কিতে নিক্ষেপ, আকস্মিক অর্থহীন চীৎকার— সবই বিধেয়) শিষ্যকে অনবরত এমনভাবে চমকে দেয়া যাতে সে বুদ্ধির মোহজাল থেকে ধীরে-ধীরে মুক্ত হ'য়ে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে। এবং একবার সেই উত্তরণ ঘটলে (পারিভাষিক নাম 'সাটোরি') আর-কোনো সমস্যা থাকে না, এক মহান মৌনতায় বিশ্বের স্বরূপ উন্মীলিত হয় ; ভাষা, চিন্তা, চেষ্টা— সব অবান্তর হ'য়ে ঝ'রে পড়ে।

এ-কথা কি সত্য নয় যে ভারতীয় বৌদ্ধ যুগেও হিন্দু মানস প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে গেছে ? কেননা অজ্ঞাবাদী তথাগতের আমরা নাম দিয়েছি 'ভগবান বুদ্ধ', 'অবদানশতক' (দৃষ্টান্ত : 'নটীর পূজা'র শ্রীমতী) ভক্তিরসে উচ্ছল, এবং অজন্তা-চিত্রও হার্দ্য আবেদনে বলীয়ান ? কিন্তু জেন ধর্মে জ্ঞান যেমন বর্জনীয় তেমনি প্রেমেরও স্থান নেই ; এবং বুদ্ধি ও হৃদয়, বিচার ও বিশ্বাস যুগপৎ পরিহার্য হ'লে যা অবশিষ্ট থাকে তা এত বেশি সূক্ষ্ম যে বাইরে থেকে সব রাস্তাই বন্ধ মনে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় সব তন্ত্রই স্ববিরোধে আক্রান্ত ; ভাষার অর্থহীনতা প্রমাণের জন্য জেন মুনিরা যেমন লক্ষ কথা লিখে গেছেন, তেমনি তাঁদের শূন্যবাদ, অসবর্ণ চৈনিক সৌন্দর্যচর্চার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে, এমন কয়েকটি ক্রিয়াকর্মের জন্ম দিলে, যা পরতে-পরতে বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত ও আনুষ্ঠানিক। আমাদের ভাষায় যা ব্রত, জাপানের চা-অনুষ্ঠান তা-ই, আমাদের

দেবমূর্তির মুদ্রার মতো নো নাটকে প্রতিটি ভঙ্গি অর্থপূর্ণ ; এবং এই সবই জ়েন-এর অবদান, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলাতেও তার প্রভাব দূরস্পর্শী। সাধনার লক্ষ্য যেখানে নির্মমভাবে অরূপ, সেখানে রূপের এই বিচিত্র আবির্ভাব এ-কথাই প্রমাণ করে যে কোনো-না-কোনো রকম প্রতিমা ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না।

মঠ দেখা শেষ হ'লে, সংলগ্ন ভোজনশালায় হায়াশি আমাদের নিয়ে এলেন। কাননে ঘেরা একতলা কাঠের বাড়ি, পরিবেশ মনোরম, সারি-সারি কয়েকটি ঘর-বরাবর রৌদ্রপ্লাবিত বারান্দা চ'লে গেছে। একটি কামরা— আমার মনে হ'লো হায়াশি আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন— আমরা তার বারান্দায় উঠতেই সহাস্য ও ভাষাহীন অভ্যর্থনা জানালেন এক প্রৌঢ় ভিক্ষু, তিনিই বোধহয় ভোজনশালার পরিচালক। এতক্ষণ ধ'রে শীতে কাঁপার পরে ভালো লাগলো রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে চুল্লিতে হাত সেঁকতে। খাওয়া হ'লো জাপানি ধরনে— নিরামিষ, কিন্তু সাকে দিলে। বেরিয়ে আসার সময় বারান্দায় দুটি গেইশা-মেয়েকে দেখলুম ; তাদের খোঁপা জটিল ও বিরাট, গায়ে চিত্রিত কিমোনো, মুখে পাণ্ডুর প্রসাধন। ছেলেবেলায় পড়া 'জাপানি ফানুষ' বইটা মনে প'ড়ে গেলো আমার ; মনে হ'লো এরা সেই রূপকথা থেকে উঠে এসেছে।

১৫ জানুয়ারি, বিকেল

প্র. ব. সওদা করতে বেরোলেন, মাস্থ তাঁর সঙ্গিনী ও পরামর্শদাত্রী, আমি অগত্যা অনুচর।

ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার ধারণা হ'লো যে জাপানিরা ভারি সুদর্শন জাত। আমরা এদের বেঁটে ব'লে ভাবি— সেটা ভুল ; আমরা ভাবি এদের নাক চ্যাপ্টা— সেটাও ভুল। লম্বা, সুগঠিত নাসা— এমন লোক রাস্তায় অগুনতি। গায়ের রং চীনেদের মতো হলদে নয়, বরং গোলাপির দিকে, চোখের কোল ফোলা-ফোলা কিন্তু আকার ছোটো নয় ; মুখের ছাঁদ আমাদের পক্ষে অচেনা হ'লেও অনেক মুখ আমাদের, বা অন্য যে-কোনো হিশেবে, সুশ্রী। স্বাস্থ্য ভালো, পোশাক ভালো (বিলেতি সাজ মেয়ে-পুরুষে সার্বিক) ; রোগা, মোটা বা বেঢপ বলা যায় এমন চেহারা প্রায় চোখেই পড়ে না (তার

কারণ কি এদের স্বল্পাহার, রান্নার ধরন, জুডো ব্যায়ামের অভ্যাস ?) ; সকলকেই দেখছি পুষ্ট, আঁটোসাঁটো, সতেজ, শীতের বিরুদ্ধে যথোচিতভাবে আচ্ছাদিত। একটা নতুন জিনিশ চোখে পড়লো : কেউ-কেউ নাকের ডগা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত এক টুকরো পাৎলা কাপড়ে ঢেকে নিয়েছে ; অনুমান করছি এটা শীত ঠেকাবার একটি দৈশিক ও সাবেকি উপায়, এবং এই লোকেদের অবস্থা অসচ্ছল। কিন্তু এদের বসনও এমন নয় যাকে দীন বলা যায়, হ'তে পারে পশমি কাপড়টা জাতে নিচু, কিন্তু ছাঁটে-কাটে সুদৃশ্য, তাপরক্ষায় অক্ষম ব'লেও মনে হয় না।

রাস্তায় যারা চলছে, দোকানে যারা কেনাবেচা করছে, তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ সংখ্যায় সমান-সমান। ন্যুয়র্কে মেয়েদের সংখ্যা বেশি হ'তো, কলকাতায় (রাসবিহারী এভিনিউতে ছাড়া) মেয়েরা হ'তো পুরুষের দশমাংশ। 'নারী-প্রগতি'র ব্যাপারে জাপানে এখন ইংলণ্ডের মতো অবস্থা ; প্রায় সব কাজেই মেয়েদের দেখা যায়, কিন্তু দেশটাকে মেয়েদেরই রাজত্ব ব'লে মনে হয় না (যা আমেরিকায় কখনো-কখনো হ'য়ে থাকে)। নম্রতায় প্রাচ্য, অথচ অন্তঃপুরজাত জড়িমার লক্ষণ একেবারেই নেই— এই হ'লো আজকের দিনের জাপানি মেয়ে। বোধহয় ভুল হ'লো কথাটা, কেননা জাপানি মেয়েদের কোনোকালেই ঠিক অন্তঃপুরে অন্তরীণ হ'য়ে থাকতে হয়নি, তাদের 'মুক্তি' সাম্প্রতিক ঘটনা হ'লেও তার কারণ শুধু প্রতীচীর অভিঘাত নয়। বরং এ-কথাই সত্য যে মধ্যযুগে (জাপানে সেটাই প্রাচীনকাল) জাপানি মেয়েদের যে-রকম সুপরিণত ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদা দেখা গিয়েছে, সমকালীন ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

আমরা জানি, কিন্তু সব সময় ভেবে দেখি না, যে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের মনে কতগুলো দুর্বলতা গেঁথে দিয়ে গেছে। 'প্রাচী' বলতে শ্বেতাঙ্গের মনে যে-গতানুগতিক বিম্ব ভেসে ওঠে (ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী, নীতিজ্ঞানহীন, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন), আমরা সেটাকেই অন্ধের মতো মেনে নিয়েছিলুম। আজকের দিনেও, কোনো য়োরোপীয় সতীদাহের উল্লেখ করলে আমরা বড়ো লজ্জা পাই, মনে রাখি না যে য়োরোপে আঠারো শতকেও 'ডাইনি' পোড়ানো হ'তো।*

---

* সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' দেখে আমি প্রচুর কেঁদেছিলাম, কিন্তু ভেবে পাইনি সতীদাহের দৃশ্যটি তিনি কেন দেখালেন। শেক্সপীয়রের জীবনী নিয়ে আধ ঘণ্টার ছবি তৈরি হ'লে তাতে ধর্মদাহের দৃশ্য কি অপরিহার্য ?

কেউ বহুবিবাহের কথা তুললে আমরা কেমন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে পড়ি; ভুলে যাই যে য়োরোপের রাজন্যসমাজেও ঐ প্রথা সম্মানিত ছিলো, শুধু অন্যান্যরা নামতও স্ত্রীর পদ পেতেন না, রক্ষিতারূপেই বিখ্যাত হতেন। কোনো ত্রয়োদশী বালিকা, পিতার মনোনীত পাত্র বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে তার বরাদ্দ হ'তো বেত্রাঘাত; আঠারো শতকে সুইফট আক্ষেপ করেছেন এই ব'লে যে স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক মেলামেশা, প্যারিসে প্রচলিত হ'য়ে থাকলেও, লণ্ডনে অসম্ভব, আর সেইজন্যেই ইংরেজ ভদ্রলোকের আচার-ব্যবহার এমন স্থূল ও রুচিভ্রষ্ট। জানি, অন্য কারো অন্যায়ের দ্বারা নিজেদের অন্যায়ের সমর্থন হ'তে পারে না, আর এ-কথাও কে না মানবে যে মেয়েরা, শুধুমাত্র মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে ব'লেই, আজকের দিনেও ভারতে যে-হীনতা ও নির্যাতন ভোগ ক'রে থাকে, তার অমানুষিকতা অকথ্য। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সামাজিক অবিচার বা অত্যাচার কোনো একটি মানব-সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, সব দেশেরই ইতিহাসে তার কালো অধ্যায় অনেক ছড়িয়ে আছে; আর আজকের দিনে আমরা যাকে মানবধর্ম বলছি তার আদর্শে সমাজগঠন সর্বত্রই সাম্প্রতিক ঘটনা। জর্জ সাঁ, য়োরোপের প্রথম 'আধুনিক' বিদ্রোহিণী, তাঁর মৃত্যুর পরে একশো বছরও এখনো কাটেনি; আর সেখানে মেয়েরা সামগ্রিকভাবে 'মুক্ত' হলেন মাত্রই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ভারতেও (অন্তত নগরগুলিতে) দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে ও পরে মেয়েদের অবস্থা যে-রকম দ্রুত ও বিপুলভাবে বদলে গেলো, তা চিন্তা করলে আমি পর্যন্ত অবাক হ'য়ে যাই; আর সেই পরিবর্তনের গতি যেহেতু স্বাধীনতার পরে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই মনে হয় যে আমাদের দেশে নারীনিগ্রহ অতীত হ'য়ে যেতে আর বেশি দেরি হবে না।*

এই একটা বিষয়ে জাপান কিন্তু অবাক ক'রে দিয়েছে পৃথিবীকে; আর কোন দেশে মধ্যযুগেও শিক্ষিত হতেন মেয়েরা, শিল্পকলা নিসর্গপ্রীতির চর্চা করতেন, নিজেদের উপলব্ধি করতেন— স্ত্রী, মা, বোন বা সন্ন্যাসিনী হিশেবে নয়—নিতান্ত একজন ব্যক্তি ব'লেই? যে-কালে য়োরোপ বা এশিয়ার অন্যান্য

---

* তবে বর্তমান ভারতে মহিলাদের মধ্যে আছেন রাজ্যপাল, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত, তুলনীয় উন্নত আসন অন্য কোনো দেশেই মহিলারা আজ পর্যন্ত পাননি।

দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মেয়েদের প্রায় অস্তিত্বই নেই, সেই এগারো শতকে জাপানি সাহিত্যের যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা প্রায় সকলেই মহিলা। শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি কাহিনী', শোনাগনের ডায়েরি বা 'বালিশ-পুঁথি' (নামকরণে বোধহয় বোঝানো হচ্ছে যে বইখানা ঘুমের আগে শুয়ে-শুয়ে পাঠযোগ্য), শ্রীমতী শিকিবুর কবিতা— এই সবই জাপানি সাহিত্যের চিরায়ত অংশ ব'লে স্বীকৃত, উপন্যাসে তো মুরাসাকির নাম আজ পর্যন্ত প্রথম—শুধু ঐতিহাসিক নয়, গুণবাচক অর্থেও। এঁরা তিনজন সমকালীন ও সমবয়সী, একই সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদে সখীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু এই তিনজন শ্রেষ্ঠ ব'লে ব্যতিক্রম নন ; জাপানের এই হেইয়ান যুগে আরো অনেক মহিলা সাহিত্যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ডায়েরি লেখার প্রচলন করেন তাঁরাই, আরো আশ্চর্য যে কবিদের মধ্যেও পুরুষের চাইতে মেয়ের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহাসিক অর্থে পৃথিবীর প্রথম গদ্য উপন্যাস যদি নাও বলা যায়, তবু 'গেঞ্জি মনোগাটারি'কে পৃথিবীর প্রথম আধুনিক উপন্যাস ব'লে মেনে নিতে আমরা বাধ্য, কেননা এটি শৃঙ্খলিত ছোটোগল্পের পর্যায় নয়, অলৌকিকেরও স্থান নেই এতে, আছে বাস্তব তথ্য, ঘটনাস্রোত ও চরিত্রচিত্রণ, আছে কাহিনীর কেন্দ্রনির্ভর সংহতি। এবং এই উপন্যাস এতটাই 'আধুনিক' যে এক ঘণ্টা ধ'রে পড়লে তিনবার মার্সেল প্রুস্তকে মনে পড়ে। 'ভোরবেলা প্রণয়ীর কেমন ক'রে বিদায় নেয়া উচিত'— শোনাগনের ডায়েরির এই অধ্যায়টিকে, কিছু অনুপুঙ্খ বদল ক'রে, কোনো উনিশ-শতকী ফরাশি উপন্যাসের অংশ বললে কারো অবিশ্বাস হবে না। রচনা থেকে এই মহিলাদের যে-ছবি বেরিয়ে আসে তা সংস্কৃতির সর্বলক্ষণে প্রোজ্জ্বল ; আমরা দেখতে পাই তাঁরা বুদ্ধিমতী, অন্তর্বীক্ষণে অভ্যস্ত, প্রণয়ে ও শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, মানবচরিত্রে ও মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ, নিজেদের ও অন্যদের বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সক্ষম। এঁরা প্রণয়প্রার্থীকে উৎসাহিত বা নিরস্ত করেন সাংকেতিক কবিতা লিখে, ডায়েরির পাতায় পরস্পরের মর্মভেদী সমালোচনা ক'রেও এঁরা পরস্পরের গুণগ্রহণে গভীর ; পুরুষদের প্রতি এঁদের আগ্রহ যে-কারণে শমিত হ'য়ে আছে তা শুধু সাংসারিক সাবধানতা নয়, সেই সঙ্গে এমন একটি উন্নত রুচি যা তাঁদের পক্ষে চরিত্রেরই নামান্তর। এবং এই সব গুণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যা তাঁদের চৈনিক সভ্যতার উত্তরাধিকার— প্রকৃতি বিষয়ে এমন একটি

বিশুদ্ধ ও স্বজ্ঞাজাত অনুভূতি, যা আমরা 'ইণ্ডো-য়োরোপীয়' সাহিত্যের কোনো-খানেই খুঁজে পাবো না। গাছ, ফুল, পাখি বা চাঁদের সঙ্গে এঁরা একটি সহজ, ব্যাকুলতাহীন, স্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ, চেতনে-অচেতনে যেন ভেদ নেই এঁদের মনে, তাই দ্বন্দ্ববোধের বেদনাও নেই। রোমান্টিক আকৃতির এটা ঠিক উল্টো পিঠ, কালিদাসের যক্ষের আর্তিরও পরপারে। এই ভাবটিকে আমাদের হঠাৎ মনে হ'তে পারে বড়ো বেশি শান্ত ও নিস্তাপ, কিন্তু এটাই হয়তো প্রধান কারণ যার জন্য চীনে-জাপানি কবিতা আধুনিক প্রতীচীকে এমন নিশ্চিতভাবে জয় ক'রে নিয়েছে। দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্লেক, গ্যেটে, বোদলেয়ার প্রভৃতি কবিদের তীব্রতায় ও ঐশ্বর্যে যখন ক্লান্তি আসে, বা তাঁদের পথে আর এগোবার উপায় থাকে না, তখন যেখানে অব্যর্থভাবে শুশ্রূষা ও সুপরামর্শ পাওয়া যায়, তা এই পূর্বতম পৃথিবীর আবেগহীন, গতিহীন, এমনকি প্রায় আয়তনহীন কবিতা—এক-একটি মুহূর্তের স্থির চিত্ররূপ যেন—যা প্রতীচীর পক্ষে, ও আমাদের পক্ষেও, সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ বৈদেশিক ও অনাত্মীয়।

আর-একটা কথা এখানে উল্লেখ্য। এই মহিলারা, জর্জ্ঁ সাঁ বা জর্জ এলিয়টের মতো, কখনো জেদ ক'রে 'পুরুষ ব'নে যেতে' চাননি (বরং একজন কবি-রাজপুরুষ মহিলা সেজে ডায়েরি লিখেছিলেন); পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এঁদের কল্পনায় ছিলো না। নারীর মন দিয়েই জগৎকে দেখেছেন এঁরা, জীবনযাপনেও 'পুরুষোচিত'কে গ্রহণ করেননি, এঁদের রচনার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমরা এঁদের নারীত্বের সুঘ্রাণ অনুভব করি। মনে হয়, এমন সম্পূর্ণরূপে নারী না-হ'লে এমন সার্থক শিল্পী এঁরা হ'তে পারতেন না। এশিয়ার এই অজ্ঞাত দেশে, প্রায় এক হাজার বছর আগে, এই অঘটন কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো, তা যত ভাবছি তত আমার অবাক লাগছে।* এর আংশিক কারণ হ'তে পারে পুরুষদের মধ্যে চীনে ভাষার প্রতিপত্তি; মধ্যযুগের য়োরোপে যেমন লাটিন, তেমনি জাপানে 'সাহিত্যিক' ভাষা হিশেবে স্বীকৃত ছিলো চীনে; সে-ভাষা মহিলাদের সাধারণত শেখানো হ'তো না;† আর তাই, পাণ্ডিত্যের

* আমি ভুলে যাচ্ছি না যে প্রাচীন ভারতেও মেয়েরা শিক্ষা ও স্বাধীনতায় হীন ছিলেন না, অন্তত আথেনীয়াদের তুলনায় তাঁদের অবস্থা ছিলো ঈর্ষাযোগ্য, কিন্তু সাহিত্যে মহিলাদের যে-কৃতিত্ব জাপানে দেখা গেছে, তা কোনো প্রাচীন 'আর্য'কুলোদ্ভব সমাজে কল্পনাতীত।

† শ্রীমতী মুরাসাকির ভ্রাতার জন্য চৈনিক শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন; তাঁর অধ্যাপনা শুনে-শুনে

বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হ'য়ে তাঁদের মন ও হৃদয় মাতৃভাষার স্বাচ্ছন্দ্যবেগে অমরতায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে।— কিন্তু মাতৃভাষাতেও তাঁদের যে বর্ণপরিচয় হ'তো, সেটাই বিস্ময়কর। এতেও প্রমাণ হয়— যদি নতুন প্রমাণের প্রয়োজন থাকে— যে সপ্রাণ ও সবীজ সাহিত্যের বাহন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কিছু হ'তে পারে না।

১৫ জানুয়ারি, রাত্রি

রাত্রিকালীন কিয়োটো দেখতে আয়োজিত সফরে বেরিয়েছি। বাস্-এ আমরা ছাড়া সকলেই শ্বেতাঙ্গ ; বেশির ভাগ মার্কিন, দু-এক জনকে ইংরেজ ব'লে বোধ হচ্ছে। জাপানি গাইডটি যুবক, মুখের চেহারা গোলগাল ভালো-মানুষ গোছের ; তার ইংরেজি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি। অনর্গল ব'লে যাচ্ছে, সেটা এ-দেশের পক্ষে অসাধারণ, হয়তো একই কথা বার-বার ব'লে-ব'লে মুখস্থ হ'য়ে গেছে তার, তবু বলার ধরন ক্লান্তিকর নয়, উচ্চারণও বেশ বোঝা যায়— সেটাও এ-দেশের পক্ষে অসাধারণ। রোমে একজন গাইডের মুখে একবার যে-নমুনা শুনেছিলুম তার তুলনায় এর ইংরেজিকে ভালো বলতেও দ্বিধা হয় না। ভুল অবশ্য পদে-পদেই করছে, কিন্তু বাঙালি বা তামিল হ'লে যা হ'তো, এর ভুলগুলো সে-ধরনের নয়, ইংরেজ ও ফরাশির বাংলা বলাতেও ভিন্ন জাতের অশুদ্ধি আমরা লক্ষ ক'রে থাকি। বিদেশী ভাষায় কে কী-রকম ভুল করবে তার নিয়ন্তা যার-যার মাতৃভাষা।

প্রথম দৃশ্য— চা-অনুষ্ঠান। শহরের পুরোনো পাড়ার গলির মধ্যে কাঠের বাড়ি, বাড়িটির বয়স শুনলুম চারশো না পাঁচশো বছর। ছোট্ট উঠোন আর লম্বা বারান্দা পেরিয়ে এক নিরাসবাব ঘরে ঢোকানো হ'লো আমাদের। আরো দুটো সফর-বাস্ এসেছে, দর্শকসংখ্যার তুলনায় ঘর ছোটো, ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে মেঝের উপর ব'সে গেলুম সবাই— আসনপিঁড়ি, হাঁটু মুড়ে, হাঁটু ভেঙে, যার

বালিকা মুরাসাকি চীনে ভাষায় এতটা দক্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন যে ভ্রাতার ভুল শুধরে না-দিয়ে পারতেন না। তা জানতে পেরে পিতা একদিন বললেন, 'তুই ছেলে হ'লে কতই না গর্ব হ'তো আমার!' মুরাসাকির মন্তব্য: 'পুস্তকপ্রিয় হ'লে পুরুষদের বদনাম হয়, অতএব মেয়েদের পক্ষে তা আরো নিন্দনীয় ; আমি যে চীনে পড়তে পারি তা গোপন রাখতে সচেষ্ট হলুম।'— লক্ষণীয়, স্ত্রী-পুরুষে এই প্রভেদ সত্ত্বেও মেয়েদের কাব্যচর্চা, নিসর্গচর্চা ও গ্রন্থরচনায় সমাজের সম্মতি ছিলো।

যেমন সুবিধে। (অনেক মার্কিন দেখলুম জাপানি কায়দায় হাঁটু ভেঙে বসতে শিখেছেন।) প্রথমে এক পরিচারিকা এসে আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে চায়ের বাসন রেখে গেলো, তারপর অতি মন্থর চরণে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁর শুনলুম গেইশাদের মধ্যে মর্যাদা খুব উঁচু, আর চোখে দেখেও তা বিশ্বাস হ'লো। মেয়েটির প্রসাধন এমন সোচ্চার এবং বসনভূষণ এত জটিল ও বিস্তারিত যে দেখতে সে বিপুল হ'য়ে গেছে, চুলের সঙ্গে অন্য নানা উপাদান মিলিয়ে তার খোঁপার ওজন হয়েছে তিন সের (না কি পাঁচ সের?); কিমোনো ও অন্যান্য বসনের স্ফীতি যেমন বিশাল তেমনি বর্ণবিলাসও বিচিত্র; চূর্ণপ্রলেপে মুখ তার শ্বেত, কালিমাপ্রয়োগে আয়ত তার চোখ— সব মিলিয়ে তাকে স্বাভাবিক মানুষী আর মনে হচ্ছে না, কথাকলি-নর্তকের মতো একেও বাস্তব থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতি মৃদু লয়ে বিরাট একটি পুতুলের মতো ঘুরে-ঘুরে সে দেখালে তার কবরী ও বসনভূষণ, তারপর চা-অনুষ্ঠান ধীরে-ধীরে এগোলো। উনুন ধরানো থেকে আরম্ভ ক'রে বাটিতে-বাটিতে চা ঢালা পর্যন্ত যতগুলি ভিন্ন-ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার প্রত্যেকটি অভিনয় ক'রে দেখালে মেয়েটি ;— নৃত্য নয়, গতি খুব কম, ভঙ্গিসর্বস্ব মূক অভিনয় বলা যেতে পারে। সব সুদ্ধু সময় লাগলো আধ ঘণ্টা।

এর পরে পুরোনো একটি উদ্যানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেকালে ছিলো এক রাজন্যের বাগানবাড়ি, বর্তমান নাম গিঙ্কাকুজি বা রৌপ্যশিবির। নানা রঙের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে নকল পাহাড়, সরোবর, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতির প্যাগোডা ও মণ্ডপ। জ্যামিতিক নয়, প্রতিসাম্যহীন, সামঞ্জস্য নেই এক অংশের সঙ্গে অন্যের, দীর্ঘিকাগুলিও ঠিক চতুষ্কোণ নয়, নিয়মহীন— জাপানি উদ্যানশিল্পের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই। ধরনটাকে আমরা য়োরোপের ভাষায় রোমান্টিক ব'লে জানি, কিংবা কিছুটা অত্যাধুনিকের আদল আসে মনে হয়— কিন্তু প্রাক্কালীন বিরাট কবরীর মতো জাপানের এটা নিজস্ব ও সনাতন, এবং ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকতার বিপরীত। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে আধুনিক রোমান্টিক শিল্প মর্মাহত হ'য়ে আছে (প্রাচীন 'মেঘদূতে'ও তার আভাস নেই তা নয়); কিন্তু জাপানি উদ্যানশিল্পের সঙ্গেও জ়েন-স্পৃষ্ট প্রকৃতিপ্রেমের সম্বন্ধ নিবিড়: চন্দ্রোদয়, চেরি-মঞ্জরী, সূর্যাস্ত— এমনি সব নিসর্গশোভা অবলোকনের উপযোগী ক'রে বাগানবাড়ির বিভিন্ন অংশ

রচনা করতেন এঁরা— আর যথাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিতও হতেন। এ-কথা শুনে বিদগ্ধ পাঠকের অধর কুঞ্চিত হ'তে পারে, কেননা আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্যচর্চার আজকের দিনে আর জাত নেই, কিন্তু 'গেঞ্জি-কাহিনী' প'ড়ে প্রতীতি জন্মে যে জাপানি জীবনে একদিন এটা খুবই সত্য ছিলো, আর এ-কথাই বা কেমন ক'রে বলি যে হাল আমলে সেই ধারা একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে? (একটি আধুনিক হাইকুর নমুনা: 'বইছে হাওয়া/তাকে শুধাও গাছ থেকে/কোন পাতাটি খসবে এর পরে।')

একটি প্রাচীরহীন মণ্ডপে আমরা বসেছি, কিছুটা দূর থেকে বাজনা ভেসে আসছে। জলের ধারে ছোটো প্যাগোডা, সেখানে দুটি কিমোনো-পরা তরুণী যন্ত্র নিয়ে আসীন। এঁরা কলেজের ছাত্রী; অনুমান করছি, এই কর্ম এঁদের পক্ষে উপার্জনের উপায়। যন্ত্রের নাম কোটো, এতে অনেকগুলো ক'রে তার থাকে; কিন্তু ধ্বনি কেমন মৃদু ও অনুরণনহীন। খাঁটি জাপানি গান-বাজনায় আমাদের মন সাধারণত সাড়া দেয় না, কিছুটা দুর্বল ও একঘেয়ে ব'লে বোধ হয়; প্রতীচ্য ওজস্বিতাও নেই, আবার ভারতীয় বিধুরতারও অভাব। মনে হয় এই সংগীতে এদের নিজেদেরই আর তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই এই বিষয়ে এরা আপন ক'রে নিয়েছে য়োরোপকে, প্রতীচীর সন্তান বা অধিবাসী বা নিকট আত্মীয় নয়, এমন জাত জাপানিরাই একমাত্র, যারা প্রতীচ্য সংগীতকলায় সুদক্ষ ও সৃষ্টিশীল।

সর্বশেষে অন্য এক গেইশা-ভবন, এটিও খুব পুরোনো বাড়ি, রাত্রেও বোঝা গেলো একটি মনোরম বনস্থলীতে অবস্থিত। গেইশা প্রথা জাপানের একটি সামাজিক কলঙ্ক ব'লে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, এও শুনেছিলাম যে আধুনিক আমলে তার উচ্ছেদ হয়েছে। দুটো কথাই ভিত্তিহীন বা মাত্র অংশত সত্য ব'লে আমার ধারণা হ'লো। নৃত্য গীত অভিনয়ের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করেন এমন মেয়ের কোনো সমাজেই অভাব নেই; আজকের দিনের গেইশাদেরও তা-ই অবস্থা। এঁদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, অল্প বয়সে ভর্তি হ'য়ে ললিতকলা শিখতে হয় সেখানে; য়োরোপের ম্যাজিক হলের নটীদের মতো, এঁদেরও অন্য পেশা নেবার বা বিবাহ করার স্বাধীনতা অবাধ। জাপানি মেয়েদের মধ্যে এঁরাই এখন একমাত্র, যাঁরা লম্বা চুল রেখে পুরোনো ছাঁদে খোঁপা বাঁধেন ও ঘরে-বাইরে কিমোনো ছাড়া কিছু পরেন না। পুরোনো

জাপানের একটি চিত্রকল্প এঁরা, আর সেদিক থেকে বিদেশীর দ্রষ্টব্য। সেইজন্যে খুব সুখী হ'তে পারলাম না, যখন দেখলাম এই সংস্থার আয়োজন শ্বেতাঙ্গের উদ্দেশেই নিবেদিত।

আমরা সব দেয়াল ঘেঁষে ব'সে গেলুম, তিনটি তরুণী জলযোগ পরিবেষণ করলেন, তারপর মেঝেতে তাদের নৃত্যগীত শুরু হ'লো। চা-অনুষ্ঠানের মহিলাটির মতো আড়ম্বর নেই এঁদের, রীতিমতো স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়— গানের সুরও হালকা ধরনের বিলেতি। শ্বেতাঙ্গের পক্ষে চেনা সুর, কেননা তারা অনেকে আসন ছেড়ে উঠে করতালিসমেত নৃত্যে যোগ দিলেন। একটা ছিলো 'কয়লাখনির গান', তার প্রথম কথাটা বার-বার কানে আসছিলো —'ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্।' প্রতিবেশিনী মার্কিন মহিলাকে আমি জিগেস করলুম, ঐ জাপানি শব্দের অর্থ কী, তা কি দৈবাৎ তাঁর জানা আছে? তিনি আমাকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ ক'রে জবাব দিলেন, ওটা ইংরেজি শব্দ 'dig', পুরো গানটাই মার্কিনী ও মার্কিনীদের মাতৃভাষায় রচিত। আমি একাধিক কারণে ঈষৎ লজ্জা পেলাম।

১৬ জানুয়ারি

সন্ধ্যায় কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা, তারপর আমাদের বিদায়ভোজ। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি ভবনে টেবিলে ব'সে প্রতীচ্য ধরনে খাওয়া হ'লো। অনেক মহামহোপাধ্যায় উপস্থিত।

'ভিজ়িটিং কার্ড' নামক জিনিশটা আমার বরাবর অনর্থক মনে হয়েছে, কেননা বিদেশে নিয়োগ ভিন্ন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না, আর যাঁদের সঙ্গে নিয়োগ হয় তাঁরা সকলেই আমার নাম ও কিঞ্চিৎ পরিচয় অন্তত জেনেছেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এও জেনেছিলুম যে ঐ শ্বেত ও চতুষ্কোণ নামলিপিকা সঙ্গে না-থাকলেও পাশ্চাত্য দেশে অতিথির স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু এবারে কী মনে ক'রে কিছু কার্ড ছাপিয়ে সঙ্গে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিশ নিয়েছিলুম— কেননা (আগে এটা আমার জানা ছিলো না) জাপান পৃথিবীর একটি দেশ যেখানে পকেট থেকে কার্ড বের করতে না-পারলে বর্বর প্রতিপন্ন হ'তে হয়। কোনো-কোনো বিষয়ে প্রতীচীর চেয়েও কত বেশি পাশ্চাত্য এরা,

অথচ সেই সঙ্গে এদের জাপানিত্বও কেমন অক্ষুণ্ণ ! এখানে কোনো ভদ্রলোক কার্ড ছাপাতে ও পকেটে নিতে ভোলেন না ; একদিকে জাপানি, উল্টো পিঠে রোমান হরফে নাম ছাপানো থাকে তাতে ; কারো সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'লে প্রথমে একবার বিনতি করেন, আবার বিনতিসমেত কার্ড এগিয়ে দেন তাঁর হাতে, তিনি প্রতিদান দিলে পুনশ্চ বিনতির বিনিময় । এবং যে-রকম চিত্রলভাবে দু-জন জাপানি ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন, তা হয়তো বূর্বঁ সম্রাটের পারিষদের পক্ষে সম্ভব ছিলো, কিন্তু আজকের দিনে অন্য সকলেরই অসাধ্য । বিশেষত বাঙালিদের আদবকায়দার তেমন কড়াকড় নেই ; আমার অনবরত মনে হ'তে লাগলো এই অত্যন্ত পরিশীলিত সুধীসমাজে আমাকে না জানি কেমন অশোভন দেখাচ্ছে । কিন্তু রোমে রোমক হবার উপদেশ শিরোধার্য হ'লেও কোনো মানুষ কি রাতারাতি নিজেকে বদলাতে পারে, না কি সে-রকম চেষ্টা করলেই শোভন হয় ?

কিন্তু শুধু শিষ্টাচার নয়, সব দেশেই (হয়তো ক্ষণিক অতিথির পক্ষে ইংলণ্ডে ছাড়া) মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায় ব'লেই ঘর ছেড়ে বেরোনো সার্থক । ভোজের শেষে সেখানেই আমাদের বিদায় দিলে সৌজন্যে কোনো ত্রুটি হ'তো না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এলেন হায়াশি, আর ওসাকার প্রবীণ অধ্যাপক মিয়ামোটো- - এঁর সঙ্গে কলকাতায় আমার আগে একবার দেখা হয়েছিলো । দু-জনেই অনেক দূরে থাকেন, ট্রেনে ফিরতে হবে, বাইরে শীতও তীব্র । তবু শেষ ট্রেনের সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কাটালেন এঁরা । মিয়ামোটো ইংরেজি খুব কম বলেন ; বাড়িতে তাঁর পড়ার ঘরে এখনো চেয়ার-টেবিল প্রবেশ করেনি ; অধ্যয়ন ও রচনাকর্মের সময় হাঁটু ভেঙে বসা তাঁর অভ্যেস । 'একটু আসছি,' ব'লে এক সময়ে উঠে গেলেন তিনি ; ফিরে এলেন প্র. ব.-র জন্য একটি উপহার নিয়ে ; হায়াশি-দম্পতির হাত থেকে বন্ধুতার স্মরণিক আমরা আগেই পেয়েছিলুম । সঙ্গে যে-সব ছোটো-ছোটো দিশি জিনিশ ছিলো তা-ই দিয়ে বিনিময় করলুম আমরা । 'আবার আসবেন কলকাতায়,' 'আবার দেখা হবে ।'— এগুলো ইচ্ছা মাত্র, আর মানুষের ইচ্ছার পূরণ অনিশ্চিত ; কিন্তু তবু থাকে স্মৃতি— মানুষের সেই এক বান্ধব যা তাকে কখনো ছেড়ে যায় না ।

কাল সকালে টোকিওর প্লেন ।

১৭ জানুয়ারি

টোকিওতে আমাদের প্রথম দিন কাটলো। বিরাট নগর, পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে বড়ো আজকের দিনে, এক কোটি অধিবাসী নিয়ে ন্যুয়র্ক অথবা লণ্ডনকে ছাড়িয়ে গেছে। প্লেনে কিয়োটো থেকে এক ঘণ্টার পথ, তার মধ্যে পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিট ধ'রে ফুজিয়ামা আমাদের দৃশ্য হ'য়ে রইলো। পাহাড়টি নিটোল ও ত্রিকোণ, ক্রমশ সরু হ'তে-হ'তে পরিচ্ছন্নভাবে উপর দিকে উঠে গেছে, এই শীতের দিনে প্রায় অর্ধাঙ্গ তার তুষারে মোড়া। জাপানের অন্য সব-কিছুর মতো, এই বিখ্যাত পাহাড়টিও স্থমিত ও স্থচারু, এর সৌন্দর্য বেশ র'য়ে-স'য়ে ভোগ করা যায়, প্রবল আঘাতে নিশ্বাস কেড়ে নেয় না। রৌদ্রময় দিন ও তুষারময় চূড়া পরস্পরকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলছে; উভয় অর্থে দেখতে-দেখতে টোকিও এসে গেলো।

এয়ার-পোর্টে সস্ত্রীক এসেছেন সাবুরো ওটা। ইনিও অধ্যাপক, এবং জাপানি তুলনামূলক-সাহিত্য-সংস্থার কর্মসচিব। স্বামী-স্ত্রী দু-জনের মুখেই ভাঁজে-ভাঁজে হাসি, দু-জনের হাতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা। এঁদের সঙ্গে স্থদীর্ঘ পথ গাড়িতে চলতে-চলতে টোকিওর বিশালতার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেলো। পথে পড়লো লৌহনির্মিত টোকিও-স্তম্ভ, ঈফেল-স্তম্ভের চেয়েও এর উচ্চতা বেশি। ইম্পীরিয়াল হোটেলে গাড়ি থামিয়ে আমার মনোমতো সিগারেটের টিন অনেকগুলো কিনে নিলুম: এ-বিষয়ে আমার ব্যাকুলতা দেখে ওটা কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করলেন। আমাকে স্বীকার করতে হ'লো— যা ইতিমধ্যেই আমার ব্যবহার থেকে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন— যে ঐ ক্ষীণ, শুভ্র ও বর্তুল ধূম্রশলাকা ব্যতীত আমার এক দণ্ড চলে না, অথচ আমার কণ্ঠনালী ও ফুশফুশে যে-সব সিগারেট সহ্য হয় তা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড ছাড়া অধিকাংশ দেশেই দুর্লভ। অতএব বিদেশে এসে আমার একটি প্রথম কর্তব্য হ'লো— আমার অনুমত ধোঁয়ার খোরাক সংগ্রহ করা; এবং এই কাজটি চুকে যাবার পরে এখন আমি টোকিওর জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত।

এক ঘণ্টায় অসংখ্য রাস্তা পেরোবার পর গাড়ি থামলো এশিয়া সেণ্টারের সামনে। এই আবাসটি ওটা আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমিও কলকাতায় ব'সে এতে সম্মতি জানিয়েছিলুম। কিন্তু এসে দেখি, বিজ্ঞাপনে ও বাস্তবে বেশি মিল নেই— কিংবা আমারই হয়তো বোঝার ভুল হয়েছিলো।

যে-ঘরে নিয়ে গেলো তাতে শয়ন ভিন্ন অন্য কোনো কর্ম অসম্ভব, বাথরুমে শরিক একাধিক, বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে হ'লে জিমনাসটিক্সের কসরৎ ভিন্ন উপায় নেই। দামে শস্তা, আমরাও লক্ষপতি নই, কিন্তু সহনীয়রকম আরাম চাই তো। প্র. ব. ও আমি ম্লানভাবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছি; এদিকে ওটা তাগাদা দিচ্ছেন এক্ষুনি লাঞ্চ খেয়ে নিতে, নয়তো কাফেটেরিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। কাফেটেরিয়া শুনে মনটা আরো দ'মে গেলো, ট্রে হস্তে বাঁধা-ধরা সময়ে লাইনে না-দাঁড়ালে খাবার জুটবে না? আসলে ভবনটি একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস; এবং যদিও আমাকে বিদ্যার্থী বললে ব্যাকরণের ভুল হয় না, এবং আমার হৃদয় এখনো তারুণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ব'লে আমি দাবি ক'রে থাকি, তবু এক দল সচল, সশব্দ ও অত্যুৎসাহী যুবক-যুবতীর সংসর্গে এক অপরিসর স্বল্পাসবাব ঘরের মধ্যে সপ্তাহকাল যাপন করার প্রস্তাবটিকে কোনোরকমেই মনোরম ব'লে মানতে পারলুম না। কিন্তু আমরা এখানে থাকতে না-চাইলে ওটা যদি কিছু মনে করেন? বা তাঁকে বিব্রত করা হয়?— নাঃ, এ-সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জাটা কিছু কাজের নয়, তাঁকে খোলাখুলি মনের কথা বলাই ভালো। মনস্থির ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি, ওটা-দম্পতি লাঞ্চের মধ্য-পথে; আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে তাঁরা যে নিজেরা অভুক্ত থাকলেন না, এতেও প্রমাণ পেলুম জাপানিদের সংসার-যাত্রা কত গভীরভাবে পশ্চিমধর্মী— বা আসলে হয়তো এই বাস্তবনিষ্ঠা তাঁদের নিজেদেরই স্বভাবসিদ্ধ। আমাদের আবেদন শুনে ওটার কোনো ভাবান্তর হ'লো না; খাওয়া শেষ ক'রে ছিপছিপে শরীরে কর্মঠভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর তৃতীয় বা চতুর্থ টেলিফোন সফল হ'লো, আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে বদলি হলুম গিন্‌জা টোকিও হোটেলে। তারপর চা, স্যাণ্ডুইচ, আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচির আলোচনা; এমনকি, কিছুটা হাস্যপরিহাস। 'এমনকি' বলছি এইজন্যে যে হাস্যপরিহাসের জন্য অনেকখানি ভাষার প্রয়োজন হয়, এবং ওটার ইংরেজি বেশ শড়োগড়ো। সন্দেহ নেই, এ-বিষয়ে তিনি জাপানিদের মধ্যে অসামান্য ব্যতিক্রম।

হোটেলের সামনেই গিন্‌জা স্ট্রীট, শহরের বড়ো-বড়ো দোকানপাট সব এই রাস্তায়। সন্ধেবেলা সেদিকে আমাদের অভিযান হ'লো। প্রশস্ত পথ, বিপুল জনতা, অসংখ্য যান, অন্তহীন নিয়ন-চিহ্ন, প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খল শব্দহীন ব্যস্ততা। কাউকে চোখ বেঁধে এনে ছেড়ে দিলে তার হঠাৎ মনে হবে কোনো মার্কিনী

শহর। সবুজ সংকেতে রাস্তা পেরোবার ভিড় দেখলে মধ্যনাগরিক মান-হাটানের কথাই মনে পড়ে। আর বিভাগীয় বিপণিগুলি— আয়তনে ও ঐশ্বর্যে গিম্বেলস বা মেসির সমান না হোক, আকর্ষণে কারো চাইতেই কম যায় না। পণ্যবস্তু বহু ও বিচিত্র, সজ্জা নয়নহরণ, ব্যবস্থাপনা অনিন্দ্য। সব দেশেই, বেচা হ'য়ে গেলে, জিনিশটাকে কোনো বাক্সে বা ঠোঙায় পুরে ক্রেতার হাতে দেয়া হয়, আর সেই আধারগুলোকে সুদৃশ্য ও সুবহ করতেও সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু এই গৌণ ব্যবসায়িক বিষয়টিকে জাপানিরা যে-রকম একটি গৌণ ললিতকলায় পরিণত করেছে, সে-রকম অন্য কেউ পারেনি, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব ব'লেও আমার মনে হয় না। আছে একটি সূক্ষ্ম জাপানি স্পর্শ, তা বিশ্লেষণের অতীত, বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো যায় না, কিন্তু চলতে-ফিরতে সমস্ত ব্যাপারেই তা ধরা পড়ে। এখানে অনেক কিছুরই বাইরের চেহারা আমেরিকার মতো, এশিয়ার অন্য কোনো-কোনো দেশেও এই ভাবটি দেখা দিচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে মনে হয় যে যথেষ্ট আমেরিকার মতো হচ্ছে না, আর জাপানে এলে দেখা যায় যে মার্কিনী ধরনের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছে, যা খাশ মার্কিনীর পক্ষেও নতুন ও উপাদেয়।

ফেরার পথে ফুটপাতে একটি অন্ধ ভিখিরি দেখলাম। পাশে ভিক্ষাপাত্র, গায়ে শীতবস্ত্র নেহাৎ কম নেই, পিছনে এক ভক্ত কুকুর অটলভাবে আসীন। কুকুরটির চোখে করুণা, মাঝে-মাঝে সামনের পা তুলে সে এমনভাবে আবেদন জানাচ্ছে যে কিছু দেবার লোভ সংবরণ করা প্রায় অসম্ভব। পশুটির, এবং তার প্রভুর, দু-জনেরই বেশ পুষ্ট চেহারা, উপবাসজনিত কার্শ্যের কোনো লক্ষণ নেই। আবার আমার মার্কিন-দেশ মনে পড়লো। এক বরফ-পড়া সন্ধেবেলা ন্যুয়র্কের সাত-এভিনিউতে একটি ভিখিরি দেখেছিলাম; কলকাতার পুলিশ-ম্যানদের মতো একটা আঁটো কাঠের ঘরের মধ্যে সে ঢুকে আছে, যখন চলে ঐ ঘরটাকে ঘাড়ে নিয়েই চলে, ওভারকোট টুপি ইত্যাদির দ্বারা সে এমন-ভাবে আচ্ছাদিত যে চোখ দুটি ছাড়া তার মুখের প্রায় কিছুই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখলে দৈত্য-দানব ব'লে ভুল হয়। শীতের দেশে ভিক্ষে করতে হ'লেও অন্ততপক্ষে জামা-জুতো যথেষ্ট চাই।

১৭ জানুয়ারি

কপালগুণে এই হোটেলটা চমৎকার। আইনমাফিক পয়ল-নম্বরি নয়, মার্কিনী তিন-তারার পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু হয়তো সেইজন্যেই বেশি উপভোগ্য। আড়ম্বর অফুরন্তভাবে বাড়িয়ে চলা যায়, কিন্তু অচিরস্থায়ী অতিথির আরাম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এর চেয়ে বেশি ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে, তা ভেবে পাওয়া শক্ত। সামনের কাচের দরজাটি দুই পাল্লার; ঢোকার ও বেরোবার সময় কাছে আসামাত্র নিজে-নিজেই খুলে যায়। প্রশস্ত লাউঞ্জ; কেরানি ও পরিচারকেরা সংখ্যায় যেমন বেশি, মনোযোগেও তেমনি অক্লান্ত; যে-কোনো কাজ সম্পন্ন হ'তে দু-এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। হোটেলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের চারটি ভোজনালয়; তার মধ্যে যেটি উপাহারের জোগান-দার সেটি দিনে-রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। বেসমেণ্টে সারি-সারি দোকান, আধ ঘণ্টা খুচরো সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটি বেশ। আমাদের ঘরে আছে বিশ্রামের সোফা, লেখার টেবিল, দেরাজে চার-পাঁচরকম চিঠির কাগজ, রাত্রে বই পড়ার জন্য যে-বাতি দিয়েছে তা অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এই তিন রকম শক্তি ধারণ করে। বাথরুমের সাজ-সরঞ্জাম প্রায় বিলাসিতার পর্দায় বাঁধা, শয্যারচনা মনোরম, নবনীপেলব কম্বলটির উষ্ণতা, কেন্দ্রীয় তাপের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, রাত্রে আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলে বদলি ক'রে দেয়। কাপড়ের আলমারিতে কিমোনো ও সুতির চটি রাখা আছে; ভোরবেলা চায়ের ট্রেতে খবরকাগজ দিয়ে যায়, আর দেয়, সাবান তোয়ালে ইত্যাদির মতো, প্রত্যহ নতুন কয়েকটি দেশলাই। ও-রকম সুন্দর দেশলাইও আর-কোনো দেশে আমি দেখিনি— কাজে অমন মজবুত, আর দেখতে অমন অসাধারণ ভালো।

হোটেলের লিফট চালায় মেয়েরা। বড়ো লিফট, ভিতরে রেডিও চলছে, তার আলো নয়নাভিরাম এবং চালিকারাও তা-ই। দিনের মধ্যে তিনবার সাজ-বদল করে এরা: সকালে দুপুরে আলাদা রঙের স্কার্ট, সন্ধ্যায় পরে কিমোনো। এদের কপোল অরুণবর্ণ, চোখ-মুখ অহরহ সহাস্য, একই লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার ওঠা-নামা করলেও বিরক্তির রেখামাত্র পড়ে না, ধন্যবাদ জানালে পাৎলা লাল ঠোঁট খুলে উজ্জ্বল দাঁতে পাখির মতো গলায় বলে, 'You are welcome.' লিফটগুলো স্বতশ্চল, অর্থাৎ চালক অপরিহার্য নয়, এই মেয়েদের আসল কাজ হয়তো শোভাবর্ধন, এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে মানতেই হবে যে এই

উদ্দেশ্য এরা প্রভূতভাবে সার্থক করেছে। ব্যাবসাদারি? হ্যাঁ— হয়তো— নিশ্চয়ই— কিন্তু আর কোন দেশে ব্যাবসাদারি এমন মনোমুগ্ধকর?

একবার 'কুইন মেরি' জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলাম। কাকে বলে বিলাসিতা, 'রাজার হাল' কথাটার অর্থ কী, সেই পাঁচ দিনে সে-বিষয়ে কিছু ধারণা হয়েছিলো। সকালে চোখ মেলার মুহূর্ত থেকে রাত্রে ঘুমের সময় পর্যন্ত অফুরান সেবা ও সম্ভোগের ব্যবস্থা প্রতিটি ঘণ্টাকে চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছে। পানভোজনের আয়োজন এমন বিপুল যে মনে হয় কোনো পুরাণকাহিনী বাস্তব হ'য়ে উঠলো। ভোজনশালার কাচের দরজা খুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দুটি রাফায়েলের দেবদূত, আর ভিতরে এক রুবেন্সীয় জগৎ ঐশ্বর্যে ও ইন্দ্রিয়-বিলাসে উদ্বেল। ঘন গালিচা; শিল্পিত দেয়াল ও সীলিং; স্ফটিক, ধাতু ও মোমগাত্র কাষ্ঠফলকে বিচ্ছুরিত বৈদ্যুৎ; কান্তিমান চিক্কণ পরিচারকবৃন্দ; আপাতসুখী, আপাতসুস্থ, আলাপোৎসুক নরনারীর দল: এই হ'লো পটভূমিকা। আর উপচার? তাকে অন্তহীন বললে বেশি বলা হয় না; অন্ততপক্ষে মর্ত-প্রকৃতির কোনো সৃষ্টি বাদ পড়েনি। পশু, পাখি, অণ্ড ও জলজ প্রাণী; শাক, শস্য, দুগ্ধদ্রব্য; পঞ্চাশ রকম 'অর্দভ' বা 'সৃষ্টিছাড়া' ছোটো-ছোটো খাবার; পঞ্চাশ রকম সূপ ও পনির; অতিকায় আঙুর, আপেল ও হেমন্তের অন্য সব দান; যেন স্বর্গের চাবি কোমরে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গম্ভীরদর্শন মদিরারক্ষী: উচ্ছল পাত্র; নীল আগুনে সুরাসিঞ্চিত মাংস; আসব-রক্তিম মিষ্টান্ন; কফির ঘ্রাণ; সিগারেটের ধোঁয়া: — রূপে, রসে, তাপে, সৌগন্ধ্যে বিশাল কক্ষটি যেন বাষ্পাকুল হ'য়ে আছে। এক-একবার আহার শেষ ক'রে আপনি ডেক-এ গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন, তক্ষুনি কোনো পরিচারক ছুটে এসে আপনার গায়ে কম্বল বিছিয়ে দিলে, পায়ের সামনে এগিয়ে দিলে চৌকি; আরামে হয়তো তন্দ্রা এসেছে আপনার, কিন্তু একটু পরেই সামনে নিয়ে এলো 'বীফ-টী' বা গোমাংসরস, অথবা বৈকালিক চা। প্রকাণ্ড জাহাজের মধ্যে যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই প্রাচুর্য ও বিলাসিতা, সেখানেই ভোগের আমন্ত্রণ অবারিত। কিন্তু আপনি যেহেতু ইন্দ্র অথবা জুপিটার নন, একজন মানুষমাত্র, এবং মানুষের শক্তি ও সময় যেহেতু শোচনীয়রূপে সীমিত, সেইজন্য এই প্রাচুর্যই অবসাদের জন্ম দেয়, নিঃশ্রম নিশ্চিন্ত দিনগুলিতে যেন মূঢ়তার প্রচ্ছদ নেমে আসে। আপনাকে তাই খুঁজে-খুঁজে বের করতে হয় কোথায় আছে একটু নির্জনতা,

যেখানে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বড়ো-বড়ো পাগল ঢেউগুলির উপর দিয়ে আপনি আপনার মনকে মেলে দিতে পারেন, বা দেখতে পান বিকেলের আলোয় রূপবান নাবিক-যুবাদের অবসর-যাপনের হিল্লোল ; বা সূর্যাস্তের সময় পিছন দিকের ছোটো খোলা ডেকটিতে শক্ত ক'রে থাম আঁকড়ে দাঁড়াতে হয়, পাছে দারুণ হাওয়া উড়িয়ে ফেলে দেয় আপনাকে ; বা বেশি রাত্রে পানশালা নৃত্যশালা এড়িয়ে উঠে আসতে হয় একেবারে উপরকার ডেক-এ, যেখানে নেই মানুষ, আছে আকাশ, আর অন্ধকারে দিকদিগন্ত আবৃত, আর মাস্তুলের আলোতে আর তারাতে মিলে যেন কোন অনন্তকে মূর্ত ক'রে তুলছে, আর যেখানে বাতাসের ও সমুদ্রের গর্জনে আবার আপনি শুনতে পাবেন আপনার হৃদয়ের ক্রন্দন— সেই গোপন, সেই দুর্বোধ ভাষা, যা অকথ্য এবং অসহ্য হ'তো যদি না শুধু কবিতা থাকতো আমাদের স্মরণে ও সম্ভাবনায়।

কিন্তু আমাদের টোকিওর এই হোটেলটি কোথাও মরত্বের সীমা লঙ্ঘন করেনি ; যা-কিছু থাকলে সুখ হয় তা সবই আছে, কিন্তু কোনো বিষয়ে আতিশয্য নেই ব'লে উপভোগের স্পৃহা অথবা শক্তি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে না। তাছাড়া বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যাপারে টোকিও আমাকে বেশ খানিকটা খাটিয়ে নিচ্ছে, এবং পরিশ্রমের পরে এলেই সুখ সুস্বাদু।

অন্য একটা কারণে জাপান খুব আরামপ্রদ। সারা দেশটা পারিতোষিকের উৎপাতরহিত ; হোটেলের বিল-এর মধ্যে যেটুকু ধ'রে নেয় তার উপরে এক ইয়েনও কারো প্রত্যাশা নেই। প্রতীচীর সঙ্গে তুলনায় এবং প্রতিতুলনায় অনেক ক্ষেত্রে জাপান নিশ্চয়ই জিতে যাবে।*

---

* কয়েকদিন পরে সান ফ্রানসিস্কোতে আমরা যে-হোটেলে উঠলাম তার নাম মার্ক হপকিন্স ; আগে জানতুম না হোটেলটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। সেখানে আমাদের জানলার বাইরে ছিলো উপসাগর, পুলের উপর দিবারাত্রি স্রোতের মতো মোটরগাড়ি ; ঘরের মধ্যেও অভাব কিছু ছিলো না। ভালো নিশ্চয়ই ; কিন্তু বলতেই হবে যে গিন্‌জা টোকিও-র মতো সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে পাইনি, যদিও মূল্য দিতে হয়েছে তিনগুণেরও বেশি। জাপানি জিনিশপত্রও দামে শস্তা, কিন্তু গুণপনায় অত্যুৎকৃষ্ট। আমি ধনবিজ্ঞানী নই, কেমন ক'রে জাপানিরা এই অসাধ্যসাধন করে বলতে পারবো না ; অনুমান করি এর একটা কারণ এই যে মজুরির হার জাপানে তেমন উঁচু নয়। কিন্তু গুণের সঙ্গে কম-দামের এই সমন্বয় পশ্চিম জর্মানিতেও লক্ষ করেছি।

১৮ জানুয়ারি

আমাদের আজকের দিনটা টোকিওর বাইরে কাটবে; ওটা আমাদের সঙ্গী।

দৈনিক যাত্রীতে বোঝাই ট্রেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চলেছি। কেজো সকালবেলা এখন; টোকিও আর য়োকোহামার মধ্যে দুই দিকে মিনিটে-মিনিটে ট্রেন ছুটছে; বিশ শতকের সমস্ত উদ্যম ও উপায়নৈপুণ্য এই দুই নগরকে মিলিয়ে দিয়ে প্রখর স্রোতে প্রবাহিত। ভিড়ের ধরনটা প্রতীচ্য; কেউ কথা বলছে না, প্রায় সকলের চোখই খবরকাগজে নামানো, স্টেশনে-স্টেশনে নামা-ওঠার কাজটি নিঃশব্দে ও দ্রুতবেগে সম্পন্ন হচ্ছে। য়োকোহামা পেরিয়ে আমাদের অন্য একটা ট্রেনে উঠতে হ'লো; সেটা একেবারে ফাঁকা, বড়ো কোনো কর্মস্থলে যাচ্ছে না, বোঝা যায়। চোখে পড়লো কামরার প্রসাধন, আসনের গদির রংটি গাঢ় নীল, হাতের কাছে ছাইদান আছে, মেঝে, জানলা, জানলার কাচ— সব ঝকঝকে পরিষ্কার। পরিচ্ছন্নতার কোনো প্রতিযোগিতা হ'লে পৃথিবীর মধ্যে জাপানের জয় অনিবার্য।

যে-স্টেশনে নামলুম তার নাম মাচিদা-সিটি। ('City' শব্দের মার্কিনী অর্থ জাপানিরা মেনে নিয়েছে, দেখছি; যে-কোনো ছোটো শহর বা বড়ো গ্রামকে ঐ আখ্যা দিতে এদের বাধে না।) কাছেই টামাগাওয়া গাকোয়েন; 'গাকোয়েন' শব্দের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যায়তনটির সুখ্যাতি দেশে থাকতেই শুনেছিলুম। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কুনিয়োশি ওবারা; জনশ্রুতি থেকে মনে হয়েছে যে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আদর্শ কিছুটা রবীন্দ্রনাথের মতো; শহরের বাইরে, 'প্রকৃতির বক্ষে', এই জাপানি আশ্রমের চেহারাটা চোখে দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিলো।

ওবারা গাড়ি পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য, পাঁচ মিনিটে বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। কাছিমের পিঠের মতো একটি পাহাড়, তার ধাপে-ধাপে বিদ্যালয়টি ছড়ানো। পাহাড়ের মধ্যপথে গাড়ি থামলো, গাছপালা নিবিড় সেখানে, চূড়ায় দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের চ্যাপেল— বা শান্তিনিকেতনের ভাষায়— মন্দির। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওবারা-পত্নী দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় ক'রে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে উপস্থিত হলুম। প্রটেস্টান্ট গির্জের মতো কক্ষটি, সেই রকমই ঠাণ্ডা। দুই সারিতে আলাদা হ'য়ে বসেছে য়ুনিফর্ম-পরা ছাত্র-ছাত্রীরা, তাদের বয়স আট-দশ থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে; তাদের উঠে

দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকেই বোঝা গেলো তারা শৃঙ্খলায় অত্যন্ত বেশি অভ্যস্ত। বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি বাইবেল থেকে উপদেশ শোনাচ্ছেন, দৃষ্টিপাত-মাত্র বুঝতে পারলুম, ইনিই ওবারা। বৃদ্ধ, কিন্তু চেহারা যুবকের মতো সতেজ; পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ-কামানো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; একমাথা রুপোলি চুলের তলায় মুখখানা সুগোল, স্নিগ্ধ ও গোলাপি রঙের; সব মিলিয়ে ও-রকম একটি সুদর্শন পুরুষ যে-কোনো দেশেই বিরল। বাইবেল থেকে নীতিশিক্ষাদান শেষ ক'রে তিনি আমাদের বিষয়ে ও উদ্দেশে দু-চার কথা বললেন; ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভুল সুরে 'জনগণমন' গাইলে, তারপর আমাকে অল্প কিছু বলতে হ'লো, প্র. ব. শোনালেন কয়েক পংক্তি রবীন্দ্রসংগীত। দেশপ্রেম বা রবীন্দ্র-ভক্তি কোনোটাই আমার পেশা নয়, কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানি ছেলেমেয়েদের মুখে 'জনগণমন' গান শুনে আমি ঈষৎ বিচলিত না-হ'য়ে পারলুম না— তার কারণ বোধহয় ভারতবর্ষ যতটা, তার চেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ।

লাঞ্চের আগে ও পরে, ওবারার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বিদ্যালয় দেখলুম। দিনটা কনকনে ঠাণ্ডা; তার উপরে, কী কারণে জানতে পারিনি, ওবারা তাঁর আশ্রমের মধ্যে টুপি পরা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। আমি তাই যখনই যে-ঘরে ঢুকছি, প্রথমেই খানিক দাঁড়িয়ে নিচ্ছি চুল্লির ধারে, চেষ্টা করছি অন্ততপক্ষে হাত দুটোকে তাতিয়ে নিতে। আমরা যাকে লেখাপড়া বলি, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা তাতে আবদ্ধ নয়; আছে নানা রকম হাতের কাজ ও যন্ত্রবিদ্যা, সব্জিখেত মাছের পুকুরও বাদ পড়েনি, কাচের ঘরে উত্তাপে লালিত হচ্ছে বিরল ও মূল্যবান গাছপালা। কলাভবন ও চিত্রশালাটি রীতিমতো উল্লেখ-যোগ্য ব'লে বোধ হ'লো। ছাত্রদের ছবি দেখেও বোঝা যায় যে জাপানি চিত্রকলার ঐতিহ্যে কখনো ভাঙন ধরেনি, বা এখানে 'ঐতিহ্য' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়নি 'অচলায়তন'— নিজেদের উপর আস্থা রাখে ব'লেই এরা জগতের দিকে সবগুলো দরজা-জানলা খুলে রেখেছে। জাপানের অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো, এখানেও ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক, শেখানো হয় অত্যাধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে। ক্লাশে শিক্ষয়িত্রী একজন থাকেন বটে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের আসল কাজ হ'লো কানে যন্ত্র লাগিয়ে রেকর্ড শোনা। কয়েক মিনিট আমিও কান পাতলুম তাতে; ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট ক'রে, মার্কিনী উচ্চারণে বলা হচ্ছে: 'Mary,

Mary, get up from bed. It is time to go to school.' একই কথা আটবার, দশবার ক'রে বলা হচ্ছে, যাতে শিশুদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। শুধু যদি বলতে শেখানো উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে এই উপায় নিশ্চয়ই প্রশস্ত; কিন্তু অনুমান করছি এটা জাপানে সম্প্রতি আমদানি হয়েছে, কেননা যাঁদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করছি তাঁরা অনেকে পণ্ডিত হ'লেও নামমাত্র ইংরেজি বলেন। স্বয়ং ওবারা তাঁদেরই একজন।

একটি পঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'লো: সে কোনো-একটা ফলিত বিজ্ঞান শিখছে এখানে, সামনের বছর দেশে ফিরে যাবে। জাপানি ভাষা বেশ রপ্ত হ'য়ে গেছে ছেলেটির, তা না-হ'লে এ-দেশে কিছুই শেখা যায় না। শুনলুম, প্রতি বছর একটি ক'রে বিদেশী ছাত্রের পড়া-খরচ অন্যান্য ছেলেমেয়েরা চাঁদা ক'রে জুগিয়ে দেয়, য়োরোপের অতি-দূরবর্তী দেশ থেকেও মাঝে-মাঝে ছাত্র আসে এখানে, নানা দেশের সঙ্গে যোগস্থাপনে এঁরা নিত্যসচেষ্ট। যাকে বলে মানবিক বিদ্যা, এই প্রতিষ্ঠানের ঝোঁকটি ঠিক সেদিকে নয়; 'skills and technics' শিখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংসারের জন্য সক্ষম ক'রে তুলছেন এঁরা; ব্যায়াম তাই আবশ্যিক, ঘর পরিষ্কার, বিছানা পাতা ইত্যাদি কাজ নিজেদেরই করতে হয়; প্রয়োজনমতো সমাজসেবাতেও ডাক পড়ে। আমি বালক বয়সে এ-রকম বিদ্যালয়ের ছাত্র হ'লে সুখী হ'তে পারতুম না; কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে বেড়াতে এসে বেশ ভালো লাগছে।

একটা জিনিশ আমার কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেলো: প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ব-বিদ্যালয় বলা হয় কেন। ছাত্রছাত্রী অধিকাংশই নাবালক, এবং শিক্ষণীয় বিষয়-গুলিতেও তেমন ব্যাপ্তি নেই; আমাদের হিশেবে এটি একটি উৎকৃষ্ট আবাসিক মহাবিদ্যালয়। কিন্তু জাপানে শিক্ষায়তনের পরিভাষা বোধহয় অন্য রকম; কেননা এক টোকিওতেই, শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় আছে পঞ্চাশটি, যা পৃথিবীর অন্য যে-কোনো নগরের পক্ষে কল্পনাতীত। এমন কি হ'তে পারে না যে অন্যান্য দেশে যাকে 'স্কুল' বা 'কলেজ' বলে, এখানে সেগুলোই আকারে বড়ো হ'লে বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে গণ্য হয়? খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি, মনে হয় ব্যাপারটা তা-ই।

অপরাহ্নে ওবারার বাসভবনে একটু বিশ্রাম। ঠাণ্ডায় অনেকক্ষণ ঘোরা-ঘুরির পর চুল্লির ধারে বসতে পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করলুম, এবং আমাদের পক্ষে

সেই মুহূর্তে যার মতো বাঞ্ছিত জিনিশ আর-কিছু ছিলো না, সেই 'কালো' বা ভারতীয় চা পরিবেষণে শ্রীমতী ওবারার তৎপরতা আমাদের মুগ্ধ করলে। তাঁর কাছে, অন্যান্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা চায়ের পরে গাড়িতে উঠলুম। ওবারা আমাদের সঙ্গে চলেছেন, তিনিই নিমন্ত্রণকর্তা, আমাদের রাত্রিবাস হবে হাকোনেতে।

চলেছি গ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু 'গ্রাম' বলতে আমাদের ভারতীয় মনে যে-ছবি জেগে ওঠে তার সঙ্গে এর কিছুই মেলে না। নেই উদার আকাশ অথবা সীমাহীন প্রান্তর ; পাহাড়ি দেশ শীতে ঘনিষ্ঠ ; নিসর্গ, কৃষকদের কুটির, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো শহরে কাচের দরজাওলা দোকান— সব-কিছুই প্রতীচীর সঙ্গে স্বরে বাঁধা। যে-পথ দিয়ে চলেছি তা গেছে টোকিও থেকে কিয়োটো পর্যন্ত ; পুরোনো এবং ঐতিহাসিক পথ এটি, ছবিতে ও কবিতায় বিখ্যাত, পূর্বযুগে যাত্রীরা যাতায়াত করেছে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে। তখন এর নাম ছিলো টোকাইডো— যার অর্থ 'পূর্বসাগরের মুখোমুখি পথ' ; এক-এক দিনের ভ্রমণের ব্যবধানে তিপ্পান্নটি বিশ্রামস্থল গ'ড়ে উঠেছিলো— পাহাড়ের কোলে, হ্রদের তীরে, পাইন-বনের শান্ত নির্জনতায়। অনেকবার মোড় নিতে-নিতে আমাদের সামনেও খুলে গেলো সেই 'পূর্বসাগর'— সন্ধ্যার ছায়ায় ইস্পাত-রঙের প্যাসিফিক ; তার ধার দিয়ে একটি রেলগাড়িকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলুম। আমাদের মোটরগাড়িও উপকূল ঘেঁষে চললো খানিকক্ষণ, নামলো রাত্রি, ধীরে এগিয়ে এলো পথের দু-ধারে আলো-জ্বলা বাড়ি আর দোকান ;— এই জায়গাটাই হাকোনে।

দোতলা একটি কাঠের বাড়ির সামনে আমরা নেমেছি। তক্ষুনি সামনের ঠেলা-দরজা খুলে গেলো, একটি ছিপছিপে যুবক বেরিয়ে এসে নতজানু হ'য়ে অভিবাদন করলেন। ওবারার প্রাক্তন ছাত্র ইনি, এই সরাইখানার মালিক ; বোঝা গেলো, ওবারা আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন, আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। আমরা ভিতরে যেতেই একটি দাসী এগিয়ে এসে নতজানু হ'লো আমাদের জুতো খুলে নেবার জন্য, যথারীতি কাপড়ের চটি প'রে আমরা দোতলায় এলাম। বলতে পারবো না সিঁড়িটি কী সুন্দর ও নির্মল, ঘরটি কী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তা বলা যাবে না। আভরণ স্বল্প, সেই স্বল্পতাই সবচেয়ে

বড়ো আভরণ। জাপান বিষয়ে ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু শুনে আসছি, যা-কিছু পড়েছি, কল্পনা করেছি বা ছবিতে দেখেছি, ঐ ঘরটিতে ঢোকামাত্র হঠাৎ সব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো, যেন জাপানের অন্তরাত্মার একটি রূপ দেখতে পেলাম। মাদুরে মোড়া মেঝে, অর্ধেক মাদুরে মোড়া দেয়াল, দেয়ালের ও সীলিঙের কাঠে অল্প কারুকার্য, বসবার ব্যবস্থা মেঝেতে। পাশে ছোটো শোবার ঘর, পিছন দিকের লম্বা বারান্দায় হালকা চেয়ার অপেক্ষা করছে, তার ভোক্তা হবার ইচ্ছে থাকলেও এই শীতের রাত্রে কারোরই সাধ্য নেই। বারান্দার তলা দিয়ে, পাথরে-পাথরে প্রতিহত হ'য়ে, ছলচ্ছল শব্দে ব'য়ে চলেছে ক্ষীণকায় গিরিস্রোতস্বিনী, তার ওপারে গাছপালার অন্ধকার। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে হ'লো যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাড়িগুলোতে সাজ-সজ্জার যে-বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম তার ধরনধারন কিছুটা জাপানি।

ফুজিয়ামা কাছেই। এখন আর অগ্নি-উদ্‌গিরণ নেই তার, শুধু জালাময় স্মৃতি উপকারী উষ্ণ প্রস্রবণে নিহিত হ'য়ে এই অঞ্চলে প্রচুরভাবে ছড়িয়ে আছে। যাঁরা বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের সন্ধানী, এবং যাঁরা দৃশ্যের প্রেমিক, তাঁদের সকলের পক্ষেই হাকোনে একটি পীঠস্থান। আমাদের সরাইখানার তলাতেই একটি প্রস্রবণ লুকোনো। লুকোনো বলছি এইজন্যে যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই ; নৈসর্গিক তপ্ত জলকে অনেকগুলো ছোটো-ছোটো কুঠুরির মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার একটাতে ঈষৎ শঙ্কিত চিত্তে নাইতে ঢুকলুম। বাষ্পে ঘন হ'য়ে আছে কুঠুরিটা, চোখে ভালো দেখা যায় না প্রথমে, একটা চৌবাচ্চার মধ্যে অনবরত সধূম জল প্রবেশ করছে, আর-এক পাশে টবে রাখা আছে ঠাণ্ডা জল। যদিও সব রকম ব্যবস্থাই ছিলো, আমি পায়ের মোজা ভিজিয়ে-টিজিয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে অচিরেই ঘরে ফিরে এলুম ; কিন্তু এটা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হ'লো না যে যারা হাত-পা ব্যবহারে আমার চেয়ে পটু, তারা এখানে স্নান ক'রে অগাধ আরাম পাবেন। বন্ধু ওটাকেই দেখলুম নগ্ন গাত্রের উপর কিমোনো জড়িয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত মুখে বেরিয়ে আসছেন।

এবার মেঝেতে ব'সে জাপানি ধরনে সান্ধ্যভোজ। নিচু, চৌকো টেবিলের চারদিকে চারজনে বসেছি, সকলের গায়েই সরাইখানার দেয়া কিমোনো।

সুকোমল আসন, চেয়ারের মতো হেলান দেবারও ব্যবস্থা আছে। টেবিলের তলার দিকটায় কম্বল বিছোনো, সেই কম্বলের ভিতর দিয়ে পা গলিয়ে দেয়ামাত্র নিচে অতি সুখপ্রদ তাপ অনুভূত হ'লো। মেঝের তক্তা সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানে, তলায় তাপপাত্র জ্বলছে; যদি আমরা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতুম, আর টেবিলের তলায় থাকতো অগ্নিকুণ্ড, তাহ'লে যা হ'তো তার চেয়ে আরাম কিছুমাত্র কম মনে হ'লো না। পায়ের তলায় তাপ, পাশে তাপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে, হাঁটুর উপরে কম্বল, কণ্ঠনালীতে উষ্ণ সাকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে— সারাদিন পরে এতক্ষণে সত্যি-সত্যি শীত ভাঙানো গেলো। ওবারার গোলাপি রঙের মুখটি হাসিতে ও সরলতায় উদ্ভাসিত, আমাদের সুখী হ'তে দেখে আনন্দিত তিনি, আমরা যা-কিছু বলি তার ভাষা না-বুঝেই সারা মুখে প্রীত হ'য়ে ওঠেন, ওটা কথাটা বুঝিয়ে দিলে পরে তার যথাযোগ্য উত্তর দেয় আবার তাঁর অনাবিল হাসি ও চোখের উজ্জ্বলতা। এমনি বিকশিত মনে, মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিয়ে, কৌতুক ও প্রীতি-বিনিময়ের ফাঁকে-ফাঁকে, আমরা পাচকের প্রতি সুবিচার করতে লাগলুম;— এক ঘণ্টার আগে ভোজন শেষ হ'লো না। শুতে গিয়ে দেখি, রেশমের লেপের তলায় বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র দিয়েছে; ঘর অন্ধকার ক'রে দেয়ামাত্র শিয়রে নদীর কলতান ধ্বনিত হ'লো। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে— ঘুমিয়ে পড়লুম বলতে পারলেই শোভন হ'তো, কিন্তু জানি না কেন, হয়তো ঘরে অত্যধিক তাপের জন্যই, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না।

*　　　*　　　*

মনে পড়লো আর-এক দিনের কথা। এই প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে ক্যালিফর্নিয়া, সেখানে আমি দু-এক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ। ঘুরতে-ঘুরতে উপস্থিত হয়েছি বিগ সুর-এ, হেনরি মিলারের আমন্ত্রণে। সান ফ্রানসিস্কো ও লস এঞ্জেলেস-এর মধ্যবর্তী এই 'বড়ো দক্ষিণ'; মণ্টেরে এয়ারপোর্ট থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে এর সীমানা আরম্ভ। যেমন ডি. এইচ. লরেন্সের স্মৃতিজড়িত নিউ মেক্সিকো, তেমনি এই অঞ্চলও এমন অনেকের বাসভূমি যাঁরা লেখক অথবা চিত্রকর, কিংবা যাঁরা শিল্পকলার প্রেমিক, বা অন্য কোনো কারণে সমাজে খাপছাড়া। তার একটা কারণ, এ-সব পাড়ায় প্রকৃতি এখনো কিছু পরিমাণে

বন্য ; আর-এক কারণ পূর্বতটের বা যে-কোনো নগরের তুলনায় খরচ অনেক কম এখানে।

কয়েকদিন আগে ক্ষণিকের জন্য নিউ মেক্সিকোতেও থেমেছিলাম। শুকনো হাওয়া লাল মাটির দেশ : পথে যেতে-যেতে উত্তরপ্রদেশ বা দিল্লি অঞ্চল মনে পড়ে। আলবাকার্কে থেকে বাস্-এ ক'রে টাঅস-এ যখন পৌছলাম তখন ভর সন্ধে। আমি বাস্ থেকে নামামাত্র আমার কাঁধের উপর একখানা হাত পড়লো : মুখ ফিরিয়ে যাঁকে দেখতে পেলাম তিনি ডরথি ব্রেট। আদিতে ছিলেন 'অনারেবল' উপাধিধারিণী অভিজাত ইংরেজ মহিলা : ডি. এইচ. লরেন্সের অনুগামিনী হ'য়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবার পর আর ইংলণ্ডে ফিরে যাননি। লরেন্সের প্রথম ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম ইনি, তাঁর বিষয়ে প্রথম যুগের একটি পুস্তকের রচয়িত্রী। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আমি নির্ভুলভাবে লরেন্সীয় নায়িকাকে চিনতে পারলাম। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে আঁটো প্যান্ট ও কোর্তা, মাথার চুল ধূসর, চোখ তীক্ষ্ণ, মুখের প্রতিটি বার্ধক্যজনিত রেখাতে বুদ্ধি ও উদ্যম প্রকাশ পাচ্ছে। করমর্দনের সময় দেখা গেলো যে তাঁর হাতখানা আকারে আমার দ্বিগুণ। 'আমাকে ব্রেট ব'লে ডাকবে, সবাই তা-ই ডাকে আমাকে। পুরুষের মতো পোশাক পরি ব'লে এখানকার কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁয় আমাকে যেতে দেয় না, কিন্তু অন্য আরো ভালো জায়গা আছে— চলো।' এই ব'লে আমাকে তাঁর স্টেশন-ওয়াগনে তুললেন। গাড়ির পিছন দিকে আসন নেই, আছে উঁচু একটা বিছানার মতো ব্যাপার, তাতে বিবিধ কুশানে কম্বলে পরিবৃত হ'য়ে এক বিরাট কুকুর রাজার মতো আসীন। যে-রেস্তোরাঁয় যাওয়া হ'লো সেটা কাঠের বাড়ি, এ-দেশে যাকে লগ্-ক্যাবিন বলে সেই গোছের, মনে হয় যেন হেলাফেলা ক'রে বানানো, কিন্তু বসবাসের অযোগ্য নয়। ইলেকট্রিক আলো জ্বালেনি, টেবিলে-টেবিলে নরম আলো মোমবাতির, আর অগ্নিকুণ্ডে জ্বলন্ত কাঠ লাল আভায় গনগনে। একটুখানি খোলা উঠোন পেরিয়ে হাত ধোবার ঘরে যেতে হ'লো— ক্ষণিকের জন্য আমাকে অবাক ক'রে দিলো অন্ধকার, আকাশের তারা, ঘনিষ্ঠ মফস্বলি রাত্রি। আমরা ঢুকতেই চারদিকে রব উঠলো— 'হ্যালো, ব্রেট ! হ্যালো ! কী খবর ?' এই ছোটো শহরে এঁকে না চেনে এমন কেউ নেই। আমেরিকার অন্য এক চেহারা দেখা যায় এখানে, সেটা পুরোপুরি নাগরিক বা প্রতীচ্য নয়, ন্যুয়র্ক বা শিকাগোর চাইতে এখানকার অনেক বেশি কাছের দেশ মেক্সিকো ;

যে-স্বল্পসংখ্যক 'ইণ্ডিয়ান' এখনো ম্রিয়মাণভাবে টিকে আছে তারা অনেকেই এখানকার অধিবাসী। লরেন্স যে এই মহাদেশের মধ্যে নিউ মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যকরতাই তার একমাত্র কারণ ব'লে মনে হয় না। ইংলণ্ডে যা নেই, এবং যার অভাবে লরেন্স কষ্ট পেতেন, সেই প্রসার এখানে অপর্যাপ্ত, ভৌগোলিক ও চারিত্রিক দুই অর্থেই। আহারের পরে ব্রেট আমাকে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে কিছুটা বাঙালি ধরনে খোলামেলা আড্ডা হ'লো। যে-হোটেলে রাত কাটালুম সেখানেও হোটেলিয়ানা খুব কম; ভিড় নেই, অতএব ব্যস্ততাও নেই, চালচলন ঢিলেঢোলা গোছের; দিন-রাত্রির যে-কোনো সময়ে বিনামূল্যে ধোঁয়া-ওঠা কফি বা চা পাওয়া যায়; সকলেরই সকলের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে এবং সময় আছে; যাঁরা কুড়েমি করার শক্তি ধারণ করেন তাঁদের পক্ষে আদর্শ স্থান।

পরের দিন সকালে ব্রেট আমাকে নিয়ে গেলেন একটি 'ইণ্ডিয়ান' 'পোয়েবলো' বা গ্রাম দেখতে। সেখানেও অনেকে তাঁর পরিচিত; যারা ইংরিজি জানে (সকলে জানে না) তারা কেউ-বা এগিয়ে এসে আলাপ করলে। বাড়িগুলো মাটির, একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত তাদের উচ্চতা; লোকগুলোর হাব-ভাব গম্ভীর, মুখে হাসি নেই, কথাও কম; আমাদের সাঁওতালদের মধ্যে যেমন একটি প্রফুল্ল সরব কর্মিষ্ঠতা দেখা যায়, এখানে তার বদলে যেন একটা নির্বেদের ভাব ছড়িয়ে আছে; এদের অনিবার্য অবলুপ্তির অচেতন বোধ তার কারণ হ'তে পারে। আমরা একটা পুকুরের দিকে যাচ্ছিলুম, একটি ছোটো মেয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে তার ভাষায়, এবং হাত-মুখ নেড়ে, আমাদের নিষেধ করলে; বোঝা গেলো, ঐ পুকুরটা ট্যাবু, কোনো বিজাতীয় লোক তার ধারে গেলে অপদেবতার দৃষ্টি পড়বে। ও-রকম পবিত্রতা অবশ্য বাড়িগুলোর নেই; এক গৃহস্থের ঘরের মধ্যে, ব্রেট যেহেতু পরিচিত, ঢুকে পড়া গেলো। দেখলাম, অতীতে ও বর্তমানে মিলে এক জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে: মোষের শিং, মাদুলি, পাখির পালকের সাজ, অব্যবহৃত তীর-ধনুক— এ-সবের সঙ্গে সাজানো আছে ইলেকট্রিক টর্চ, চামড়ার বেল্ট, এলুমিনিয়মের বাসন, আর আরো অনেক কলে তৈরি কম দামের জিনিশ। করুণ লাগলো দৃশ্যটা; আমার মনে পড়লো এক লাল সর্দার, এদেরই পূর্বপুরুষ, সদ্য-আসা শ্বেতাঙ্গদের কাছে কয়েক পয়সায় বেচে দিয়েছিলেন— মান্নাহাট্টা দ্বীপ— যেখানে আজ আকাশ-আঁচড়ানো

ন্যুয়র্ক দাঁড়িয়ে। সে-দৃশ্য আজ ম্যুজিয়মে দেখানো হয়; এই 'পোয়েবলো', আর স্বল্পভাষী বিমর্ষ মানুষেরা— ম্যুজিয়মের পুত্তলিগুলি সপ্রাণ হ'লে যা হ'তো, এরাও যেন তা-ই; যেন ম'রে গেছে, কিন্তু এখনো সৎকার করা হয়নি; গোধূলির ছায়ায় অর্ধলীন হ'য়ে অস্পষ্টভাবে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

এর পরে ব্রেটের বাড়িতে আধ ঘণ্টা কাটলো। ছাত্র বয়সে যখন ঢাকায় ছিলুম, রমনার নীলখেতের একটি বাড়িকে আমি মনে-মনে নাম দিয়েছিলুম 'পৃথিবীর সীমা'। তারপরে আর বাড়ি ছিলো না, শহর ছিলো না, শুধু দিগন্তকে বিদীর্ণ ক'রে একটি রেল-লাইন চ'লে গেছে। ব্রেটের বাড়ি দেখে সেই স্মৃতি আমার মনে জাগলো— কিন্তু এর নিঃসঙ্গতা ঢের বেশি তীব্র। প্রতিবেশী বাড়ি একটিও নেই, চারদিকে শুধু ঢেউ-খেলানো বৃক্ষবিরল মাটির বিস্তার, রোদ্দুরে তাদের ধূসর-ব্রাউন রংটিকে বেশ কড়া লাগছে। চারদিক এমন শব্দহীন, গতিহীন ও আকাশের দ্বারা আপ্লুত যে মনে হয় সত্যি বুঝি পৃথিবী এখানে শেষ হ'য়ে গেলো। একা, শুধু একটি কুকুরকে সঙ্গী ক'রে, এই নির্জনে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন প্রৌঢ়া চিরকুমারী। লম্বা ছাঁদের একতলা কাঠের বাড়ি, মার্কিনীরা যাকে 'লিভিংরুম' বলে সেটি মস্ত, আর সেখানে যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে শেষ-করা, আরম্ভ-করা, অর্ধসমাপ্ত ছবি, আর রং তুলি ইজ়েল ইত্যাদি সরঞ্জাম। ছবি আঁকেন ব্রেট, তাঁর রচিত কয়েকটি ক্যানভাসের সোনালি-নীল পটভূমি থেকে লরেন্সের তীক্ষ্ণ চোখ আমাকে বিদ্ধ করলে। জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে এক পাহাড়, মাথায় তার টুপির মতো স্তম্ভ; লরেন্সের স্মৃতিসৌধ সেটি, তাঁর পত্নী ফ্রীডার নিবেদন। 'ওখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু এখনো পুরোপুরি বরফ গলেনি, পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যাবে না।...আমি লরেন্সকে অনেক বলেছিলুম য়োরোপে ফিরে না-যেতে, এখানে এসে তাঁর শরীর অনেক সেরেছিলো, থেকে গেলে অমন অকালে মৃত্যু হ'তো না।...তোমার সঙ্গে লরেন্সের দেখা হওয়া উচিত ছিলো; তোমার ভালো লাগতো তাঁকে, ভালো লাগতো।' যে-অল্প কয়েকটা বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার তিলতম সন্দেহ নেই ব্রেটের শেষ উক্তিটি তারই অন্যতম, তাই আমি এ-কথার কোনো জবাব দিলুম না।...'আমার একটা ছবি উপহার দিই তোমাকে, দেশে নিয়ে যেয়ো। এইটে—?'

ব্রেটকে নিয়ে শহরে ফিরে এলুম লাঞ্চ খেতে। যেখানে-সেখানে ছবির

মেলা, রেস্তোরাঁর মালিকও কিছু আর্টের চর্চা করেন ; এর মধ্যে যে সবটাই খাঁটি তা বিশ্বাস করতে হ'লে অত্যন্ত বেশি আশাবাদী হ'তে হয়। তবে যাকে বলে একটা আবহাওয়া আছে। রাস্তায় মাঝে-মাঝে ভিখিরি, রঙিন ঘাঘরা আর কম্বলে জড়ানো অলস 'ইণ্ডিয়ান', খুব একটা কেজো অথবা পোশাকি ভাব কোনোখানেই নেই। এই বিমিশ্র ও চিত্রল আমেরিকার মধ্যে ডরথি ব্রেট— পুরোনো পৃথিবী থেকে ছিটকে-পড়া ; লরেন্সের প্রতিভার প্রভাবে যে-সব মেয়েদের জীবন ব্যর্থ অথবা সার্থক হয়েছিলো তাঁদেরই একজন— তাঁর উচ্চ-বর্ণশোভন ইংরেজ উচ্চারণ,* কাটাছাঁটা ইংরেজ হিউমার, তাঁর বিদ্রোহী পোশাক, ব্যবহারে মার্কিনী স্বাচ্ছন্দ্য, আর সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সহজ আত্মপ্রত্যয়— আমি ব'সে-ব'সে এই সব উপভোগ করলুম আরো ঘণ্টাখানেক, আমার স্মৃতিতে টাঅসের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেলেন।

তেমনি, আমার পক্ষে, বিগ স্থর-এ হেনরি মিলার। আশ্চর্য মানুষ, জায়গাটিও আশ্চর্য। টাঅসের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতিতে মিল থাকলেও, বাইরের দৃশ্য একেবারে আলাদা। মিলারের এক বন্ধুর সঙ্গে এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে আসতে-আসতে দেখি, রাস্তার একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, আর-একদিকে সারি-সারি পাহাড় উঠে গেছে। ছোটো পাহাড়, আমাদের হিশেবে টিলাও বলা যায়, কিন্তু গায়ে-গায়ে অরণ্য এত ঘন যে দেখতে গম্ভীর। ধাপে-ধাপে নয়, এক-একটি পাহাড়ের মাথার উপর এক-একটি বাড়ি, নিচে থেকে সবটা তার চোখে পড়ে না। মালিকেরা রাস্তার উপরে স্বনামাঙ্কিত মস্ত লোহার চিঠির বাক্স বসিয়েছেন, ডাকপিওন সেখানেই চিঠিপত্র রেখে চ'লে যায়, আর তাতেই বোঝা যায় কোন বাড়ির বাসিন্দা কে। নেই রাস্তার নাম অথবা বাড়ির নম্বর ; এমনি কয়েকখানা বাড়ি— বনানীর মধ্যে, পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের মুখোমুখি : তা-ই নিয়ে বিগ স্থর। এমন এক পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছি, যার আদিম রূপ এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি ; ইংরেজিতে যাকে বলে 'ঈশ্বরের প্রাচুর্য', এ যেন তা-ই ; মনে হয় এখানে একটি আস্ত পাহাড়ের উপরে বাড়ি তুলে বসবাস করতে লেগে গেলেই হ'লো, কাঠখড় হাতের কাছেই ছড়িয়ে

* 'Trout' শব্দের তিনি উচ্চারণ করলেন 'ট্রাউট'। এটা আমি আর কারো মুখে শুনিনি, অক্সফোর্ড অভিধানেও বলে না।

আছে ; কেউ কিছু বলবার নেই। এখানে যেন এখনো বিশ্বাস করা সম্ভব যে প্রকৃতি স্নেহময়ী।

ছোটো-বড়ো গাছ, ঝরা পাতা, লম্বা ঘাস ;— মধ্যখানে আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি পাহাড়ে উঠলো, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পৌছলাম। কাঠের বাড়ি— এখানেও সেটাই রেওয়াজ, বাঁধানো উঠোনে আমার নিমন্ত্রণকর্তা দাঁড়িয়ে। তিনি এগিয়ে এসে যে-ভাবে আমার করমর্দন করলেন, তা আমি এখনো ভুলিনি। অনেকে— আর তাঁদের মধ্যে মহিলা বেশি— এই প্রথাটিকে শিষ্টাচারের কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত করেন, এমনভাবে দুটি নিষ্প্রাণ আঙুলের ডগা বাড়িয়ে দেন যেন কোনো অবাঞ্ছিত স্পর্শের সংকোচ কাটাতে পারছেন না। এটা সাধারণত ঘটে বড়ো পার্টিতে সদ্যপরিচিত মহলে, কোনো মানবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনার বাইরে ; সেখানে হয়তো নিতান্ত নিয়মরক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু 'যাকে আমরা হৃদয় দিতে পারি না তাকেও আমাদের কিছু দেবার আছে', এ-কথাটার প্রমাণ ওতে পাওয়া যায় না। আবার অনেক মার্কিনী পুরুষ, করতল সুদ্ধু পাঁচটি আঙুল টান ক'রে দিয়ে, সমস্ত বাহুটিকে সোজা তলোয়ারের মতো বাড়িয়ে দেন ; এটাকেও কেমন সামরিক ভঙ্গি ব'লে মনে হয়, বা অস্তিত্বহীন হৃদ্যতার দেখানোপনা। কিন্তু মিলারের হাতের চাপ একেবারে পূর্ণ, সপ্রাণ ও সবল, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা 'হাতে রাখা' নেই, আছে উষ্ণ ও অব্যবহিত হৃদয়ের সম্ভাষণ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁর পরিবারের অন্তর্ভূত হলাম।

যদি না বার্ধক্যে আমার স্মৃতিলোপ ঘটে তাহ'লে, যতদিন বেঁচে আছি, বিগ স্যূর-এ হেনরি মিলারের গৃহস্থালির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগবে। কৃশ, ঋজু, দীর্ঘকায় হেনরি, ষাটের কাছাকাছি বয়স ; স্ত্রী, ঈভ, সুন্দরী ও প্রৌঢ়যৌবনা ; দুটি চার ও পাঁচ বছরের সন্তান, ভাল ও টোনি, নীল চোখ ও পট্টবর্ণ চুলে নয়নহরণ। ঈভ আগে ছিলেন অভিনেত্রী ; এটি তাঁর তৃতীয় ও হেনরির দ্বিতীয় বিবাহ। ছেলেমেয়ে দুটি হেনরির পূর্বপক্ষের, তারা পালা ক'রে বছরে ছ-মাস বাপের ও ছ-মাস মায়ের কাছে থাকে। হেনরির মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা ; কথা বলেন ধীরে ও ঈষৎ শ্লথভাবে ; ঘাড় হেলিয়ে মনোযোগপূর্বক অন্যের কথা শোনেন। ইনি খাশ আমেরিকান, এঁর জীবনেও মার্কিনদেশের চরিত্র প্রতিফলিত। জন্ম গরিবের ঘরে, কলেজে

পড়াশুনোর সুযোগ পাননি, যৌবনে টেলিগ্রাফের কেরানিগিরি ক'রে জীবিকা চালাতেন। এমন দিন গেছে যখন ন্যুয়র্কে শীতের শেষে নগণ্য দামে গা-ছাড়া করেছেন ওভারকোট। সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ ক'রে প্যারিস; সমবয়সী অন্য অনেক মার্কিনী লেখকের মতো, উদ্বেল ও বিপদসংকুল বোহেমিয়ায় নিমজ্জন। ফিরে এলেন যৌবনের শেষে কুখ্যাত ও বিখ্যাত হ'য়ে; তাঁর প্যারিসে ছাপা কয়েকটি উপন্যাস এখনো অ্যাংলো-স্যাক্সন জগতে নিষিদ্ধ।* লেখা, ছবি আঁকা, বিগ স্বর-এর নিসর্গ ও সংসর্গ— এই দিয়ে আপাতত রচিত তাঁর জীবন। কদাচ পূর্বতটে যান, বিশ্ববিদ্যালয় বা ফাউণ্ডেশনগুলির সঙ্গে সংস্রব নেই; তাঁর অবস্থা কোনো-কোনো মধ্যবয়সী বাঙালি লেখকের মতো— কিছুটা খ্যাতি হ'য়ে থাকলেও অর্থ আসেনি, 'এক-একদিন এমনও হয় যে বিদেশে একটা চিঠি লেখার জন্য দশ সেণ্ট জোটে না।' হয়তো য়োরোপে দীর্ঘ প্রবসনের জন্য, বা স্বভাবেরই প্রভাবে, তাঁর কয়েকটা অভ্যেস লক্ষণীয়ভাবে অমার্কিনী; ইনি চিঠি লেখেন সর্বদা 'লম্বা হাতে', তাও অনাধুনিক ফাউণ্টেন-পেনে: জেট-প্লেন ও কাফেটেরিয়ার জগৎকে অন্য যে-সুবিধাজনক ও নিশ্চরিত্র লেখন-যন্ত্র জয় ক'রে নিয়েছে, সেই তথাকথিত ডট-পেন ব্যবহার করেন না এমন আমেরিকান আমি এঁকেই শুধু দেখেছি। এবং বন্ধুতার স্থাপনে ও লালনে ইনি যদিও প্রতিভাবান, তবু এঁর ব্যক্তিত্বটি সংবৃত; আমাকে ভালোবেসেও 'মিস্টার বোস' ভিন্ন আর-কোনো সম্বোধন করলেন না; সেটা আমার পক্ষে বেশ মনোমতো হ'লো।

পক্ষান্তরে, ঈভ দু-লাইন চিঠি লিখতে হ'লেও টাইপরাইটার খুলে বসেন, তাঁর কথা উচ্ছল, চলাফেরা দ্রুত, সরলতায় ও কৌতূহলে ভরা চোখ, নিজেকে এমন সহজভাবে প্রকাশ করেন যা শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। আমি যেন তাঁকে 'ঈভ' ব'লে ডাকি, এই ইচ্ছাটি তিনি অনেকবার ব্যক্ত করলেন, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে আমার সঙ্গে বরং হেনরির মিল অনেক বেশি। কিন্তু এই দুই ভিন্ন চরিত্রের মানুষের যুগপৎ সঙ্গ আমার পক্ষে খুব আনন্দের হ'লো। যাতে রান্নার সময়ে স্ত্রীকে নির্বাসিত হ'তে না হয়, সেইজন্য লিভিং রুমেরই এক অংশে রান্নাঘর পেতে নেয়া হয়েছে; কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কথা চলে, কিছু-একটা

* ১৯৬১-তে, প্রথম প্রকাশের সাতাশ বছর পর, তাঁর একখানা এ-যাবৎ নিষিদ্ধ উপন্যাসের মার্কিনী প্রচার সম্ভব হ'লো। ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতি ও বিত্ত দু-ই বর্ধিত হয়েছে।

চাপিয়ে ঈভ এসে বসেন আমাদের সঙ্গে। হয়তো ঈভ কথা বলেন, হেনরি এলিয়ে ব'সে সিগারেট খান, টোনি, ভাল ও আমাকে নিয়ে হেনরি বেরোন বেড়াতে, আর ঈভ বাড়িতে থাকেন স্বামীর মনোমতো ক'রে মুর্গি রাঁধার জন্য ; আবার কখনো ঈভ গাড়ি চালান, হেনরি একটু ঘুমিয়ে নেন সেই ফাঁকে। গাড়ি না-থাকলে ক্যালিফর্নিয়ায় বাস করা দুঃসাধ্য, বিগ স্যুর-এ অসম্ভব। এখান থেকে নিকটতম বাজার সেই কার্মেল শহরে, নিকটতম ড্রাগ-স্টোর কোন না পাঁচ-সাত মাইল দূর হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হ'য়েও বিগ স্যুর-এ টেলিফোন নেই,* যে-কোনো ছোটো কাজেও নিজে না-বেরোলে চলে না। তাই গাড়ি চাই, আর এখানে গাড়ি মানেই স্টেশন-ওয়াগন। হেনরিরও আছে একটি ; সেই যানে, রাত দশটার পরে, তিনি আমাকে আমার শয়নাগারে পৌঁছিয়ে দিলেন।

হাকোনের মতো, বিগ স্যুরও স্বাস্থ্যকর স্নানের জন্য নামজাদা। একটা জায়গায় প্যাসিফিক একটু দ্রুত রেখায় বেঁকে গেছে, তার কাছে এলে তীব্র একটা গন্ধ পাওয়া যায়। প্রকৃতি এই জলের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে গন্ধক ; জল তাই তপ্ত, ফেনিল ও সধূম ; তট ঘেঁষে, শিলাখণ্ডগুলিকে ঝাপসা ক'রে দিয়ে, এক বুদ্‌বুদময় আলোড়ন চলছে সব সময়। কাছেই আছে স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভাড়া নেবার জন্য কয়েকটি কাঠের কুঠুরি ; তার একটি, হেনরি মিলারের গরজে, আমার জন্য ঠিক করা ছিলো। উদ্ভিদের সবুজে ও ঘনতায় বেষ্টিত পাহাড়, তার তলায়— বড়ো হোটেল বা বিলাসী বাংলো নয়, সরল কুঠুরিতে বহুদিন পর রাত্রিকে খুব গভীরভাবে অনুভব করলাম। বাঁকা চাঁদ, কুয়াশায় চ্যাপ্টা, সমুদ্রের উপর ঝুলে আছে ; তাকে দলিত ক'রে অন্ধকারের তোরণ উঠেছে আকাশ পর্যন্ত ; শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে, ঘুমন্ত লোকের পাশ ফেরার মতো, বোবা গাছগুলোর অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়। ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়ামাত্র কালো রাত্রির প্লাবন নামলো আমার উপর। আমার পিছনে অরণ্য আর সামনে মহাসাগর, আমার চেতনার মধ্যে পশ্চিমতম আমেরিকা, মধুর বন্ধুতা, অন্য কত বন্ধুতার স্মৃতি, কত হারিয়ে-যাওয়া, ফিরে-পাওয়া এবং আবার যাকে হারাতে হবে এমনি সব স্বপ্ন : মনে হ'লো এই রাত্রিটি ঘুমের জন্য

---

* আমি ১৯৫৪-র কথা বলছি ; এখনকার অবস্থা জানি না।

তৈরি হয়নি। এই কথাটাকেই বলার জন্য কবিতার লাইন ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে সমুদ্রের সঙ্গে ভালো ক'রে দেখা হ'লো। এখানে আধো-চাঁদের আকার নিয়েছে প্যাসিফিক, যেন দুই হাত বাড়িয়ে মাটিকে আঁকড়ে আছে; আর তট যেখানে ঢালু হ'য়ে-হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে ঠিক সেখানেই কুঠুরির মালিক রেস্তোরাঁ বসিয়েছেন। আমার প্রাতরাশ শেষ হ'তে-হতেই হেনরি মিলার আমাকে নিতে এলেন।

কাঠের কুঠুরিতে এই নিস্তব্ধ রাত্রি আর মিলার-দম্পতির সঙ্গপূর্ণ দুই আনন্দিত দিন দ্রুত কেটে গেলো। দেখলাম রেড-উড বৃক্ষের অরণ্য, সবুজ অন্ধকারে ভরা আরণ্যক দুপুর, ড্রাগ-স্টোরের জানলা দিয়ে শ্লথস্রোত সবুজ বিগ স্যুর নদী— অনেকটা আমাদের পূর্ববঙ্গের খালের মতো, কিন্তু দুই দিকের তরুপল্লব অনেক বেশি নিবিড়— মিলারের উঠোন থেকে আবছা লাল সূর্যকে নেমে যেতে দেখলাম সমুদ্রের মধ্যে। গন্ধকজলে স্নানও করা হ'লো।* কিন্তু সবচেয়ে আমার যা বেশি মনে পড়ে তা গৃহস্বামী ও স্বামিনীর আতিথ্য, তাঁদের আলাপ, আগ্রহ, হেনরির স্বতঃস্ফূর্ত, মনোযোগী ও উচ্ছ্বাসহীন বন্ধুতা। আমাকে একটি তাম্রমুদ্রাও তিনি ব্যয় করতে দিলেন না; কুঠুরির ভাড়া, এমনকি প্রাতরাশের দাম— আমার ব্যাকুল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সবই তিনি মিটিয়ে দিলেন; এর প্রেরণা, আমি জানি, নেহাৎ সৌজন্যবোধ নয়, হৃদয়ের পরামর্শ। নিশ্চয়ই তাঁর হাতে তখন অনেক কাজ ছিলো, কিন্তু এই দু-দিনের সবটুকু সময় তিনি আমার জন্য ক্ষয় করলেন— একেবারে ফিরতি প্লেনে তুলে

---

* এই স্নানের একটা বর্ণনা সংক্ষেপে দেয়া যেতে পারে। সমুদ্রে যেখানে গরম ধোঁয়া উঠছে, তার ধার ঘেঁষে স্নানের ব্যবস্থা— মেয়ে ও পুরুষের জন্য আলাদা। একটা টবে গরম গন্ধকজল, পাশে আর-একটাতেও সাধারণ জল রাখা আছে— পরে পরিষ্কৃত হবার জন্য। হেনরি আমাকে নিয়ে এসে বললেন, 'নেমে পড়ো।' কোনোরকম আব্রু নেই, সারি-সারি টব সাজানো আছে; হেনরি আধ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবৃত হ'য়ে গন্ধক-জলে দেহ ডুবিয়ে শুয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, ভারতীয় অভ্যাসবশত তাঁর অনুকরণ করা আমার পক্ষে সহজ হ'লো না; আমি কোনোরকমে একটুখানি গা ভিজিয়ে পুনশ্চ দ্রুত সবস্ত্র হ'য়ে নিশ্বাস ফেললুম। দেখলুম, এক পিতা এলেন শিশুপুত্রকে নিয়ে; দু-জনেই আদমের বেশে অনায়াসে স্নানে নামলেন। আমার অবশ্য অজানা ছিলো না যে পাশ্চাত্ত্য সমাজে অনাবরণ নিষিদ্ধ হয় শুধু মেয়ে-পুরুষ একত্র থাকলে, কিন্তু অন্য দু-একটি সংস্কারের মতো, আমাদের শারীরিক লজ্জা এখনো দুরপনেয়।

দেয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গদানে বিরাম ছিলো না। অথচ তিনি আমাকে জানেন শুধু চিঠিপত্র এবং ক্ষণিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে ; আমার ভাষা তাঁর অজানা ; আমার রচনা, চেষ্টা, সংকল্প— সবই তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে ; যাকে অর্থহীন বিনয় না-ক'রে আমি বলবো আমার আসল অংশ, তা তাঁর পক্ষে প্রদোষান্ধকারে আবৃত। কিন্তু তাঁর কিছু লেখা আমি পড়েছি, তাঁর পটভূমি ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিনা আলাপেও তাঁকে ধারণা ক'রে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব। এ-দিক থেকে আমাদের সম্বন্ধে সাম্য নেই, তাঁর দিকে পাল্লা অনেক ভারি। ভারি এই অর্থে যে আমাকে এমন সহজে ও সম্পূর্ণভাবে তিনি গ্রহণ করলেন, যেন, আমার কোনো লেখা না-প'ড়েও, আমার অন্তর তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেন তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে কাছে ব'সে, কথা শুনে যেটুকু পাওয়া যায়, তা পেরিয়েও আমার কিছু মূল্য আছে। সেবারে আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে, অন্যদের কাছেও এই ধরনের বন্ধুতা আমি মাঝে-মাঝে পেয়েছিলাম, এবারে জাপানে এসেও তা ভাগ্যে জুটে গেলো। আমার ব্যর্থ জীবনের এই একটি অমূল্য উপার্জন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি।

১৯ জানুয়ারি

প্রাতরাশ শেষ ; আমাদের যাবার সময় হ'লো। ছু-চারটে ছড়ানো জিনিশ গুছিয়ে নিয়ে নিচে নামলুম। আমাদের অপেক্ষায় সামনের দরজার কাছে সিঁড়ির উপর ওবারা ব'সে আছেন— সকালবেলা তাঁকে ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কাপড়ের চটি ছেড়ে গত সন্ধ্যার পরিত্যক্ত জুতো প'রে নিলুম আমরা ; সরাইখানার মালিক ও দাসী তেমনি আনত হ'য়ে অভিবাদন করলে। ওবারা এলেন আমাদের সঙ্গে গাড়ির দরজা পর্যন্ত ; এই সদাশয়, সদানন্দ, বৎসল মানুষটির কাছে অবশেষে বিদায় নিতে হ'লো। গাড়ির ব্যবস্থা তিনিই করেছেন, যাতে টোকিওতে ফেরার আগে হাকোনের ন্যাশনাল পার্ক আমরা দেখতে পাই। এই ভ্রমণ ও রাত্রিযাপনের সমস্ত ব্যয়ও তিনি বহন করলেন।

এঁকে-বেঁকে অত্বরবেগে গাড়ি চলেছে ; আমাদের চোখ চার দিকে চপল। ডাইনে ও বাঁয়ে, সামনে ও পিছনে— সবই দ্রষ্টব্য, সবই সুন্দর। পাহাড় ও

হ্রদ, স্রোতস্বিনী ও বনভূমি— যেন অন্তহীন। যেখানে স্বচ্ছ নীল আশি-হ্রদের মুকুরে শুভ্র ফুজিয়ামা নিজেকে অবলোকন করছে ঠিক সেখানে, তুষারচূড়ার মুখোমুখি, একটি চিত্তহারী হোটেল। পথে-পথে প্রস্রবণ, কোথাও পাহাড়ের গা ফেটে উত্তাপের ধোঁয়া উঠছে, কোথাও হ্রদের মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য স্টীম-লঞ্চ অপেক্ষমাণ; আর কোথাও বা সিডার পাইন মেপলের রহস্য দুই দিকে ছায়া ক'রে আছে। মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে উপত্যকায় বসতি, দূরে কোনো মঠ বা সরাইখানার সিন্দুরবর্ণ ঢালু ছাদ, কখনো বা গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। বাঁকা পথ, বাঁকা জল, জলের উপর বাঁকা পুল, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে হালকা-রেখা আকাশ: নটীর মতো শিল্পিত এক প্রকৃতি। হিমালয়ের মতো ভীষণ বা আল্পসের মতো উত্তুঙ্গ নয় দৃশ্য; বিগ স্যুর-এর মতো বন্যতাও নেই;— সাজানো, গুছোনো, পরিপাটি ও ত্রুটিহীনরূপে রমণীয়।

১৯ জানুয়ারি, রাত্রি

এই সপ্তাহে টোকিওতে কোনো নো নাটক দেখানো হচ্ছে না; ওটা-দম্পতিকে নিয়ে একটা কাবুকি দেখতে এসেছি। উৎসাহ আমারই, কেননা আগে একবার ন্যুয়র্কে কাবুকি-নামাঙ্কিত নৃত্যাভিনয় উপভোগ করেছিলুম।— কিন্তু সেটা যে খাঁটি জিনিশ ছিলো না, আর তার মিশোলের অংশে যে প্রতীচীর অবদান ছিলো অনেকখানি, তা বুঝতে, টোকিওর থিয়েটারে পরদা ওঠার পর কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগলো।

আমাদের হোটেলের প্রায় পাশের বাড়ি এই থিয়েটার, এখানে কাবুকি ভিন্ন আর-কিছু অভিনীত হয় না, এবং শীত ঋতুতে প্রত্যহ অনুষ্ঠান থাকে। এ থেকেই বোঝা যাবে কাবুকি কতদূর জনপ্রিয়। নো যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত, কাবুকি তেমনি লৌকিক ধারার অনুগামী। এতে মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পুরুষেরা— বালক নয়, বয়স্ক পুরুষ; নাটকে থাকে হাস্য, শোক, ত্রাস প্রভৃতি নানা রসের আবেদন, সংগীতের অংশ প্রচুর, এবং সাধারণত সমাপ্তি হয় সুখের। অনেকটা আমাদের যাত্রার মতো ব্যাপার— যদিও রঙ্গমঞ্চের গঠন পুরোপুরি প্রতীচ্য; এতেও আছে এমন গায়কবৃন্দ

যারা নাটকের কুশীলব নয়, শুধু গানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। ন্যুয়র্কের কাবুকিতে এই গায়কবৃন্দ ছিলো না, মেয়েদের ভূমিকায় ছিলেন নটীরা, কাহিনী ছিলো ব্যালে-র মতো সরল, আর নাচের কোনো-কোনো ভঙ্গির মধ্যেও ধ্রুপদী ব্যালের আমেজ ছিলো। সেই স্মৃতি নিয়ে এখানে এসে প্রতিহত হলাম।

বেশ বড়ো প্রেক্ষাগৃহ, একটি আসনও খালি নেই। নাটকের প্রধান নায়িকা প্রথম থেকেই উপস্থিত। এই ভূমিকায় যিনি নেমেছেন তিনি বর্তমানে জাপানের সবচেয়ে বিখ্যাত 'নারী-অভিনেতা'। তাঁর কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি অবিকল মেয়েলি, তাঁর কাঁধ চওড়া, কটি ক্ষীণ নয়, কিন্তু নায়িকাটিও প্রৌঢ়া ব'লে তা মানিয়ে গেছে। তাঁর অভিনয়, ও নাটকের অগ্রগতি, প্রভূত আনন্দ দিচ্ছে সকলকে, শুধু আমরা দুই অদীক্ষিত বাঙালি কাষ্ঠপুত্তলির মতো ব'সে আছি। নাটকের কাহিনীটি যেমন দীর্ঘ তেমনি জটিল, আর তার মধ্যে অর্থগৌরবও বেশি কিছু নেই— অন্তত ইংরেজি চুম্বক প'ড়ে তা-ই মনে হচ্ছে আমাদের; জাপানকে এত ভালোবেসেও এই অভিনয়ের আমরা রসগ্রহণ করতে পারছি না; বর্বর ঘুমের আক্রমণে আমি তো থেকে-থেকেই বিহ্বল হ'য়ে পড়ছি: প্র. ব. আমাকে পীড়ন ক'রে জাগিয়ে দিচ্ছিলেন ব'লে কিছুটা তবু দেখতে পেয়েছিলাম। খুব লজ্জা পেলাম ওটা-দম্পতির কাছে, আপ্রাণ সচেষ্ট হলাম মনঃসংযোগে; কিন্তু দুটো অঙ্ক ধ'রে কসরৎ করার পর হার মানতে হ'লো, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় রইলো না। হোটেলে ফিরে জাপানি বন্ধুদের নিয়ে যখন আহারে বসলাম, ততক্ষণে আমার নিদ্রালুতা অবশ্য সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

যা অসংখ্য জাপানির পক্ষে উপভোগ্য, আমরা কেন তা থেকে কিছুই নিতে পারলুম না? ভাষা জানি না ব'লে? কিন্তু জর্মান ভাষাও আমি জানি না, তবু হ্বাগনার-এর অপেরাতে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরতে হয়নি। আসল কথা, হ্বাগনার-এর জগৎ আমার পরিচিত, তাঁর পাত্র-পাত্রীর জীবনী আমার অজানা নেই, আর য়োরোপীয় গান, তাতে আমার রক্তের টান না-থাকলেও আমার পক্ষে তা একেবারে অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই কাবুকির অভিনয় যে-সব প্রচলের উপর নির্ভর করছে সেগুলি— শুধু জ্ঞানের নয়, আমার ধারণার পর্যন্ত বাইরে। সেই পটভূমির অভাবে, তার ভঙ্গি বা ভাব বা সংগীত

আমার মনে লেশমাত্র সাড়া জাগাতে পারলে না। জাপানি ভাষায় অজ্ঞ হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, যদি এর অভিনয়ের ভাষা আমি জানতুম। সেই গভীরতর সাংকেতিক ভাষা জানা নেই ব'লে, একবার এর্নাকুলমে গিয়ে, আমি কথাকলি নৃত্যের সামনে নিস্তাপ ও অসহায়ভাবে ব'সে ছিলুম। শুধু 'প্রেমে'র অভাবেই 'গানভঙ্গ' হয় না, তার জন্য অশিক্ষাও দায়ী। 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে'— এটা নিশ্চয়ই পরম গুণগ্রহণের শর্ত, কিন্তু শিক্ষা না-থাকলে এই অবস্থাটি অসম্ভব।

২২ জানুয়ারি

জাপানে আমার শেষ কর্তব্য— রেডিওতে বক্তৃতা— গতকাল সম্পন্ন করেছি। যাবার আগে আজকের দিনটা ছুটির। মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ ছিলো এক বাঙালি রাজপুরুষের বাড়িতে; সেখানে মুগের ডাল ও আলুকপির ডালনায় প্র. ব. চমৎকৃত, আর সর্ষে দিয়ে রাঁধা মাছের ঝোলে, আমি। সন্ধেবেলা ওটা-দম্পতি এলেন; রাত্রে, হোটেলের দরজায়, আমাদের এখানকার নিত্যসঙ্গী সাবুরো ওটার কাছে বিদায় নিতে হ'লো। এ-যাত্রায় তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

কেন এমন হয় যে বিদেশীমাত্রেই জাপানে এসে দেশটার প্রায় প্রেমে প'ড়ে যান? অন্যান্য দেশ নিয়ে মতভেদ ঘটে, শোনা যায় নানা জনের মুখে নানা দিক থেকে প্রশংসা বা তার উল্টোটি, আর নির্ভাঁজ প্রশংসা, বিলেত-পাগলা দিশি ছোকরাদের মুখে ইংলণ্ড বিষয়ে ছাড়া, প্রায় কারো মুখেই শোনা যায় না। কিন্তু জগৎ যেন জাপান বিষয়ে একমত; হোক য়োরোপীয়, ভারতীয় বা মার্কিনী, সকলের পক্ষেই জাপানের মোহ দুর্বার। সকলেই, জাপান বিষয়ে কিছু বলতে গেলে, স্বতই একই ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করেন; আমার এই লেখাটাতেও ছড়িয়ে আছে 'মনোরম', 'রমণীয়', 'সুচারু', প্রভৃতি শব্দপর্যায়, যার মর্মাংশ হ'লো— মনোমুগ্ধকর। মনোমুগ্ধকর বলতে ঠিক যা বোঝায়, উদারতম ও গভীরতম অর্থে জাপান হ'লো তা-ই; তার নিসর্গ, তার আচার-ব্যবহার— বাইরে থেকে হঠাৎ এসে যা-কিছু চোখে পড়ে, কোনোটাই এই বর্ণনার বহির্ভূত নয়। আছে এমন দেশ যায় দৃশ্য ভীষণের মিশ্রণে আরো বেশি

সুন্দর, যার সভ্যতা আরো পুরোনো বা সমৃদ্ধ, কিংবা যার উন্নতির স্তর আরো বেশি উঁচু ;— কিন্তু আর-কোনো দেশ নেই, যাকে চোখে দেখা মানেই ভালোবাসা— আর তা কোনো স্মৃতি বা অনুষঙ্গের প্রভাবে নয়, তার নিজেরই জন্য।

নিশ্চয়ই এর একটা কারণ জাপানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব বিপুল ; অধিবাসীরা মঙ্গোলীয়, তাদের চোখ মুখ ভাষা রীতিনীতি সবই আমাদের পক্ষে অচেনা ; এবং এই দেশ, যা এই শতকের প্রারম্ভ থেকেই আধুনিক বিদ্যায় য়োরোপের সমকক্ষ, তা জগৎ-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলো মাত্রই সেদিন। এই রকম চমকপ্রদ সমন্বয় অন্য কোনো দেশে ঘটেনি। যা নিতান্ত বৈদেশিক ব'লেই নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী— যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে 'exotic'— প্রতীচ্যদের, এবং আমাদের পক্ষেও, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জাপান। আর সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছে এর আশ্চর্য সাংসারিক উদ্যম ও কর্মিষ্ঠতা, যা দেশটাকে রাতারাতি বদলি ক'রে দিয়েছে মধ্যযুগ থেকে বিশ শতকে। যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, তারিফ না-ক'রে উপায় নেই। বিশেষত আমরা যারা এমন এক দেশ থেকে আসছি যেখানে 'প্রাচী' নামক এক অবাস্তব বা সুদূরপরাহত ধারণায় জনসাধারণ বুঁদ হ'য়ে আছে, আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ নয় যে জাপান ও ভারতবর্ষ একই এশিয়ার অন্তর্ভূত। এ-দুই দেশে পদে-পদে গরমিল। যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে জাপানের কারয়িত্রী প্রতিভা অবাক ক'রে দেয় আমাদের ;— কী মসৃণ ও সক্ষম এদের প্রতিটি যন্ত্র, কী নিখুঁত এদের সেবা, কী প্রকাণ্ড এদের বাণিজ্যবল, ছোটো-বড়ো সমস্ত কাজে কী নিঃশব্দ ও পূর্ণ এদের অভিনিবেশ! জগৎ-সংসারে কৃতী হ'তে হ'লে যে-সব গুণ আবশ্যক— শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, বিশ্লেষণশক্তি, বাস্তবধর্মিতা, বিমূর্ত ধারণার বদলে মূর্ত তথ্যের প্রতি মনোযোগ, এগুলো যেন জাপানিদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে, কোনোমতেই তার ব্যত্যয় হবার উপায় নেই। 'সময়ের মাপ আমাদের হ'লো মিনিট,' এক মার্কিনী বলেছিলেন আমাকে, 'আর জাপানিদের— সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ।' ঠিকই তা-ই ; ওটার একদিন বেলা দশটায় আমাদের হোটেলে আসার কথা ছিলো ; দশটার একটু আগে তিনি টেলিফোন ক'রে জানালেন তাঁর পাঁচ মিনিট দেরি হবে, আর

নির্ভুলভাবে দশটা বেজে পাঁচ মিনিটেই তিনি এলেন। বক্তৃতা দিতে, বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, যখনই যেখানে গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি সময়ের হিশেব চুলচেরা ; কোনো-একটা তুচ্ছ বিষয়েও কেউ যদি কোনো কথা দিয়েছে সেই কথামতো কাজ করতে ভোলেনি ; যে-সব কাজ আমরা হীন বা কষ্টকর ব'লে ভাবি তার সম্পাদনাও অনবরত অনাহতভাবে অম্লান। এই লক্ষণগুলোকে আমরা সাধারণত প্রতীচ্য ব'লে ভেবে থাকি, কিন্তু এদের চরম প্রকাশ জাপানেই দ্রষ্টব্য। অনন্তবোধের বেদনার দ্বারা এরা যেন কখনোই বিদ্ধ হয়নি, কখনোই যেন স্বীকার করেনি যে মানুষের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে পারে ; সংসারের উপর এদের আস্থা এত গভীর যে জাপানি ভাষায় ভগবানের কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই। একটি শব্দ আছে, 'কামি', তার আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চ' ; সেই উচ্চতা পার্থিব বা আত্মিক হ'তে পারে ; 'আত্মা', 'দেবতা', 'পূর্বপুরুষ', শ্রদ্ধেয় বা শ্রেষ্ঠ যে-কোনো সত্তা বা বস্তু— এই সব বিভিন্ন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই শ্রদ্ধার মধ্যে পূজা বা আত্মনিবেদনের ভাবটি নেই ; অগ্নি, বায়ু, মৃত্যু প্রভৃতি শক্তি কার আদেশে ধাবিত হচ্ছে, এই প্রশ্ন এ-দেশে অবান্তর। এ-দিক থেকে এরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুর ঠিক বিপরীত, আর বিপরীত ব'লেই আকর্ষণে এত শক্তিশালী। একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না, কিন্তু আমার ধারণা হ'লো যে জাপানি মানস একান্তভাবে জাগতিক, যাকে ইংরেজিতে বলে 'secular' ; 'আপনার ধর্ম কী ?' এই কথা অনেককে জিগেস ক'রে স্পষ্ট কোনো জবাব পাইনি ; 'হয়তো বৌদ্ধ— হয়তো শিন্টো— ঠিক জানি না,' অর্থাৎ বিষয়টা চিন্তার বা আলোচনার যোগ্য নয়। ভারতের কথা ছেড়েই দিই, ধর্ম বিষয়ে এ-রকম মনোভাব প্রতীচীতেও বিরল।

কিন্তু এই কি জাপানিদের বিষয়ে সবটুকু কথা ? তা যদি হ'তো, তাহ'লে এদের আমরা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিতুম জগতের সেরা কেজো লোক ব'লে, বণিকবৃত্তির চরম চূড়ায় বসিয়ে দিতুম একেবারে— আর তার পর এদের বিষয়ে আর-কিছু বলার প্রয়োজন হ'তো না। সত্য, এরা অনেক বিষয়ে ইংরেজের মতো, কিন্তু আগন্তুকের মনের উপর লণ্ডন যে-নিস্তাপ ধূসরতা ছড়িয়ে দেয়, টোকিওতে তা অকল্পনীয়, এবং এদের শত্রুরাও কখনো বলেনি যে এরা 'দোকানদার' বা 'লেজার-পূজারি' মাত্র। আশ্চর্য এই যে এদের কেজো দিকটা,

অনিবার্যভাবে লক্ষণীয় হ'লেও, কখনোই যেন খুব বড়ো হ'য়ে দেখা দেয় না ; সবচেয়ে আগে যা চোখে পড়ে এবং সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা মনে থাকে, তা এই যে এরা সুন্দর। আগে একবার লিখেছি : 'পাশ্চাত্ত্য জাতির যে-সব সামরিক অভ্যাস এখন সামাজিক গুণে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সবই জাপানিদের আয়ত্ত, এমনকি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচ্য লাবণ্য এদের সহজাত, এবং এ-দুয়ের মিশ্রণের জন্যই বিদেশীর কাছে জাপান এমন মনোমুগ্ধকর।' জাপানে দশদিন কাটিয়ে এমন-কিছু দেখলাম না, যা এই কথাটার প্রমাণ না দিচ্ছে। একটা ছোটো উদাহরণ দিই : পরিচ্ছন্নতা। এই বিষয়টাতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে ব'লে আমি দাবি করতে পারি, কেননা আমি যখনই যে-টেবিলে লিখি, বা যে-চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম করি, সেখানেই দুর্দমনীয়ভাবে জ'মে ওঠে সিগারেটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি, বই, চিঠিপত্র, ছেঁড়া কাগজ, বাজে লেফাফা— দরকারি ও বেদরকারি জিনিশের এমন একটি বিমিশ্র ও বিবর্ধমান স্তূপ, যাতে সৌন্দর্য বা সুবিধে কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার এই অভ্যাসের জন্য দেশে-বিদেশে বিবিধ মহিলাদের দ্বারা আমি তিরস্কৃত হ'য়ে থাকি, এবং যদিও আমি সব সময়ে জবাব দিই যে এই অবস্থাই আমার পক্ষে আরামদায়ক, তবু কোনো করুণাময়ী কোনো-এক সকালে আমার টেবিলটি গুছিয়ে দিয়ে গেলে, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি কত বড়ো একটা পরিবর্তন ঘ'টে গেলো। মন হালকা লাগে তখন, কাজে আরো উৎসাহ পাই, শ্রম তেমন কাতর করে না। অর্থাৎ, আমার নিজের স্বভাবে তা নেই ব'লেই, পরিচ্ছন্নতা আমার ঈপ্সিত, এবং আর-কোনো দেশে ঐ গুণটিকে আমি এমন ব্যাপক, শ্রীমণ্ডিত ও মানবিকভাবে অনুভব করিনি, যেমন করেছি জাপানে। কিয়োটোর রাস্তা এত পরিষ্কার যে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলতে স্ববস্ত্রদাহক আমি পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয়েছি ; এবং বিরাট টোকিওতেও এমন কোনো রাস্তা আমি দেখিনি যা ন্যুয়র্ক বা কলকাতার কোনো-কোনো অংশের মতো আবর্জনায় বর্ণাঢ্য। ঘর বাড়ি দোকান হোটেল ট্রেন ট্যাক্সি, সবই একেবারে ঝকঝকে তকতকে ;— এদের বিষয়ে বেশি বলা বাহুল্য। কিন্তু হাকোনের সেই সরাইখানাটিকে আর-একবার স্মরণ না-ক'রে পারছি না, কেননা তার পরিচ্ছন্নতা বর্ণনাতীত— প্রায় অনির্বচনীয়। সেখানে গিয়ে যেন বুঝেছিলাম প্রতীচীর সঙ্গে জাপানের মৌলিক

তফাৎটি কোনখানে। আমেরিকাতেও এক-এক জায়গায় দেখেছি পরিচ্ছন্নতাকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— কিন্তু তার ভিতরকার কথা হ'লো নির্বীজতা ও স্বাস্থ্যকরতা, তা এমন নিষ্কলঙ্ক ও নিরঞ্জন যেন হাসপাতালের আদর্শে রচিত, তার অন্তরালে প্রাণের সাড়া সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানি পরিচ্ছন্নতায় এমন একটি সৌন্দর্যবোধ আছে, আর মানুষের হাতের সেবা তার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত ব'লে মনে হয়, যে তাকে আমরা বলতে পারি মর্মস্পর্শী ; অর্থাৎ, তা শুধু আমাদের চোখের ও দেহের পক্ষেই প্রীতিকর নয়, যেন হৃদয়ের কাছেও তার আবেদন আছে।

—কিংবা হয়তো হৃদয় কথাটা ভুল হ'লো , সবটাই সাজানো, বানানো, 'শিল্পিত', এইটেই জাপানি স্টাইল। তা-ই যদি হয়, তাহ'লে কথাটা এইখানে দাঁড়ায় যে জাপানিদের নিজস্ব একটা স্টাইল আছে, যা আমাদের নেই, বা থাকলেও বহির্জগতে এখনো প্রকাশ্য হয়নি। একদিন ওটা আমাদের নিয়ে গেলেন এক জায়গায় এদের বিখ্যাত 'টেম্পুরা' বা মাছ-ভাজা খাওয়াবার জন্য। খাশ জাপানি ধরনের ভোজনালয়, মহার্ঘ নয় তা দেখেই বোঝা যায় ; কিন্তু খাদ্য সুস্বাদু, পরিচর্যা ত্রুটিহীন, আসনের ও তাপের ব্যবস্থা আরামদায়ক, ও পরিচ্ছন্নতা ব্রাহ্মণোচিত। বিদেশীদের বেশ ভিড় দেখলুম, রান্নার জন্য খ্যাতি আছে জায়গাটার। তুলনীয় কোনো রেস্তোরাঁ কি আছে কলকাতায় ? এমন কোনো ভোজনালয়, যেখানে মলিন বাসন, অধ্যবসায়ী মাছি, বা অত্যধিক মশলা-প্রণোদিত অগ্নিমান্দ্যের আশঙ্কা না-ক'রে আমরা বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে খাওয়াতে পারি ধনেপাতা-সুবাসিত মুসুরির ডাল, কালোজিরে-চর্চিত স্নিগ্ধ লাউ, দই দিয়ে রাঁধা রুই মাছ, আর মিষ্টি-আদা-টোম্যাটোয় সম্পন্ন তীব্র চাটনি ? না কি এমন কোনো ভদ্রগোছের হোটেল বা সরাইখানাই আছে, যার ধরনটাকে যে-কোনো অর্থে বাঙালি, বা ভারতীয় বা এমনকি প্রাচ্য বলা যায় ? থাকলেও, আমি তার ঠিকানা জানি না, বিদেশীরাও তার সন্ধান না-পেয়ে অনবরত এমন সব হোটেলে ওঠেন, যা অসম্পূর্ণ ও বিমলিনভাবে 'বিলেতি'। সেখানকার 'পাশ্চাত্ত্য' ভোজ বিস্বাদ ও বিকল্পহীন, আর 'ভারতীয়' নামাঙ্কিত যে-খাদ্য অনেক বিদেশী সাগ্রহে আহার করেন তা কোন অর্থে ভারতীয় তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। আর নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদ ? তা এমন বস্তাপচা বিলেতি মাল, আর তারই মধ্যে জৌলুশ আনার চেষ্টা এমন করুণ, যে

সে-বিষয়ে মন্তব্য করার প্রয়োজন দেখি না। পোল্যাণ্ড বা ইস্রায়েল বা মেক্সিকো থেকে হঠাৎ কোনো অতিথি এসে অবাক হয়— তাই তো, এদের কি নিজস্ব ব'লে কিছু নেই ? ভারত-পথিক বিদেশীরা একমাত্র যা নতুন দেখতে পায় তা হ'লো কোনো-কোনো রাজ্যে সুরানিরোধক অনুশাসন। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিতান্তই না-ধর্মী : যা সমগ্র সভ্যজগতে প্রচলিত এমন একটা ক্রিয়াকে আমরা অস্বীকার করছি মাত্র, কিন্তু এখনো এমন কিছু দেখাতে পারছি না, যা আমাদের আবহমান জীবনধারার বিশিষ্ট সৃষ্টি। আমি বলছি না সে-রকম কিছু নেই, নিশ্চয়ই অনেক আছে ;— কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই আমাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ ; সেগুলোকে— চীনে বা জাপানিদের মতো নৈপুণ্যে— বহির্বিশ্বের উপযোগী ক'রে তুলতে পারছি না আমরা, আর সে-জন্যে কোনো মহলে আক্ষেপও নেই। যদি এর পরে আমাদের দেশে গো-মাংসভোজন নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়, সেটাও একটা নূতনত্ব হবে বটে, কিন্তু সেটাতেও হাঁয়ের দিকে কিছু থাকবে না। এখনো কি সময় আসেনি, যখন আমরা— কলকারখানা নৌবহর বিমান-বাহিনীর ব্যাপারে শুধু নয়— দৈনন্দিন জীবনযাপনেও বর্জনের চাইতে অর্জনের দিকে উন্মুখ হবো ? এখন পর্যন্ত, অন্তত বাংলাদেশে, আমাদের জীবন বড়ো বেশি পারিবারিক, জীবিকার ক্ষেত্রটুক বাদ দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণই তা-ই ; আমাদের জীবনের যে-অংশটিতে সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে তার পরিচয়, কোনো পরিবারের মধ্যে মিশতে না-পারলে, কোনো বিদেশী লোক কখনোই পাবে না। কিন্তু সত্যি কি আমরা শুধুই গৃহস্থ, জগতের আমরা কেউ নই ?

জাপানি মেয়েদের বিষয়ে আগে উল্লেখ করেছি, কিন্তু যথেষ্ট বলা হয়নি। এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো যে রূপের দীপ্তিতে যদিও উত্তরভারতের কন্যারা শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতিযোগী হ'তে পারেন, তবু, সংস্কৃত কবিরা যে-ভাবে তাঁদের মানসীদের চিত্রিত ক'রে গেছেন, নম্য, পেলব, সুকুমার ও ক্ষীণকায়— তার আংশিক প্রতিরূপ যদি কোথাও দেখা যায় তো পূর্ব-ভারতে— হয়তো বাংলায়, বা উড়িষ্যায়, বা তার চেয়েও বেশি, আসামে। কিন্তু এখন দেখছি, জাপানি মেয়েরা— 'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' না হোক— কোমলতায় অতুলনীয়া ; যাকে বলেছি প্রাচ্য লাবণ্য তা এদের মধ্যে অবিকলভাবে মূর্ত। লাবণ্য, লালিত্য, কমনীয়তা— যে-সব লক্ষণ আমাদের কাছে বিশেষভাবে ললনাশোভন, এ-দেশের প্রতিটি মেয়েকে স্বভাবতই তার অধিকারিণী ব'লে মনে

হয়—বয়স, রূপ অথবা সামাজিক মর্যাদা যেমনই হোক না। পূর্বোল্লিখিতা মাস্থ তরুণী ও সুরূপা হ'লেও ব্যতিক্রম নন : গলার আওয়াজ বাতাসের মতো, মুখে ও সমস্ত দেহে একটি সংবৃত ও শোভন বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে— জাপানি মেয়েদের সামান্য লক্ষণ হ'লো এই। অথচ এদের প্রায় প্রত্যেকেরই ছাঁটা চুল, সাজ পাশ্চাত্ত্য, বহির্জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এমন কেউ নেই। দুই বিপরীতকে যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে দিয়েছে এরা : দেখলে মনে হয় পুষ্পাঘাতে মূর্ছাপ্রবণ, কিন্তু ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে এদের দক্ষতা ও দার্ঢ্যের পরিচয় অনবরত পাওয়া যায়। চলাফেরা দ্রুত, ব্যবহারে হিন্দু রমণীর 'লজ্জা' অথবা আড়ষ্টতা নেই, কিন্তু কখনো এমন কোনো ভঙ্গি করে না যা মুহূর্তের জন্যও মনে হ'তে পারে খর, বা অসুন্দর, বা পুরুষালি। বরং, যে-ভঙ্গিটি এদের পক্ষে সহজাত ও নিত্যনৈমিত্তিক, তা হ'লো আত্মোৎসর্গের ; যখন যে-কাজটুকু করছে তার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছে যেন ; আর এটা যে কোনো আভিজাতিক শিক্ষার ফল তাও নয়, কেননা হোটেলের পরিচারিকা বা দোকানের কর্মিণীরাও, তাদের নিরন্তর ব্যস্ততার মধ্যে, ব্যবহারে নিরন্তর স্নিগ্ধ ও অবনম্র। চিত্রলতায় জাপানি মেয়েদের জুড়ি নেই।

জাপানি জীবনের যে-দিকটি আমার মনে গভীরতম রেখাপাত করেছে, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তা হ'লো— এ-দেশে ইংরেজি ভাষার অবস্থা। আগেই বলেছি, জাপানিরা ইংরেজি বলাতে পটু নয় ; সেই অপটুতা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয়দের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও আলোচনাযোগ্য। বিদগ্ধ, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতদের মধ্যেও এমন মানুষ অত্যন্ত বিরল, যিনি স্বচ্ছন্দে ও নির্ভুলভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে ইংরেজিতে আলাপ চালাতে পারেন। পারেন না ; — তার চেয়েও জরুরি কথা হ'লো, চেষ্টাও করেন না, অত্যধিক চেষ্টাপ্রয়োগের উপযোগী ব'লেই ভাবেন না বিষয়টাকে। সাধারণ লোকেরা অনেকেই এক ধরনের কেজো ইংরেজি ব্যবহার করে ; অর্থাৎ যার যা কর্ম, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভাষাটুকু এরা শিখে নেয় ; সেই গণ্ডির বাইরে পরভাষার অস্তিত্ব নেই এদের কাছে। অনেক মেয়েকে দেখেছি, হাতব্যাগে প্রসাধনদ্রব্যের সঙ্গে একটি ইংরেজি অভিধান সঙ্গে রাখে সব সময় ; কোনো কথা বুঝতে না-পারলে তক্ষুনি অভিধান খুলে জেনে নেবার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, পড়ান ইংরেজি বা ফরাশি সাহিত্য, এমন অধ্যাপকও আমার কোনো-কোনো প্রশ্নের

উত্তর দিয়েছেন শুধু মৃদু হেসে বা শিরসঞ্চালন ক'রে ; আমার কথাটা তিনি যে বুঝতে পেরেছেন এমন কোনো লক্ষণও দেখতে পাইনি।

এই শেষের কথাটায় আমাদের দেশে অনেক ভুরু কপালে উঠবে, মনে হয়। ইংরেজি পড়ান, কিন্তু ইংরেজি বলেন না— এ কী-রকম হ'লো? খুব সোজা উত্তর: জাপানে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন অনন্যরূপে জাপানি। স্কুলে ইংরেজি একটি আবশ্যিক বিষয়— য়োরোপেও অনেক দেশে আজকাল তা-ই ; কিন্তু স্কুলে কয়েক বছর অভ্যাসের ফলে সত্যিকার শেখা কতটুকু হয় তা আমরা হাল-আমলের সাধারণ ম্যাট্রিক-পাশ বাঙালি ছেলের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবো। আমাদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে ইংরেজি কম জানলে জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধে হয় আমাদের ; এদের তাতে কিছুই এসে যায় না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা— সব এ-দেশে পড়ানো হয় মাতৃভাষায় ; পাঠ্যপুস্তক ও প্রশ্নোত্তর মাতৃভাষায় ; গবেষণা, গ্রন্থরচনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা— সব মাতৃভাষায়। মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হয় বাণিজ্য, সরকারি কার্য, শাসন, বিচার, বিধানরচনা— সব-কিছু। এক কথায়, যা স্বাভাবিক, আর সবচেয়ে বেশি ফলদ, আর সমগ্র আধুনিক জগৎ যা মেনে নিয়েছে, সেই ব্যবস্থাই জাপানে বদ্ধমূল। তাই ব'লে বিদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার ভাবটি একেবারেই নেই ; পণ্ডিতেরা তাঁদের বৈশেষিক নিবন্ধ মাঝে-মাঝে ফরাশি বা ইংরেজি বা জর্মান ভাষায় প্রকাশ ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন চেষ্টাও এঁদের থাকে যাতে বিদেশীরা জাপানি শিখতে উৎসাহ বোধ করে। অনেক গবেষণা-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি ছাপা হয় জাপানিতে, কিন্তু তার ইংরেজি বা ফরাশি চুম্বক অন্যদের কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। নিজের বিষয়ে, জ্ঞানের কোনো বিশেষ উপবিভাগ নিয়ে বিদেশী ভাষায় কিছু লিখতে হ'লে এঁরা পরাঙ্মুখ হন না, কিন্তু সেই ভাষা কানে শোনার, বা মুখে বলার উপলক্ষ জাপানি বিদ্বজ্জনদের জীবনে অল্পই ঘ'টে থাকে। অনেকেই য়োরোপে বা আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের সমগ্র জীবনের পরিমাপে সেই কিছুদিনের প্রভাব আর কতটুকু! বৈদেশিক সাহিত্য বা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশত এঁরা প্রয়োজনীয় ভাষাটিকে গভীরভাবে পড়তে শেখেন, এবং ছাত্রদেরও তা-ই শেখান ; কিন্তু সেই ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলা যে তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত, বা তাঁদের অধিকারভুক্ত, এমন চিন্তা ছাত্র বা

অধ্যাপকের মনে কালে-ভদ্রে উদিত হয়। সাম্প্রতিক মার্কিনী প্রভাবের ফলে ইংরেজির প্রতি ঔৎসুক্য যদিও বর্ধিষ্ণু (ওটার, দেখলুম, বিশেষ চেষ্টা যাতে তাঁর যুবক পুত্র ইংরেজিতে পাকা হ'য়ে ওঠে), তবু এমন কথা সারা জাপানে অভাবনীয় যে শিক্ষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি জ্ঞানের কোনো সম্বন্ধ আছে।

পক্ষান্তরে, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচলন বিপুল। বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না যে ইংরেজি যেখানে মাতৃভাষা নয়, এমন সব দেশের মধ্যে ঐ ভাষায় সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখা যায় সাধারণভাবে ভারতবর্ষে। এ-কথাও সত্য যে আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ইংরেজি পড়া, লেখা ও বলার ক্ষমতা ততদূর পর্যন্তই আয়ত্ত করেছেন যতদূর কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্ভব। (বিদেশীর পক্ষে একটা সীমা থাকবেই : এই পর্যন্ত, কিন্তু তার বেশি আর না।) এই অস্বভাবী অবস্থার ফলে আমরা স্বদেশে ও বিপুল বিশ্বে অনেকগুলো সুবিধে ভোগ করছি, সে-কথাও অনস্বীকার্য। শুধু এই সুবিধেগুলোর জন্য নয়;—বম্বাইতে বা বার্লিনে কাউকে-না-কাউকে জিগেস ক'রে হোটেলের পথ জানতে পারি ব'লে নয়; লণ্ডনে বা বস্টনে বা মন্ট্রিয়ালে মাষ্টারি, ডাক্তারি অথবা কেরানিগিরি করতে পারি, শুধু সে-জন্যে নয়,* তত্ত্ব অথবা তথ্যঘটিত কোনো আলোচনা জরুরি হ'য়ে উঠলে, তা কোনোরকমে ভিন্নভাষী ভারতীয়ের সামনে প্রকাশ করতে পারি, সে-জন্যেও নয়;— ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা জগতের উপর ঐ একটিমাত্র জানলা আমাদের খোলা আছে। যে-শুভদিনে আমাদের মধ্যযুগ-মানসতা সর্বতোভাবে লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তার আগেই যদি ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষ থেকে স'রে যায়, তাহ'লে আমরা পুনর্বার যে-অন্ধকারে তলিয়ে যাবো তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। ইংরেজি ভাষার জন্য নয়, তার মধ্য দিয়ে বিশ্বের যে-বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে, আবহমান

* কথাটা লিখেই মনে হ'লো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে য়োরোপ থেকে সম্প্রতি-আসা এমন অনেক প্রবীণ অধ্যাপক আছেন, যাঁরা আসবার সময় প্রায় কিছুই ইংরেজি জানতেন না, আর বসবাসের ফলেও যেটুকু শিখেছেন তাকে যথোচিত বললে বেশি বলা হয়। কিন্তু তাঁরা নিজ-নিজ বিষয়ে অসামান্য পণ্ডিত ব'লে, তাঁদের ক্ষীণ শব্দকোষ ও অদ্ভুত উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভের অন্তরায় হয়নি। অবশ্য তাঁরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী ব'লে আমার ধারণা— আর বিজ্ঞানে ভাষার ব্যবধান দুরপনেয় নয়, কিন্তু সাহিত্যেরও এমন অধ্যাপক দেখেছি, যাঁরা জর্মান বা ইটালিয়ান সাহিত্যে পারঙ্গম, কিন্তু যাঁদের ইংরেজি এখনো বাধো-বাধো।

মানবসভ্যতার যে-বীজময় সংস্পর্শ আমরা পাচ্ছি, তারই জন্য তা মূল্যবান। তারই জন্য আমরা মানতে বাধ্য যে আমাদের জীবনের মধ্যে ইংরেজির অস্তিত্ব মঙ্গলজনক, আর যাতে অকস্মাৎ কোনো অন্ধতার ফলে তা দূর হ'য়ে না যায় তার জন্যও আমাদের প্রযত্ন বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু— এই প্রশ্নটাই আসল— আজকের দিনে ইংরেজি যে-ভা বে আমাদের অধিকার ক'রে আছে, সেটা কি ভালো ? ভালো কেমন ক'রে বলি, যখন দেখছি পৃথিবীর মধ্যে শুধু হতভাগ্য আমরাই এক পরভাষার পুতুল-পুজো করছি এখনো, তার দ্বারা লভ্য আত্মার সন্ধান না-ক'রে শুধু খোলশ নিয়ে মহোৎসাহে মেতে আছি ? সাড়ম্বর, মধ্য-ভিক্টোরীয়, 'ক্লিশে'-পুষ্পিত, বহুমাত্রিক লাতিন শব্দে মরচে-পড়া শিকলের মতো ঝনৎকৃত, ব্যাকরণে এমন অভ্রভেদীভাবে নির্ভুল যে মনে হয় কোনো মুখস্থ-করা মৃত ভাষা আওড়ানো হচ্ছে— এমন ইংরেজি তো ভারতবর্ষীয় অধ্যাপকের মুখে ছাড়া আজকের দিনে আর কোথাও শোনা যাবে না। আমরা যারা নিজেদের ভাবি ইংরেজিতে ওস্তাদ, বা অন্যদের তা ভাবতে দিই আমাদের বিষয়ে— সেই আমাদের ইংরেজিতে ভুল হয়তো কমই থাকে, কিন্তু তেমনি থাকে না গতি অথবা জীবনীশক্তি, ভুল এড়াবার কঠিন চেষ্টাতেই অবসন্ন হ'য়ে পড়ি আমরা, আক্ষরিকতার কচুরি-পানায় আমাদের বক্তব্য দম আটকে ম'রে যায়। আর আমাদের মধ্যে যাঁরা কয়েক মাস 'ইউ.কে.'-তে* কাটিয়ে এসেছেন, বা হয়তো পাঠ নিয়েছেন জ্যোতিষ্মান অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজে, তাঁরা ইংরেজি ভাষার কুটিল অ্যাকসেন্টগুলিকে কণ্ঠে খেলাবার জন্য এমন কঠিন সাধনা করেন যে কখনো কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্যুতি হয়েছে টের পেলে, তাঁরা হয়তো— চেখভের গল্পের সেই কেরানির মতো, যে বড়োবাবুর টাকের উপর হেঁচে ফেলে তারপর আর মনের শান্তি ফিরে পায়নি— কে জানে, হয়তো বা সেই করুণ কেরানির মতোই তাঁরা শয্যা নিয়ে শয্যা ছেড়ে আর উঠবেন না।

আর-একটি কথা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য : আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার সত্যিকার কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি ? যেহেতু ভারতের একটি বড়ো অংশে মধ্যযুগের তিমির এখনো নিবিড়, সেইজন্য ইংরেজি আমাদের পক্ষে উপকারী ও

---

* হায় ব্লেক, ব্রাউনিং, চেস্টার্টনের ইংলণ্ড— তুমি অবশেষে 'ইউ. কে.'তে অধঃপতিত হ'লে !

প্রয়োজনীয়, এমনকি তাকে অপরিহার্য ব'লেও আপাতত মানা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত— তা মনে রাখা চাই। অকস্মাৎ কোনো বিরাট দুর্ঘটনা না-ঘটলে এমন একদিন আসবেই, যখন আধুনিক মানসতা সার্বিকভাবে ব্যাপ্ত হবে আমাদের মধ্যে ; সেদিন ভারতবর্ষীয় ইংরেজি নিজে-নিজেই শীর্ণ হ'য়ে যাবে, তাকে সগর্বে বহন ক'রে বেড়াবার মতো অধ্যাপকীয় স্কন্ধও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই পরিণতির জন্য আমরা যত বেশি প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে পারি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। ইংরেজি শেখার বিরুদ্ধে আমি বলছি না ; কিন্তু সেই শিক্ষা ভৃত্যের ধরনে না-হ'য়ে সমকক্ষ বিদেশীর ধরনে হোক, এটুকু আমার বক্তব্য। মানুষের চিন্তা, চেষ্টা ও সৃষ্টির বাহন শুধু তার মাতৃভাষাই সার্থকভাবে হ'তে পারে, এই কথাটা অঙ্গীকৃত হ'লে পরভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ কী-রকম বদলে যায়, জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখলে তা বুঝতে দেরি হয় না।

তুলনা করলে মনে হয়, আমরা এত যত্ন নিয়ে ইংরেজি শিখেও— বা সেইজন্যেই— জাপানিদের কাছে মৌলিকভাবে হেরে আছি। পৃথিবীর দিকে তার দরজা যেদিন খুলে গেছে প্রায় সেদিন থেকেই জাপান আধুনিক— সেই আধুনিকতা তত্ত্বগত নয়, তথ্যনির্ভর— অতএব ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন এদের কখনোই হয়নি, তার সঙ্গে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এদের মৌখিক ইংরেজির কোনো দাবি-দাওয়া নেই ; তার ব্যাকরণ-হীনতা ও অস্পষ্ট উচ্চারণ সরলভাবে বৈদেশিকতা ঘোষণা করছে, আর এদের খবর-কাগজের মার্কিনী-ঘেঁষা ইংরেজি অন্ততপক্ষে সচল ও ঝকঝকে— পাঠ্য-বইয়ের এঁটোকাঁটায় ছিটোনো নয়। বিদেশীরা ভারতে এসে অর্জন করেন ধনমান, কিছুটা সামাজিক মেলামেশাও ক'রে থাকেন, বছরের পর বছর বা সারা জীবন কাটিয়ে দেন হয়তো— অথচ তার জন্য (দু-কুড়ি-খানিক ভৃত্যভাষিত হিন্দি শব্দ ছাড়া) আমাদের কোনো ভাষার একটি অক্ষরও তাঁদের শিখতে হয় না। আর জাপানে জাপানি না-জানলে কিছুই করা যাবে না ;— না ব্যবসা, না অধ্যয়ন বা শিক্ষকতা, না বিবাহ বা বসবাস। এটাই আসল কারণ, যার জন্য নানা ভাষায় জাপানি সাহিত্যের এত বেশি অনুবাদ হয়েছে ও হচ্ছে, আনকোরা আধুনিক সাহিত্যও বাদ পড়ছে না ; এদিকে বিদেশীর ভারতবিদ্যা বা 'ইণ্ডলজি' এখনো প্রত্নতত্ত্বের জাদুঘরেই আবদ্ধ। দুটি তরুণ মার্কিনের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো, তারা অনর্গল জাপানি বলছে, দেশটাকে

খুব ভালো লাগছে ব'লে এখানেই দীর্ঘকাল তাদের থাকার ইচ্ছে। আমেরিকায় জাপানি-জানা লোকের সংখ্যা আজকের দিনে নেহাৎ নগণ্য নয় ; বড়ো-বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি বিভাগগুলি জীবন্ত ;— এর একটা কারণ নিশ্চয়ই যুদ্ধ, অ্যাটম-বোমার 'বিবেকমূল্য'ও হ'তে পারে, কিন্তু এর প্রধান কারণ এই যে জাপানের সঙ্গে যে-কোনো প্রকার স্থায়ী ও ফলপ্রসূ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হ'লে প্রথমেই তার ভাষায় অভিজ্ঞতা চাই। এরা জাপানি শিখতে বাধ্য করেছে বিদেশীদের, আমরা ইংরেজি শিখে নিজের ভাষাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছি না ;— আর সেইজন্য আমাদের মনের কথা, হৃদয়ের কথা, এখনো বিশ্বজগতে পৌঁছলো না। কোনদিকে পাল্লা ভারি তা না-বললেও চলে।

কিন্তু হয়তো ইংরেজিকে 'অবহেলা' করার ফলে জাপানের অন্য দিকে ক্ষতি হয়েছে? হয়তো জগতের জ্ঞানে ও বিদ্যায় আমরাই বেশি ওয়াকিবহাল?— দুঃখিত, ঠিক উল্টো কথাটা সত্যি। শুধু বিজ্ঞানে নয়, সাহিত্যেও এরা বিশ্বনাগরিক, এদের তুলনায় আমরাই বরং প্রাদেশিক হ'য়ে আছি— যে-আমরা ইংরেজ ইস্কুলমাষ্টারের চোখ দিয়ে এখনো দেখি জগৎটাকে, যাদের কাছে 'ইংরেজি' ও 'প্রতীচ্য' প্রায় সমার্থক। যে-ইংরেজি ভাষা জগতের উপর আমাদের জানলা, সেটাই— এমনি ভাগ্যের বিদ্রূপ— আমাদের জগতের উপর পরদা টেনে দিয়েছে। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয় তাদের মধ্যে আছে— ইংরেজি ছাড়া— ফরাশি, জর্মান, ইটালিয়ান, গ্রীক ও লাটিন। এতগুলো প্রতীচ্য সাহিত্য পড়ানো হয় এমন কোনো ভারতীয় বিদ্যালয়ের কথা আমার জানা নেই, কিন্তু জাপানে আরো বেশি উদার আয়োজন দুষ্প্রাপ্য নয়। এদের তুলনামূলক-সাহিত্যসংস্থার সভ্যসংখ্যা বিপুল, এবং এই সংস্থার একটি প্রধান কাজ হ'লো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগসাধন। দেখে, শুনে, ও পত্রিকাদি প'ড়ে অনুমান করছি যে প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে অন্য কোনো প্রাচ্য ভাষা জাপানির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আমাকে এক সভায় নিয়ে যাবার জন্য একদিন একটি মেয়ে এলো, সে সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে, গাড়িতে যেতে-যেতে তাকে জিগেস করলুম সে য়োরোপীয় সাহিত্য কিছু পড়েছে কিনা। সে তার যৎসামান্য ইংরেজিতে আমাকে জানালে যে সে ডস্টয়েভস্কির প্রগাঢ় ভক্ত, টলস্টয়, ফ্লোবেয়ার, স্তাঁদাল তার অজানা নেই। আর এ-সব বই সে পড়েছে

তার মাতৃভাষাতেই, অন্য বহু শ্রেষ্ঠ লেখক অনুবাদে তার অধিগম্য, 'ইউলিসিস'-এর মতো দুর্ধর্ষ পুস্তকের একাধিক অনুবাদ প্রচলিত আছে। এই অনুবাদগুলো ভালো না মন্দ তা আমার পক্ষে অভিজ্ঞতার অতীত হ'লেও ধারণার বহির্ভূত নয়, কেননা জাপানে সাহিত্যচর্চার ব্যাপ্তি ও নিবিড়তা দেখে বিশ্বাস হয়* যে দেড়শো পৃষ্ঠায় একটি তথাকথিত 'আনা কারেনিনা' প্রকাশ করা এদের পক্ষে অসম্ভব, এবং পূর্বোক্ত মেয়েটি যে ডস্টয়েভস্কি প'ড়ে আনন্দ পেয়েছে, সেটাও অনুবাদের গুণপনারই প্রমাণ। আমরা বাঙালিরা সাহিত্যপ্রেমিক ব'লে শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের ভাষায় অনুবাদ কেন সাধারণত যত্নহীন ও পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর? তার কারণ আমাদের এই অদ্ভুত ও অর্ধোচ্চারিত ধারণা যে অনুবাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই, কেননা ইংরেজিতে প্রায় সমগ্র য়োরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ পাওয়া যায়, আর দেশের মধ্যে শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন। শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন? না কি, যাঁরা ইংরেজি পড়েন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত ব'লে গণ্য? না কি—আরো মারাত্মক কথা—যাঁরা ইংরেজি জানেন না তাঁরাই অশিক্ষিত ও ডস্টয়েভস্কি পড়ার অযোগ্য? এই সবগুলো কথাই আমাদের মনের তলায় কাজ করছে। আমরা যেন ভাবতেই পারি না—যদিও এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা মাত্র—যে ভারতবর্ষে এমন লোক অসংখ্য যারা মাতৃভাষায় ডস্টয়েভস্কির জন্য ক্ষুধিত হ'য়ে আছে, আর এমন লোকেরও অভাব নেই যারা উত্তম ইংরেজি জেনেও বুদ্ধির ব্যায়ামের জন্য শুধু অগাথা ক্রিস্টি পাঠ ক'রে থাকেন। তাছাড়া, মাতৃভাষায় যদি কোনো যত্নসাধিত অনুবাদ দৈবাৎ বেরিয়ে যায়, আমরা কেমন বাঁকা চোখে তাকাই তার দিকে; কোনো-এক অজ্ঞেয় কারণে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা যেন সম্ভব হয় না যে সুধীন্দ্র দত্তের অনুবাদে পোল ভালেরি ধরা পড়েছেন, বরং তার তুলনায় অক্ষম কোনো ইংরেজি অনুবাদ হাতে এলে আমরা ব'র্তে যাই। কিন্তু জাপানিদের মনের কথাটা এই রকম: ইংরেজিটা অনুবাদ, জাপানিটাও তা-ই, অতএব যদি মূলে পৌঁছতে না পারি নিশ্চয়ই আমার নিজের ভাষাতেই পড়া ভালো। আর-এক কথা: যদি ইংরেজিতে

* পরে এক সুইস-জর্মান-মার্কিন অধ্যাপকের মুখে শুনলাম যে জর্মান সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় জাপানিরা আজকাল অন্যতম অগ্রণী।

অনুবাদ সম্ভব হ'য়ে থাকে, নিশ্চয়ই জাপানিতেও হ'তে পারে। জাপানিরা অন্য যে-কোনো জাতির সমকক্ষ ব'লে ভাবে নিজেদের, বরাবর তা-ই ভেবেছে, আর আমাদের এখনো কল্পনা করার সাহস হয় না যে আমরা শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ। তলিয়ে দেখলে, একেবারে ভিতরকার কথাটা হ'লো এই।

এমন একদিন ছিলো যখন গঙ্গাতীরবাসী তীক্ষ্ণচক্ষু সংস্কৃত-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সহনশীল সমালোচকের দৃষ্টিতে নবাগত শ্বেতাঙ্গদের দেখেছিলেন। সেই সহজ ও অনাক্রমণীয় আত্মমর্যাদাবোধ, যা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে মূর্ত হয়েছিলো, কোথায় তার স্মৃতিচিহ্ন আজকের দিনে? এখন, স্বাধীনতার পরে, বক্তৃতায় ও বুলিতে ফেনিল হ'য়ে উঠছে দেশাত্মবোধ, কিন্তু বাস্তবে আমাদের আত্ম-সম্মানবোধ কত দুর্বল, কী-রকম প্রায় অস্তিত্বহীন আমাদের আত্মবিশ্বাস, আর সেইজন্য— আমরা যাকে বলি 'আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি', তার নাবালকদশা কী-রকম দুরতিক্রম্য— এই সবই আমরা জানতে পারি বক্তৃতা ভুলে তথ্যের দিকে মনোযোগ দিলে। মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেছিলেন দাস-মনোভাব তা যে আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি তার প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের ইংরেজির প্রতি অসহায় ও কাতরতাময় মুগ্ধতা। ইংরেজির সামাজিক মর্যাদা বা স্নব-মূল্য, ক'মে যাওয়া দূরে থাক, সম্প্রতি বরং আরো বেড়েছে,* এবং ভাষা থেকে এই মোহ সঞ্চারিত হয়েছে নতুন ক'রে তাদের প্রতি, যারা শ্বেতাঙ্গ, আর অ ত এ ব আমাদের চেয়ে উন্নত। ঐ 'অতএব'-এর যুক্তি কী, তা জিজ্ঞাস্য বা আলোচ্য নয়, কেননা সরকারি ও বেসরকারি, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়িক, উচ্চ ও নীচ— সব মহলে এই কথাটাকে নিঃশব্দে মেনে নেয়া হয়েছে যে শ্বেতাঙ্গরা সমগ্র ও স্বতন্ত্রভাবে আমাদের নিজেদের চাইতে অধিক শ্রদ্ধাভাজন। (এবং এই রকম ভাবি ব'লে আমরা সত্যই নিকৃষ্ট হ'য়ে আছি; আমাদের প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণ দৃষ্টি, সর্ব ব্যাপারে মফস্বলি মনোভাব— এ-সবেরই কারণ হ'লো এক প্রেত-প্রতিম ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের সম্মোহন— আমাদের এই সহজ কথাটা উপলব্ধি করার অক্ষমতা যে সত্যিকার পূর্ণরক্তবান ইংরেজি— বহুদূরবর্তী দেশ-

---

* এর একটা প্রমাণ আমাদের দেশে নবোদ্গত 'ইংলিশ-মিডিয়ম' বিদ্যালয়গুলি— যেখানে, শিক্ষার সারাংশ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না-ক'রে, বহু ব্যয়ে সন্ততিদের পড়াতে পেরে অনেক পিতামাতা কৃতার্থ বোধ করছেন।

সমূহের যা মাতৃভাষা— তা কখনোই, কোনো অর্থেই 'আমাদের' হবে না, হ'তে পারে না— আর তার প্রেতচ্ছায়াকে আঁকড়ে থাকলে আমরা সভ্যতার প্রান্তিক বাসিন্দামাত্র হ'য়ে থাকবো।) কোনো বিদেশী গুণী ক্ষণকালের জন্য আগত হ'লে তাঁকে বিশেষ আতিথ্য ও অভিনিবেশ নিশ্চয়ই দেবো আমরা— সেটাই স্বাভাবিক ও সেটাই সভ্য আচরণ ; কিন্তু যে-কোনো দিকে ঈষৎমাত্র নামজাদা কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কলকাতায় এলে আমরা যে-রকম বিহ্বল হ'য়ে পড়ি তাতে তাঁরাই হয়তো মনে-মনে লজ্জাবোধ করেন। আমাদের ভাবটা হয় ভক্তিভরে করজোড়ে কাছে যাওয়ার মতো, যেন তাঁকে মাষ্টারমশাইয়ের চেয়ারে বসিয়ে আমরা সন্ত-কলেজে-ঢোকা ছাত্রের মতো বাছা-বাছা প্রশ্ন করছি— আর আমাদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ বা দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক, অন্য কারো সাহিত্যিক হিশেবে খ্যাতি আছে। পশ্চিম বাংলার যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় জীবনানন্দ দাশ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে কখনো কবিতা শোনাতে আহ্বান করেননি, বা ক'রে থাকলেও তাঁদের উপস্থিত করেছেন শূন্যপ্রায় কাষ্ঠাসনশ্রেণীর সামনে, সে-সব বিদ্যালয়েই কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ কবি উদিত হ'লে ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকেরা পুঞ্জিত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় কাব্যসুধা পান করেছেন— সেই সব ছাত্রেরাও, যারা দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথ নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে পারে না, এবং সেই সব অধ্যাপকও, যাঁরা সমকালীন কবিতার বিষয়ে 'গর্ভিণীর অরুচি' নিয়ে সাধারণত স্বাস্থ্যকরভাবে কালাতিপাত ক'রে থাকেন।* এ-রকম অবস্থায় কী ক'রে বলি যে মনের দিক থেকে আমাদের স্বাধীনতালাভ সার্থক হয়েছে?

ভারতে উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হ'তে পারে কি পারে না, এ নিয়ে অফুরন্ত বিতর্ক চলছে দেখে আমি অফুরন্তভাবে বিস্মিত হ'য়ে আছি। মনে হ'তে পারতো, এ-বিষয়ে শেষ কথা রবীন্দ্রনাথই ব'লে গিয়েছেন, কিন্তু স্বাধীন ভারত তার সাম্প্রতিক আলোচনা ও আচরণ দ্বারা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে অপরিমাণ পুতুল-পুজো ভিন্ন 'গুরুদেবে'র আর-কিছু প্রাপ্য নেই।

---

* ভারতে প্রকাশিত একখানা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী গ্রন্থে দুটি শংসাপত্র হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে, তাদের প্রণেতা রবার্ট ফ্রস্ট ও আলবের্ট শোয়াইটজার। শোয়াইটজার 'ভারতের গোটে' রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার একটি হ'লো 'charming'; মরণোত্তর রবীন্দ্রনাথকেও শ্বেতাঙ্গরা পিঠ না-চাপড়ালে আমরা পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করি না।

কেমন সন্তুষ্টচিত্তে অনেকেই বলছেন বা ভাবছেন যে পৃথিবীর সব দেশেই যা সম্ভব হয়েছে, যার কোনো ব্যতিক্রম আধুনিক জগতে অচিন্তনীয়, তা অসম্ভব শুধু ভারতবর্ষে, যে-দেশের অবিচ্ছেদ সভ্যতার বয়স অন্ততপক্ষে তিন হাজার বছর! বিতর্কের কোনো কারণ নেই আমি তা বলি না, নিশ্চয়ই একটি বিপুল বাধা আছে, তার নাম— জাড্য। 'আমি ইংরেজিতে শিক্ষালাভ করেছি, আমার পিতা ও পিতামহও তা-ই করেছেন, এবং আমি যে পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে শিক্ষাদান ক'রে আসছি তাও ইংরেজিতে; আমার ছাত্রকুল নানা স্থলে ছড়িয়ে ইংরেজিতে শিক্ষাদানে নিযুক্ত, আবার তাদের ছাত্ররাও তা-ই করছে অথবা করবে— অতএব কী ক'রে কল্পনা করা যায় যে ইংরেজির বদলে হঠাৎ এসে জুড়ে বসবে বাংলা অথবা মরাঠি অথবা তামিল?' এটা কোনো যুক্তি নয় অবশ্য, কিন্তু তা নয় ব'লেই মনোজ্ঞ— অন্তত এটা সবচেয়ে অপ্রতিরোধের রাস্তা, এটাকে মেনে নিলে নতুন ক'রে কোনো চেষ্টা অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংলগ্ন অন্য একটা প্রশ্ন আছে— আসলে বোধহয় সেটাই মৌলিক: মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বা ঞ্ছ নী য় কিনা, সত্য কিনা এই ধারণা যে ইংরেজের ছেলে যেমন ইংরেজিতে, তেমনি বাঙালির ছেলে বাংলায় পড়লে যা শিখবে তা যে-ভাবে তার মনে, প্রাণে, রক্তে গিয়ে মিশবে, সে-রকম কোনো পরভাষার দ্বারা হ'তেই পারে না। আর যদি প্রমাণ হয় যে এই ধারণায় ভুল নেই, তাহ'লে আর তর্ক কিসের। তাহ'লে বাকি থাকে শুধু জাড্যকে জয় করার প্রশ্ন আর কিছু ব্যবস্থাপনার সমস্যা। সে-বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমরা যদি স্থিরচিত্তে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে সেই ভাষার বর্তমান অভাব পূরণ হ'তে দেরি হবে না, অনিবার্যভাবে দেখা দেবে পাঠ্যপুঁথি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, এবং কালক্রমে ঐ ভাষাতেই নতুন জ্ঞান সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ, যুগপৎ আমাদের ভাষা হবে আরো পরিণত, এবং শিক্ষা আরো প্রাণবন্ত ও সারবান। কিন্তু যদি আমরা ভীরুতাবশত কেবলই পেছিয়ে যাই, যদি আমরা অনবরত ভাবি যে আমাদের মাতৃভাষা এখনো 'উপযোগী' হয়নি, তাহ'লে তার পরিণতির সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করা হবে। যেমন জলে না-নামলে সাঁতার শেখা যায় না, এও তেমনি।

এ-বিষয়ে আমাদের পক্ষে উজ্জ্বলতম উদাহরণ জাপান। উজ্জ্বলতম এইজন্যে

যে জাপানও এশিয়া, আর এশিয়ার মধ্যে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। এই অভ্যুত্থানের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে এখানে নব্যতম, প্রতীচ্যতম বিদ্যাও মাতৃভাষাতে বিকীর্ণ হয়েছে; জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েও, কখনো পরভাষার দাসত্ব করার মতো আত্মঘাতী ভুল করেনি। অসংখ্য বার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সুস্পষ্ট ভিন্ন মত সত্ত্বেও, এ-রকম কথা বলা হ'য়ে থাকে যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সাহিত্য প্রভৃতি মানবিক বিদ্যায় যদি বা সম্ভব হয়, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় ইংরেজি নাকি অপরিহার্য। আসলে, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যাতেই বাধা অল্প, কেননা তাতে ভাষার ব্যবহার সীমিত ও বৈশেষিক, ভাষার বদলে চিহ্নের ব্যবহার ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক চিহ্ন ও পরিভাষাসমূহ সব ভাষার সামান্য সম্পত্তি। কিন্তু আপাতত এই তর্কের মধ্যে না-গিয়ে শুধু একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি: বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় অধিক অগ্রসর কে— ইংরেজিনবিশ আমরা, না কি এই জাপানিরা, যারা মাতৃভাষায় শিক্ষিত হ'য়ে তার দ্বারাই সর্ব কর্ম চালনা ক'রে থাকে? (আমার অনুরোধ: এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে কেউ যেন নিজেকে বিব্রত না করেন।)

২৩ জানুয়ারি

সকাল। গোছগাছ ক'রে তৈরি হচ্ছি এমন সময় জাপান এয়ার-লাইন্স থেকে টেলিফোন এলো: প্লেন বিলম্বিত। লোকটি প্রীতিকর কণ্ঠে জিগেস করলে আমাদের ন্যাশনালিটি কী, এবং আমরা কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য ইচ্ছা করি কিনা। আমি জানিয়ে দিলুম আমরা শাকাহারী নই।

সুন্দর দিন; যে-পোর্টারটি গাড়িতে আমাদের মাল তুলে দিলে সে সুশ্রী; এয়ারপোর্টের যুবক কেরানিটি, আমার মনে হ'লো, আমাদের মালের ওজন কিঞ্চিৎ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কোনো আপত্তি করলে না। উঠে আসতে হ'লো দোতলায়, আমাদের দেখামাত্র শ্রীমতী ওটা এগিয়ে এলেন। তাঁর স্বামী আজ জরুরি কাজে ব্যস্ত; তিনি এসেছেন দু-জনের হ'য়ে আমাদের বিদায় জানাতে। জানতেন না প্লেনের দেরি হবে, ট্রেনে, বাস্-এ বহুদূরবর্তী বিমানবন্দরে এসে

দু-ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা করছেন। তাও মাত্র দশ মিনিটের জন্য দেখা হ'লো। কিন্তু সময়ের অভাব, ভাষার অভাব, উভয় পক্ষের বিদায়বেদনাকে কিছুই অব্যক্ত রাখতে পারলে না।

এমন একটা সময় আসেই যখন আর পিছনে তাকানো যায় না, বা তাকালেও চেনা মানুষ হারিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, হস্টেসের হাসি, যাত্রীদের স্বর, প্লেনের ভিতরে সুগন্ধ ও যান্ত্রিক গান, হাত-মালগুলো গুছিয়ে রাখার চঞ্চলতা। তারপর দরজা বন্ধ করার শব্দ, উপসাগরের উপর দিয়ে প্লেন উঠলো মহাশূন্যে।

২৩-২৫ জানুয়ারি

যাঁদের মতে যন্ত্রের প্রসার পৃথিবীটাকে কুৎসিত ক'রে দিচ্ছে, তাঁরা চারদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কথা বলেন না, কিংবা কোনোদিকেই দৃষ্টিপাত না-ক'রে শুধু শোনা কথা বলেন। যদি আমরা তত্ত্বালোচনার লোভ সামলে আমাদের সরল ও সত্যবাদী ইন্দ্রিয়ের শরণ নিই, যদি গ্রহণ করি মতের বদলে অভিজ্ঞতাকে, তাহ'লে আমাদের মানতেই হবে যে যন্ত্র, অর্থাৎ বিজ্ঞানের শক্তি আধুনিক জগতে এমন অনেক নতুন সৌন্দর্য এনে দিয়েছে, পূর্বযুগে যা ধারণা করা সম্ভব ছিলো না। যে-উপত্যকায় নাইটিঙ্গেলেরা গান করে তা যেমন সুন্দর, তেমনি কি সুন্দর নয় সেই বন্দর যেখানে অনেক সমুদ্রের গল্প নিয়ে নানা দেশের জাহাজ এসে দাঁড়ায়, সেই প্রাঙ্গণ যেখানে আধো ঘুমের স্বপ্নের মতো রাত দুটোতে ট্রেন এসে থামে, সেই প্রান্তর যেখানে নামে দিগন্ত থেকে উঠে এসে অবতল ভঙ্গিতে ঘুরে-ঘুরে ব্যোমযান? সমুদ্র ছিলো, তার উপকূলে পাহাড়; এটা বেশি কিছু নয়, এই রকমের অসংখ্য স্থান আছে পৃথিবীতে; কিন্তু সেই উপকূলে যখন রচিত হ'লো বিমানবন্দর তখনই তাতে সঞ্চারিত হ'লো প্রাণ, তা হ'য়ে উঠলো বিশেষ ধরনে সুন্দর, যেন ভূষণে ও প্রসাধনে সুসম্পূর্ণ। আজকের দিনে পৃথিবীর সুন্দর স্থানগুলির তালিকা যদি করতে হয়, তা থেকে কয়েকটি বিমানবন্দরকে বাদ দেয়া চলবে না;— ধরা যাক হংকং, যেখানে পাহাড়ে-ঘেরা সমুদ্রের উপর দিয়ে ধীরে-ধীরে প্লেন এসে নামে, এত নিচু দিয়ে যে ভয় হয় বুঝি পাহাড় স্পর্শ করলো, বুঝি ভুল ক'রে নেমে পড়লো জলের মধ্যেই; কিন্তু একটু

পরেই মাটি ছোঁবার মৃদু ঝাঁকুনি, আবার গাছপালা বড়ো হ'লো, বিকেলের আলোয় ছবির মতো পৃথিবী।

কিন্তু আকাশ থেকে আমরা যা দেখি মাটিতে নামার পরে আর তা দেখতে পাই না; অতীতে যা ছিলো শুধু কবির কল্পনায় আজ আমাদের চর্মচক্ষু তা-ই দেখছে। নতুন দৃশ্য, অভাবনীয় বর্ণ ও বিন্যাস, সৌন্দর্যের অনেক, অনেক নতুন ও বিস্তীর্ণ বীথিকা— এই সব এরোপ্লেন খুলে দিয়েছে আমাদের চোখের সামনে। মাটিতে দাঁড়িয়ে যে-পৃথিবীকে সমতল ছাড়া আর-কিছু মনে হয় না, তা হঠাৎ খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়ায় বা আড় হ'য়ে হেলে পড়ে; যে-মেঘ আমাদের মাথার উপরে সব সময় ঘুরে বেড়ায়, তা হ'য়ে ওঠে মাটির মতো স্থির আর তুষারের মতো ঘন ও পুঞ্জিত, তা রচনা ক'রে দেয় আকাশের উপর অন্য এক কুট্টিম বা প্রান্তর, শূন্যে গ'ড়ে তোলে প্রাসাদ, নগর বা বর্ণময় অরণ্য— কখনো বা প্রপাতের মতো ঝ'রে পড়ে। আমরা দেখতে পাই এমন সমুদ্র যা চষা খেতের মতো কোঁকড়া আর মরুভূমির মতো নিশ্চল; দেখতে পাই নদী কেমন অনবরত এঁকে-বেঁকে চলে, বা আল্পসের চূড়ায়-চূড়ায় তুষারজ্যোতির বিকিরণ;— আর বিশাল রাত্রি, অলৌকিক সূর্যাস্ত, অলৌকিক আকাশ। সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ আকাশ— আর সবচেয়ে নতুন; তাকে বলতে পারি মানুষের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের অন্যতম।

পুরীর সৈকতে দাঁড়িয়ে আমরা যে-সমুদ্র দেখি, আর আটলান্টিক পাড়ি দেবার সময় চারদিকে যা আমাদের চোখে পড়ে, এ-দুটোকে ঠিক এক জিনিশ বলা যায় না। তেমনি, ঐ যে আকাশ আমাদের সনাতন সঙ্গী, যার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমরা নিঃশব্দে জপ করি আমাদের বেদনা— তারও একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা আজকের দিনের জেট-প্লেন আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে। একটা প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে: সমুদ্র দেখতে, আকাশ দেখতে আমরা ভালোবাসি কে ন? কেন দিগন্ত-ছোঁয়া ধূসর জলরাশি আর পাংশুবর্ণ বর্তুল মহাশূন্যকে আমরা দিয়েছি সৌন্দর্যের সংজ্ঞা, আমাদের আনন্দের স্বীকৃতি? তার কারণ এই যে সমুদ্র নিরন্তর চঞ্চল, আর আকাশ অবিচলভাবে স্তব্ধ, আর উভয়েই ব্যাপ্ত, বিশাল ও সুদূরস্পর্শী; একটি তার চিরন্তন গতি নিয়ে, আর অন্যটি তার দূরত্বময় মৌনতায়, আমাদের মনে অনন্তের আভাস এনে দেয়, আর যেহেতু আমরা সকলেই মনে-মনে অসীমের জন্য

আকাঙ্ক্ষিত, যেহেতু আমাদের সব ক্ষণিক ভালোবাসার পিছনে একটি নামহীন বিরতিহীন বাসনা নিঃশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাই আমরা আকাশ ভালোবাসি, ভালোবাসি সমুদ্র দেখতে। কিন্তু সমুদ্র, আকাশ, এদেরও অনেক ভিন্ন-ভিন্ন রূপ আছে ; শীতের দিনে লণ্ডনে বা ন্যুয়র্কে আকাশের প্রায় অস্তিত্বই থাকে না, আর ভারত থেকে য়োরোপ পর্যন্ত জাহাজে যেতে-যেতে যে-সব জল পেরোতে হয় তা প্রায় খেলাঘরের সমুদ্র, আমাদের মন মুক্তি পায় না সেখানে। কিন্তু এই সব ছোটে-ছোটো সমুদ্র পেরিয়ে যেমন আমরা পৌঁছতে পারি সেই মহাসাগরে, যেখানে জলের বিস্তার ও উত্তালতা আমাদের নিশ্বাস কেড়ে নেয়, তেমনি, জেট-প্লেনের সৌজন্যে, আমরা আজ উঠে যেতে পারি আমাদের চিরচেনা আকাশের অনেক উর্ধ্বে এক মহাকাশে— এক আশ্চর্য, আলৌকিক নীলিমায়।

টোকিও থেকে ছেড়েছি ঘণ্টাতিনেক হ'লো, প্যাসিফিক পেরিয়ে চলেছি হনলুলুর দিকে। জাপানি প্লেন, তার আতিথেয়তা অতুলনীয়, প্রত্যেক যাত্রীর জন্য কিমোনো আর কাপড়ের চটি পর্যন্ত রাখা আছে, আছে সচিত্র হাতপাখা আর চিঠির কাগজ, কিমোনো-পরা হস্টেসরাও ছবির মতো দেখতে, আর সেই সঙ্গে দশভুজার মতো কর্মিষ্ঠ। প্লেন ছাড়ামাত্র তাঁরা নিয়ে আসেন মুখমার্জনার জন্য গরম তোয়ালে— ক্লান্তি অপনোদনের জন্য এই চৈনিক প্রথাটি উত্তম ;— তারপর পরম্পর খাদ্যপানীয়ের পর্যায়, যাত্রীদের প্রতিটি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইচ্ছা তাঁরা পূরণ করেন অক্লান্তভাবে, অম্লানভাবে ও অবিলম্বে, শ্রমের মধ্যে লাবণ্যের হিল্লোল জাপানি মেয়েরা যে-ভাবে সঞ্চারিত ক'রে দেন, সেই ধরনটা নিতান্তই জাপানি, এবং সেটা ভোক্তার পক্ষে উপরি-পাওনা ব'লেই মহামূল্য। বিমান-কক্ষের সাজসজ্জাতেও এমন কিছু-কিছু স্পর্শ আছে যা বিশিষ্টভাবে জাপানি ;— মোটের উপর এঁদের ব্যবস্থায় এমন কিছু নেই যা চোখ, মন ও দেহের পক্ষে তৃপ্তিকর নয়।

লাঞ্চ হ'য়ে গেছে, বাসন অপসৃত, প্লেনে নেমেছে বিশ্রাম। যাকে আমরা ভর-দুপুর বলি, এটা ঠিক সেই সময়। আমরা আছি ভূপৃষ্ঠ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে, ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে পূর্বদিকে চলেছি। কিন্তু বেগের কোনো অনুভূতি নেই, এক বিশাল গুঞ্জনময় ভ্রমরের মতো স্পন্দিত এই ব্যোমযান, যেন নীলিমার উপর নিশ্চল, যেন রৌদ্রের মদিরায় ঘুমন্ত। উজ্জ্বল

দিন আকাশে আলোকে এমনভাবে ব্যাপ্ত ও ভরপুর হ'য়ে আছে যে মনে হয় যেন অসীমের সীমা পর্যন্ত স্পর্শ করলো। এখানো দিগন্ত নেই, চারদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু আকাশ, অবিকল অর্ধগোলাকার মহাকাশ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নীল, গভীর নীল, গাঢ়তম, নির্মলতম নীল; এমন ভাস্বর ও নিস্পন্দ নীল যে চোখ প্রায় ঝলসে যায়, মধ্যভাগে প্রায় মনে হয় কালো, আর দূরে, বাইরের দিকে, সেই নীলিমা ধীরে-ধীরে পাণ্ডুর হ'য়ে রৌদ্রে গ'লে গেছে। মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা ও পাখিদের অনেক ঊর্ধ্বে এই আকাশ, সব আন্দোলন ও পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে; এই আকাশ আমরা ধরাতলবাসীরা শুধু যে কখনো দেখি না তা নয়, ভাবতেও পারি না। ধ্যান বলতে আমাদের মনে যে-ভাবটি জেগে ওঠে— যা অবিকার, অচঞ্চল ও অনাক্রমণীয়; চিরন্তনকে চিন্তা করলে মনের মধ্যে যে-স্তব্ধতা আমরা অনুভব করি; এই আকাশ যেন তারই প্রতিরূপ, বা তারই দর্পণ। শেলি একটি অমর শব্দবন্ধে যাকে বলেছিলেন 'শাশ্বতের নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি', এ যেন তা-ই; কিন্তু আমাদের 'বহুবর্ণ গম্বুজ'টিও একেবারে অদৃশ্য হয়নি; নিচে দেখা যাচ্ছে আর-একখানা আকাশ, তার নীলিমা যেমন মলিন তেমনি তা নানা রঙে চিহ্নিত, লক্ষ করলে বোঝা যায় ঐ পরস্পরে জড়ানো রঙিন খণ্ডগুলো হ'লো মেঘ;— অর্থাৎ, যেটা আমাদের মর্ত্যবাসীদের আকাশ, যার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আমরা অভ্যস্ত, এখন সেটাকেই আমরা উপর থেকে দেখছি। এই মেঘে রঙিন, মেঘে ফেনিল পার্থিব আকাশ আমাদের নিচে প'ড়ে আছে, আর উপরে যেন দীপ্ত হ'য়ে আছে দ্যুলোক; এই দুই আকাশে মিলে যে-পূর্ণ বৃত্তটি রচনা করেছে আমাদের প্লেনের যাত্রাপথ তারই মধ্য দিয়ে; — জলের সমুদ্র আরো কত নিচে তা ধারণা করা যায় না। এমনি চলেছি মিনিটের পর মিনিট, তৃপ্তিহীন চোখ মেলে রেখেছি বাইরের দিকে; স্থির রৌদ্র, স্তব্ধ নীলিমা, দূর এবং দূরতর নির্বেদ— সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এই দ্যুতিময় দিন যেন অফুরান, যেন আমরা এমন এক জগতে এসে পড়েছি যেখানে সময় অবশেষে থেমে গেছে।

কিন্তু এ-রকম মনে হচ্ছে যখন, ঠিক তখনই প্লেনের ঝাঁকুনি বেড়ে গেলো, বদলে গেলো এঞ্জিনের ছন্দ, হঠাৎ এক-এক দমকে অনেকটা যেন নিচে নেমে যাচ্ছি আমরা। তবে কি তীরে নামতে বেশি দেরি নেই আমাদের? কিন্তু এখনো তো একই দৃশ্য, একই আকাশ, একই উজ্জ্বলতা। একই, কিন্তু ক্রমশ

যেন নীলিমা আরো ঘন হচ্ছে, যেন বহুদূরে কোথাও কোনো সন্ধ্যা হ'য়ে এলো আর তারই ছায়া এলিয়ে পড়ছে ধীরে-ধীরে, যদিও আমাদের সূর্য এখনো অমল ও বলীয়ান। পাইলট যখন ঘোষণা করলেন যে এইমাত্র আমরা আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা পার হলাম, আর হস্টেস যাত্রীদের হাতে দিয়ে গেলেন একখানা ক'রে কাটা ছবির পোস্টকার্ড, তখনও বাইরে জ্বলজ্বল করছে দিন, কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের জ্যোতিঃপুঞ্জ যেন দপ ক'রে নিবে গেলো, মুহূর্তে মহাশূন্যকে দখল ক'রে নিলো রাত্রি, অন্ধকার বন্যার মতো ফুলে উঠলো, হস্টেস আমাদের জানিয়ে দিলেন যে তারিখ একদিন পেছিয়ে গেছে আর সময় এখন রাত্রি দশটা। আমাদের হাতের ভালোমানুষ ঘড়িতে তখন টোকিওর হিশেবে বেলা তিনটে ; সে-বেচারা তো আর জ্বল ভের্ন পড়েনি, জানে না যে সর্বত্র ও সব সময় আমরা অমোঘভাবে পৃথিবীর আবর্তনের অধীন ; জানে না যে তেইশে জানুয়ারি পূর্বাহ্ণে টোকিও থেকে যাত্রা করলে হনলুলুতে পৌঁছতে হয় বাইশ তারিখের রাত্রিকালে।...আর-কিছু দেখার রইলো না ; আমরা ফিরে এলাম উপস্থিতে, অনুক্রমিক সময়ের মধ্যে, এত অল্প ব্যবধানে ডিনারের প্রতি সুবিচার করতে পারবো কিনা, সেই দুশ্চিন্তায়।

প্রায় মধ্যরাত্রে হনলুলুতে অবতরণ। নেমেই দেখি, প্লেনের সিঁড়ির গা ঘেঁষে দুটি হাওয়াই তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কালো চুলে লাল ফুল গোঁজা, গলায় ফুলের মালা দুলছে, ঝিরিঝিরি ঘাসের ঘাঘরা পরনে— প্লেন-কোম্পানির বিজ্ঞাপনে যেমন ছবি দেয়, দেখতে ঠিক তেমনি। তারা এগিয়ে এসে আমাদের দু-জনকে দুটো মালা পরিয়ে দিলে। দৈবাৎ সেদিন আমরাই প্রথম প্লেন থেকে নেমেছি, তাই মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম এই ব্যবস্থা বুঝি আমাদেরই জন্য, কিন্তু আমার অহমিকা ও অস্বস্তির নিরসন ক'রে তরুণীরা সব যাত্রীদেরই মাল্য-দান করলে ; বোঝা গেলো এটা হনলুলুর অনন্য দেশাচার, আগন্তুকদের এমনি ক'রেই অভ্যর্থনা জানানো হয় এখানে। কাস্টমস-এর বেড়া ডিঙিয়ে যেই বাইরে এসেছি তখনই এক ভদ্রলোক সহাস্যে করমর্দন করলেন, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি তিনি, তাঁর হাত থেকে পুনশ্চ মালা নিতে হ'লো। তাঁর ক্ষুদ্রকায় কিন্তু বলিষ্ঠ ফোক্সভাগেনে শহরের দিকে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে গন্ধ পেলাম জুঁইফুলের মতো ; ভেবে একটু অবাক লাগলো যে পৃথিবীর অন্য সব দেশ ফুল দিয়ে তোড়া বাঁধে, কিন্তু মালা গাঁথে শুধু ভারতবর্ষে আর

পলিনেশিয়ায়। আবার আমাদেরই অনুরূপ প্রথায় তা ধারণ করে মস্তকে নয়, কণ্ঠদেশে।*

যেদিন কলকাতা ছেড়েছিলাম সেদিন কলকাতার পক্ষে কড়া শীত ছিলো; দু-ঘণ্টা পরে রেঙ্গুনে এসে পাখা ছাড়া এক দণ্ড চলে না; আবার জাপানে কনকনে ঠাণ্ডায় কাটিয়ে এখানে মনে হচ্ছে রীতিমতো গরম— আমাদের শেষ-ফাল্গুন বা প্রথম চৈত্রমাসের মতো। এই দ্বীপে প্রকৃতির মেজাজটি বড়ো সুস্থির, দিনে-রাত্রে বা বছরের বিভিন্ন সময়ে অল্পই তার ওঠা-নামা, তাপ মৃদু, বৃষ্টি হালকা, শীত অস্তিত্বহীন। ব্যাপারটাকে বলা যেতে পারে চিরবসন্ত, আবার ঋতুহীনতা বললেও ভুল হয় না। কিন্তু এই আবহাওয়ার জন্যেই আজকে এই জানুয়ারির মধ্যরাত্রেও এমন জলজ্বল করছে শহরটি; একদিকে পাহাড়ের আলো-জ্বলা ধাপে-ধাপে ধনীদের বসতি, নিবিড় উদ্ভিদের ফাঁকে-ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে বাড়িগুলোর শুভ্রতা; অন্য দিকে অনুমান করছি সমুদ্র, আর মধ্যখানে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য সাধারণিক প্রতিষ্ঠান, মধ্যবিত্তের বাসভূমি। আসলে অবশ্য, নগরটি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত, আর তার উপর বন্দর ব'লে, সামুদ্রিক দৃশ্য এখানে বিরল নয়; যাঁদের গৃহ অথবা কর্মস্থলের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায় এমন ভাগ্যবান নাগরিক অনেকেই আছেন। যেখানে আমাদের গাড়ি থামলো সেটা কোন জায়গা বুঝতে পারলাম না, যদিও আগেই জেনেছিলাম যে শ্রীমতী ওয়াটুমল (স্বনামধন্য সিন্ধি বণিকের বিধবা পত্নী তিনি) তাঁর একটি অ্যাপার্টমেণ্টে আমাদের আতিথ্য দেবেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম তেতলার এক সুসজ্জিত ঘরে, গরমের জন্য রাত্রে ভালো ঘুম হ'লো না। কিন্তু সকালে উঠে একদিকের দরজা খুলে যেমন অবাক হ'তে হ'লো, তেমনি অনুতপ্ত হলাম এ-কথা ভেবে যে কাল রাত্রে ঐ দরজাটা কেন খুলিনি। ঘরের বাইরে খানিকটা ঢাকা বারান্দা, তারপর খোলা ছাত; নানা ধরনের আরামদায়ক আসবাবে আর তরুপল্লবে সাজানো; সামনে রাস্তায় তালজাতীয় গাছপালার ঝালর দুলছে বাতাসে, আর তা পেরিয়ে, ঠিক আমাদের চোখের

* তবে একটা তফাৎ এই যে ভারতবর্ষে প্রকাশ্যে পুষ্পমাল্য ধারণ করে শুধু বিবাহকালে বরবধূ, জনসভার বক্তা, গণ-নেতা, ও মৃতেরা, কিন্তু হনলুলুতে মেয়েরা মালা প'রে দৈনন্দিন কাজেও বেরোন, এমনকি ছাত্রীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন।

উপর, প্রশান্ত মহাসাগর বিস্তীর্ণ। বুঝতে পারলাম, বিখ্যাত ওয়াইকিকি সৈকতের আধ মিনিট দূরে আছি আমরা।

আড়াই দিন হনলুলুতে কী করেছিলাম আমরা? বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে হ'লো আমাকে, কিছু আলোচনা হ'লো দু-তিনজন অধ্যাপকের সঙ্গে, এক সন্ধ্যা কাটলো সামাজিকতায়, রাত্রে একটি বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে পলিনেশীয় নৃত্যের কিছু নমুনা দেখা গেলো, আর দেখলাম শ্রীমতী ওয়াটুমলের গিরিচূড়াস্থিত রমণীয় হর্ম্যের বারান্দায় ব'সে চা খেতে-খেতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর সূর্যাস্ত। আর বাকি সময়— পরিমাণে খুব বেশি নয় সেটা— চেষ্টা করলাম সৈকত-সংলগ্ন কালাকাউয়া এভিনিউতে ঘুরে-ঘুরে স্থানীয় জীবনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হ'তে। আমি ভালোবাসি না চলতি মতের পুনরাবৃত্তি করা, কিন্তু হনলুলু বিষয়ে দ্বিমত অসম্ভব, প্রায় বিজ্ঞাপনের ভাষা মেনে নিয়ে সকলকেই বলতে হবে যে বিশ্রামসম্ভোগের পক্ষে এটি একটি 'আদর্শস্থল'। আর তা প্রধানত এইজন্যে যে আধুনিক সভ্য জগতে যা বিরল থেকে বিরলতর হ'য়ে আসছে, সেই নির্জনতা আছে এখানে, আর তাই এখানে আলস্য এখনো সম্ভবপর। ভিড় নেই, অথচ আছে ভালো দৃশ্য, মৃদু আবহাওয়া, এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব রকম আধুনিক ব্যবস্থা— এমন স্থল খুঁজে পাওয়া সহজ নয় আজকের দিনে। অন্যান্য নামজাদা সমুদ্রতীরে— ধরা যাক ভূমধ্যসাগরের রিভিয়েরা উপকূলে— যে-বিপুল আন্তর্জাতিক ভিড় জ'মে ওঠে তার প্রভাবে অবকাশ আক্রান্ত হয় উত্তেজনায়, কর্মক্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী হয়তো যথোচিত শুশ্রূষা পায় না। কিন্তু হাওয়াই যেহেতু য়োরোপ থেকে বহু দূর, এশিয়া বা আমেরিকারও ঠিক কাছে নয়, আর ঐ তিন মহাদেশের অন্যান্য আকর্ষণও যেহেতু নেই এখানে, তাই ধ'রে নেয়া যায় এখানে কখনো দলে-দলে যাত্রী আসবে না, রেস্তোরাঁর পরিচারকের চোখে পড়ার প্রত্যাশা নিয়ে কাউকে হবে না আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে। আর রাজধানী হনলুলুর স্থায়ী লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষেরও কম, কলকাতার এক বালিগঞ্জ পাড়াতেই হয়তো তার চেয়ে বেশি লোকের বসতি। সংখ্যা স্বল্প, প্রাকৃত সম্পদও কম নেই, তাই ধনার্জন দুঃসাধ্য নয় এখানে; যুদ্ধ করতে হয় না জীবিকার জন্য বা ঋতুর বিরুদ্ধে; কোমল জলবায়ু ও সহজ উপার্জনের প্রভাবে লোকেদের ভাবভঙ্গিও সহজ ও

বিশ্রান্ত ; কাকে বলে তাড়াহুড়ো তা যেন এরা জানেই না। হনলুলুতে প্রায় প্রত্যেকেরই গাড়ি আছে, কিন্তু পৃথিবীর এই একটি শহরে পদাতিকেরা প্রাণের ভয় না-রেখে যেখানে-সেখানে রাস্তা পার হ'তে পারে, কেননা লোক দেখলেই গাড়ি থামিয়ে দেয়া এখানকার নিয়ম। আর এই একটি শহর দেখলুম যেখানে দ্বিতীয়-যুদ্ধ-পরবর্তী যুগেও বাসস্থানের অনটন নেই ; ওয়াইকিকি সৈকতের ধারে-ধারে— বড়ো হোটেল শুধু নয়, সুন্দর ছোটো-ছোটো ফ্ল্যাট-বাড়িও অনেক চোখে পড়লো, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই 'Vacancy' চিহ্ন ঝুলছে ;— আমরা যারা কলকাতাবাসী তাদের পক্ষে ঐ চিহ্ন চোখে দেখাও কত সুখের তা বোধহয় না-বললেও চলে।

সৈকতে যাঁদের বেশি দেখা যায়, বলা বাহুল্য তাঁরা অধিকাংশই মার্কিন ট্যুরিস্ট, অর্থাৎ খোদ আমেরিকা থেকে বেড়াতে এসেছেন। সকাল থেকে সঞ্চরণ করছেন তাঁরা ; পুরুষদের পরনে শুধু একটি সংক্ষিপ্ত অধোবাস ; মেয়েরাও স্নানের জন্য সজ্জিত বা অসজ্জিত— কেউ বা শখ ক'রে পরেছেন হাওয়াইরা যাকে 'মুমূ' বলে, খুব ঢিলে, লম্বা আর রঙিন একটা শেমিজের মতো ব্যাপার, নেহাৎ মন্দ লাগে না দেখতে। আমরাও একদিন স্নান করতে গেলুম— মনে হ'লো এত কাছে এসে সমুদ্রে একটা ডুব না-দিলে বরুণদেবের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হবে। বালুর উপর বিছিয়ে আছেন যথাসম্ভব অনাবৃত হ'য়ে সারি-সারি মেয়ে-পুরুষ ; সঙ্গে আছে ছাতা, ফাঁপানো বালিশ, সিগারেট, ক্যামেরা, সচিত্র পত্রিকা, কারো-কারো এমনকি কিছু খাদ্য-পানীয়, কেউ-কেউ একটা ভেষজ তেল মেখেছেন সর্বাঙ্গে যাতে রোদের তাপে গা পুড়ে না যায়। বোঝা যায় তাঁরা বহুক্ষণের জন্য তৈরি হ'য়ে এসেছেন, রৌদ্রে ও সিন্ধুলবণে গাত্রবর্ণকে গাঢ় না-ক'রে ঘরে ফিরবেন না। আমার কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ হ'লো যখন দেখলুম এঁদের মধ্যে দু-চারজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও আছেন ; কেননা 'কালো' হবার চেষ্টা শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে সংগত হলেও আমাদের বা নিগ্রোদের পক্ষে তা নিতান্ত অনাবশ্যক। এঁদের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে যেতে-যেতে আমার মনে পড়লো, অনেকদিন আগে একবার কান্ শহরের সৈকতে দেখেছিলুম রজস্বল জগতের অনাবরণ উচ্ছ্বাস ; বেলাভূমি, আর পুকুরের মতো শান্ত ভূমধ্যসাগর— সব যেন অধিকৃত হ'য়ে আছে উন্মোচিত গাত্রে বাহুতে উরুতে ; অনেকে বায়ুপূর্ণ

জাজিম নিয়ে জলের উপরে ভাসমান, আরো অনেকে বালুর উপর আলম্বিত; কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না; সকলেই একান্তভাবে মনঃসংযোগ করেছে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য-সঞ্চয়ের মহৎ কর্তব্যে। কেউ-কেউ বালিশে মুখ গুঁজে হয়তো বা নিদ্রা যাচ্ছে, কালো চশমা হরণ করেছে অনেক সুন্দর মুখের লাবণ্য; এক রক্তবর্ণ মহাকায় পুরুষ শুধুমাত্র কটিতটে আচ্ছাদন নিয়ে আমেরিকান এক্সপ্রেসের কার্যালয়ে প্রবেশ করলেন। সেদিন আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলাম— আর-কোনো কারণে নয়, এই ধরনের পুঞ্জীভূত মাংসমেদের প্রদর্শনীতে আমি অনভ্যস্ত ব'লে; পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারিনি, ভূমধ্যসাগরিক আনীল অপরাহ্ণ থেকে যেন অপ্রতিভ হ'য়ে ফিরে এসেছিলুম। হনলুলুতে প্রদর্শনী তেমন জমকালো নয়, কিছুদূর হেঁটে গিয়ে নিভৃত একটি কোণ পাওয়া গেলো;— কিন্তু স্নান ক'রে তৃপ্তি হ'লো না। আমরা যারা পুরীতে প্রথম সমুদ্র দেখেছি, ভারতে ও ভারতের বাইরে অন্য প্রায় সব সমুদ্র তাদের কিছুটা নিরাশ করে; মধ্যসমুদ্রে আটলান্টিক যদিও অতুলনীয়রূপে উত্তাল, এমন কোনো স্নানোপযোগী সৈকত আমি বিদেশে দেখিনি, সমুদ্র যেখানে পুরীর মতো গর্জমান ও তরঙ্গময়। সন্দেহ নেই, প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণটি সার্থক; এর জলরাশি কলরব করতে জানে না, ছোটো-ছোটো ঢেউ পা ভিজিয়ে স'রে যায়, এর বেগ নয় উদ্বেল, ফেনিলতা নয় নিবিড় ও দিগন্তস্পর্শী। পুরীতে স্নানে নামলে সমুদ্র যেন যুদ্ধে আহ্বান করে আমাদের, কিন্তু হনলুলুতে— ও অন্য অনেক বিখ্যাত সৈকতে— সমুদ্র আমাদের খেলার সঙ্গী হ'তে আপত্তি করে না।

হনলুলুর স্থাপত্যে ও গৃহসজ্জায় অভিনবত্ব আছে। স্নানের পরে যে-রেস্তোরাঁয় আমরা খেতে গেলুম, সেটি বাঁশের তৈরি— আমাদের ভাষায় কুটির বলা যায় তাকে, কিন্তু অমন মনোরম কুটির রচনা করতে অনেকখানি বুদ্ধি খাটাতে হয়। সবুজ দেয়াল, সরু-সরু বাঁশের চিক রোদের তাপ ঠেকিয়েছে, মস্ত পাতাওলা গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে কাচের বাক্সে খেলা করছে রঙিন মাছ;— সব মিলিয়ে শ্যামল হ'য়ে আছে ঘরটা, দুপুরবেলা জলে ডুব দিলে যে-রং দেখা যায় সেই রঙে উদ্ভাসিত যেন, অর্থাৎ একটা সামুদ্রিক সুর যোজনা করা হয়েছে, প্রায় কল্পনা করা যায় জলের তলায় আছি, কেননা টেবিলে বসলে ঠিক চোখ-বরাবর যা ভেসে ওঠে, তা প্রশান্তসাগরের নীলিমা। কাঠ, বাঁশ,

নারকোলের দড়ি— এই সব শস্তা উপাদান দিয়ে এরা ঘরের মধ্যে যে-শোভনতা সম্পাদন করে, তার মধ্যে কিছুটা নিশ্চয়ই আছে জাপানি প্রভাব, কিন্তু মোটের উপর শৈলীটাকে দেশীয় ব'লেই মনে হ'লো। অবশ্য যে-দেশে প্রকৃতি যেমন, এবং প্রকৃতি যা দান করে, তার সঙ্গে বসবাসের পদ্ধতির একটা সম্বন্ধ আছেই ; মানুষ যত্নবান হ'লে প্রাপ্তব্য উপকরণ থেকেই চারুতা নিষ্কাশন ক'রে নেয়। যাঁরা ফুল, উদ্ভিদ, অর্কিড ইত্যাদি ভালোবাসেন তাঁদের পক্ষে হনলুলু এক স্বর্গরাজ্য ; ও-সব শোভা এখানে স্বভাবতই প্রচুর ব'লে ঘরে-ঘরে স্থান হয় তাদের ; এবং এই দ্বীপপুঞ্জের যারা আদি অধিবাসী তাদের ধরনধারনও পরবর্তী শ্বেত-পীত আগন্তুকদের আংশিকভাবে মেনে নিতে হয়েছে। এইজন্যে, যদিও ক্যালিফর্নিয়াতেও শীত কম, আর সেখানকার আবাসগুলিতেও বারান্দা উঠোন বাগান গাছপালা থাকে, তবু ক্যালিফর্নিয়ার কোনো বাড়িতে ঢুকলে পুরোপুরি মার্কিনী ব'লেই মনে হয়, কিন্তু হনলুলুতে যাঁরা খাঁটি আমেরিকান তাঁদের বাড়িতেও অন্য একটা ভঙ্গি ধরা পড়ে, একটা দেশান্তর-সৌরভ যেন ; আর সেটাই এই দ্বীপপুঞ্জের স্বাক্ষর ব'লে স্বীকার্য।

আমি আমার চেনা জগৎটাকে মোটামুটি চারটে অংশে ভাগ ক'রে নিয়েছিলুম : পাশ্চাত্য, মধ্য-প্রাচ্য, ভারতীয়, ও চৈনিক। কিন্তু হাওয়াইকে এর কোনোটার মধ্যেই সঠিকভাবে ফেলা গেলো না। এই দ্বীপপুঞ্জ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ, কিন্তু হাওয়াই কি আমেরিকা? এর নিসর্গ ও ক্ষিতিজ সামগ্রী উষ্ণ মণ্ডলের সৃষ্টি, প্রধান প্রাকৃত সম্পদ আনারস, আদি ও মিশ্রিত অধিবাসীদের চেহারার ধরনটাও এশীয়, তবু একে এশিয়া ব'লে ভাবতে গেলেও মন ঠিক সম্মতি দেয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত অথচ সমগ্র প্রজাসংখ্যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি জাপানি বংশোদ্ভূত, আর খাঁটি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান সিকিভাগ মাত্র। আছে চীনে, ফিলিপিনো, হিস্পানি, অল্প কিছু অমিশ্র হাওয়াই এখনো টিকে আছে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম যে দেশটা সমৃদ্ধিতে ও রাজনৈতিক অর্থে আমেরিকা, কিন্তু প্রজাগণনায় ও অংশত আচারে-ব্যবহারে একে এশিয়া বললে ভুল হয় না। এইজন্যে স্থানীয় লোকেরা আজকাল বলতে শুরু করেছেন যে হাওয়াই হ'লো আধুনিক বিশ্বের একটি দ্রবপাত্র, অন্তত পূর্ব-পশ্চিমের এক নব্য মিলনস্থল। এই পদবি এক কালে ছিলো আলেকজান্ড্রিয়ার, তারপর

ভেনিস তা সগৌরবে ভোগ করেছে ; সেই সব উজ্জ্বল স্মৃতি পেরিয়ে হঠাৎ এই নব-আবিষ্কৃত বহুদূরবর্তী দ্বীপের উপর মনঃসংযোগ করা সহজ ব'লে মনে হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্ব-ইতিহাসে এমন সব দ্রুত ও চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটছে যে কোন দেশের ভাগ্যে কী আছে তা কে বলতে পারে? আমরা আমাদের সভ্যতার প্রাচীনতা নিয়ে গর্ব ক'রে থাকি— য়োরোপীয়রাও তা কম করেন না ; কিন্তু দেখা তো গেলো যে নতুন দেশ আমেরিকা অল্প সময়ের মধ্যে য়োরোপের উপায়নৈপুণ্যেই য়োরোপকে অতিক্রম করেছে। তেমনি, যে-আফ্রিকা আজ সদ্য জেগে উঠে অত্যন্ত বেশি অশান্ত, সে ক্রমশ ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করলে মানবসভ্যতায় নতুন দান দিতে পারবে না তা কে জানে। আর এ-কথাই বা কেমন ক'রে বলা যায় যে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ অতীতে যা ছিলো ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে— একটি ছুটি কাটাবার মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জ শুধু? ইতিমধ্যেই হনলুলুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি প্রাচী-প্রতীচী কেন্দ্র গ'ড়ে উঠছে ; সেখানে প্রতি বছর আহূত হবেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের 'মূলভূমি' থেকে কৃতী ছাত্র ও গবেষক ; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিচয় ও অনুশীলনের আর-একটি দরজা খুলে গেলো। এই কেন্দ্রের পরিকল্পনা বিষয়ে যা শুনলুম তাতে মনে হ'লো এর ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশান্বিত হবার কারণ আছে।

১৯৬১

তৃতীয় খণ্ড

আমেরিকায়

১

অসহ্য হ'য়ে উঠলো। যেমন দিন, রাত্রিও তেমনি, তফাৎ নেই সকালে ও সন্ধ্যায়, সব প্রহর নির্বিশেষ। সব সময়, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে, ঘরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। একতলায় ফ্ল্যাট, অন্ধকার, অসূর্যম্পশ্য : রোদ, আকাশ, রাস্তা, বরফ পড়া— এই বিবর থেকে সব অদৃশ্য ; ঘাড় বাঁকালে বড়ো জোর হয়তো চোখে পড়ে কোনো-এক সময়ে অদূর কোনো দেয়ালের গায়ে ছায়া, বা অনেক উঁচুতে মরীচিকার মতো উদ্ভাস। বাতিও নয় আধুনিক ধরনের স্রোতস্বল, তা নম্রভাবে দিনের আলোর অনুকরণ করে না, বরং রূঢ় প্রতিবাদে ঘণ্টাগুলিতে কাঁটা বিঁধিয়ে রাখে। সকাল থেকে সারাদিন তাই বিরক্ত হ'য়ে আছি আমরা, দিনের সঙ্গে তফাৎ করা যায় না ব'লেও রাত্রিও বৃথা মনে হচ্ছে ; তারপর যখন শোবার সময় হয় তখনও অস্বস্তির অবসান নেই। কেননা বাড়িওলার মতে যেটি 'শোবার ঘর' সেটি আসলে একটি বড়োশড়ো সিন্দুক, তাতে আক্ষরিক অর্থে শয়ন সম্ভব হ'লেও শুধুমাত্র শয়নই সম্ভব ; সেই ঘোর-কালো কুঠুরি যেন কবরের মতো গিলে নেয় আমাদের— তাই, যাতে চোখে না-লাগে, অথচ বোঝা যায় যে জীবিত আছি, এইভাবে কোথাও একটা বাতি জ্বেলে রাখতেই হয়। এই রুগ্ন পরিবেশ বিশ্রামের পক্ষে অনুকূল নয় তা বলাই বাহুল্য ; অসংখ্যবার পাশ ফেরা, দীর্ঘশ্বাস, কম্বল থেকে পা বের ক'রে আবার ঢুকিয়ে দেয়া— এই সব ব্যায়ামের দ্বারা বিধ্বস্ত না-ক'রে কোনো রাত্রেই ঘুম নামে না ; ফলত যখন চোখ মেলি তখন আলো-জ্বলা দশটা বেলা পেরিয়ে গেছে। সময় নষ্ট, কাজ নষ্ট, কখন প্রাতরাশ, কোথায় লাঞ্চ কিছুরই ঠিক নেই ; দিনগুলি যেন আবোলতাবোলে ছত্রখান। সপ্তাহ যায়, আর-এক সপ্তাহ, রোজ ভাবি অভ্যেস হ'য়ে যাবে, কিন্তু না— দিনে-দিনে আরো বেশি খারাপ লাগছে।

খারাপ লাগার অন্য কারণও নেই তা নয়। ন্যুয়র্কের অনেক ফ্ল্যাট-বাড়িতে বরাদ্দ যে-সব সুবিধে থাকে— যেমন পরিচারিকা, শয্যাদ্রব্য, টেলিফোন ও কর্মপরায়ণ কেরানি— তার কিছুই নেই এখানে, এবং আসবাবপত্র যা আছে তাও যথোচিত বললে ভুল হবে। না-হয় শয্যাদ্রব্য কিনে নেয়া গেলো, টেলিফোন পেতেও দেরি হ'লো না, কিন্তু দৈনিক ঝাঁটপাট হবে কেমন ক'রে? হয় সেটা নিজেদেরই করতে হবে, নয়তো গাঢ় হবে দিনে-দিনে মালিন্য,

অসংস্কৃত মেঝে হবে চক্ষুশূল। আর আমাদের পক্ষে, অন্তত এ-ব্যাপারে, স্বাবলম্বিতা যে অসম্ভব তা বুঝতে দু-চারদিন মাত্র সময় লাগলো। প্রথম কথা, আমরা যখন এসেছিলুম তখনই এই বাসা ছিলো (আমেরিকার পক্ষে) অবিশ্বাস্যরকম অপরিচ্ছন্ন ; পূর্বতন বাসিন্দাদের 'শূকরস্বভাব'ই এ-জন্যে দায়ী, এই খবরটি বহুবার শোনাবার পর বাড়িওলার গোমস্তা আমাদের আশ্বাস দিলে যে 'চার্লি এসে এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে দেবে', কিন্তু তাকে পঞ্চমুদ্রা পারিতোষিক দিতে আমরা যেন না ভুলি। এলো চার্লি, সভ্যযুবক নিগ্রো, বাড়ির দরোয়ান ; কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে সঞ্চালিত হ'লো সে, কিন্তু দেখা গেলো কলের ঝাঁটা ভাঙা, তার হাতেও তেমন উৎসাহ বা পটুত্ব নেই, এদিকে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ নাকি তার আজকের মতো ছুটি হ'য়ে গেলো। বাসস্থলের নির্মলতা-সাধনের জন্য কিছু অর্থব্যয় করার তৃপ্তিটুকু আমরা পেলুম বটে, প্রাক্তন স্থূল আবর্জনাও কিছু-কিছু দূর হ'লো না তা নয়, কিন্তু তেমনি রইলো ধূলিধূসর হ'য়ে মেঝের আচ্ছাদন, জানলার কাচ বিবর্ণ, সব মিলিয়ে আমাদের অবস্থা তেমনি শ্রীহীন। বুঝে নিলুম, চার্লি কিংবা গোমস্তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না ; একটা চলনসই গোছের ঝাঁটাযন্ত্রও ভাঁড়ারে নেই এদের ; আর নিজেরাই যন্ত্র কিনে তোড়জোড় ক'রে লেগে যাবো এমন সময় আমাদের কোথায়, বা সময় যদি বা ক'রে নেয়া যায়, অচিরস্থায়ী প্রবাসে তার সার্থকতা কতটুকু ? মানতেই হবে, আমরা অন্য দু-একটা কাজে অভ্যস্ত থাকলেও ঝাড়পোঁচে তেমন সুদক্ষ হবার সুযোগ পাইনি, আর নতুন বিদ্যে শেখার মতো বয়সও আমাদের অতীত হয়েছে।

এই বাড়ির আর-এক অভিশাপ হ'লো— প্রবেশের ব্যবস্থা। সদর দরজার কাচের পাল্লা দুটি মুখোমুখি ঠেকলেই নিগূঢ়ভাবে বন্ধ হ'য়ে যায়, বাইরে থেকে চাবি ভিন্ন খোলা যায় না। ভিতর থেকে খুলে দেবার জন্য আইনত আছে ডোরম্যান, কিন্তু চার্লিযুগলের উপস্থিতি কেমন অনিশ্চিত ; তারা দেখছি নানাভাবে ব্যস্ত বা অব্যস্ত থাকে ; অনেক সময় কাগজের ঠোঙায় কফি খেতে-খেতে গোমস্তার সঙ্গে আড্ডা দেয়াও তাদের একটা কর্তব্য ব'লে অনুমান করছি। একদিন দুপুর-নাগাদ, দু-হাত বোঝাই সওদাপত্র নিয়ে, আমাকে অসহায় ও বিমূঢ়ভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো ; চাবি আনিনি, কেউ কোথাও নেই ; কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় এক চাবিধারিণী পড়োশিনীর

কৃপায় ভাগ্যে ঢুকে পড়া গেলো। পরে জানলুম, প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্য বাইরে একটি ক'রে বাক্‌যন্ত্র বসানো আছে; তার সাহায্যে বাড়ির অন্য লোকের কাছে প্রবেশপ্রার্থনা জানানো সম্ভব। কিন্তু অন্য লোক যদি কেউ না থাকে? যদি, ধরা যাক, আমরা দু-জনেই রাত্তির বারোটায় ফিরে আবিষ্কার করি যে সদর-দরজার চাবি আনিনি? তাহ'লে কি নিজেদের বাড়ির সামনে শীতে জ'মে ম'রে থাকতে হবে? এটা কল্পনার দৌড় নয় কিন্তু;— ন্যুয়র্কের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনার উল্লেখ শুনেছি।

এই সব···আর তার উপর প্র. ব.র দন্তশূল, অবেদকপ্রয়োগের ফলে ডেনটিস্টের কামরায় তাঁর চৈতন্যলোপ, দুঃখময় রাত্রি, ডাক্তারের কাছে আনাগোনা, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় টেলিফোন, এবং এই সব-কিছুর উপরে, সব-কিছু পেরিয়ে—শীত।

কয়েকদিন অথবা কিছুদিন আগে, যখন উষ্ণ শ্যামল সমুদ্রবিলাসী হনলুলুতে ছিলুম, তখন একটি ঔৎসুক্যজনক বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েছিলো। ছবি: কুয়াশা মেঘ তুষারের আড়ালে ঝাপসা দেখা যায় স্কাইস্ক্রেপার-সারি; একটি মনুষ্যমূর্তি, তার নাকের ডগাটুকু ছাড়া কিছুই অনাবৃত নেই, তীব্র হাওয়ায় ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে কোনোরকমে রাস্তা পার হচ্ছে। নিচে লেখা: 'ওখানে যাবার অত তাড়া কিসের? ধীরে-সুস্থে আরাম ক'রে জাহাজে যান। আমাদের লাইন সবচেয়ে···' ইত্যাদি। কৌতুক অনুভব করেছিলুম এই বিজ্ঞাপন দেখে, ন্যুয়র্কে পৌছবার জন্য আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো ব'লেই কৌতুক। মনে-মনে বলেছিলুম: 'শুনুন, আমার মার্কিনী বন্ধুরা, আপনাদের পক্ষে যা বাৎসরিক ব্যাপার, অভ্যাসে জীর্ণ, গতানুগতিক, তা আমার পক্ষে নতুন, আশ্চর্য, রোমাঞ্চকর— রীতিমতো এক অভিজ্ঞতা। যেমন আপনাদের পক্ষে বরফ থেকে পালাতে চাওয়া, তেমনি স্বাভাবিক তার প্রতি আমার আকর্ষণ— বিশেষত যখন আপনাদের দেশে কেন্দ্রীয় তাপের ব্যবস্থা এমন সার্বিক যে রাস্তায় যেটুকু হাঁটতে হয় তার বাইরে শীতের আর নিপীড়ন নেই। আমার তো ভাবতেই ভালো লাগছে যে বাইরে যখন শূন্যের নিচে অনেক ডিগ্রি নেমে গেছে, তখন একটি উষ্ণল ঘরে ব'সে-ব'সে আমি দেখছি কাচের বাইরে শীতের দৃশ্য— শ্বেতকোমল পাপড়ির মতো নেচে-নেচে নেমে আসছে তুষার, যেন পৃথিবীকে দ্রব ক'রে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশা, তারপর

একদিন যখন পাংশু আকাশে সূর্যদেব উঠলেন, তখন সেই হিমেল রোদে চোখ-ধাঁধানো পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার, তৃণহীন বিস্তীর্ণ শুভ্রতা, কঙ্কালের মতো কালো-কালো গাছগুলি, ঢালু ছাদ থেকে ঝুলন্ত বরফের চিত্রলতা, আমরা কি কোনোদিন এ-সব দেখি যে দেখতে পেলে মুগ্ধ হবো না ?'…শীতের বিষয়ে এই রকম প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতি নিয়ে এক সন্ধ্যায় আইডলওয়াইল্ড বিমানবন্দরে অবতীর্ণ হলুম। প্রথম কয়েকদিন একটি ছোটো হোটেলে কাটলো, আমার কর্মস্থল কাছেই।

প্রসিদ্ধ এই 'ওয়াশিংটন স্কোয়ার পাড়া, মার্কিনী সংস্কৃতির এক আদিভূমি, সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতিময়। কিন্তু এখন এই সবই অনুভূতির বহির্ভূত। যে-তথ্যটি এখন ইন্দ্রিয় ও মনের কাছে সবচেয়ে স্পষ্ট, তা হ'লো— শীত। শহর যেন বরফে চাপা প'ড়ে আছে। উঁচু বরফ ছোটো-বড়ো সব রাস্তায়— মানুষের পায়ে-পায়ে তার শুভ্রতা নেই আর— রং-চটা, নোংরা, জলে কাদায় জঞ্জালে মাখামাখি, নাগরিক আবর্জনায় আবিল। বড়ো রাস্তাগুলিতে মাঝে-মাঝে আসে ক্ষমতাশালী বুলডোজার, কলের শাবল চালিয়ে-চালিয়ে অন্ততপক্ষে বাস্-চলাচল অব্যাহত রাখে, কিন্তু ফুটপাতের দিকে পৌর প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি দেন না, আর যেগুলি ছোটো রাস্তা, যেখানে গৃহস্থের বসবাস বেশি, সেখানে চলে প্রকৃতির খেয়াল অপ্রতিহত। ফুটপাতে পাহাড়ের সারি বাড়িগুলোর একতলা পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে ; মা, বাবা, ছেলেমেয়েরা— পালা ক'রে-ক'রে সবাই খাটছে বরফ সরাতে, নিজের বাড়ির সিঁড়ি আর প্রবেশ-পথটুকু কোনোরকমে ব্যবহার্য রাখা, এর বেশি উচ্চাশা কারো নেই। মাঝে-মাঝেই ঘন আস্তরণে আবৃত যে-সব আকৃতি চোখে পড়ে সেগুলোকে মোটরগাড়ি ব'লে চিনতে একটু দেরি হয়— কখনো-কখনো, হঠাৎ তুষারবৃষ্টি নেমে এলে হয়তো দু-ঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় ঘটে অবরোধ, তখন মালিকেরা যেখানে-সেখানে গাড়ি ফেলে চ'লে যান, তাছাড়া উপায় থাকে না, বরফ গললে তবে গাড়ি উদ্ধার হবে।* একদিন শুরু হয়

* ন্যুয়র্কবাসীরা, ধনী হ'লেও, গাড়ি কম রাখেন; তার প্রথম কারণ পার্ক করার স্থানাভাব, দ্বিতীয় কারণ শহরের পথে ট্র্যাফিকের মন্থরতা, তৃতীয় কারণ ট্রেন ও সাব-ওয়ের দ্রুতি ও প্রাচুর্য, চতুর্থ কারণ শীত ঋতুতে গাড়ির সচলতার অনিশ্চিতি। যদি আড়াই মিনিট পর-পরই লাল আলোর সামনে দাঁড়াতে হয়, দেড় মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে তবে পৌঁছতে হয় গন্তব্যে, যদি বছরের কঠিনতম সময়েই গাড়ির সুবিধে না পাওয়া যায়, আর সত্যি যদি ভূতলযানই সবচেয়ে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হয়, তাহ'লে আর গাড়ি রেখে লাভ কী ?

বরফ গলা ; যা ছিলো কঠিন তা চুঁইয়ে পড়ে, গড়িয়ে নামে, ছড়িয়ে যায়, ব'য়ে চলে স্রোত হ'য়ে পঙ্কিল, তারপর আবার আকাশ কালো ক'রে নামে কুয়াশা, সূক্ষ্ম বৃষ্টি, শব্দহীন, প্রতিকারহীন তুষার।

'আপনাদের দেশে যন্ত্রের এত উন্নতি হয়েছে, অথচ রাস্তার বরফ সরানো যায় না কেন?' 'রাস্তার বরফ?' নিমন্ত্রণকর্তা সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে। 'সরাতে গেলে প্রতি বর্গ ফুটে খরচ হবে তিন ডলার ; এখন ভেবে দেখুন ন্যুয়র্ক কত বড়ো, ব্যয়ের পরিমাণও চিন্তা করুন। আর যদি বা সেই টাকা জোগাড় হয়— হওয়া শক্ত, কিন্তু হ'লেও— সারা শহরের বরফ মিলোলে একটি হিমালয় কি রচিত হবে না? তা আপনি ফেলবেন কোথায়? হাডসন নদীতে? কিন্তু নদীর স্রোত বন্ধ হ'য়ে যায় যদি? খাবার জল চাই, জাহাজের আনাগোনা চাই, রাস্তার বরফ সে-তুলনায় এমন-কিছু সমস্যা নয়। মজা দেখুন, ন্যুয়র্ক আর নেপলস-এর একই অক্ষাংশ, এখানে এত ঠাণ্ডা হবার কোনো কথাই ছিলো না, কিন্তু কানাডা আর আমাদের মধ্যে কোনো পাহাড় নেই ব'লে উত্তরমেরুর বরফ আর ব্লিজার্ড একেবারে সোজা চ'লে আসে— এই হ'লো মুশকিল।'

শীতের অনুভূতির বর্ণনা দেবার কি চেষ্টা করবো? আবরণের চাপে দ্বিগুণিত ওজন নিয়ে টলতে-টলতে রাস্তায় বেরোলাম। প্রথম কয়েক মিনিট ঘরের তাপ গায়ে লেগে থাকে, কিন্তু তারপরই পিঠ যায় বেঁকে, দেহ বিবশ, এক হিম চেতনার মধ্যে লুপ্ত হয় অন্য সব ইন্দ্রিয়বোধ। মেঘলা দিন? রোদ্দুর? না কি তুষার? যেটাই হোক, কিছু এসে যায় না, একই কথা আমাদের পক্ষে। সকাল? দুপুর? রাত্রি? একই কথা। রোদ যেন বরফ-গলা জল, আর যদিও জনরব শুনি যে তুষারপাতে শীতের মাত্রা ক'মে যায় সেটাও আমাদের অভিজ্ঞতায় ঠিক ধরা দেয় না। ডাকবাক্সে চিঠি ফেলতে বা সিগারেট ধরাতে যদি পকেট থেকে হাত বের করি কখনো, আঙুলগুলো অসহযোগ ঘোষণা করে, আর যদি মিনিটখানেক বাইরে হাত ঝুলিয়ে রাখি তাহ'লে মনে হয় ওটা আমার কাঁধের সংলগ্ন হ'য়ে থাকতে আর রাজি হচ্ছে না, ভারি হ'য়ে-হ'য়ে এক্ষুনি ছিঁড়ে প'ড়ে যাবে। হাতে কোনো জিনিশ থাকলে দস্তানা ভিন্ন উপায় নেই, কিন্তু দস্তানা হাতে কাজ আর বেতো পায়ে নৃত্য প্রায় একই রকম ব্যাপার। পাঁচ, সাত, দশ মিনিট হাঁটার পর আর যেন পারা

যায় না ; তখন যে-কোনো ড্রাগ-স্টোর— ঢুকে পড়ামাত্র আরাম, যাকে বলে হাড়-জুড়োনো ঠিক তা-ই, তাপ যেন ঘুমের মতো, নেশার মতো সারা শরীরে আমেজ এনে দেয়। এক পেয়ালা চা, আবার কষ্ট, কিছুক্ষণ পরে আবার কোথাও ঢুকে পড়া। কেনাকাটা, দৃশ্য দেখা, বা অন্য কোনো কারণে যদি হাঁটাহাঁটি করতে হয় তাহ'লে এ-ই হ'লো টেকনীক। আর যদি বয় পিশাচীর মতো বাতাস*— বরফ ছড়াতে-ছড়াতে উত্তরমেরু থেকে উড়ে এসে গালের মাংস উপড়ে নিতে চায়, তখন যেন কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেলে লোকেরা ; খালি ট্যাক্সি হাত তুললে থামে না, কিংবা— শৃঙ্খলা ও সাধারণ ভদ্রতা ভুলে গিয়ে, কেউ-কেউ ছুটে এসে গায়ে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে সেই ট্যাক্সিতে, আমরা যেটাকে আগে থামিয়েছিলুম। নিয়মনিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গসমাজে এ-রকম ঘটনা প্রত্যাশিত নয়, স্বাভাবিকও নয়, এর জন্য দুঃখ জানাবার মতো অপরিচিত সজ্জনও রাস্তাতেই জুটে যায় ;— স্থানীয় লোকেদের মধ্যে শীত কী-রকম ত্রাসের সঞ্চার করে তারই উদাহরণস্বরূপ এটা উল্লেখ করলুম।

ক-দিন ধ'রে সমানে বরফ পড়ছে। সবেমাত্র পনেরো স্ট্রীটের নিরালোক ফ্ল্যাটে এসেছি, ডাকের ঠিকানা এখনো আমার কর্মস্থল। দু-দিন ছেলেমেয়েদের চিঠি পাইনি ; আজ নিশ্চয়ই আসবে এই ভেবে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তা প্রায় দেখা যায় না, সব বরফ। রবারের জুতোয় মোড়া ভারি পা, পাঁচ পল্লা পশমের আচ্ছাদনে পরিস্ফীত দেহ, আবৃত শির, আবৃত কান, সজল চক্ষু ও নাসিকা— এই সব নিয়ে, সাবধানে, পরস্পরকে সাহায্য ক'রে-ক'রে, বন্ধুর ও পিচ্ছিল পথে ধীরে এগোচ্ছি। পথিক বেশি নেই, বরফের মধ্যে একটি আঁকাবাঁকা পদরেখার উপর দিয়ে পা টিপে-টিপে চলছে সবাই, কেউ কাউকে অতিক্রম করছে না, কেউ বা হঠাৎ পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছে। এইভাবে দেড়

---

* অনেকদিন আগে, এক নায়িকার 'কুন্তলা' নামকরণ ক'রে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলুম। 'কুন্তলা' ও 'অনিলা' বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিলো যে চুলকে 'চুলানি' বা হাওয়াকে 'হাওয়ানি' বলার কোনো মানে হয় না। (তখনও বাংলাদেশে 'ছন্দা' 'স্বপ্না' 'জয়িতা' প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।) কিন্তু 'পিশাচীর মতো বাতাস' ব্যাকরণসংগত হোক বা না-ই হোক, সার্থকতায় তর্কাতীত, কেননা পিশাচের চাইতে পিশাচীরা যে অনেক বেশি নিষ্ঠুর এ-বিষয়ে মুনিজনেরা সর্বত্র একমত।

মাইল পথ পেরিয়ে এসে ব্যর্থ হ'তে হলো : চিঠি নেই। ফেরার পথে লাঞ্চ খেয়ে নিতে হবে, কিন্তু সিক্সথ এভিনিউতে পনেরো মিনিট ধ'রে হেঁটে একটি আহারস্থল পাওয়া গেলো না। আছে সারি-সারি অনেকগুলো, কিন্তু বাইরের চেহারা পছন্দ হয় না আমাদের, আর যেটাকে মনে হয় আমন্ত্রণকারী, সেটাই বরফের স্তূপে দুর্গের মতো দুষ্প্রবেশ্য হ'য়ে আছে। অবশেষে কী ভাগ্যে চোখে পড়লো 'হাওয়াইয়ের কোণ,' তার দ্বার নির্বাধ, অভ্যন্তর সুচারু, খাদ্য ও পরিবেষণ রুচিসম্মত। সেখান থেকে যখন বেরোলাম, তখন মনে হ'লো তুষার আরো ঘন, আকাশ আরো অন্ধকার। রাস্তা যানবিরল, ট্যাক্সি নেই, আমরা সাবওয়ের নিশানা ঠিক জানি না। বাস্-এর জন্য দাঁড়াবো ? না, দাঁড়ানো অসম্ভব, বায়ুমণ্ডল ছুরির মতো বিঁধছে, বরং পা চালালে দেহ অন্তত নিঃসাড় হবে না। একই ভাবে, সবচেয়ে ব্যস্ত প্রহরে স্তব্ধ-হ'য়ে-থাকা পথ বেয়ে-বেয়ে, কোনো-এক সময়ে বাড়ি ফিরে এলুম।

পরের দিন কাগজে সবচেয়ে বড়ো খবর বেরোলো— শীত। এমন ঠাণ্ডা নাকি পঁচাত্তর অথবা পঁচাশি বছরের মধ্যে পড়েনি। অনেক ট্রেন বন্ধ ছিলো, অনেক প্লেন অচল ; বাস্, গাড়ি আটকে গেছে হাইওয়েতে। ছবি দিয়েছে : মানহাটানের বিজন বড়ো রাস্তায় চলেছে দু-একটি দুঃসাহসী পথিক। আমরা দুই বাঙালি যে গতকাল রাস্তায় বেরিয়ে বীরত্বের কাজ করেছিলুম সেটা তখন জানতে পারলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম হ'তে পারতো।

মৃত্যুর মতো এই শীত, মৃত্যুর এক অবিকল চিত্রকল্প। শুধু ঘাস ফুল পল্লবের নয়, মানুষের পক্ষেও এর আক্রমণ করাল ; কিন্তু মানুষ কী-ভাবে তার অবস্থার উপর জয়ী হয়েছে, গ'ড়ে তুলেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, তা এবার ন্যুয়র্কের এই আর্ত ফেব্রুয়ারিতে উপলব্ধি করা গেলো। আগে একবার পিটসবার্গে এক শীত কাটিয়ে গিয়েছিলাম ; আমার বাসায় যথোচিত তাপ ছিলো না ব'লে কষ্ট পেয়েছিলাম অনেক বেশি— রাত দশটার পর থেকে দু-তিন বার ক'রে চা খেতে হ'তো ; দুটো বা তিনটে নাগাদ অগত্যা শবশীতল শয্যায় আশ্রিত হ'য়ে বহুক্ষণ ঘুমোতে পারতুম না। কিন্তু একে এবার শীত আরো তীব্র, তুষারপাত অনেক বেশি নিবিড়, তার উপর এই মহানগরে যত বিচিত্রভাবে ঋতুর শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে, কোনো মফস্বলে তা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। সত্য ব'লে অনুভব করছি টয়নবীর ঘোষণা যে প্রকৃতি মানুষকে

মৌলিকভাবে যুদ্ধে ডাক দেয়, আর তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারলে তবেই ঘটে মানবসভ্যতার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ, মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে যা উদ্বোধিত ক'রে তোলে তা আনুকূল্য নয়, বিরুদ্ধতা— বা বিরুদ্ধতাকেই আনুকূল্যে রূপান্তরিত করার প্রেরণা।

কিন্তু যাকে আমরা সভ্যতা বলি তার সবচেয়ে রহস্যময় উদ্ভাবন হ'লো সৌন্দর্যবোধ। যাতে আছে ব্যবহারিক সুবিধে, বা আমাদের জৈব প্রবৃত্তির পক্ষে যা উপযোগী বা উপকারী, শুধু তা-ই নয়— যা ক্ষয়িষ্ণু, স্খলনোন্মুখ, মৃত্যুর দ্বারা স্পৃষ্ট, তাও আমাদের মন ও দৃষ্টিকে আবিষ্ট করে— হয়তো বা বর্তমান কালে তারই আবেদন প্রবলতর। সন্ধ্যা, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, হেমন্তর কুয়াশা বা পিঙ্গল পত্ররাশি— এ-সবে যিনি সৌন্দর্য খুঁজে পান না, যিনি শুধু প্রভাত, পূর্ণিমা ও বসন্ত ঋতুর অনুরাগী, তিনি যে সংবেদনে দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই উত্তরদেশের তুষারও যে মনোহরণ রূপ নিতে পারে তা আমাকে নতুন ক'রে মানতে হ'লো এক রাত্রে, যখন দূরবর্তী শহরতলিতে এক বাঙালির গৃহে নিমন্ত্রণ সেরে, আকাশের তলায় বেরিয়ে এলাম। স্তব্ধ প'ড়ে আছে ধবল হ'য়ে প্রান্তর, কালির আঁচড়ের মতো দূরে-দূরে নিষ্পত্র গাছগুলো, হলদে আলো ছড়ানো-ছিটানো জানলায়— কিন্তু তা ছাপিয়ে অন্য এক আভায় উদ্ভাসিত যেন পৃথিবী, ধবলের আভা, বিস্তীর্ণ তুষারের বিকিরণ। পূর্ণিমার রাত মেঘলা হ'লে যেমন হয় ঠিক তেমনি, যেন রূপসীর বসনচ্ছুরিত গাত্ররূপ, যেন আকাশ ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে স্নিগ্ধ নীলাভ স্বপ্নময় এক নিস্রাব। টাটকা নরম বরফের মধ্যে পা ডুবিয়ে-ডুবিয়ে, কোনোরকমে গৃহকর্তার গাড়িতে পৌঁছনো গেলো, তিনি তা শম্বুক-গতিতে চালিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলেন সাবওয়ে-স্টেশনে। বাড়ির কাছে ভূতল থেকে উঠে দেখি সেখানেও আলো হ'য়ে আছে রাত্রি, একদল যুবক বরফ নিয়ে খেলা করতে-করতে কলহাস্যে পথ চলেছে।

* * *

দুই সপ্তাহ বিবরবাসী হ'য়ে কাটাবার পর প্র. ব. একদিন বাসা-বদলের প্রস্তাব করলেন। শাস্ত্রের যে-সব বচন আমি কিছুতেই মানতে পারি না, 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী' তার অন্যতম। তার কারণ, জীবনে আমি অনেকবার স্ত্রী-জাতির পরামর্শের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আমার স্বভাবে জাড্য দোষ কিছু বেশি, কোনো

একটা অবস্থা যতক্ষণ সহনীয় থাকে ততক্ষণ তার পরিবর্তনে আমি এতদূর পর্যন্ত অনুৎসুক যে ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের নড়চড় হ'লেও আমার প্রতিবাদ সরব হয়ে ওঠে। আমাদের পনেরো স্ট্রীটের বাসাটাকে ঠিক সহনীয় বলা যায় না, কিন্তু তার সঙ্গেও আপোশ ক'রে নিতে আমি মনে-মনে প্রস্তুত ছিলুম : এটা ছেড়ে যাওয়া যে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, উপরন্তু সম্ভবপর, এই চিন্তায় একজন মহিলাই আমাকে উত্তেজিত করলেন। খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা শুরু হ'লো। গ্রীনিচ গ্রামে জলের দরে পাওয়া যাচ্ছে স্টুডিও, ছোটো ফ্ল্যাট— বর্ণনা প'ড়ে ভালোই মনে হয়। টেলিফোনে প্রথম প্রশ্ন : 'ম্যান অ্যাণ্ড ওয়াইফ ?'— শুধু স্বামী-স্ত্রী তো ? (সন্তান-সহ দম্পতিকে দেয়া হবে না।) শেষ প্রশ্ন : 'কতদিনের জন্য ভাড়া নেবেন ?' 'তিন মাস।' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব : 'দুঃখিত, আমরা দু-বছরের লীজ় চাই।' কয়েকবার এ-রকম অপঘাতের পরে আমি ভেবে দেখলুম যে এরা যাকে অ্যাপার্টমেণ্ট-হোটেল বলে, আমাদের পক্ষে তারই একটা হবে সবচেয়ে উপযোগী ; সেখানে কোনো অর্থেই সময়ের বাঁধাবাঁধি নেই, এবং আছে দৈনিক পরিচর্যা ও অন্য অনেক সুবিধাজনক আয়োজন। আগের বারে অন্য পাড়ায় এমনি একটি আশ্রয় পেয়ে ন্যুয়র্ককে ভালোবাসতে শিখেছিলুম। একদিন 'ভিলেজ'-এর এক গলির মধ্যে ও-রকম একটি অ্যাপার্টমেণ্ট দেখাও হ'লো। ভাড়া অবিশ্বাস্য শস্তা, কর্তৃপক্ষের গরজও প্রকট— কিন্তু লিফট চলে কি চলে না, দুটি ঘরই ক্ষুদ্রাকার, আর কেমন একটা বস্তাপচা দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আবার বিজ্ঞাপন খুঁজে-খুঁজে প্র. ব. এক হোটেলের সন্ধান পেলেন ; রাস্তার নম্বর দেখে বোঝা গেলো মোটামুটি কাছেই ; আমার কর্মস্থল থেকে বেশি দূরে যেতে চাই না আমরা। মেঘলা দুপুরে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম দু-জনে— যেতে-যেতে অন্য বাড়ি হয়তো চোখে প'ড়ে যাবে, সেই সম্ভাবনাও রইলো। তেইশ স্ট্রীটে, আট এভিনিউর পশ্চিমে, পাওয়া গেলো ইংরেজ নামসম্পন্ন কিংস আর্মস হোটেল। ঝকঝকে চেহারা, আশায় বুক বেঁধে বারো তলায় উঠে গেলুম। কী আলো, কী উজ্জ্বলতা, বিরাট বৃত্তাংশ নিয়ে জানলার বাইরে আকাশ! আসবাবপত্র আধুনিক, দিনের সোফা রাত্রে বিছানা হ'য়ে যায়, বসার ঘরে দেয়াল-সংলগ্ন কিচেনেট, নিষ্কলুষ বাথরুম। প্রয়োজনীয় সবই আছে কিন্তু ঘর দুটি এমন হৃদয়হীনভাবে অপরিসর যে চলতে-ফিরতে দু-জন মানুষেই ঠোকাঠুকি হ'য়ে যায়— এর মধ্যে, বন্ধুবান্ধব

আহ্বান করা দূরে থাক, নিজেদের ঘরকন্না লেখাপড়া ইত্যাদি কী ক'রে চলবে তা-ই ভেবে পাওয়া শক্ত। দ্বিধান্বিত বিষণ্ণ মনে তেইশ স্ট্রীট ধ'রে ফিরতে-ফিরতে সাত এভিনিউর কাছাকাছি এসে চোখে পড়লো সাইনবোর্ড— চেলসী হোটেল। আমি কিছুটা হতোদ্যম হ'য়ে পড়েছিলুম, কিন্তু, প্র. ব. বললেন, চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? আচ্ছা, দেখা যাক।

এবারে যে সবই আমাদের পছন্দমতো জুটে গেলো সেটাকে ভাগ্যের দয়া ছাড়া আর কী বলবো? 'ঠিক আছে, আটাশ তারিখেই আসবেন আপনারা, আমি ঘরদোর সাফ করিয়ে রাখবো—' ডেস্কের কেরানির এই কথাগুলো আমাদের কানে মধুবর্ষণ করলে। দীর্ঘাকার সহাস্য পুরুষ, জন্মস্থল জর্মানি, তখন নাম ছিলো আপ্‌ফেলবাউম বা 'আপেল-বৃক্ষ', এখন সরলতর মিঃ আপেল-এ পরিণত হয়েছেন। 'আগাম ভাড়া দিয়ে যাবো?' 'দরকার নেই— তা ইচ্ছে হ'লে দিতে পারেন।' আমার দেবারই ইচ্ছে হ'লো; ব্যাপারটাতে কোথাও একটু ফাঁক রেখে লাভ কী? সপ্তাহান্ত কাটিয়ে এলুম ওয়াশিংটনে এক বন্ধুর আতিথ্যে; ফিরে এসে বাসা-বদল।

চার তলায় উজ্জ্বল ফ্ল্যাট। দু-খানা ঘরই বেশ বড়ো, আসবাবপত্র যথেষ্ট ও সুশ্রী, রান্নাঘরে প্রসারে বা ব্যবস্থায় কোনো কার্পণ্য নেই। চারটে 'ফরাশি' জানলা রাস্তার দিকে— আসলে দরজা সেগুলো; লোহার রেলিং-বসানো সেকেলে ব্যাল্কনিও আছে, যদিও শীতের প্রকোপে বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব। কিন্তু ইচ্ছে হ'লে ঘরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় তেইশ স্ট্রীটের জনতা, দোকানপাট, রাত্রে নিয়নবাতির বর্ণচ্ছটা, তুষার, বৃষ্টি, সন্ধ্যারাগ। মানহাটানের ভূগোল বেশ সরলভাবে জ্যামিতিক; বড়ো রাস্তাগুলি চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, সেগুলোকে এরা বলে এভিনিউ— হোটেল, দোকান, আপিশ, বাণিজ্য বেশির ভাগ সেখানে। আর পুবে-পশ্চিমে রাস্তাগুলোকে বলে স্ট্রীট, সেগুলো আবাসিক পল্লী, কিন্তু মাঝে-মাঝে এক-একটা স্ট্রীটকেও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে— যেমন আমাদের পাড়ায় 'গরিবের ফিফথ এভিনিউ' চোদ্দ স্ট্রীট, তারপর তেইশ, তেইশের পরে চৌত্রিশ, বিয়াল্লিশ, ইত্যাদি। আমাদের যে বড়ো রাস্তায় বাসা জুটলো, আর ঘর থেকে যে উদারভাবে রাস্তা দেখা যায়, এটাও খুব সুখের হ'লো আমার পক্ষে; এক শতকের চতুর্থাংশ কাল রাসবিহারী এভিনিউতে কাটাবার ফলে আমি হাড়ে-হাড়ে নাগরিক হ'য়ে গিয়েছি:

মাঝে-মাঝে যান, দোকান ও পথচারী আবালবৃদ্ধবনিতার দিকে তাকিয়ে থাকা আমার জীবনের একটি প্রধান বিনোদন।

সবদিক থেকেই ফ্ল্যাটটি ভালো। রবিবার ছাড়া রোজ ঝাঁটপাট দিয়ে যায় নিগ্রো পরিচারিকা ; প্রতি সপ্তাহে বদলে দেয় বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড়, বাথরুমে ছিটিয়ে দেয় বীজাণুনাশক রাসায়নিক, রান্নাঘর ধুয়ে-মেজে ঝকঝকে ক'রে তোলে। মিঃ আপেল ও তাঁর সহকর্মীরা সুভদ্র, মনোযোগী, সহায়তায় উৎসুক ; টেলিফোনের কেরানি-মেয়েটি মধুরহাসিনী ; যখন আমরা বাড়ি নেই তখন কোনো টেলিফোন এলে নির্ভুলভাবে বার্তা পাওয়া যায় ; সারারাত সামনের দরজা খোলা, আর ডেস্কেও লোক থাকে ব'লে কুঞ্চিকানির্ভর ভয়াতুর জীবন কাটাতে হয় না। অর্থাৎ, আমাদের প্রাক্তন ফ্ল্যাটে যা-কিছু ছিলো দুঃখ-জনক অভাব, তার কোনোটাই নেই এখানে। এবং এতগুলো সুবিধের তুলনায়, ও ন্যুয়র্কের হিশেবে, ভাড়ার অঙ্কটাও অনুগ্র। উপরন্তু, দু-একদিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারলুম, এই চেলসী হোটেলের বয়স প্রায় নব্বুই বছর, আমেরিকার পক্ষে প্রাচীন বললে অত্যুক্তি হয় না ; আর এটি প্রথম থেকেই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিবাসরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এডগার লী মাস্টার্স বহুকাল কাটিয়ে গেছেন এখানে, টমাস উলফের প্রথম উপন্যাস নাকি এই হোটেলে ব'সে লেখা হয়েছিলো, ডিলান টমাস ন্যুয়র্কে এসে এখানেই উঠতেন। এমনি আরো গৌরবের কথা ম্যানেজার মশাই শোনালেন আমাকে, এ-মুহূর্তেও সাহিত্যিক অধিবাসীর অভাব নেই। আমাকে মনে-মনে মানতে হ'লো যে আমরা না-জেনে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি।

চেলসী হোটেল আমাদের ভালো লাগার আর-একটি ক্ষুদ্র কারণ উল্লেখ করি। দেখা গেলো, বাথরুমে একটি-দুটি আরশোলা কখনো বা ঘুরে বেড়ায়। যাকে বলে অ্যাট হোম, আমাদের অনুভূতি হ'লো আক্ষরিক অর্থে তা-ই ; আর আমেরিকা যে আসলে একেবারে নির্মমভাবে নির্বীজ নয় তার প্রমাণ পেয়েও তৃপ্তি পাওয়া গেলো।* প্র. ব. কিনে আনলেন ঘর সাজাবার আরো

* পরে শুনলুম, এক মার্কিন মহিলা তাঁর রান্নাঘরে হঠাৎ একটি আরশোলা দেখতে পেয়ে এতদূর পর্যন্ত ভীত হয়েছিলেন যে মধ্যরাত্রে স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে, জিনিশপত্র সব পরিত্যাগ ক'রে, গাড়ি হাঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ চ'লে গিয়েছিলেন বহুদূরে অন্য এক শহরে। আর-এক মহিলার কথা

কিছু উপকরণ, আমরা গুছিয়ে বসলুম ; শীতের নির্যাতন প্রশমিত হ'য়ে রইলো তার তীক্ষ্ণতা ; ন্যুয়র্কের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা আরম্ভ হ'লো।

শুনেছিলুম, যিনি ভারতে এসে ডিম ছাড়া কোনো স্থানীয় খাদ্য গ্রহণ করেননি ; তাঁর স্বামীর পাঠানো টিনের খাবার এয়ার-পার্সেলে পৌঁছলে, তবে তাঁর প্রাণধারণ হ'তো। এবং এমন শাকাহারী ভারতীয়ের কথাও শোনা গেছে, যিনি কোপেনহেগেনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে ঢুকে গেছেন— রাঁধুনিরা তাঁর খাদ্যের মধ্যে কোনো আমিষরূপী বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে কিনা, তা-ই পরীক্ষা করতে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সব দেশেই পাওয়া যায়, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁরা সব দেশেই বিরল।

২

ভ্রমণ ব্যাপারটা উপন্যাস পড়ার মতো। যতক্ষণ অভিজ্ঞতাটি ঘটছে ততক্ষণ তাতে মগ্ন হ'য়ে আছি ; কিন্তু— যত ভালো উপন্যাসই হোক— কিছুদিন পরেই অনুপুঙ্খগুলো ভুলে যাই, ঘটনাস্রোত হারিয়ে ফেলে তার পারম্পর্য, পাত্রপাত্রীরা অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। শুধু ভ্রমণ কেন, সমস্ত জীবনটাই এই রকম, কিন্তু এখানে তত্ত্বালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, যেমন উপন্যাস পড়ায় তেমনি ভ্রমণে, শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে যা সঞ্চিত ও সন্নিবিষ্ট থাকে, তা কিছু আবহ, কয়েকটি ছবি, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা হয়তো, এবং সেই লেখক অথবা দেশ সম্বন্ধে কিছু ধারণা। আমার দু-বারের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দু-একটা ধারণাকে এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে হয়তো অবান্তর হবে না। আমি প্রথম প্রতীচ্য দেশে এসেছিলুম মধ্যবয়সে, ততদিনে, সাহিত্যচর্চার বদভ্যাসের ফলে, তার প্রায় কিছুই আমার পক্ষে নতুন ছিলো না। তবু, বই পড়া আর চোখে দেখার একটা তফাৎ থাকেই, যদিও সেটা ঠিক কী-ভাবে অনুভূত ও সংকলিত হয় তা বলা খুব শক্ত। সেখানে যাবার আগে আমার যা ধারণা ছিলো, প্রতীচ্য পৃথিবী তা থেকে কিছু আলাদা নয়, কিন্তু সাহিত্যপাঠের স্মৃতির সঙ্গে এখন কয়েকটা জৈবনিক স্মৃতি যুক্ত হয়েছে। তার একটা অন্য রকম স্বাদ আছে তা মানতেই হবে।

'প্রতীচ্য পৃথিবী' কথাটা বড্ড বড়ো হ'লো, য়োরোপীয়রা যেমন তুর্কি থেকে জাপান পর্যন্ত সমগ্র 'প্রাচী'কে একই বস্তার মধ্যে পুরে ফেলার চেষ্টা ক'রে ভ্রান্তিতে মজেন, এও যেন তেমনি শোনাচ্ছে। কিংবা হয়তো তা নয় ; কেননা ইংলণ্ডের সঙ্গে ইটালির আচারে-ব্যবহারে যতটা পার্থক্য, তার চেয়ে বেশি পার্থক্য (এখন পর্যন্ত) বাংলার সঙ্গে তামিল প্রদেশের ; আর আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য (অন্ততপক্ষে 'গভীর দক্ষিণ' বাদ দিলে) প্রাকৃতিক, তাত্ত্বিক অথবা অনুমেয় ব্যাপার, সামাজিক তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু অন্য এক প্রভেদ, সেবারে যখন প্রথম দেশান্তরে যাই, আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো : তা আমেরিকার সঙ্গে য়োরোপের। এবং আবাল্য য়োরোপীয় সাহিত্যের প্রেমিক হ'য়েও, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে এই তুলনায় সর্বতোভাবে য়োরোপের প্রতি পক্ষপাতী হ'তে পারিনি।

অভারতীয় পৃথিবীর যে-অংশ আমি প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলাম, এবং একমাত্র যেখানে আমি বসবাস করেছি, তা হ'লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লণ্ডনে বিশ্রামের জন্য একরাত মাত্র কাটিয়ে, সেবারে সোজা উড়ে যেতে হ'লো কলকাতা থেকে ন্যুয়র্কে। সেই দেশে কাটলো প্রায় এক বছর— ক্লাশ পড়িয়ে, বক্তৃতা ক'রে, প্লেনে, ট্রেনে, বাস্-এ অথবা বন্ধুর গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে, স্থিত অথবা ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়। পূর্ব থেকে পশ্চিম তট পর্যন্ত অনেকগুলো রাজ্যে, শহরে, বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ হ'লো। রাত কাটলো দামি হোটেলে, শস্তা হোটেলে, বিশ্ববিদ্যালয়িক অতিথিশালায়, কখনো ছাত্রাবাসে, কখনো বা সাহিত্যিক বা অধ্যাপকের ছাদের তলায়। পথে-পথে বন্ধু পেলাম অনেক; তাঁদের কারো-কারো সঙ্গে, দূরত্ব সত্ত্বেও এখনো আমার সংযোগ ছিন্ন হয়নি। তারপর দেশে ফেরার পথে য়োরোপ : সেই জগজ্জয়ী মহাদেশে পদার্পণ ক'রেই চমক লাগলো।

প্রথম চমক : এত মলিন য়োরোপ! এমন অনিপুণ! এরা তো আমাদের মতো নির্ধন নয়। আর এদের কি কথার কোনো মূল্য নেই? মনে পড়ে লণ্ডনের হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। বাইরে শীত, ট্যাক্সিওলা কর্কশ। ডেস্কের কেরানিটি আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে বললে, আজ রাতে ঘর দিতে পারবে না। 'তার মানে? কুড়ি দিন আগে থেকে রেজ়ার্ভেশন আছে আমার!' 'আপনার পৌঁছতে দেরি দেখে সে-ঘর আমরা অন্যকে দিয়ে দিয়েছি।' 'জাহাজ বা ট্রেন যদি দেরি করে তার জন্য আমি দায়ী নই!' 'আপনাকে অন্য হোটেল ঠিক ক'রে দিচ্ছি।' 'না, অন্য হোটেলে আমি যাবো না, এখানেই আমাকে ঘর দিতে হবে।' লোকটি দিলে আমাকে ঘর, কিন্তু, নিজেকে অসাধু ও অনৃতভাষী প্রমাণ ক'রে তারপর দিলে। মনে-মনে না-ব'লে পারলুম না, 'আমেরিকায় কখনো এ-রকম হ'তে পারতো না।' ঘরের সংলগ্ন বাথরুম নেই, পরদিন সকালে উঠে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো, আর ভিতরে গিয়ে যা দেখলুম তা এত অপরিচ্ছন্ন যে স্নান করতে প্রবৃত্তি হ'লো না। দেয়ালে ঝুলছে নোটিশ : 'স্নানের পরে টব পরিষ্কার করবেন।' আবার মনে জাগলো আমেরিকার সঙ্গে তুলনা, সেখানকার সাধারণ হোটেলেও এই রকম মালিন্য বা নির্দেশ কল্পনাতীত। যে-হিস্পানি রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলুম সেখানে আইসক্রীম চেয়ে অপ্রস্তুত হ'তে হ'লো ;

'আপনার কি ধারণা এখনো আমেরিকায় আছেন ?' টিপ্পনি কাটলেন আমার ইংরেজ বন্ধু। জুলাই মাসেও সে-বছর বেশ ঠাণ্ডা ছিলো, প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাপের ব্যবস্থা বন্ধ— কেননা ঋতুটা যে পঞ্জিকামতে নিদাঘ। প্যারিসে এসে দেখলাম ভদ্রোচিত এমন এক বাসা, যেখানে স্নানের কোনো ব্যবস্থা নেই— বাসিন্দারা মাঝে-মাঝে ভাড়াটে বাথরুমে পয়সা দিয়ে মার্জিত হ'য়ে আসেন। কান্‌-এ যাবার পথে কষ্ট পেলুম ট্রেনে, বসার ও শোবার ব্যবস্থা অনুদার, যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পর্যন্ত আছে, সারারাত এক ফোঁটা পানীয় জল জুটলো না। এমনি সব বৈষম্য ধরা পড়লো পদে-পদে। মনে হ'লো য়োরোপ যে আমাদের ও আমেরিকার মধ্যবর্তী দেশ, তা শুধু ভৌগোলিক নয়, অন্য অর্থেও ; জীবন-যাপনের মানে আমাদের সঙ্গে য়োরোপের যতটা, য়োরোপের সঙ্গে আমেরিকারও প্রায় ততটাই পার্থক্য।

আমি জানি, তথ্য ও গণিতের সাহায্যে আমার এই কথাটাকে দেড় মিনিটে অপ্রমাণ ক'রে দেয়া যাবে। এবং এও আমি মানতে বাধ্য যে আমার এই লেখাটা বিম্বধর্মী, অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আমার মন যে-ভাবে সাড়া দিয়েছে, আমার 'উপাদান' তা ভিন্ন আর-কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মন বিনা চেষ্টায় যে-সব বিম্বকে গ্রহণ করে, আমাদের অনুভূতি, আমাদের ইন্দ্রিয় ও সহজবুদ্ধির দ্যোতনা— সত্যানুসন্ধানে এ-সবের কোনো মূল্য নেই, তা-ই বা কেমন ক'রে বলি ? ইংলণ্ডের গৌরবময় ইতিহাস, তার ভাষা, সাহিত্য ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়— সব সত্ত্বেও লণ্ডনে এসে আমি যে ঠিক সুখী হ'তে পারলাম না, দেশটাকে মনে হ'লো কৃপণ ও বিবর্ণ, এটাকে নিতান্তই আমার দুর্ভাগ্য ব'লে ভাবলে বোধহয় ভুল হবে, কেননা, যতদূর মনে পড়ে, আমার আগে কোনো-কোনো বৈদেশিক অতিথি অনুরূপ ধারণা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। হয়তো এটাই ইংলণ্ডের চরিত্র— অর্থাৎ অতিথির পক্ষে তা-ই, এদিক থেকে আমেরিকায় সে উল্টো যে দীর্ঘকাল বসবাস না-করলে তাকে ভালোবাসা অসম্ভব।

দ্বিতীয় চমক : য়োরোপীয় শ্রেণীভেদ। আমেরিকায় এসে প্রথম এক মাসের মধ্যেই আমি যা গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম, আর যেখানে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, তা মানুষের মর্যাদা ও মুক্ত শ্রী। প্রত্যেক মানুষ এখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে ;

কারো পিঠ বাঁকা নয়, কেউ হাত কচলায় না, যাকে বলে চোখ রাঙানো তাও দৈনন্দিন সামাজিক ও কর্মজীবনে সম্ভবপরতার বহির্ভূত। ধনে, বৃত্তিতে ও শিক্ষাদীক্ষায় প্রভেদ আছে নিশ্চয়ই— সেটা অনিবার্য, কিন্তু মানুষ, শুধু মানুষ হ'য়ে জন্মেছে ব'লেই, কয়েকটা মৌলিক বিষয়ে শ্রদ্ধেয়, এই চেতনা ও স্বীকৃতির পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যায়। এক শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে পদবি, খেতাব, উপবীত অথবা নীল রক্তের উপদ্রব নেই, যেখানে ধনী ও স্বল্পবিত্তের মধ্যে বিভেদ কখনো রূঢ় হ'য়ে ওঠে না; এক বিরাট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, সবচেয়ে মহার্ঘ যেখানে শ্রম, সুযোগ সকলের পক্ষেই অপর্যাপ্ত, আর গুণ, বুদ্ধি ও উদ্যমের পথ অনবরত নির্বাধ— এই হ'লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ব্যতিক্রমস্বরূপ একমাত্র ও বিশেষভাবে যা উল্লেখ্য তা মার্কিনী সমাজব্যবস্থার সেই প্রধানতম কলঙ্ক— অর্থাৎ নিগ্রোদের অবস্থা— ঐ তিমিরবর্ণ ভীমবল তরলচক্ষু মখমলকণ্ঠ গীতরসিক অধিবাসীদের উপর পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা ও অপমান। আমি ততদূর পর্যন্ত দক্ষিণে যাইনি যাতে নিগ্রোদের চরম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু লোকমুখে বর্ণনা শুনে বুঝেছি যে ব্যাপারটা দক্ষিণ ভারতীয় অস্পৃশ্যতার চেয়েও শোচনীয়। যাঁদের মুখে শুনেছি তাঁরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ, এবং সকলেই এ-ব্যাপারে বিবেকদুঃখী। এতদিনে হয়তো কারোরই অজানা নেই যে আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার— এবং অধিকাংশ মনীষী— এই কলঙ্কময় বৈষম্য অপসারণের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট; কিন্তু বুদ্ধ, চৈতন্য ও মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও উদাহরণ, এবং দিল্লীর লোক-সভায় প্রণীত নববিধান সত্ত্বেও, যেমন এখন পর্যন্ত ভারতীয় অস্পৃশ্যতা— বা এমনকি জাতিভেদ— দূর হ'তে দেরি হচ্ছে, তেমনি, নিগ্রোদের বিষয়ে, আমেরিকায়। মার্কিনী গৃহ-যুদ্ধের সময়ে উত্তরে-দক্ষিণে যে-বিভেদ উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো, যে-অন্ধতার ফলে লিঙ্কন নিহত হন, এই একটি ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তার নিরসন হ'লো না। বলা বাহুল্য, দক্ষিণী রাজ্যগুলি অশ্বেত বিদেশীর পক্ষেও সব সময় সুখধাম হয় না, এবং সেখানে বর্ণভেদের বিরুদ্ধতা ক'রে মার্কিনী শ্বেতাঙ্গরা মাঝে-মাঝে স্বেচ্ছায় যে-সব নিগ্রহ ভোগ ক'রে থাকেন, তাও চমকপ্রদ। ভার্জিনিয়াতে এক মহিলা-কলেজে গিয়ে শুনলুম, দুটি ছাত্রী সম্প্রতি কারারুদ্ধ হয়েছে: অপরাধ— তারা সিনেমা-গৃহে নিগ্রোদের জন্য পৃথক্‌কৃত অংশে বসেছিলো। প্রায় একই সময়ে, দক্ষিণতর অন্য এক রাজ্যে,

একদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণদের সঙ্গে এক বাস্‌-এ ভ্রমণ করতে গিয়ে যার দ্বারা প্রতিহত ও বিপর্যস্ত হলেন তার নাম বিশুদ্ধ পশুশক্তি। কিন্তু এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে ও লোকমুখে যে-প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জাগলো তাতে অন্তত এটুকু প্রমাণ করে যে সংস্কার বা কুসংস্কার দুর্মর হ'লেও, আঠারো-শতকী 'আলোকপ্রাপ্তি'র উত্তরাধিকার তার বিরুদ্ধে অনবরত দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু আমি মার্কিনী নিগ্রো সমস্যার আলোচনা করতে বসিনি— তার কোনো যোগ্যতাও আমার নেই। আমরা সকলেই জানি যে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশেও নিগ্রোদের পক্ষে ভালো পাড়ায় বাড়ি পাওয়া, বা সব রেস্তোরাঁয় ও হোটেলে গৃহীত হওয়া প্রায় অসম্ভব ; কিছুকাল আগে ন্যুয়র্কে একদল আফ্রিকান রাজপুরুষ, এবং কোনো দক্ষিণী রাজ্যে এক ভারতীয় নর্তকী যে-ভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তাও আমি ভুলে যাচ্ছি না। কিন্তু তুলনীয় ঘটনা য়োরোপেও কখনো ঘটে না তা নয় ; লণ্ডনের মতো ভারত-সম্পৃক্ত নগরেও অনেক হোটেলে অশ্বেতরা অপাংক্তেয় ; মেনে নেয়া ভালো যে জাতি -বা বর্ণগত সংস্কার থেকে কোনো দেশই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রতি মানুষকে মানবিক মূল্য দেবার দিকে আমেরিকার একটি সাধারণ প্রবণতা আছে, সেটা আগন্তুকেরও অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়ে। ন্যুয়র্ক বা সান ফ্রানসিস্কোতে বেড়াতে এসে, কোনো বিদেশীর হঠাৎ বোধগম্য হবে না উচ্চ ও নীচে, বা শ্বেত ও অশ্বেতে কোনো অধিকারগত বিভেদ আছে। তিনি দেখবেন, আপিশ-গুলোতে বেয়ারা বা পিওনজাতীয় কোনো কর্মী নেই, আসন ত্যাগ না-ক'রে এক গ্লাশ জল পাওয়াও দুঃসাধ্য ; বড়োবাবু ও ঝাড়ুদার একই কাফেটেরিয়ায় কফি পান করছে ; শ্যামাঙ্গী পরিচারিকা (যদি কোনো ভাগ্যবান গৃহে তা থাকে) কাজের ফাঁকে কর্ত্রীর সঙ্গে ব'সে গালগল্প করছে সিগারেট ধরিয়ে। মানুষে-মানুষে অসাম্যই প্রকৃতির বিধান, কিন্তু মার্কিনীরা এমন একটি অভেদানন্দ সংস্কার রচনা করেছে, যা আমাদের কাছে ভারি আশ্চর্য ব'লে বোধ হয়। 'শ্রমের মর্যাদা' নামক যে-বিষয়টিতে আমাদের দেশে স্কুলের ছেলেরা এখনো বোধহয় রচনা লিখে থাকে, তার সত্যিকার অর্থ আমি আমেরিকায় উপলব্ধি করেছিলাম।

ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ প্রায় সকলেই ধবল, কিন্তু সেখানে পা দেয়ামাত্র যা টের পাওয়া যায়— না-পেয়ে উপায় থাকে না, সত্যি বলতে— তা এদের শ্রেণীভেদ।

উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন— এই তিন শ্রেণীতে এমনভাবে বিভক্ত এই সমাজ যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চেহারা ও বেশবাস দেখে, বা উচ্চারণ শুনে, আমার মতো বিদেশীও ব'লে দিতে পারে, কে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূ'ত। যারা নিম্নবর্ণ, তারা খর্বকায়, অসুন্দর, ব্যবহারে রুক্ষ, উচ্চারণে বিদেশীর পক্ষে প্রায় দুর্বোধ। খবর-কাগজ, পানশালা, বিদ্যালয়, আহারস্থল, আমোদ-প্রমোদ— সব-কিছু শ্রেণী হিশেবে পরিচ্ছন্নভাবে বিভক্ত। এক বন্ধুকে জিগেস করলুম: 'আপনাদের সমুদ্র-তীরবর্তী একটি শহর দেখতে চাই। আপনি কোনটি অনুমোদন করেন?' 'আপনি কী দেখতে চান— উচ্চ, মধ্য, না নিম্নশ্রেণীর উপযোগী সমুদ্রতীর— তার উপর নির্ভর করছে।' আর-একজন বললেন, 'আমাদের নিম্নশ্রেণী আগে পনির খেতো না— কিন্তু যুদ্ধকালীন র‍্যাশনের ফলে তাদের আহারের অভ্যেস বদলে গেছে— স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে সেজন্য।' মনে রাখতে হবে এই বিভেদ ধনগত নয়, শ্রেণীগত— আদর্শের দিক থেকে, এবং অংশত ব্যবহারেও, আমাদের জাতিভেদের মতোই; নিম্ন থেকে মধ্যে, বা এমনকি উচ্চস্তরে, প্রতিভাবানের উত্থান সম্ভব হ'লেও সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থায় নড়চড় নেই।

কোনো-কোনো পাঠকের হয়তো স্মরণে আছে যে কিছুদিন আগে 'এনকাউণ্টার' পত্রিকায় একটি সোৎসাহ আলোচনার বিষয় ছিলো— 'ইউ' ও 'নন-ইউ' বচন (U=Upper class)। সব দেশেরই ভাষাতে আছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, আছে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিভিন্ন শব্দপ্রয়োগ ও উচ্চারণ; কিন্তু ভাষার মধ্যে এই শ্রেণীগত পার্থক্য যেন ইংরেজ সমাজের মর্মস্থল থেকে উৎসারিত; আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তুলনীয় আলোচনার কোনো অবকাশ আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে যা বলে, ব্যাপারটা সে-রকম নয় ব'লেই তা চর্চাসাপেক্ষ; অর্থাৎ 'উচ্চ' ভাষা সর্বত্র নয় 'অনুচ্চে'র তুলনায় সুষ্ঠু, বা যুক্তিসংগত, বা এমনকি শালীন। আমি, এই সব গূঢ় রহস্যে অদীক্ষিত বহুদূরবর্তী বিদেশী মাত্র, আমি সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে জেনেছিলাম যে 'উচ্চ' বাগ্‌ধারায় 'Yours faithfully' লিখলে সূচিত হয় বন্ধুতা, আর 'Yours sincerely' মানে লৌকিকতামাত্র, এবং সবান্ধবে সুরাপানের পূর্বে 'চীয়র্স' ব'লে যারা শুভেচ্ছা জানায় তারা হ'লো অনুচ্চভাষী, উচ্চ মহোদয়েরা তৎপরিবর্তে শুধু জন্তুর মতো অস্পষ্ট একটি ধ্বনি নির্গত করেন। আমি যতদূর লক্ষ করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়নি ব্যবহারে

ও বিধানে সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে— তা থাকতেও পারে না— কিন্তু এ নিয়ে যে সূক্ষ্ম ও সবিস্তার তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব, তার কারণই ইঙ্গদ্বীপবাসীদের শ্রেণীবদ্ধমূল মনোভাব।

ভাষার সামান্যতা, পিলগ্রিম-পিতাদের স্মৃতি, রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগ— এই সব কারণে ইংলণ্ড ও আমেরিকার নাম অনেক সময়ই যুক্ত হ'য়ে থাকে, কিন্তু এই দুই দেশে চারিত্রিক ব্যবধান সুস্পষ্ট।* পাৎলা ঠোঁটে কাটাছাঁটা কথা, কম কথা, লাজুকভাবে চোখের দিকে প্রায় না-তাকানো, প্রয়োজনীয় কর্মটুকু সমাধা হওয়ামাত্র নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়া, হাসির অভাব, ঔৎসুক্যের অভাব, শ্লেষ্মার আধিক্য, 'তুমি কারে করো না প্রার্থনা, কারো তরে নাহি শোক'— এই ধরনের আত্মধৃত উদাসীনতা : এই হ'লো ইংরেজের সাধারণ চরিত্র। আর মার্কিনীরা খোলামেলা সহজ ও উচ্ছল ; তারা কাছে এগিয়ে আসে, হাসে, অপ্রয়োজনেও কথা বলে ; তারা আতিথ্যে উদার, মেলামেশায় স্বচ্ছন্দ, বন্ধুতায় আগ্রহশীল। সব দিক থেকেই খুব খোলা মনে হয় দেশটাকে : আকারে বৃহৎ, প্রজাসংখ্যায় বিচিত্র, সুযোগে প্রচুর, মানসতায় জঙ্গম ও পরিবর্তনপ্রিয়। আমি মানতে বাধ্য যে স্বল্পভাষী ও নতচক্ষু ইংরেজের একটি বিশেষ ধরনের রমণীয়তা আছে, আর মার্কিনী সরলতাকে কখনো-কখনো মনে হ'তে পারে তরলতা, কোনো আচরণ কিছু বা ঝাঁঝালো, হঠাৎ কোনো প্রকাশভঙ্গি খর। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের সভ্যতা কত প্রাচীন, বহু যুগের স্রোত আমাদের যে-রকম মৃদু, ক্লান্ত, বহুস্তর ও বিনষ্ট+ ক'রে রেখে গেছে, এই আনকোরা তাজা টগবগে নতুন দেশে তা আশা করা অন্যায় ; এবং য়োরোপীয় মানসপটে 'ইয়াঙ্কি' নামে যে-ছবিটা মুদ্রিত আছে

---

* অ্যাংলো-স্যাক্সন দ্বৈপায়ন ইংরেজদের অনন্য বললে অত্যুক্তি হয় না ; য়োরোপীর মহাদেশ-বাসীদের অনেক বিষয়েই তাদের সঙ্গে গরমিল, এমনকি স্কচ, ওয়েলশ বা আইরিশ চরিত্রেও তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। এডিনবরায় এক হৃষ্ট ও সদালাপী ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলাম ; তাঁর মুখে অনর্গল কথা শুনে আমি নিশ্চয়ই অবাক হতাম, যদি-না তিনি মাঝে-মাঝেই বলতেন— 'আমাকে মাপ করবেন— বড্ড কথা বলছি— আমি ওয়েলশ কিনা!' আঠারো শতক থেকে ইংলণ্ডের ভাগ্য তাকে যুক্ত করেছিলো এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে ; সম্প্রতি সে তার য়োরোপীয় সত্তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।

\+ এই শব্দটিকে ইংরেজি 'sophisticated' অর্থে ব্যবহার করছি।

বা ছিলো, সেটা ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া কিছু নয়। আর, শেষ পর্যন্ত, যদি কখনো বেছে নেবার কথা ওঠে, তাহ'লে প্রবাসযাপনের পক্ষে, আমি মার্কিনী ধরনটাকেই পক্ষপাত জানাবো।

কখনো কোনো অশোভন বা রূঢ় ব্যবহার পাইনি তা বলতে পারি না, কিন্তু মোটের উপর মার্কিনী জীবনে আমি যা অনুভব করেছি, তা এমন একটি সহজ মানসিক ভঙ্গি, যা পথিকের মুহূর্তগুলিকে স্বাদু ক'রে তোলে। যাঁরা গুণী বা বিদ্বান তাঁদের প্রীতি ও উদারতা অন্যান্য দেশেও ভোগ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; এ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করতে চাই না, যদিও মার্কিন দেশে কারো-কারো সৌহার্দ্য আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাতীত হয়েছিলো। কিন্তু যারা জনসাধারণ, নামহীন এবং ক্ষণকালীন, এবং যাদের সঙ্গে সংযোগ ভিন্ন বেঁচে থাকা যায় না, তাদের বিষয়ে উল্লেখ না-করলে আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লণ্ডনের ট্যাক্সিওলাদের বিষয়ে আমার মনে একটি স্বাস্থ্যকর ভীতি গ্রথিত হ'য়ে আছে, কিন্তু আমেরিকায় ঐ সম্প্রদায় আমাকে শুধু স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছিয়ে দেয়নি, অনেকে প্রবৃত্ত হয়েছে আলাপে, তারিফ করেছে তেনজিং বা (ফিল্মে দেখা) তাজমহলের, আমি কৌতূহলবশত কোনো প্রশ্ন করলে তার যথোচিত উত্তর দিয়েছে, দু-একটা রসিকতা করাও তার অধিকারের বহির্ভূত ব'লে ভাবেনি, কখনো বা গন্তব্যে পৌঁছে এ-কথাও বলেছে, 'আপনাকে চালিয়ে এনে খুব ভালো লাগলো আমার। গুড-বাই। গুড-লাক্।' কোনো নতুন দেশে বা শহরে পৌঁছনোমাত্র একটি মানুষের স্পর্শ যদি পাওয়া যায়, তাতে যে প্রবাসীর মন স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।* পূর্বোল্লিখিত চার্লি ও পনেরো স্ট্রীটের গোমস্তাকে

*ন্যুয়র্কের বাস্-চালকেরা সাধারণত খুব রাশভারি গম্ভীর চেহারার পুরুষ, কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম দেখেছিলাম। শীতের শেষ তখন; সেন্ট্রাল পার্কের বরফ গলেনি, কিন্তু সবেমাত্র একটি-দুটি কচি পাতা দেখা দিয়েছে। বাস্-এর চালকটি ছিলো তরুণ ও সুশ্রী। যাত্রীদের নামা-ওঠার সময় সে জনে-জনে প্রত্যেককে সম্ভাষণ করছে: 'Watch your step, fair lady'. 'Good afternoon, sir,' 'Nice day, sir'. 'Good night, ma'am. Have a nice evening'. — এমনি অনবরত চলছে তার শুভেচ্ছাজ্ঞাপন। আমার আনন্দ হচ্ছিলো তাকে দেখে: মনে-মনে ভাবছিলাম, যুবকটি কি আজ বাগ্‌দত্ত হয়েছে, না কি সে বসন্তের দ্বারা স্পৃষ্ট, না কি শুধু বেঁচে থাকার সুখেই এমন উচ্ছল?

পাঠক যেন ব্যতিক্রম হিশেবে ধ'রে নেন, কেননা উল্টো দিকে নজিরের অন্ত নেই। প্রায় সর্বদাই দেখেছি, দোকানের কর্মী ও কর্মিণীরা চোখে-চোখে তাকায়, হেসে কথা বলে, একটু অবকাশ পেলে কিঞ্চিৎ ঘরোয়া গল্প ক'রে নেয়, এমনকি কখনো-কখনো 'হানি' বা 'ডার্লিং' ব'লে সম্বোধন করতেও বাধে না তাদের। যাদের কাছে ঘন-ঘন যেতে হয় তারা বলে— 'আজ আপনি কেমন আছেন? ক-দিন থাকবেন এ-দেশে? জানেন আমার স্বপ্ন কী? একবার ভারতে যাওয়া।' বা হয়তো— 'আপনার স্ত্রী আজ কোথায়? She's a nice lady'. সেবারে পিটসবার্গে ক্রিসমাসের ছুটিতে কলেজের ডাইনিংরুম বন্ধ ছিলো, ক্যাম্পাস জনহীন, আমাকে খেতে হ'তো পরিচারিকাদের সঙ্গে বেসমেণ্টে ব'সে; সেই স্থূলকায় অসংস্কৃত মধ্যবয়সী মহিলারা যে-রকম যত্ন ক'রে খাওয়াতেন আমাকে, গল্পগুজবে নিঃসঙ্গ বিদেশীকে সান্ত্বনা দিতেন, তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না-ক'রে পারি না। ডাক্তারের কেরানি, হাসপাতালের নার্স, কসাইখানার ছোকরা— সকলেরই চোখে হাসি, ভাষায় ও ভঙ্গিতে হৃদ্যতা। এ-সবের কোনো অর্থ নেই তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু কোনো মূল্য নেই তা কেমন ক'রে বলি? শুধু ব্যবসায়িক সম্বন্ধের জন্য নয়, আমাকে যে একজন ব্যক্তি ব'লেও স্বীকার ক'রে নেয়া হচ্ছে, এই চেতনাটুকু দিনযাপনকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ক'রে তোলে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভঙ্গি য়োরোপেও কোনো-কোনো দেশে দেখিনি তা নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-একমাত্র য়োরোপীয় দেশের ভাষা আমি বলতে পারি, সেখানে এটি একেবারেই পাওয়া যায় না। — কিন্তু 'একেবারেই' কথাটা ভুল হ'লো, কেননা লণ্ডনে অন্তত একটি স্থান আছে যেখানে প্রবেশ করলে অনুভূত হয় তাপ, সজীবতা, মানুষের হৃৎস্পন্দন, এবং যেখানে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয় না পাছে গলার আওয়াজ ফিশফিশানির উপরে উঠে যায়। সেটি হ'লো— পাব্। প্যারিসের কাফের মতোই ব্যাপ্ত এই প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ, খ্যাতিমান মৃত ও জীবিতের দ্বারা নন্দিত, স্মৃতিভারে গরীয়ান— যদিও আকার-প্রকারে এ-দুই বস্তু যতদূর সম্ভব আলাদা। উত্তর ও দক্ষিণ, প্রটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম, কুয়াশা ও দ্যুতি, শেক্সপীয়র ও রাসিন, স্বপ্ন ও স্বচ্ছতা— য়োরোপকে যতদিক থেকে ভাগ করা সম্ভব, লণ্ডনের পাব্ ও প্যারিসের কাফের কথা ভাবলে এই বিভেদের চিত্রকল্প যেন চোখে দেখা যায়। এবারে লণ্ডনে

যে-সব বাঙালির সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো, তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সাংবাদিক বা সাহিত্যিক ; এক সন্ধ্যায় দল বেঁধে যাওয়া হ'লো ফ্লীট স্ট্রীটে। যে-পাব্-এ আমরা ডিনার খেলুম তার নাম 'চেশিয়র চীজ়' ; পুরোনো তিনতলা বাড়ি, চিৎপুরের মতো অন্ধকার গলি দিয়ে ঢুকতে হয়, সিঁড়িতে দু-জনের বেশি পাশাপাশি হাঁটা যায় না, ঘরগুলির স্তর অসমতল। লোকেরা গল্প করতে-করতে খাচ্ছে— হাসছেও, কেউ বা— হয়তো একা হবারই জন্য, বা কোনো বন্ধুর অপেক্ষায়— ব'সে আছে পাশের ঘরে নিরিবিলি— কোলে বই, সামনে এক গ্লাশ বিয়ার। তেতলার একটি ঘর অব্যবহৃত, সেখানে কিছু দ্রষ্টব্য আছে। এই পাব্-এ ছিলো ডক্টর জনসন-এর আড্ডা ; ঐ যে তাঁর চেয়ার, কাচের বাক্সে তাঁর অভিধানের প্রথম সংস্করণ। 'Household Words'-এর বাঁধানো কয়েকটা ভল্যুম নেড়ে-চেড়ে দেখা গেলো, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চার্লস ডিকেন্স। দেয়ালে দুটো চেক রেখে দিয়েছে বাঁধিয়ে, প্যাঁচালো স্বাক্ষর উদ্ধার করতে বেশ চেষ্টা করতে হ'লো, যদিও সেই নাম আমার বহুকালের চেনা। ছেলেবেলায় এঁর কাছে শোনা গল্প— হাসি, কান্না, উৎকণ্ঠা-আন্দোলন— পেগটি, উরিয়া হীপ, মিকবর, লিটল নেল— সমুদ্রের শব্দ শুনতে-শুনতে জেগে-থাকা একলা ছেলেটা— সব মনে প'ড়ে গেলো। একটি চেক-এর টাকার অঙ্ক, একশো বছর আগেকার হিশেবে, এত বড়ো যে মনে হয় ডিকেন্স এক বছরের সবান্ধব খাদ্য-পানীয়ের ঋণ এই একবারে শোধ ক'রে দিয়েছিলেন। মালিকেরা বুদ্ধিমান— চেক বাঁধিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু লণ্ডন বড়ো বেশি গৃহস্থ ; প্যারিসের মতো রাত ভোর করা দূরে থাক, আড্ডা দিয়ে এগারোটা পর্যন্ত বাজানো সেখানে সহজ নয়। অথচ, গ্রীষ্মকালে, এগারোটা তো আক্ষরিক অর্থে সবে সন্ধে। চেশিয়র চীজ় থেকে অনিচ্ছায় উঠতে হ'লো আমাদের। 'পাশে আর-একটা আছে— দি বেল্‌স্— সেটা বোধহয় বন্ধ হয়নি এখনো— চলুন।' বন্ধুর এই পরামর্শমতো, দেড় মিনিট হেঁটে, আবার কিছুটা গলি পার হ'য়ে আমরা অন্য এক আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হলুম। একতলার ঘর, বড়ো নয়, আলো কম, সিগারেটের ও পাইপের ধোঁয়ায় ঝাপসা হ'য়ে আছে, আর এমন সরগরম যে প্রায় বিশ্বাস হয় না লণ্ডনে আছি। সবাই দাঁড়িয়ে, সবাই সরব, মনে হয় সকলেই সকলের চেনা। আমরা ভাবছি, ঐ কোণের আসনগুলি দখল করা যাক, এমন সময় সেই আবছায়া থেকে অচেনা

গলায় হঠাৎ আমার নাম শুনতে পেলাম। কে একজন ব'লে উঠলো—'এই যে! তুমি! What a pleasure! কতকাল পরে দেখা বলো তো!' আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হ'লো না যে এখানে আমাকে 'তুমি' বলার মতো কেউ থাকতে পারে, স্পষ্ট বাংলা ভাষায়, প্রথম নামে সম্বোধন ক'রে। 'কী? চিনতে পারছো না?...না? ঢাকার কথা মনে পড়ে? আর সেই যে কলকাতায় একবার—' ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন, উল্লেখ করলেন অন্য দু-একটা তথ্য, ধীরে-ধীরে তাঁর উনিশ-কুড়ি বছরের চেহারাটা—যখন আমারও ছিলো ঐ বয়স আর কিছুটা চেনাশোনা ছিলো তাঁর সঙ্গে—সেই সময়ের ছবি আমার মনে ভেসে উঠলো। 'আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি—' চেষ্টা ক'রে আমিও 'তুমি' বের করলাম—'যে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো! কিন্তু—খুব ভালো লাগছে।' এর পরে উভয় দলে পরিচয়, অনেক হাত-ঝাঁকাঝাঁকি, প্রশ্নোত্তর, হাস্য-বিনিময়। আমার ফিরে-পাওয়া বন্ধুটি দীর্ঘকাল ধ'রে প্রবসিত, অথবা এটাই তাঁর স্বদেশ হ'য়ে গিয়েছে, লণ্ডনের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তিনি, তাঁর সঙ্গীদেরও ঐ পেশা। বোঝা গেলো, এ-পাড়ার সবগুলো পাব্‌ই সাংবাদিকদের দ্বারা 'অধিকৃত', এক-একটা এক-এক পত্রিকার (বা বার্তাসংঘের) এলাকা ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। এই আকস্মিক সাক্ষাতের ফলে, আর যেটুকু সময় বাকি ছিলো, বেশ দিলখোলা আড্ডা জমলো আমাদের। যাকে বলে আবহাওয়া, তার কোনো অভাব ছিলো না: অল্প আলো, স্ফটিকের দীপ্তি, সেকেলে আসবাব, পরিশ্রমী দিনের শেষে বিরামভোগী একদল মানুষ—আর সবই পুরোপুরি ইংরেজি ধরনের; অগ্নিবরণী, ক্ষিপ্র-ককনি-ভাষিণী, সামনের-এক-দাঁত-পড়া, আস্তিন-গোটানো, মার্জারচক্ষু পরিচারিকাটি—যে আমাদের নবলব্ধ বন্ধুর আতিথেয়তায় এক গ্লাশ বিয়ারমন্ড এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে রক্তিমতর মুখে নগ্ন বাহু নেড়ে আমাদের সকলকে পানীয় পরিবেষণ করলে, তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে ব'লে উঠলো, 'হূজ গুইংটু পাই?—অর্থাৎ 'কে দাম দেবে?'—তাকে মনে হ'লো হুবহু যেন চসার অথবা শেক্সপীয়র থেকে উঠে এসেছে। জীবনে এমনি দু-একটা ভালো জিনিশ দৈবে কখনো জুটে যায়।

৩

আমি এ-বিষয়ে সচেতন যে আমেরিকায় এমন কিছু নেই, যার সঙ্গে লণ্ডনের স্মৃতিমেদুর গাম্ভীর্যের বা প্যারিসীয় শ্রী ও বিলাসের তুলনা হ'তে পারে, বা যাতে পাওয়া যায় সেই বিশেষ ধরনের সুখ ও সৌষ্ঠবের স্পর্শ, যা রোম অথবা ম্যুনিকে প্রাপণীয়। এবং আমি এ-কথাও ভুলে যাইনি যে মার্কিন দেশের য়োরোপীয় আত্মা দুই শতক ধ'রে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে আজ তাকে একাধিক অর্থে নতুন দেশ বলা যায়। একই মৌলিক সভ্যতার অন্তর্ভূত, ও পরস্পরের আত্মীয় হয়েও, বিভিন্ন দেশে (এমনকি প্রদেশে) যে-সব বৈশিষ্ট্য স্বতই দেখা দেয়, তাতেই প্রমাণ করে যে 'এক হওয়া মানে একাকার হওয়া নয়,' আর মনের ধর্মই অভিব্যক্তি। য়োরোপই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জননী, কিন্তু সন্তানের সতেজ ও স্রোতস্বল যৌবন প্রৌঢ়া মাতাকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। জ্ঞাতিত্বে এত নিকট ব'লেই তফাৎগুলো এমন ঔৎসুক্যজনক। মনে হয়, য়োরোপে যার জন্ম তার পরিণতি যেন আমেরিকায় ;— যে-সব যন্ত্র, বিজ্ঞান, ধারণা ও ভাব-ধারা পনেরো থেকে উনিশ শতকের মধ্যে য়োরোপে উদ্গত হয়েছিলো, যা সৃষ্টি করেছে আমাদের এই আধুনিক জগৎ, এবং যা সর্বমানবের জীবনে আজ স্বীকৃত, তার দূরতর সম্ভাবনার ঘটনাস্থল এই মহাদেশ। যন্ত্রের এমন ব্যাপক ও ক্ষমতাপন্ন ব্যবহার অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। ট্রেন, গাড়ি, লিফট, সাব-ওয়ে— সবই আকারে বড়ো, সংখ্যায় বেশি, ও অধিক বেগবান, দু-হাজার মাইল দূরস্থ বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে সংযুক্ত হ'তে তিন সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে ; যে-কোনো দুই বড়ো শহরের মধ্যে ট্রেন ও প্লেন যাতায়াত করছে ভোর থেকে নিশীথ পর্যন্ত ঘণ্টায়-ঘণ্টায় , আন্তঃরাজ্যিক বাস্‌গুলি তট থেকে তটান্তর পর্যন্ত অহর্নিশ সঞ্চরণশীল। বিমানবন্দরে জেট-প্লেন থেকে নেমে, তারপর হেলিকপ্টারে চ'ড়ে হোটেলের ছাতে অবতরণ, রবিবাসরীয় দৈনিকে একশো পৃষ্ঠা ও উপরন্তু দুটি বৃহৎ ক্রোড়পত্র ; ট্রেনে বা প্লেনে চলতে-চলতে টেলিফোনে বাড়ির অথবা আপিশের সঙ্গে কথা বলা ; আকাশের গায়ে ধূমাক্ষরে আঁকা বিজ্ঞাপন ;— যন্ত্রশক্তির এতদূর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। এ-বিষয়ে বেশি বলা বাহুল্য, কেননা কে না জানে মার্কিনী জীবনে বস্তু যেমন বহুবিধ ও প্রচুর, তেমনি আছে অসংখ্য দ্রুতবর্ধমান ও অংশত নিষ্প্রয়োজনীয় 'গ্যাজেট' বা কলকব্জা।

কিন্তু এর একটা উল্টো দিকও আছে। 'এ-দেশে সুবিধে আছে অগুনতি, কিন্তু আরাম নেই।' কথাটা যে-মহিলার মুখে শুনেছিলাম, তিনি বাস করছেন প্রায় তিরিশ বছর ধ'রে আমেরিকায়, কিন্তু বাঙালির ঘরে জ'ন্মে, জীবনের আদিপর্ব সেখানেই কাটিয়েছিলেন— নয়তো সুবিধে ও আরামের এই তুলনাটুকু তাঁর মনে আসতো না। কত সত্য এই কথা, তা বুঝতে আমার অল্পই সময় লেগেছিলো। যন্ত্র নামক মহাভৃত্য নিরন্তর উপস্থিত, কিন্তু মনুষ্য-দেহধারী এক-আধজন সাহায্যকারীর অভাবে জীবন কী-রকম শ্রমাক্ত ও শঙ্কিল হ'য়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত যে-কোনোদিন যে-কোনো স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। পিটসবার্গে বিপণি-পাড়ায় মহিলাদের দেখতাম: সপ্তাহের বাজার নিতে বেরিয়েছেন, চার-পাঁচ দোকান ঘুরতে হচ্ছে, আকটিকণ্ঠ পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চলেছেন বাতাসে বরফে কুঁজো হ'য়ে বন্ধুর পথে, গাড়ি আছে আধ মাইল দূরে; — বাড়ি পৌঁছে আবার সিঁড়ি, চাবি ঘোরানো, 'এটা একটু ধরো' বলার কেউ নেই। স্যুটকেসের ভারে বেঁকে গিয়ে চলেছে রেল-স্টেশনে তরুণী ছাত্রী; অনেক সিঁড়ি, বিরাট লম্বা প্লাটফর্ম; তার উপর যদি মিনিটে-এক-মাইল বেগে চলন্ত দোলায়মান ট্রেনে, কামরাগুলোর মধ্যবর্তী পাষাণপ্রতিম দরজা ঠেলে-ঠেলে আসনের সন্ধান করতে হয়, তাহ'লে দাঁতে দাঁত চেপে নিশ্বাস নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মফস্বলে প্রোফেসর এসেছেন আমাকে নিয়ে আমেরিকান এক্সপ্রেসের আপিশে, আমার কাজ সারতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে তাঁর মুখ উদ্বিগ্ন, কেননা গাড়ি পার্ক করার জন্য মিনিট গুনে দাম দিতে হয়, দৈবাৎ ভুল হ'য়ে গেলে জরিমানা। এবং দশ হাজার যন্ত্র মিলে যে-একটি আদিশ্রমের লাঘব করতে পারেনি, বরং আমেরিকায় যা অনবরত অপরিহার্য, তা হ'লো পদচালনা। ন্যুয়র্কে পরিবহণ প্রচুর, তবু যদি একই দিনে থাকে নগরের বিভিন্ন অংশে একাধিক নিয়োগ, তাহ'লে— সব সময় ট্যাক্সি নেবার সামর্থ্য বা ইচ্ছে না-থাকলে— সাব-ওয়ের সিঁড়ি, পেন্ স্টেশনে আরো দুই স্তর পাতালে নেমে অন্য গাড়ি ধরা, প্রকাণ্ড গোলকধাঁধার মতো টাইমস স্কোয়ার স্টেশনের জটিল অলিগলি পেরিয়ে আবার গাড়ি বদল, অবশেষে আকাশের তলায় উঠে আসা, সেখান থেকে রাস্তার নম্বর গুনে-গুনে নিয়োগস্থলে পৌঁছনো আবার একই-ভাবে অন্যত্র— সব মিলিয়ে দশ-বারো মাইল হাঁটতে হ'লে এমন কী আর বেশি বলা যায়! অর্থাৎ, এত রকম সুবিধে সত্ত্বেও, এখানে জীবনযাপনের পরীক্ষাটি

বড়ো সহজ নয় ; তাতে সসম্মানে পাশ করতে হ'লে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চাই প্রভূত পেশীবল, গতির ক্ষিপ্রতা, গৃহকর্মে নৈপুণ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খে মনোযোগ ; আনমনা বা উদাস ভাবটির প্রশ্রয় নেই এখানে, হস্তপদের ক্ষমতা কম হ'লে লজ্জা পেতে হয় ;— যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় চলছে, এমনি কাটে দিনের পর দিন।

এ-দেশে যে-পরিমাণ ধন উৎপন্ন ও সঞ্চিত হচ্ছে, এবং যে-ভাবে তা সর্বসাধারণে আবর্তমান, তার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে কোথাও নেই ; কিন্তু লোকেরা নয় ভোগেচ্ছু বা বিলাসী ;— এদের ঐশ্বর্যের অন্য পিঠে আছে বিপুল শ্রম, কঠিন স্বাবলম্বিতা, আর এমন এক প্রকার নিয়মনিষ্ঠা যা কখনোই কিছু ফেলে রাখে না, মুহূর্তের দাবি প্রতি মুহূর্তে মিটিয়ে চলে। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আট-ন' ঘণ্টা ক'রে খাটুনি, দুপুরবেলা ডেস্কে ব'সেই কফি-স্যাণ্ডুইচ, আর সপ্তাহান্তে— যার যেমন রুচি— বিশ্রাম, বিনোদ বা উত্তেজনায় গা ঢেলে দেয়া : এই হ'লো সাধারণ লোকের সাধারণ জীবন। নিজের অথবা বন্ধুর 'পল্লী-কুটিরে' পলায়ন, বেলা এগারোটার আগে বিছানা ছেড়ে না-ওঠা, যামিনীর দ্বিতীয়ার্ধে বাড়িতে পার্টি জমানো, বিবিধ ক্রীড়া ও প্রমোদ— সাপ্তাহান্তিক কৃত্য বলতে এগুলোকেই বোঝায় ; কিন্তু যে-বেচারা শুধু টেলিভিশন দেখে আর্তগ্রীব হয়েছে, এবং যে-বীর চর্মতুল্য রসনা ও প্রস্তরবৎ মস্তকের ভারে পীড়িত, সোমবারে তারা দু-জনেই যথাসময়ে কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছবে— বৃষ্টি, বরফ, ঝড়-ঝাপটা যা-ই হোক না। স্বাস্থ্য, উদ্যম, কর্মিষ্ঠতা, দার্ঢ্য, ক্লান্তিহীনতা— অন্ততপক্ষে ক্লান্তি গোপন করার শক্তি— এ-সব গুণ উত্তর য়োরোপেও প্রকট, কিন্তু আমেরিকায় এগুলোর চর্চা যে-রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে স্বীকৃত, তা, মানতে বাধা নেই, আমাদের অনেকের পক্ষেই অনুকরণের অগম্য। 'ক্লান্ত আছি', 'মন ভালো নেই', 'মাথা ধরেছে'— এ-রকম কথা মুখ ফুটে কেউ বলে না কখনো— সেটা প্রায় সামাজিক বেয়াদবি* ; সকলেই সব সময়ে প্রস্তুত ও

---

* সামাজিক জীবনে যা অনুমত নয়, সেই সব স্বীকারোক্তির জন্য আগে ছিলেন পুরোহিত বা কুলগুরু, এখন আছেন নানা ধরনের ডাক্তার বা মনোবিজ্ঞানী। আমাদের ন্যুয়র্কীয় বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়ুং-এর শিষ্য ; আমি একদিন তাঁকে জিগেস করলুম তাঁর পেশার ঠিক প্রকৃতি কী। তিনি বললেন, 'আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই— মনোরোগের চিকিৎসক নই ; আমি মনোবিদ— সাইকলজিস্ট। আমার কাজ বাড়িতেই ; নানা ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে লোকেরা

উপস্থিত, প্রসাধন ও বেশভূষার প্রতি অবিরাম মনোযোগও এইজন্যে যাতে চোখে-মুখে কোনো মালিন্য কখনো ধরা না পড়ে। যাদের সামাজিক জীবন বৃহৎ ও বিচিত্র, ও কর্মকাণ্ড বহুমুখী, ঘরের বাইরে, নিত্য-নব সংস্রবে ও বিনিময়ে যাদের অধিকাংশ জাগ্রত প্রহর কেটে যায়, তাদের পক্ষে এই ধরনের প্রস্তুতি যে অপরিহার্য তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। এদের কাছে জগৎটা সত্য ; জগতের জন্যই নিজেদের এরা খাটিয়ে নিচ্ছে ও সাজিয়ে রাখছে ; অন্যের বা নিজের প্রতি এতটুকু অবহেলাকে এরা প্রশ্রয় দেয় না। আট ঘণ্টা কাজ করার পর বর্ষাতি-জড়ানো গৃহস্বামী বাড়ি ফিরলেন— বাইরে বৃষ্টি, কাদা, শীত ; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে তাঁকে দেখা গেলো পরিষ্কৃত ও প্রফুল্ল, গাঢ়-নীল সান্ধ্যবেশ ধারণ ক'রে অতিথিদের সঙ্গে যোগ দিলেন ;— পানীয় ও উপাহার পরিবেষণ : সূক্ষ্ম সুচারু ফালিতে কাটা কাঁচা গাজর, পেঁয়াজকলি, অরুণবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি টোম্যাটো, পনির অথবা কাভিয়ারলিপ্ত বিস্কুট, ধোঁয়ানো হ্যাম, সার্ডিন— এ-সব তিনিই সাজাচ্ছেন থালায়, এগিয়ে দিচ্ছেন সকলের দিকে, নিজেও খাচ্ছেন, সাংলাপিক আপ্যায়নেরও অভাব হচ্ছে না। এই প্রাথমিক আতিথেয়তা প্রধানত তাঁরই কৃত্য, শ্রীমতীর নয়। তারপর ডিনার : দু-জনে মিলে টেবিল সাজালেন, পরস্পর খাদ্য আনলেন টেবিলে ; যথাসময়ে উঠে গিয়ে বদলে দিলেন থালা ; তাঁরাই হোতা, তাঁরাই পরিবেষক, গল্প করতে-করতে খাচ্ছেন আর খেতে-খেতে কাজ ক'রে যাচ্ছেন— সুবেশ, সতেজ, সপ্রতিভ : হয়তো একই ঘরে বসার ও খাওয়ার ব্যবস্থা, আহার শেষ হওয়ামাত্র ছবির মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেলো ঘর, এলো কফি, চা, লিকিয়ার ; তারপর— যত রাত্রেই পার্টি ভাঙুক তাঁরাই বাসন ধুয়ে রেখে, মোজা কেচে, হয়তো স্নান ক'রে, তবে শুতে যাবেন। (অতিথিদের কাছে সাহায্য প্রত্যাশিত, কিন্তু সব সময় তা গৃহীত হয় না।) স্ত্রী-পুরুষের শ্রম-বিভাগে যে অসাম্য নেই, এটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য— বরং মাঝে-মাঝে পুরুষকেই দেখা যায় গৃহকর্মে অধিক সক্ষম ও উদ্যোগী। মায়ের অতিথিদের জন্য কিশোর পুত্র রেঁধে রাখছে, বা তরুণী পত্নীকে দীর্ঘতর বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে প্রবীণ

আসে আমার কাছে, আমি তাদের সাহায্য করি।' 'তারা উপকৃত হয়?' 'হয় বইকি, নয়তো আসে কেন?' 'ধরুন একজন কবি কবিতা লিখতে পারছেন না— তিনি আপনার চর্চায় ফল পাবেন?' 'তা সম্ভব হ'তে পারে।' আমি অবাক হলাম।

অধ্যাপক নিজেই তৈরি করছেন প্রাতরাশ, বা অকৃতদার নিভৃ´ত্য পুরুষ বাড়িতে বন্ধুবান্ধব ডেকে বাজার করা থেকে বাসন ধোয়া পর্যন্ত সব কাজ এক হাতে করছেন— এ-সব ঘটনায় এখানে কিছু অসাধারণত্ব নেই। পত্রিকাদির বিজ্ঞাপন ও রসিকতা প'ড়ে অনুমান হয় যে পত্নীদের হীনতর অর্ধেরা মাঝে-মাঝে বাসন ধোয়াটা এড়িয়ে যাবার অপচেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে তাঁরা উল্লেখ্যরূপে সফল হন কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ রাখা যুক্তিসংগত। পুরুষ নামক অলস ও সুখ-লিপ্সু জন্তুকে মার্কিনী রমণীরা যে-ভাবে পোষ মানিয়ে, জোয়ালে ঠেলে, তাঁদেরই সেবায় নিযুক্ত রেখেছেন, এবং যে-রকম অম্লান ও অবিদ্রোহীভাবে পুরুষদের তাতে সম্মত দেখা যায়, তাতে যেন প্রায় সভ্যতার একটি নবপর্যায় সূচিত হচ্ছে, কেননা আবহমান ইতিহাসে— অন্ততপক্ষে ককেশীয়বংশে— এ-যাবৎ ছিলো পুরুষেরই কর্তৃত্ব।* ফলত হয়তো পুরুষের কিছু যোগ্যতা বেড়েছে— আমি অন্তত তাঁদের হাতের দক্ষতায় অনবরত মুগ্ধ না-হ'য়ে পারিনি; কিন্তু অভ্যাসদোষে মনে-মনে বরং কৃতজ্ঞ হয়েছি যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাংলাদেশেই নরজন্ম লাভ করেছিলাম।

গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা— যার উদ্ভব ইংলণ্ডে, আর বৈপ্লবিক বিজয়-ভূমি ফ্রান্স— এই ধারণাটিও আমেরিকায় যে-ভাবে ও যতদূর পর্যন্ত প্রযুক্ত, তা দেখে, আমরা যারা পুরোনো পৃথিবীর অধিবাসী, আমাদের কখনো-কখনো চমক লাগে। মনে প'ড়ে যায়, অন্যান্য দেশ (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, ভারত ইত্যাদি) আদিতে এবং বহুকাল ছিলো অভিজাতপন্থী, তা থেকে ধীরে-ধীরে গণতান্ত্রিক হয়েছে বা হচ্ছে, কোথাও বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র, ও সমাজ-সংঘে আভিজাত্য সহজীবী। কিন্তু আমেরিকা প্রথম থেকেই রাজতন্ত্র ও পুরোহিত-পূজার বিরোধী : সাম্য, গণতন্ত্র, ধর্মীয় স্বাধীনতা— এই সব ধারণার উপরেই

---

* নারী-প্রগতির সূত্রপাত হয় য়োরোপে, কিন্তু এ-বিষয়েও আমেরিকা আজ অগ্রণী। য়োরোপে ভ্রমণকালে শুনলাম; অধুনা সেখানে মেয়েদের চরম কাম্য হ'লো—মার্কিনী স্বামী; কেউ-কেউ এই উচ্চাশাপূরণের সংকল্প নিয়ে আটলান্টিকের ওপারে চ'লে যাচ্ছেন : এর কারণ নাকি বিত্ত নয়— তীরান্তরবর্তী পতিদের অতুলনীয় আনুগত্য ও বাধ্যতা। পক্ষান্তরে, লণ্ডনে একটি সদালাপী বাঙালি যুবকের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো; শনিবার হ'লেই, যখন তিনি গিনেস-সহযোগে বিশ্রাম বা বই পড়ার জন্য উৎসুক, তখন তাঁর ইংরেজ স্ত্রী তাঁকে বিবিধ গার্হস্থ্য ফরমাশে নিরন্তর না-খাটিয়ে ছাড়তেন না। অবশেষে বিবাহবিচ্ছেদ হ'লো।

প্রতিষ্ঠিত এই যুক্তরাষ্ট্র ; প্রথম যাঁরা পিতৃপুরুষের মাতৃভূমি ছেড়ে নতুন দেশে বাসা বেঁধেছিলেন, তাঁরা প্রটেস্টাণ্ট-বিপ্লবের সন্তান। 'কোনো রাজা বা পুরোহিত ভগবানের প্রতিভূ নন,' 'মানুষমাত্রেরই চিন্তার ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে,' 'কতগুলি মৌলিক মানবিক অধিকার সকলেরই প্রাপ্য'—এই আদর্শ, যা তর্কাতীতরূপে শ্রদ্ধেয়, তা থেকে এমন একটি সংস্কার গ'ড়ে উঠেছে যেন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিরও কোনো প্রভেদ নেই, আর সবচেয়ে সাধারণ হওয়াই সবচেয়ে ভালো। পরস্পরকে প্রথম নাম নিয়ে ডাকা, যা অন্যান্য দেশে হৃদ্যতাব্যঞ্জক ও সময়সাপেক্ষ, তা এখানে প্রায় নিয়মের মধ্যে পড়ে ; কলেজের দরোয়ানের পক্ষে প্রেসিডেণ্টকে 'টম' ব'লে সম্ভাষণ করা অসম্ভব নয়, আর যারা প্রথম পরিচয়ের অনতিপরেই 'মিস্টার'-এর আব্রু সরিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক, তারাও অনেক*। দেশাচার সর্বত্রই মান্য, আর এতে এক ধরনের মসৃণতাও অনুভূত হ'তে পারে, কিন্তু পিটসবার্গে এক বালিকা যখন তার পিতামহপ্রতিম এক প্রবীণকে বার-বার 'প্রাফুলো' ('প্রফুল্ল') ব'লে সম্বোধন করছিলো, আমি তখন অপ্রকাশ্য অস্বস্তির চাপে পীড়িত না-হ'য়ে পারিনি। দৈনন্দিন ভাষায়, ব্যবহারে ও উচ্চারণে, জনসাধারণ ও উচ্চশিক্ষিতে তফাৎটা তেমন স্পষ্ট নয়, কোনো বিষয়ে বৈশিষ্ট্য যেন সকলেরই অনভিপ্রেত, সকলেই অন্য সকলের মতো কাপড় পরতে, কথা বলতে, পানাহার করতে আগ্রহশীল। সাধারণের প্রতি এই সম্মানবোধের ফলে অনেক নতুন নামকরণ হয়েছে : এ-দেশে যারা যন্ত্রপাতি মেরামত করে তাদেরও বলে 'এঞ্জিনিয়র' ; কোনো গৌণ বিষয়ে তিনজনে ব'সে কিছুক্ষণ কথা বলতে হ'লে তারও নাম আক্ষরিকভাবে 'কনফারেন্স' ; কোনো শিক্ষায়তনের প্রশাসন বিভাগে পদবিগুলি যত নিনাদী, সে-অনুপাতে কর্ম সব সময় উন্নত হয় না। পিটসবার্গে যে-কলেজে আমাকে পড়াতে হ'তো সেখানে একজন 'বিজ়নেস ম্যানেজার' ছিলেন ; আমি প্রথমে ভেবে পাইনি কোনো বিদ্যালয়ে এই কর্মিকের কী প্রয়োজন হ'তে পারে ; তাঁর সংস্পর্শে এসে যতদূর

* আট বছর পরে আমেরিকায় এসে লক্ষ করলুম, প্রথম নামের ব্যবহার তত ব্যাপক নেই, 'স্যর'ও মাঝে-মাঝে শোনা যায় ; এবং যে-সাধারণ যানের স্থানীয় নাম আগে ছিলো 'ক্যাব' এখন সেটাকে প্রায় সকলেই 'ট্যাক্সি' বলছে। আর-এক পরিবর্তন : অনুরাগের আঙ্গিক উচ্ছ্বাসে পরস্পরে লিপ্ত হ'য়ে আছে, এমন যুগল প্রত্যক্ষ না-ক'রে রাস্তায় বেরোনো বা ঘুরে বেড়ানো সম্ভব।

বুঝতে পারলাম, তাঁর কাজ হ'লো আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। কোনোরকম স্তরভেদ বা শ্রেণীভেদ যেন স্পষ্ট হ'য়ে না ওঠে, মার্কিনী সমাজের অচেতন চেষ্টা অনবরত সেইদিকে। এই অবস্থায় বর্ণিল জীবন সম্ভব হয় না (হয়তো সেইজন্যেই মার্কিনীদের দেশ-ভ্রমণে ও প্রবসনে আগ্রহ এত বেশি), কিন্তু এরই ফলে ট্যাক্সিওলাও অমার্জিত নয় এখানে; চেহারায়, পোশাকে ও ভাষায় সে আমার বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের চাইতে কতটুকু আলাদা, তা আমার পক্ষে ঠাহর করা শক্ত;— আর বস্তুত আমার বন্ধু যে কখনো ট্যাক্সি চালাতেন না, বা এই লোকটি ভবিষ্যতে হবে না সাহিত্যিক, তা কি কেউ বলতে পারে?

মার্কিনী সমীকরণের কথা বিদেশীরা প্রায়ই ব'লে থাকেন, দৈশিক মনীষীদের মধ্যেও অনেকে এর সমালোচনায় সোচ্চার। সত্য, এই মহাদেশে আপূর্বপশ্চিম যে-ধরনের সমতা দেখা যায় তা, আমাদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, য়োরোপীয়ের পক্ষেও আশাতীত। মানহাটানের যে-অংশটুকুতে স্কাইস্ক্রেপারের পুঞ্জ উঠেছে তার মতো আর কোনোখানেই কিছু নেই, অন্য কয়েকটা বিষয়েও ন্যুয়র্ক তুলনাহীন; কিন্তু ন্যুয়র্ক, আর হয়তো শিকাগো আর সান ফ্রানসিস্কো বাদ দিলে, প্রায় অন্য সব স্থান পরস্পর-সদৃশ— কিংবা তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু ভৌগোলিক। তুলনা করলে হয়তো ধরা পড়বে যে এই দেশের ভূগোল ভারতের চেয়েও বিচিত্র: আছে বিশাল হ্রদ, দুই প্রান্তে বারিধি, অরণ্য, মরু ও পর্বতমালা; আছে হিম, উষ্ণ, শুষ্ক ও সজল প্রদেশ; উৎপন্ন হচ্ছে অজস্র চাল, উত্তম খেজুর, অতুলনীয় তরমুজ, তৃপ্তিহীনভাবে সেবনীয় দ্রাক্ষা; যখন শিকাগো শীতার্ত তখন ফ্লরিডা রৌদ্রময় ও ক্যালিফার্নিয়া বাসন্তিক;— অর্থাৎ, প্রকৃতির নানাবিধ প্রকরণের একটি সংকলন যেন এই দেশ। এবং প্রকৃতির প্রভাবে বাহ্যিক পরিবর্তনও ঘটে; ভূমির পর্যাপ্তি ও ঋতুর মৃদুতা বুঝে কোথাও পাবেন বাগান উঠোন বারান্দা-সমেত হাত-পা-ছড়ানো বাংলো-বাড়ি; কোথাও সকলেরই গারাজ আছে, আর কোথাও লোকেরা রাস্তাতেই ফেলে রাখে গাড়িগুলো; তাছাড়া ধরুন, বিবাহবিচ্ছেদের আইন কোনো-কোনো রাজ্যে যতটা সহজ, সর্বত্র তা নয়। কিন্তু এই সব-কিছুই একই ব্যাপ্ত মার্কিনী মানসের অন্তর্ভূ'ত। যেটা মৌলিক, যার দ্বারা মানুষ অচেতনভাবে চালিত হয়, যাকে বলে জীবনধারা বা লোকাচার, তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। বস্টন থেকে লস এঞ্জেলেস পর্যন্ত যেখানেই

আপনি যান, সেখানেই দেখবেন একই রকম হোটেল, দোকান, আসবাবপত্র ও খবর-কাগজ, একই রকম খাদ্য পানীয় বেশবাস, একই দৈনন্দিন অভ্যাস ও সাধারণ ধ্যান-ধারণা ; বাতাস তাপিত ও বাইরে রোদ উজ্জ্বল হ'লেও, নির্ভুলভাবে ছ-টার সময় ডিনার। রাতের ট্রেনে চলেছি পিটসবার্গ থেকে ন্যুয়র্ক ; বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার খুব কম দেখেছি ; দু-তিন মিনিট কখনো হয়তো কালো হ'লো, কিন্তু তারপরেই আবার আলো, নিয়নচিহ্নিত বিপণি ও সিনেমা, জয়ধ্বজার মতো বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ, নগরে ও গ্রামে ভেদরেখা অস্পষ্ট, কিংবা আসলে 'গ্রাম' কথাটাই ভুল (ঐ শব্দের ব্যবহারও প্রায় নেই) ; এখানে আছে, আমাদের ভাষায়, শুধু শহর আর মফস্বল, আর মফস্বল মানে শহরতলি, বা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর শহর। এই সমীকরণের কারণগুলো অবশ্য স্পষ্ট : দেশের তারুণ্য, জনপদগুলির পরিকল্পিত গঠন, জীবনের অসামান্য জঙ্গমতা, পথ ও যানের প্রাচুর্য, অবিরলভাবে সম্প্রসারণশীল যন্ত্রশক্তি। তাছাড়া, মুষ্টিমেয় 'ইণ্ডিয়ান'দের বাদ দিলে, এদের সমগ্র প্রজাবৃন্দ এসেছে বাইরে থেকে, ও নানা দেশ থেকে ; কিন্তু এই বিপুল মিশ্রণ ও মন্থনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে নতুন এক জীবনধারা, যার মধ্যে আইরিশ, হিস্পানি, ইহুদি, ওলন্দাজ, জাপানি প্রভৃতি সকলেই স্বচ্ছন্দে গৃহীত হ'য়ে যায়। এখনো অনবরত অভিবাসীরা আসছে : যত সহজে ও দ্রুতবেগে তারা মার্কিনী সত্তা লাভ করে, তা আমার পক্ষে বিস্ময়কর। এই যে আশ্চর্য শোষণ-ক্ষমতা, এটাই এদের সমীকরণের উৎস। মার্কিনী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এখানে।

এবং যে-কারণে নানা দেশকে মিলিয়ে দেবার এই শক্তি এরা পেয়েছে, সেই একই ঐতিহাসিক কারণে মার্কিন দেশ বিদেশীর প্রতি সহনশীল— শুধু তা-ই নয়, আমন্ত্রণেও উদার। বললে বোধহয় ভুল হয় না যে ভারতে যেমন বাঙালির, য়োরোপে তেমনি ফরাশি ও জর্মান চরিত্রে আত্মশ্লাঘা কিছু বেশি, আর ইংরেজরা, দূরস্পর্শী সাম্রাজ্য সত্ত্বেও, এক ধরনের চেতনাহীনতায় আবিষ্ট* ;— অর্থাৎ, তাঁরা অনেকেই ভাবেন যে তাঁদের পক্ষে যা

* কিছুকাল আগে লণ্ডনের 'হোরাইজ়ন' পত্রিকায় এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিলো। দু-জন ইংরেজ সামরিক পুরুষ ভারতবর্ষে ট্রেনে চলেছেন। এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ি থামলো। একজন জিগেস করলেন : 'এই শহরের লোকসংখ্যা কত হবে?' দ্বিতীয় ইংরেজের উত্তর : 'দশ লক্ষ— অবশ্য নেটিভদের ধ'রে বলছি।' 'ফরাশিরা কী অদ্ভুত— নিজেদের শহরগুলোর নামের উচ্চারণ

অচলিত বা অচেনা, তা-ই সভ্যতার সীমানার বাইরে। কিন্তু মার্কিনীরা এদিক থেকে বিনয়ী, তা না-হ'লে চলে না তাদের, বা সেটাই তার সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার পথ; যেহেতু বিদেশীরা অচিরে তাদের আত্মীয় হ'য়ে যায়, তাই তারা ব্যতিক্রমে অভ্যস্ত হ'তে শেখে। এমন অনেকের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা বা চেনাশোনা হ'লো, যাঁরা এক পুরুষের মার্কিনী, অর্থাৎ যৌবনে এ-দেশে এসে এখন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হচ্ছেন; আমি চেষ্টা করতুম তাঁদের নাম ও উচ্চারণ থেকে আদিভূমি নির্ণয় ক'রে নিতে। সবচেয়ে নির্ভুলভাবে ধরা যেতো জর্মানভাষীদের। এঁরা মনে-প্রাণে মার্কিনী হ'য়ে গেছেন, কিন্তু কথা বলার ধরনটা এখনো পুরোপুরি স্থানীয় হয়নি— এমনকি কারো-কারো পক্ষে ইংরেজি এখনো পরভাষা, ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের টান অন্যরকম— একজন বললেন, তিনি কবিতা লিখলে জর্মানেই লিখতেন, তাঁর মুখে হঠাৎ একবার 'ফুণ্ডামেণ্টল' উচ্চারণ শুনেছিলাম। অথচ এঁরা সকলেই কৃতী ও সম্মানিত; কেউ নামজাদা অধ্যাপক, কারো বা কেনেডির দরবারে যাতায়াত আছে এবং আইন ব্যবসায়ে উপার্জন বিপুল। (মনে-মনে বলেছি: 'হা ভগবান! আর আমরা ইংলণ্ডীয় উচ্চারণের অনুপুঙ্খ নিয়ে কত না উদ্বিগ্ন প্রহর যাপন করি!')

আসল কথা, আজকাল যাকে বলা হচ্ছে 'meritocracy' বা গুণতন্ত্র, এই দেশ তার এক পীঠস্থান। এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে দু-খানা হাতের ব্যবহারে রাজি থাকলে এখানে জীবিকার অভাব হয় না;† এবং এটা কিছু নতুন কথাও নয়, কেননা অন্যান্য দেশেও সার্বিক বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে, ইংলণ্ডে ও সাম্প্রতিক পশ্চিম জর্মানিতে বৈদেশিক শ্রমিকও কম নেই। তবে শুধু কারখানার শ্রমিক বা বাস্-কণ্ডাক্টর নয়, শুধু অসামান্য যোগ্যতাশালী ব্যক্তিও নন— বহু বিভিন্ন স্তরের বিদেশীর জন্য আমেরিকা তার দরজা খুলে রেখেছে; এবং তার কারণ শুধু ধনবল নয়, ভিন্ন

জানে না!'— বললেন ফ্রান্সে ভ্রমণকালে এক ইংরেজ মহিলা। দ্বিতীয় গল্পটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, খুব সম্ভব এটা বানানো, কিন্তু ইংরেজ ভিন্ন অন্য কারো বিষয়ে এ-রকম ঠাট্টা রচিত হ'তে পারতো না।

† স্টেফান ৎসোয়াইখ-এর আত্মজীবনীতে এর একটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে, তিনি (শুধু যাচাই করার জন্য) বিজ্ঞাপন দেখে নিয়োগলাভের চেষ্টা করেন। একদিনের মধ্যে তিনটি আহ্বান তাঁর কাছে পৌঁছয়।

ইতিহাস ও মানসতা। একনায়কাধীন য়োরোপ ছেড়ে যাঁদের পালাতে হ'লো, সেই সব মনীষী ও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই আজ আমেরিকার স্থায়ী ও চিন্ময় সম্পদ। প্রতিভা, এবং আরো সাধারণ অর্থে যা গুণ বা দক্ষতা, তার সমাদর এ-দেশে অবধারিত। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বেতে ভেদ আছে ব'লেও মনে হয় না, কেননা, নৃত্যগীত দ্বারা যাঁরা বিত্ত ও খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কৃষ্ণ ও মাঝে-মাঝে পীত ব্যক্তি পাওয়া যায়; এবং সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্করের যশোকীর্তন আমি ভারতের বাইরে সবচেয়ে বেশি এখানেই শুনেছি। ছোটো-বড়ো অনেকগুলো শিক্ষায়তনে ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই কিছু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী আছেন, তাঁরা অধিকাংশই বৃত্তিলাভের ফলে স্বাবলম্বী, এবং কেউ-কেউ, সসম্মানে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে, গবেষক বা সহকারীর পদে অধিষ্ঠিত। এর ফলে, আমাদের পক্ষে, অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে: ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে— বিশেষত বিজ্ঞানে যাঁরা তীক্ষ্ণধী, তাঁরা কেউ-কেউ দেশে ফেরা বিষয়ে দোমনা হ'য়ে পড়েন, বা সেটাকে অনির্দিষ্টভাবে পেছিয়ে দেন। তাঁদের যুক্তি— 'অর্থের জন্য নয়, গবেষণার যে-সুযোগ আমরা এখানে পাচ্ছি, আমরা জানি দেশে তার শতাংশও পাবো না।' এই যুক্তি তুচ্ছ আমি তা বলি না, কেননা আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা বহু উপাদান ও যন্ত্রসাপেক্ষ, এবং এ-মুহূর্তে ভারতে তা দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের দ্বারা আহৃত যে-কোনো বিশেষ বিদ্যা যদি শেষ পর্যন্ত স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত না হয়, সেটাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। য়োরোপ সহস্রাধিক হারিয়েও দরিদ্র হ'য়ে পড়ে না, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রতিটি গুণী ও দক্ষ ব্যক্তি মূল্যবান। পার্থিব দিক থেকে তাঁদের কাছে কিছুদূর পর্যন্ত ত্যাগও আমরা দাবি করতে পারি, কিন্তু দেশের মধ্যে এমন ব্যবস্থার নিশ্চয়ই প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণী ব্যক্তিকে স্বীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাহত বা সংকুচিত হ'তে না হয়।

আমেরিকান মানে শুধু শ্বেতাঙ্গ প্রটেস্টাণ্ট অ্যাংলো-স্যাক্সন— ইহুদি নয়, নিগ্রো নয়, পুয়ের্টো-রিকান বা ইটালিয়ান নয়, এই রকম মনোভাবের যাঁরা প্রতিভূ, তাঁরা উগ্র হ'লেও আজকের দিনে হীনবল; মোটের উপর বলা যায় যে আমেরিকায়, বহু ক্ষেত্রে বহু ত্রুটি সত্ত্বেও, মানুষ তার জাতি বা ধর্মের দ্বারা অত্যন্ত বেশি চিহ্নিত নয়। যখন সদ্য এ-দেশে এসেছিলাম, এক বৃহৎ বিভাগীয় বিপণির কর্মিণী আমাকে জিগেস করলে, 'Cash or charge?' মার্কিনী বাগ্‌ধারার

সঙ্গে তখনও পরিচিত হইনি বলে, এবং অন্য কারণেও, কথাটা বুঝতে আমার একটু দেরি হ'লো। বিদেশী ও সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, আমি ইচ্ছে করলে ধারে কিনতে পারি, এটা আমার কল্পনার মধ্যে ছিলো না। অন্য এক দোকানে কিস্তিতে কিনলুম টাইপরাইটার; ঠিকানা ও চেক লিখে দেয়ামাত্র জিনিশটি আমার হাতে এলো— আমি কোথায় এবং কী কর্ম করি, তা পর্যন্ত জানতে চাইলো না দোকানি। নিতান্ত কৌতূহলবশত, কী হয় তা দেখার জন্যই, ট্রেনের টিকিটের জন্য চেক দিতে চাইলুম;— লোকটি তা নিতে আপত্তি করলে না, শুধু জিগেস করলে আমার পকেটে কি গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আছে, বা ঐ ধরনের অন্য যে-কোনো প্রমাণপত্র* ? বিদেশীর প্রতি এই রকম নির্বাধ ব্যবহার অন্য কোনো দেশে প্রচলিত কিনা, আমি তা জানবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু অন্ততপক্ষে একটা বিষয়ে আমেরিকার অনন্যতা আমাকে মানতে হয়েছে। য়োরোপে যখনই যেখানে গিয়েছি, হোটেলওলারা প্রথমেই চেয়ে নিয়েছে আমাদের পাসপোর্ট, তা থেকে সব তথ্যের প্রতিলিপি রেখে তবে ফেরৎ পাঠিয়েছে;— প্যারিসে, শুনলুম, বাড়িতে অতিথি এলে বা বাড়ি-বদল করলে, পুলিশের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো কর্তব্য। এ-সব প্রথার ঔচিত্য বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমেরিকায় এগুলো অস্তিত্বহীন। আপনি এলেন কোনো হোটেলে, একটা কার্ডে নাম-ঠিকানা লিখলেন—এ ছাড়া আর-কিছুরই প্রয়োজন হয় না, কখনো কোনো অগ্রিম মূল্যের দাবি নেই; ব্যাপারটা এত সহজ যেন অসাধুতাকে সম্ভবপরতার বহির্ভূত ব'লে ধ'রে নেয়া হচ্ছে। সর্বত্র, সব হোটেলে, এই নিয়মই দেখেছি।

আমেরিকায় ব্যবসায়িক সাধুতা ইংলণ্ডের মতো নিষ্কলঙ্ক নয়, এমন কথা কারো-কারো মুখে শুনেছিলাম। কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন তা বলতে পারবো না—কেননা আমারও দু-একবার অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ জীবনে উল্টো প্রমাণই বার-বার পেয়েছি। চেক-সমেত চিঠি, বা পার্সেলে জিনিশপত্র, যদি না বিদেশে পাঠাতে হয়, কেউ কখনো রেজিস্ট্রি

* এবার ন্যুয়র্কে কিছুটা ভিন্ন ব্যবহার পেয়েছিলাম; সাধারণ একটা সামগ্রী বেচে দোকানি চেক নেবার আগে আমার কর্মস্থলের প্রমাণপত্র দেখতে চাইলে। এ-রকম অবশ্য একবারের বেশি ঘটেনি, তাই এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না।

করে না; অনবরত সাধারণ ডাকে নির্ভুলভাবে পৌঁচচ্ছে সেগুলো। ব্যাঙ্কে চেক জমা দেয়া মাত্র তা থেকে টাকা তোলা যায়, কোনো চেক ফেরৎ আসতে পারে এটা যেন এদের ধারণায় নেই। একবার ন্যুয়র্কে বাস্‌-এর বাক্সে ভ্রমক্রমে কিছু বেশি পয়সা ফেলেছিলাম, সেটা ডাকটিকিটের আকারে আমার কাছে ফেরৎ এসেছিলো। 'মার্কিনী ডাক্তাররা অর্থগৃধ্নু'— এই জনরবের সমর্থন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব; কেননা— আমাদেরই সৌভাগ্য কিনা কে জানে— তবে একাধিকবার দেখেছি, চিকিৎসক যথোচিত পরীক্ষার পর বলেছেন, 'এ-ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই, অতএব আমি দক্ষিণাও নেবো না। আপনি অমুকের কাছে যেতে পারেন।' উপরন্তু যা বিদেশীর পক্ষে প্রীতিকর তা এদের অগম্ভীর, অমলিন ও নিঃসংকোচ স্বভাব; এদের ব্যবসায়িক ব্যবহারেও কিছুটা ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়;— চিকিৎসক, অধ্যাপক, হাসপাতালের নার্স, আয়করের অধিকর্তা, কঠিন মার্কিনী কর্মসূচি সত্ত্বেও, কিছু ঘরোয়া আলাপে সকলেই প্রবৃত্ত হন, কোনোখানেই আঁট হ'য়ে থাকতে হয় না। প্র. ব. যখন দন্তশূলে পীড়িত, তখন ডাক্তারদের সৌজন্যে আমরা এমনকি মুগ্ধ না-হ'য়ে পারিনি। যন্ত্রণা দারুণ, সংবেশকেও উপশম হচ্ছে না, এই অবস্থায় ডাক্তার স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে টেলিফোনে বললেন, কিছুমাত্র প্রয়োজন হ'লে রাত্রির যে-কোনো সময়ে আমি যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি— আর, বস্তুত, যখন ভদ্রলোকেদের ঘুমের সময় বহুক্ষণ পেরিয়ে গেছে, তখনও তাঁর কণ্ঠে কোনো ক্লান্তি বা অনিচ্ছা আমি শুনিনি। পরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি বন্ধুর মতো আগ্রহ নিয়ে করেছিলেন।

৪

'আমেরিকায় সুবিধে আছে অনেক কিন্তু আরাম নেই,' এই সূত্রটি আরো কিছুদূর অনুধাবনযোগ্য।

ধরা যাক আমাদের চেলসী হোটেলের সংসারযাত্রা। চমৎকার ফ্ল্যাট, অসুবিধের নামগন্ধ নেই ; যদি যন্ত্রের দ্বারা সত্যিই সব প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা যেতো, তাহ'লে আর ভাবনা ছিলো না। কিন্তু আহার ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম সনাতনভাবেই সমাধা করতে হয়, এবং মানুষের প্রয়োজনও অনেক, তাই প্রচেষ্টা ও শ্রম অবিরলভাবে অপরিহার্য। যে-মুদিখানা আমাদের পছন্দ সেটা খুব কাছে নয়, তারা একটা ঠেলাগাড়ি ধার দিয়েছে আমাদের— সেটা যাবার সময় মসৃণভাবে চলে, কিন্তু ফেরার পথে তার ওজন হ'য়ে যায় দ্বিগুণ। কসাইখানা আলাদা, মাছ কিনতে হ'লে যেতে হয় সাত ছেড়ে আট এভিনিউতে; অমুক দোকানের আইসক্রীম ভালো, কাঁচা পাতিলেবুর জন্য হিস্পানি দোকান— এমনি সাত রাজ্যি ঘুরে, শীতে বাতাসে দষ্ট হ'তে-হ'তে দু-জনে মিলে গাড়ি ঠেলছি ; স্ট্রীটগুলো পেরোবার সময় সাবধান, ফুটপাত থেকে নামাতে বা তুলতে গিয়ে গাড়ি যেন উল্টে না যায় ; মাঝে-মাঝে একটু ক'রে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নিচ্ছি ;— অবশেষে বাড়ি ফেরা গেলো। বলা বাহুল্য, কাচের দরজা ঠেলে গাড়িটাকে হোটেলে ঢোকানো, তারপর লিফটে তোলা, তারপর ফ্ল্যাটের দরজা একহাতে খুলে রেখে অন্য হাতে সেটাকে ভিতরে ঢোকানো— আমরা দু-জন আছি ব'লেই এগুলো টায়ে-টুয়ে সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে কোনোটাই সুসাধ্য নয়। আর তারপর যদি ধরা পড়ে যে বাসন-মাজা সাবান আনতে ভুলেছি, বা রেফ্রিজরেটরে রাঁধুনি-চর্বি শূন্য, তাহ'লে পুনর্বার পদচালনা ভিন্ন উপায় নেই। অবশ্য এ-রকম বৃহৎ অভিযানে সপ্তাহে একবারের বেশি না-বেরোলেও চলে, তবু প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু গজিয়ে ওঠে: লণ্ড্রি, জুতো পালিশ, খুচরো খাবার, সিগারেট, ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিশ ; শার্টের হাতা ছোটো করতে দিয়েছিলাম সেটা আনতে হবে, একটা আলপিনের দরকার হ'লেও নিজেদেরই তা সংগ্রহ করা চাই। ঋতু নিস্তাপ হ'লে উদ্যম বাড়ে তা মানছি, স্বাস্থ্যের শত্রুরাও এখানে নির্জীব, কিন্তু দিনরাত্রির আয়তন সর্বত্র সেই চব্বিশ ঘণ্টাতেই সীমিত, আর যিনি নির্বিকারভাবে নিদ্রাহীন থাকতে পারেন, ভূভারতে এমন নেপোলিয়নও বিরল। অতএব প্রতিটি দিন সশ্রম ও রুদ্ধশ্বাসভাবে কেটে যায়।

যে-কর্ম নিয়ে আমি এখানে এসেছি তার দাবি অগুরু, সপ্তাহে তিনটের বেশি ক্লাশ নিতে হয় না ; তবু দেখছি অপরিহার্য কালেজি বইয়ের পাতা ও-টানো এবং বিবিধ চিঠি লেখা ছাড়া, রোজ রাত্তির ছটো পর্যন্ত জেগেও, আর কোনোরকম লেখাপড়ার সময় পাচ্ছি না, অনেক দ্রষ্টব্যও অ-দৃষ্ট থেকে যাচ্ছে। কেননা শুধু গার্হস্থ্য নয়, সামাজিক জীবনও আছে— আতিথেয়তার বিনিময়, বিবর্ধমান বন্ধুসংখ্যা, কখনো কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। গৃহস্থালি বাদ দিলে বাঁচা যায় না, আর মেলামেশা যদি না-করা গেলো তবে তো দেশান্তরে আসা অর্থহীন। দুই দিকের দাবি মিটিয়েও আক্ষরিক অর্থে অবকাশ থাকে না তা নয়, কিন্তু আমি পারি না সেটাকে অবকাশ ব'লে অনুভব করতে, কেননা আমার অসংখ্য স্বাভাবিক ত্রুটির মধ্যে যে-দুটি সবচেয়ে গভীর, তা হ'লো— উদ্বেগপ্রবণতা ও বিস্তারের প্রতি আসক্তি। লাঞ্চ যদি একটায়, দশটা থেকে আমার অস্বস্তি শুরু ; তিনটি পরম্পর নিয়োগের মধ্যে যে এক-আধ ঘণ্টা ফাঁক থাকে তা কোনোরকম কাজে লাগাতে আমি সীমাহীনরূপে অক্ষম। কূটোক্তি ক'রে বলা যায়, আমার মন ছড়িয়ে বসার জায়গা না-পেলে চলতে পারে না ; অর্থাৎ, সময়ের অনেক ফেলাছড়া ক'রে তবে আমাকে ধরা দেয় উদ্যোগ ; আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজগুলির জন্য এ-রকম একটা মোহ আমার প্রয়োজন যেন আমার সময় অফুরান। এই যে আমি লিখছি— যেটুকু কলম চলছে তার চেয়ে অনেক বেশি চোখ যাচ্ছে জানলায়, রমণী চাটুজ্যে স্ট্রীট পেরিয়ে সিঙ্গি পার্কের লম্বা গাছগুলির দিকে, ভাবছি, ট্র্যামে ভিড়, স্মৃতি ও সম্ভাবনার বুদ্বুদ উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, শেষ বাক্যটি কেটে দিলাম, হলদে শাড়ি-পরা মহিলাটিকে মেঘলা বেলায় দেখাচ্ছে ভালো, হঠাৎ একটা নতুন ভাবনার স্ফুরণ, অনেক-কিছু মনে পড়ছে এ-মুহূর্তে যার প্রয়োজন নেই, শালকরের দোকান বন্ধ হ'লো— এই ভাবে নিজের মনের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে আছি, আর এটাই— কণ্টকিত ও কষ্টকর হ'লেও— আমার মতে এরই নাম অবকাশ। অর্থাৎ, এই চেষ্টা যেন আমাকে ধীরে-ধীরে বদলে দিচ্ছে, আর, যেহেতু পঙ্গুতাও এক প্রকার গতি, তাই সারাদিনের শেষে দু-পৃষ্ঠা-মতো তৈরিও যে হ'য়ে যাচ্ছে না তা নয়। ফলাফল খুব উৎসাহজনক বলা যায় না, কিন্তু ধৈর্য ও সরল গণিত আমাকে পরামর্শ দেয় যে এমনি ক'রেই পঞ্চাশ দিনে একশো পৃষ্ঠা রচিত হ'য়ে যাবে, এবং যার আরম্ভ আছে, লেগে থাকলে তার শেষও

অনিবার্য।— কিন্তু এই ধরনের অবকাশ কি আমেরিকায় কেউ পায় কখনো ?

এক তরুণ মার্কিনী সাহিত্যিক, যিনি আমাকে সৌহার্দে বেঁধেছেন, তাঁকে একদিন এই কথাটা জিগেস করেছিলুম। 'কী করে আপনারা বই লেখেন, বলুন তো ? অর্ধেক সময় কি ঘরকন্নার কাজেই চ'লে যায় না ?' 'জানেন না বুঝি ?' হেসে জবাব দিলেন আমার বন্ধু, 'সম্প্রতি কয়েকটা "হোম" হয়েছে লেখকদের জন্য।' '"হোম" মানে ?' 'মানে— নির্জন পল্লীগৃহ, ঘর, শয্যা, সব পাওয়া যায় ; কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না, সময়মতো ঘরেই খাবার দিয়ে যাবে, আপনি নিবিষ্ট হ'য়ে লিখতে পারবেন।' 'সত্যি ? আছে নাকি এ-রকম ?' 'আপনারা তো দু-জনেই লেখক, কিছুদিন কাটিয়ে আসুন না ও-রকম কোথাও, কোনো খরচ নেই, কিছু টাকাও বাঁচবে আপনাদের।' এই অভিনব আশ্রম চেখে দেখার সময় আমি পাইনি— হয়তো সেটা ভালোই হয়েছে, কেননা লেখাটা যেখানে নৈতিক দায়িত্বে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আর সেই উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান আমাকে পোষণ করছেন, সেখানে হয়তো— পাছে কিছু লেখা না হয়, সেই উদ্বেগের পীড়নেই আমি বিকল হ'য়ে যেতুম।

আমি জানি, আরো বেশি অভ্যস্ত হ'লে আমিও অনেক রন্ধ্র খুঁজে পেতুম, কেননা মানুষের অভিযোজনশক্তির তুলনা নেই, আর এই মার্কিনদেশে, শুধু একশো তলা বাড়ি নয়, কিছু-কিছু মানসকীর্তিও রচিত হয়েছে। তবু, মার্কিনী সাহিত্যিকদের প্রবাসপ্রীতিও স্পষ্ট, এবং তা এজ্‌রা পাউণ্ড ও হেমিংওয়ের সঙ্গেই অবসিত হয়নি ; এর একটি কারণ কি এ-রকম হ'তে পারে না যে অন্যান্য দেশে— এমন কি ফ্রান্স বা ইটালিতে— অবকাশ এত দুর্লভ নয় ? আমার এই অনুমান যদি ভুল হয়, তবু এ-কথা বোধহয় সত্য যে মার্কিনী ব্যবস্থা একদিকে যেমন অতুলনীয়রূপে দক্ষ ও মসৃণ, তেমনি অন্য দিকে উৎকণ্ঠাজাতক ; অর্থাৎ যদিও সময় বাঁচাবার জন্যই যন্ত্র, তবু যন্ত্রসমবায়ে আখেরে কতটুকু সময় বাঁচে, বা সময় বাঁচলেও সুখের অংশ ক'মে যায় কিনা, তা বলতে হ'লে সূক্ষ্ম হিশেবের প্রয়োজন হবে। ধরা যাক, আমরা যদি ঘরকন্নার ঝামেলা বাঁচাতে চাই, তার উপায় নেই তা নয় ; কিন্তু শুধু রেস্তোরাঁয় ও কাফেটেরিয়ায় খেয়ে কালাতিপাত করা ব্যয়সাপেক্ষ, বা সময়সাপেক্ষ, বা দুটোই ; আর দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা হ্যাম্বার্গার খেয়ে নিলে যথোচিত ক্যালরিলাভ ঘটলেও, তা আমাদের ক্ষুদ্র

বাঙালি-সাধ্যে অন্য কারণে কুলোয় না। বোতাম টিপেও কফি-স্যাণ্ডুইচ পাওয়া যায়, তার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সময়-সংক্ষেপ দুটোই সম্ভব, কিন্তু তৃপ্তি হয় কিনা সেই প্রশ্ন বাকি থেকে যায়। হাজার হোক, মানুষের একটা রসনা আছে, এবং একটা মনও আছে, আর মনের পক্ষে যেমন আহার ব্যাপারটা শুধুমাত্র খিদে মেটানো নয়, তেমনি মানুষের রসনাও বিচিত্র স্বাদগ্রহণে সক্ষম ও উৎসুক।

বিপুল লোকসংখ্যায় প্রপীড়িত আমরা, আর এ-দেশে সর্বত্রই লোকাভাব। দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে হ'লে এদের অবস্থাই বরণীয় তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু যেহেতু এরা সংখ্যায় স্বল্প, এবং কতগুলো মৌল বিষয়ে সকলেরই অধিকার সমান, তাই মানুষের অন্য দু-একটা অধিকার সংকুচিত করার প্রয়োজন ঘটে। বিছানায় শুয়ে চা, ঘরে ব'সে বা একতলায় নেমে ব্রেকফাস্ট— যা য়োরোপে মাঝারি হোটেলেও প্রাপ্য, এখানে তা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে, হোটেলগুলো অধিকাংশই অম্বুসার। এবার ন্যুয়র্কে এসে প্রথম যে-হোটেলে উঠেছিলুম, তার সংলগ্ন একটি পানশালা ভিন্ন কিছুই ছিলো না ; যে-ঈষৎরঞ্জিত উষ্ণ জল ড্রাগস্টোরে চায়ের নামে চলে, তারই উদ্দেশে, আবহাওয়া যখন মেরুপ্রতিম, সকালে উঠে আমাকে বেরোতে হ'তো। কিন্তু একদিন দেখলুম পর-পর ড্রাগস্টোর বন্ধ ; বরফ উজিয়ে মাইলখানেক হাঁটার পর অবশেষে একটা খোলা দেখতে পেয়ে উৎফুল্ল হলুম, কিন্তু সেখানে চা ব'লে যা দিলে তাকে পেয় ব'লে মানতে হ'লে অনেকখানি কল্পনাশক্তি খাটাতে হয়। ফিরে এসে, একটু বেলায়, দু-জনে মিলে আবার বেরোলাম ; কিন্তু ফিফথ এভিনিউ ধ'রে মিনিট পনেরো হাঁটার পরেও সান্ত্বনার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না : দোকানগুলো, তাদের চিত্তহারী ফলকচিহ্ন ও স্ফটিকপেটিকার সাজসজ্জা নিয়ে, হৃদয়হীনভাবে অবরুদ্ধ। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, আজ রবিবার। কয়েক সপ্তাহ পরে এক বন্ধু ডাকলেন লাঞ্চে— সেদিন শনিবার ছিলো ; ঘরে ব'সে কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি আমাকে নিয়ে এলেন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর নিচের তলায় এক নামজাদা রেস্তোরাঁয় ; সেখানে আমরা শুধু বচনের দ্বারা আপ্যায়িত হলুম, কেননা একটু আগে সেটি বন্ধ হ'য়ে গেছে। বিকল্পের খোঁজে হাঁটতে-হাঁটতে নিমন্ত্রণ-কর্তা আমাকে জানালেন যে কর্মিকদের সাপ্তাহান্তিক ছুটি দিতে হ'লে রেস্তোরাঁ সেদিন বন্ধ রাখতে হয়, কেননা, বদলি লোক দুষ্প্রাপ্য। ছুটির দিন সকলেরই

কাম্য, তা দিতে আপত্তি হওয়া যেমন অনুচিত, তেমনি সকালে উঠে এক পাত্র চায়ের প্রার্থনাও অবৈধ নয়, আর প্রকৃতিতেও এমন কোনো বিধান নেই যে মানুষ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হবে শুধু সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। অবশেষে, আত্মরক্ষার তাগিদে, আমরাও শিখে নিয়েছিলুম পাড়ার কোন দোকান শনিবারে কখন বন্ধ হয়, কোনগুলো খোলে রবিবার বিকেলে, আর কোন-কোন ইহুদির দোকান রবিবার সকালবেলাতেও প্রবেশ্য। কিন্তু এই নিখিলপৌর ন্যুয়র্ক, যেখানে জীবনের স্রোত প্রখর, আর অসংখ্য মানুষ অসংখ্য প্রকার কর্মে ও ব্যসনে লিপ্ত, সেখানে কোনো সময়ে কোনো কারণেই তুষ্ণীম্ভাব আশা করা যায় না; রবিবারের মৃতবৎ পূর্বাহ্নটাকে তাই মনে হয় যেন মহাকাব্যে ছন্দপতন, এক অসমঞ্জস মুদ্রাকরপ্রমাদ। এবং এদের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে-অদ্ভুত অদক্ষতা দেখা যায়, তারও কারণ যন্ত্রের প্রসার ও লোকস্বল্পতা; আমরা যাকে 'হস্তশিল্প' বলি তা অবশ্য প্রতীচীতে বহুদিন লুপ্ত, কিন্তু আরো সাধারণ অর্থে যা হাতের কাজ, যেমন বেশবাসে ছোটোখাটো সংস্কারসাধন, তার জন্যে উপযুক্ত কর্মিক খুঁজে বের করা— ন্যুয়র্কে না হোক, মফস্বল শহরে অতিশয় প্রয়াসসাপেক্ষ। এমনকি ন্যুয়র্কেও কোনো মহিলা তাঁর কোটের ছাঁট বদলে নিতে চাইলে খুব সম্ভব প্রতিহত হবেন, সেই কাজে ইচ্ছুক ও সক্ষম কোনো দোকান যদি বা খুঁজে পাওয়া গেলো, দেখা যাবে প্রায় সেই ব্যয়েই নববস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব। এই হ'লো একটা দিক;— আর-এক দিকে, লোকাভাবের জন্যই, বিনিয়োগকর্তারা অনেক সময় বাধ্য হন আনাড়ি দিয়ে কাজ চালাতে; এবং কর্মিকমহলে ঘন-ঘন পরিবর্তনও ঘটে; ফলত, প্রায় অবিশ্বাস্য ভুল হয় মাঝে-মাঝে, পঞ্চাশটি কবিতার বই যিনি অর্ডার দিয়েছেন তাঁকে পাঠানো হ'লো একাত্তরখানা বিজ্ঞানোপন্যাস, এ-রকম ঘটনা আমারই অভিজ্ঞতায় আছে। একই কারণে মার্কিনী রেস্তোরাঁয় পরিবেষণ অনেক সময় তৃপ্তিকর হয় না।

মার্কিনী জীবনের দ্রুতি সর্বজনবিদিত, কিন্তু তারও ব্যতিক্রম আছে। ভাবতে ঈষৎ কৌতুক বোধ হয়, যে-নগরে ভূতলযান সারারাত্রি সচল, আর রবিবারের বিপুল সংবাদপত্র শনিবার রাত্রে বেরিয়ে যায়, সেখানে দিনে একবারের বেশি চিঠি বিলি হয় না, ডাকবিভাগের গতিও অত্বর। কলকাতার চিঠি তিন দিনেও পাওয়া গেছে, কিন্তু এয়ার-মেলে শিকাগোর চিঠি অনেক

সময় ছু-দিনের ব্যাপার ; আর ট্রেনে-আসা বা এমনকি স্থানীয় পার্সেলগুলো, এক্সপ্রেস-চিহ্নিত না-হ'লে, পৌছবার জন্য কিছুমাত্র তাড়া করে না। কর্মকেন্দ্র বিরাট, সে-তুলনায় করণিক অল্প : এ-ছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ডাকঘরগুলি, নগরের আয়তন হিশেবে, সংখ্যাতে প্রচুর নয়, এবং বেশ কিছুটা দূরে-দূরে ছড়ানো। ডাকটিকিটের যন্ত্র অবশ্য যেখানে-সেখানে বসানো আছে, আছে সব হোটেল ও ফ্ল্যাটবাড়িতে ডাকবাক্স— কোথাও-কোথাও সেগুলো নেমে গেছে সোজা পঞ্চাশ থেকে একতলা পর্যন্ত— অর্থাৎ, সাধারণ লোকের সাধারণ প্রয়োজনগুলি পোস্টাপিশে না-গিয়েও মিটে যায় ; নিকটতম ডাকঘর কোথায়, সে-বিষয়ে অনেকের ধারণাও অস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ডাক-বিভাগের যা সম্বন্ধ, তাতে তার কার্যালয়গুলিতে মাঝে-মাঝে না-গেলে চলে না, আর তখন নতুন ক'রে বুঝি যে সময় ও শ্রমের ব্যয়, যন্ত্রের বেগ ও বাহুল্য সত্বেও, এ-দেশে কী-রকম অনিবার্য ও দৈনন্দিন।

যে-কোনো মুদিখানায় আপনাকে ঠেলাগাড়ি নিয়ে নিজে খুঁজে নিতে হবে জিনিশপত্র ; এটা ন্যুয়র্কে তেমন চেষ্টাসাপেক্ষ নয়, কেননা দোকানগুলি সাধারণত ছোটো, আর সাহায্যকারীও থাকে ছু-একজন। কিন্তু লস এঞ্জেলেসে দেখেছিলাম এক 'সুপার-মার্ট', বা বৃহদায়তন মুদিখানা ; থরে-থরে সাজানো আছে পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্য ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী— কর্মিক ছাড়া কিছুরই অভাব নেই। একটিমাত্র লোক কাউণ্টারে ব'সে আছে, সে এক হাতে যন্ত্রের দ্বারা হিশেব মিলোয়, অন্য হাতে সওদাগুলি ঠোঙায় ভ'রে ফ্যালে, আর মূল্য অবশ্য তারই কাছে দেয়। মস্ত ব্যাবসা একটি লোক চালাচ্ছে। মানহাটানের বিভাগীয় বিপণীগুলিকে এই মহাদেশের দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধরা হয়— সেগুলো যে কত বড়ো তা চোখে দেখেও ধারণা করা শক্ত— কিন্তু সেখানে কিছু কিনতে গিয়ে কর্মিকার কটাক্ষলাভ সাধনসাপেক্ষ হ'তে পারে। নামজাদা রেস্তোরাঁগুলোতেও একই ব্যাপার। সময়ের টানাটানি থাকলে সে-সব দোকানই শ্রেয়, যেগুলো ক্ষুদ্র ও অনামী।

আমি বলতে চাচ্ছি যে সময় জিনিশটা এমন সূক্ষ্ম ও রহস্যময় যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ শুধু আপাতভাবে জয়ী হ'তে পারে ; নানাভাবে তাকে প্যাঁচে ফেলা সম্ভব হ'লেও, অবশেষে তার কুটিল প্রতিশোধ এড়ানো যায় না। মার্কিন দেশের গতিবেগ দেখে প্রথমে খুব চমক লাগে, কিন্তু কিছুদিন বসবাস

করলে এই আদিসত্য উপলব্ধ যে হয় মানুষের সঙ্গে পরমের দূরত্ব অনতিক্রম্য, আমরা একদিকে যা অর্জন করি অন্যদিকে তার মূল্য আমাদের দিতেই হবে। দেশটা অত্যন্ত গতিশীল ব'লেই কোনো-কোনো কাজ এখানে মন্থর ; ন্যুয়র্কের ভূপৃষ্ঠগামী যানগুলোকে অনবরত লোহিত-সংকেত থামিয়ে দিচ্ছে ; নগরের সঙ্গে উপনগর মিশে আয়তন এমন স্ফীত হচ্ছে যে আবাস ও কর্মস্থলের ব্যবধান ঘোচানো অনেকের পক্ষে দ্রুত ট্রেনেও কালক্ষয়ী। পূর্বেই বলেছি, দু-একটি শিশু-সন্তান থাকলে মানহাটানে ফ্ল্যাট পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু পিতামাতাদের সমস্যা ওখানেই শেষ হয় না, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনও সন্তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমার এক সহকর্মীকে সস্ত্রীক আপ্যায়ন করার জন্য আগ্রহ ছিলো আমাদের, কিন্তু তাঁরা প্রথমে রাজি হ'য়ে শেষ পর্যন্ত আসতে পারলেন না, তার কারণটা উল্লেখযোগ্য। দিনটা ছিলো শনিবার, আগে জানতেন না সেদিন তাঁদের তরুণী কন্যার 'ডেইট' আছে ; এদিকে তাঁদের দুটি সন্তান এখনো শিশু, বয়ঃপ্রাপ্তরা একযোগে বেরিয়ে গেলে তাদের দেখাশোনা কে করে? শহর থেকে দূরে যে-পল্লীতে তাঁরা থাকেন, সেখানে শিশু-রক্ষক সহজে মেলে না, আর পুত্রকন্যার 'তারিখে' বিঘ্ন ঘটানো মার্কিনী তন্ত্রে অসম্ভব। এমনি সমস্যা এখানে সন্তান, আর এমনি অধীন এখানে পিতামাতা। সন্তানলালনের সময় এলে অনেক মেয়ে কর্ম ছেড়ে দেন, তাঁদের গতিবিধিও হয় সীমিত, আর দম্পতিকে দু-ঘণ্টার জন্য সিনেমায় যেতে হ'লেও, হয় চাই করুণাময়ী প্রতিবেশিনী, আর নয়তো শিশু-রক্ষকের জন্য ঘণ্টাপিছু ডলার গোনা আবশ্যক। শুনেছি মাঝে-মাঝে তরুণ দম্পতিরা শিশুকে আহারাদি করিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে বেরিয়ে যান ;— তুলনা করলে আমাদের সমাজে দুটো-একটা ক্ষুদ্র সুবিধে এখনো হয়তো ধরা পড়ে।

উপরোক্ত 'তারিখ' কথাটার ভাষ্য প্রয়োজন হ'তে পারে। 'তারিখ' মানে— কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি যাকে 'প্রেমিক' ও 'প্রেমিকা' বলছে, তা-ই (যদিও ঐ বাংলা কথাটার ইংরেজি প্রতিশব্দ ভাবলে যে-অর্থ দাঁড়ায়, সেটা এখানে অপ্রয়োজ্য), আর যুগলবিহারের সন্ধ্যাটিরও ঐ নাম। তরুণ-তরুণীর পূর্বরাগ-লীলা তিনটি পরিভাষার উপর নির্ভর করছে : 'বয়-ফ্রেণ্ড', 'গার্ল-ফ্রেণ্ড' ও 'ডেইট'। ডিক্ যখন মার্থাকে কোনো-এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে বেড়াবার আমন্ত্রণ জানালে, আর মার্থা তা গ্রহণ করলে, তখন তারা পরস্পরের

'ডেইট' হ'লো। ডিক্‌-এর কর্তব্য নানাভাবে মার্থাকে আপ্যায়ন করা; বয়স ও আর্থিক অবস্থা বুঝে চকোলেট, পদচারণা, সিনেমা, ডিনার, ডিনারের পরে থিয়েটার বা নৃত্য, মোটরে ভ্রমণ, উপহারপ্রদান, ইত্যাদি, আর মার্থার কর্তব্য হ'লো ডিক্‌-এর চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার ও সংরক্ষণ। কিছুদিন পরে সম্বন্ধ হয়তো ভেঙে গেলো; ডিক্‌-এর পছন্দ হ'লো শার্লটকে, আর মার্থার সঙ্গী হ'লো ফ্রেড ;— এমনি ক'রে, হার্দ্য বেগে বাঁক নিতে-নিতে, কোনো-একদিন ভাগ্যবতীরা হন অঙ্গুরীয়ধারিণী। এই প্রথা এতদূর পর্যন্ত ব্যাপক যে— আবেগ অথবা পরিণামচিন্তা না-থাকলেও— বিনোদ হিশেবেই সমাজে এটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ; নবাগত বিদেশী ছাত্রের সম্ভবপর ব্যয়ের মধ্যে মাসে দুটো 'তারিখে'র উল্লেখ করতে সব অধ্যাপক ভুলে যান না, এবং যে-কন্যা চোদ্দ পেরিয়ে প্রথম 'তারিখে' বেরোতে পারেনি, তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে জনক-জননী উদ্বিগ্ন হন। পিটসবার্গের মহিলা-কলেজের ছাত্রীরা, অবশ্য অনুমতি নিয়ে, মাঝে-মাঝে ক্লাশে আসতো 'সবান্ধবে', আর সন্ধ্যাবেলা অপেক্ষমাণ যুবকদের দেখেই বোঝা যেতো যে আর-এক সপ্তাহ শেষ হ'লো। একবার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শুনেছিলাম দুই ছাত্রের মধ্যে কিছুটা কৌতুকজনক সংলাপ: শৌচাগারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভারতীয় যুবক জিগেস করছে তার মার্কিন বন্ধুকে— 'তার সঙ্গে "ডেইট" পেয়েছিলে তুমি? বলো না— কোন রেস্তোরাঁ তার পছন্দ? কী খেতে ভালোবাসে? কী-রকম কথাবার্তা ও আচরণ তার মনোমতো? আমিও চাই তার সঙ্গে একটা "ডেইট"— যে ক'রে হোক, যত খরচ হয়— আমার কি কোনো আশা আছে মনে হয় তোমার?' এই আগ্রহের ফলাফল আমি অবশ্য জানতে পারিনি, কিন্তু মনে হয়েছিলো যুবকটি ভারতীয় ব'লেই এতটা উচ্ছ্বাসী। মার্কিনী সমাজে মেয়েরাই বেশি আগ্রহশীল, আর 'মিস'-পদবিযুক্ত প্রৌঢ়াদের সংখ্যা চিন্তা করলে তার কারণ বুঝতেও দেরি হয় না। একবার ন্যুয়র্কে এক ইহুদি কবির আতিথ্যে আমি অর্ধেক দিন কাটিয়েছিলুম; বিকেলের দিকে, নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে যখন ডিলান টমাস-এর রেকর্ড শোনাচ্ছেন, তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজলো। উঠে গেলো তাঁদের তরুণী কন্যা, দু-মিনিট পরে উদ্ভাসিত মুখে ফিরে এসে মা-কে কী যেন বললে, আর মা তাকে চুমু খেয়ে, জড়িয়ে ধ'রে, কোলে নিয়ে এমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করলেন যেন কোনো অসামান্য সৌভাগ্যের সূচনা

হয়েছে। এক ফাঁকে মুখ ফিরিয়ে তিনি সুখবরটি জানিয়ে দিলেন আমাকে : কন্যার 'বয়-ফ্রেণ্ড' মাঝে অনেকদিন উদাসীন ছিলো, তাঁরা ধ'রে নিয়েছিলেন তার ভাবান্তর ঘটেছে— কিন্তু না, আজ আবার সে 'তারিখ' নিয়েছে ওর সঙ্গে। মাতৃস্নেহের এই উদ্বেলতা সেইজন্যেই।

পাছে এই বিবরণ প'ড়ে কোনো বাঙালি পাঠক বা পাঠিকার অধর কুঞ্চিত হয়, সেইজন্যে দু-একটি মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করি। প্রত্যেক সমাজ অচেতনভাবে যে-সব ব্যবস্থা সৃষ্টি ক'রে তোলে, তার পক্ষে সেগুলোই উপযোগী ও যথোচিত ; কালক্রমে তার মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তারই নাম বিবর্তন, এবং সমালোচনার অধিকার শুধু তাদেরই আছে যারা সেই সমাজের অন্তর্ভূত। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'ভিতর থেকে দেখা', তারই চেষ্টা বিদেশীর কর্তব্য, এবং সেটুকু সাধিত হ'লেই তাঁর ভ্রমণ সার্থক। পর্যবেক্ষণ ও যথাসম্ভব সহানুভূতি— এর বাইরে, আমার বিশ্বাস, বিদেশীর অধিকার নেই। শ্বেতাঙ্গরা, নেহাৎই বাইরে থেকে দেখে, ভারত বিষয়ে যে-সব প্রহসনোচিত উক্তি মাঝে-মাঝে করেছেন— বা এখনো ক'রে থাকেন— সেই দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা হ'তে পারি সতর্ক, এড়াতে পারি এমন অনেক ভ্রান্তি, যা কিঞ্চিৎ চিন্তার দ্বারাই অপসারণীয়। এ-কথা কারো অজানা নেই যে প্রতীচীতে এখন নিখিলনিয়ম স্বনির্বাচিত বিবাহ ; কয়েকটি ধ্বংসাবশিষ্ট রাজবংশে ছাড়া পাতানো বিয়ে কল্পনাতীত, এবং পিতামাতা কর্তৃক আয়োজিত কোর্টশিপের যুগও বহুকাল অপগত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ তার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বেছে নেবে— এই ধারণা, যা আমার মতে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয়, এবং যা ভারতেও অচলিত ছিলো না এবং নেই— মার্কিনী 'তারিখে'র প্রথা তারই একটি সাম্প্রতিক পরিণতি। এইভাবেই— যদি হবার হয়— এরা বিবাহিত হবে, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এর ফলে মাঝে-মাঝে অনর্থ ঘটে না তা নয়, কিন্তু সে-সম্ভাবনা তো সর্বত্র ও সর্বদাই উপস্থিত, সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা আছে শুধু জেলখানার অন্দরমহলে। যদি বিশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অপনোদনই লক্ষ্য হয়, তাহ'লে স্বাধীনতা নিঃসার হ'য়ে পড়ে, আর স্বাধীনতা ভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব। স্বাধীনতার অর্থ কী, এবং তা কতদূর পর্যন্ত কল্যাণকর, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, তবে অন্ততপক্ষে বৈবাহিক প্রথা আলোচ্য হ'লে আমাদের নিজেদের উদ্দেশে দু-একটি প্রশ্ন করা বিধেয়। প্রশ্ন এই : এ-বিষয়ে

আমরা কি জগতের সামনে কোনো উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করছি? এখনো কি— দক্ষিণ ভারতের কথা ছেড়েই দিই— কলকাতার কাগজগুলিতেও 'সুন্দরী, এম. এ.-ডিগ্রিপ্রাপ্তা, রবীন্দ্র-সংগীত ও গৃহকর্মে নিপুণা' পাত্রীর জন্য প্রচারিত হচ্ছে না বিজ্ঞাপন, উক্ত মহিলাদের সজ্জিত ক'রে 'দেখানো' হচ্ছে না জনে-জনে— যেন তাঁরা নিষ্প্রাণ পুত্তলি বই কিছু নন, এখনো কি আমাদের 'শিক্ষিত উপার্জনক্ষম' যুবকেরা দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা শুষে নেবার পরেও সন্ত্রস্ত শ্বশুরালয়ের দ্বারা অনবরত তৈলাক্ত হচ্ছেন না? না কি এমন সদ্বিবেচক পিতা দেশে আর নেই, যিনি অসাধুতা নিবারণের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পাঁচশো জোড়া চোখের সামনে বিবাহ-সভায় স্বর্ণালংকার ওজন ক'রে নেন, না কি সেই সব সুপুত্রই নির্বংশ হয়েছে, যারা পিতার আদেশে সর্বশেষ মুহূর্তে পরিত্যাগ করে পরিণীতপ্রায় কন্যাকে? সমাজজীবনে যে-ঘটনা সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে বেশি প্রণয়োন্মুখ, তাতে এই রকম হলাহলসঞ্চার আর-কোন দেশের বৈশিষ্ট্য? আমার অনুরোধ: এই তথ্যগুলি তাঁরা যেন স্মরণে রাখেন, যাঁদের মনে মার্কিনী 'তারিখ' বিষয়ে অপক্ষপাতী মন্তব্যের উদ্রেক হচ্ছে। এবং এও যেন তাঁরা না ভোলেন যে আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে, যেখানে স্বপ্রণোদিত বিবাহের সংখ্যা বর্ধমান, সেখানেও সম্প্রতি দেখা দিয়েছে অস্থিরতা, অব্যবস্থা, সঙ্গ-পরিবর্তন, বিবাহের ধ্রুবতাও আর অবধারিত নেই। এটাই যুগধর্ম, এটাই আধুনিক রীতি;— মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও উপার্জনক্ষমতা যত বাড়বে, যতই তাঁরা ব্যক্তিত্বে ও আত্মবিশ্বাসে সম্পন্ন হবেন, ততই এর প্রসার অনিবার্য। বর্তমান জগতে স্থান পেতে হ'লে তার অশান্তিও মেনে নিতে হবে— কিন্তু আসলে সেটাই হয়তো প্রাণস্পন্দন।

মূল বক্তব্য থেকে দূরে স'রে এসেছি। বলছিলুম, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মার্কিনী কৃতি ও দক্ষতা কেমন নিজের কাছেই মেনে নিয়েছে পরাভব। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথা না-বললে অন্যায় হবে যে এদের কর্মশক্তি যেমন বিপুল, যেমন বহুমুখী, তেমনি প্রয়োগনিপুণ ও অনাড়ম্বর। পূর্ণ উদ্যম ও অভিনিবেশ ব্যবহৃত হ'লে, কত স্বল্পসংখ্যক কর্মিকের দ্বারা কত বড়ো ব্যাপার চালিত হ'তে পারে, এই দেশ তার উদাহরণস্থল। কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদন অন্যান্য দেশেও দেখা যায়, কিন্তু যা আবশ্যিক ছিলো না, এবং যাতে অন্যে লাভবান হবে, অধিকাংশ সময় সে-রকম কাজেও এদের তৎপরতা লক্ষ করেছি। আর-এক

কথা : এখানে লাল ফিতের অত্যাচার নেই ; বিভাগীয় অধ্যক্ষেরা শুধু নন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে করণিকেরাও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ; শিকাগোর রেল-স্টেশনে অব্যবহৃত টিকিট জমা দিয়ে, তখনই তার মূল্য ফেরৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। এর ফলে বেঁচে থাকার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ যে কতখানি বেড়ে যায়, আমার স্বদেশবাসীকে তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। এবং যা আমাদের চিত্তে সভয় সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, সেই সরকারি কার্যালয়গুলি এর ব্যতিক্রম নয় ; আয়করের ছাড়পত্র নিতে গিয়েও প্রসন্নতা ও সহযোগ ভিন্ন আর-কিছু অনুভব করিনি ; যদিও আমার মতো অনেক আবেদক উপস্থিত, তবু এক ঘণ্টারও অনেকখানি কম সময়ে কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমাকে সন্দিগ্ধ চোখে নিরীক্ষণ করা দূরে থাক, অধিকারীরা বরং চেষ্টা করেছেন যাতে আমি অনভিজ্ঞতাবশত ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

এই সহজ ভঙ্গি ও সাবলীলতার দ্বারা মার্কিনী ভাষাও অনুপ্রাণিত। প্রথমে অবশ্য, ঔপনিবেশিক অভ্যাসের ফলে, মাঝে-মাঝে ঈষৎ বিব্রত হ'তে হয় আমাদের ; 'hot' শব্দটি আমাদের কানে 'হাঁ-ট্'-এর মতো শোনাতে পারে, আর 'স্কেজ্‌ল' শব্দটি যে 'শিডিউল'-এর একাত্ম, তা বুঝে নিতে আমার বেশ কিছু সময় লেগেছিলো। কিন্তু এই বাধাগুলি ক্ষুদ্র ও সহজে অতিক্রম্য ; এদের উচ্চারণে ও বাগ্‌ধারায় অভ্যস্ত হ'তে দেরি হয় না ; আর তখন বোঝা যায় যে মার্কিনী ভাষা, অন্য সব ভাষারই মতো, স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলছে ; যেমন এদের জীবনের লক্ষণ চাঞ্চল্য ও উচ্চ-নীচে ভেদবিলোপ, তেমনি এদের ভাষাও ক্ষিপ্র, ঋজু ও সরল, এবং ঐ সব গুণের মিশ্রণে সতেজ ও বাড়ন্ত। এখানে অনবরত এমন য়োরোপীয় এসে বাসা বাঁধছে, যাদের ইংরেজির জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সাধারণ কাজ-চালানো ভাষা তারা যে সহজে শিখে নিতে পারে, তার প্রধান কারণ একমাত্রিক ও সামান্য শব্দের প্রতি এ-দেশের আসক্তি। ঘর গোছানো, শার্টে বোতাম লাগানো, ভোজনের আয়োজন, কোনো যন্ত্রের বা বস্তুর সংস্কারসাধন, যে-কোনো প্রকার নিয়োগের বা কর্মের ব্যবস্থা— এই সব-কিছুই একটিমাত্র ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব : তা হ'লো 'fix'। তেমনি, 'make' শব্দটিও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত ; আপনি দু-ঘণ্টার মধ্যে টেক্সাসের প্লেন ধরতে পারবেন কিনা, এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর দিতে চাইলে 'I can make it' বলাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। খবর কাগজ, রেডিও,

ব্যবসায়িক চিঠিপত্র, এমনকি রাজনৈতিকদের ঘোষণাতেও এই প্রাকৃত পন্থা লক্ষণীয়— এবং এর উপর নির্ভর ক'রেই ফ্রস্ট তাঁর কবিতার শৈলী গঠন করেছেন। অবশ্য এর উল্টো পিঠে আছেন এমন কোনো-কোনো মার্কিনী পণ্ডিত, যাঁদের রচনার সর্বাঙ্গ গ্রীক, লাটিন, বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক শব্দের লৌহবর্মে নীরন্ধ্র; কিন্তু প্রকৃতিতে এতখানি করুণা আছে যে তাঁদের অস্তিত্ব-বিষয়ে অজ্ঞতা হয় না অবিদ্যার নামান্তর, এবং জগতে ও মার্কিন দেশে এমন রচনাও কিছু-কিছু বিদ্যমান যা একাধারে সারগর্ভ ও রমণীয়। মোটের উপর, নির্ভারতাই এদের চরিত্রলক্ষণ: পাঁচ মিনিটে বিশ্ববার্তার সারাংশ আহরণ করার পরে, লণ্ডনে এসে 'টাইমস' পত্রিকাকে— তার নব বেশ সত্ত্বেও— মনে হয় কিছুটা শ্লথগামী ও গুরুগম্ভীর।

যে-সব শব্দের ব্যবহার এখানে অত্যন্ত ব্যাপক, তার একটি হলো 'know-how'। এই শব্দবন্ধে সুবাস নেই; এর পুনরাবৃত্তি শুনতে-শুনতে ধারণা জন্মে যে নির্ভুলভাবে চাটনির শিশি খুলতে না-পারলে মানবজীবন কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ হ'লো। পক্ষান্তরে, এদের প্রয়োগবিদ্যার ফলাফল দেখেও বিস্ময়বোধ স্বাভাবিক: নগরোপম অট্টালিকা, নদীর তলা দিয়ে ট্রেন অথবা গাড়ি চলার বিরাট সুড়ঙ্গ, সেতুবেষ্টিত সামুদ্রিক সান ফ্রানসিস্কো, প্রান্তরের মতো প্রশস্ত হাইওয়ে— এগুলো যাদের নিত্যব্যবহার্য তারাও এগুলোকে কীর্তি ব'লে অনুভব করে। কখনো বা মনে হয় এদের উপায়নৈপুণ্যে এরা নিজেরাই মুগ্ধ হ'য়ে আছে; মার্কিন দেশে ভ্রমণকালে 'তম' কথাটি বার-বার না-শুনে উপায় থাকে না। পৃথিবীর বৃহত্তম নগর, হোটেল, রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিমানবন্দর, বিভাগীয় বিপণি, সবচেয়ে বড়ো ফ্ল্যাটবাড়ি, গ্রোসারি (অর্থাৎ মুদিখানা) ও ফাইভ-অ্যাণ্ড-টেন স্টোর (আমরা যাকে বলি মনোহারি দোকান)— সব নাকি এই দেশেই প্রাপ্তব্য। এ-সব দাবির চাক্ষুষ সমর্থনের অভাব নেই; তবু দেখতে-দেখতে বৃহতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই, কম-বড়ো ও বেশি-বড়োর পার্থক্য আর ধরা পড়ে না। আর তাছাড়া, মন যখন বলে, 'এটা প্রকাণ্ড', তখন ইন্দ্রিয় খুব সহজে সেটা মেনে নেয়, প্রত্যাশার ফলে মৃদু হ'য়ে আসে অভিঘাত। কিন্তু একবার আমার অবস্থা হয়েছিলো ময়নির্মিত পাণ্ডবসভায় দুর্যোধনের মতো; সেটা লিপিবদ্ধ না-করলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গিয়েছিলাম হলিউডে ফিল্ম-স্টুডিও দেখতে। আমার সঙ্গী এক মার্কিন

যুবক, যিনি কিছুকাল ঢাকায় কাটিয়ে বাঙালি-প্রীতি অর্জন করেছেন। ফক্স্‌ স্টুডিওর গাইড গাড়ি নিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখালে আমাদের। আমার মনে ছিলো টালিগঞ্জের ছবি— গাছপালা, পুকুর, পোষা হরিণ, আর কয়েকটা মঞ্চ, যেখানে প্রয়োজনমতো সিঁড়ি, কুটির, কুয়ো অথবা পল্লীপথ নির্মাণ ক'রে তীব্র আলোয় ছবি তোলা হয়। তারই একটা অতিকৃতির জন্য প্রস্তুত ছিলুম, কিন্তু যা দেখা গেলো তা শুধু অতিকায় নয়, জিনিশই অন্য। একটা 'জায়গা' মাত্র নয় এই স্টুডিও, আস্ত শহর বা দেশ, বা অনেক দেশ ও যুগের এক অলীক ও বাস্তব প্রতিরূপ। গাড়ি চলছে এঁকে-বেঁকে অলিগলির মধ্য দিয়ে ; বস্তুতই গলি— কিন্তু শুধু ছবি তোলার জন্যই রচিত। সারি-সারি চিমনিওলা বাড়ি, দোকানে ঝুলছে ফলকচিহ্ন, দরজায় বাড়ির নম্বর : আঠারো শতকের ন্যুয়র্ক এটা। এটা ষোলো শতকের ফ্রান্সের গ্রাম। এটা মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডের পল্লী। পুরোনো স্পেন, সীজারদের রোম, ফারায়োর মিশর— সব আছে। আছে লাইন-বসানো রেলগাড়ি-সুদ্ধ স্টেশন ; ট্যাঙ্ক, কামান, ভাঙা প্লেন সমেত যুদ্ধক্ষেত্র ; এয়ারপোর্টও আছে। কুঞ্জ, বীথিকা, পুষ্পোদ্যান, ফলদ কানন— কিছুরই অভাব নেই। এলাম এক পুরোনো ধরনের গ্রামে ; গোল চত্বর ঘিরে কয়েকটি বাড়ি ; বারান্দায় ব'সে আছে লোকেরা— অলসভাবে, রেলিঙে পা তুলে, শূন্য চোখে তাকিয়ে। ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে অপেক্ষা করছে একটি তরুণী, ও তার 'স্বামী' না 'প্রেমিক' না 'বন্ধু' তা জানি না। মানুষ-গুলোর সেকেলে বেশবাস ও কপোলের অতিরঞ্জন : মাত্র এই দুটি লক্ষণে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা 'জীবন' নয়, অভিনয়। ভানে ও প্রকৃতে প্রভেদ এখানে নামমাত্র।

কিন্তু চলতে-চলতে হঠাৎ চোখে পড়লো প্রকৃতি। এক খণ্ড আকাশ— নীল, উজ্জ্বল নীল। এত উজ্জ্বল হয় আকাশ এই উত্তরদেশে ? কে জানে— এখন এপ্রিল মাস, আর আছি তো ক্যালিফর্নিয়ায়। কিন্তু কাছে আসামাত্র ভুল ভাঙলো। সেই নীলের পাশেই দেখতে পেলাম ম্লানিমা— পাংশু ও প্রাকৃত আকাশ— দুয়ের মধ্যে মাত্রাভেদ আমার সঙ্গে আমার মার্কিনী বন্ধুর গাত্রবর্ণের পার্থক্যের চেয়েও স্পষ্ট। যে-দীপ্তি আমাকে ভুলিয়েছিলো, তা একটি প্রকাণ্ড পট ছাড়া কিছু নয়, আকাশের তলায় অন্য এক আকাশ চিত্রার্পিত। তার ঠিক তলাতেই লম্বা বাঁধানো জলাশয়। জল আর 'আকাশ'

যেখানে মিশেছে, সেই রেখাটি মহাসমুদ্রে দিগন্ত। চলেছে ভেসে শাদা মেঘের দল অনবরত, আমার চোখের সামনে দিয়ে স'রে-স'রে যাচ্ছে, অথচ পটের সীমা কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। সবই মায়া, সবই প্রতিভাস— এই সমুদ্র, আর চঞ্চল মেঘ, আর দিগন্তরেখা ; কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে-তাকিয়েও আমি ধরতে পারলুম না ফাঁকিটা কোথায় ; যদিও চারদিকে শক্ত মাটির উপর বড়ো-বড়ো বাড়ি আছে দাঁড়িয়ে, তবু আমার ইন্দ্রিয় আমাকে মুহূর্তের জন্যও জানতে দিলে না যে এই আকাশ ও সমুদ্র অবাস্তব। জলাশয়ে ভাসছে অনেকগুলো খেলনা জাহাজ, ধারে-ধারে বৈদ্যুতিক পাখা বসানো— সেগুলো সঞ্চালিত হ'য়ে ঢেউ তুলবে, বইয়ে দেবে ঝড়, ডুবিয়ে দেবে জাহাজ। চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে জুল ভের্ন-এর 'সাগর-তলে হাজার লীগ' ; তারই জন্য এই আয়োজন।

আবার অনেক 'বাড়ি', 'দোকান', 'গ্রাম', 'শহর' পেরিয়ে এই মায়াপুরীর অন্য প্রান্তে চ'লে এলাম। ফলকে 'Post Office' লেখা দেখে আমার মনে প'ড়ে গেলো, সকাল থেকে দুটো ডাকে দেবার চিঠি পকেটে নিয়ে ঘুরছি। 'সত্যিকার ডাকঘর আছে কি এখানে?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে গাইড বললে 'এটাই।' বিদায়ের সময় তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'তোমাদের এখানে সবই খুব আশ্চর্য।' 'সবাই তা-ই বলে,' ম্লান হেসে জবাব দিলে লোকটি। 'সব দেশ থেকে দর্শক আসে এখানে, দেখে বলে— "এ-রকম তো কিছুই নেই আমাদের।" কিন্তু তারা যে কেমন ক'রে আমাদের চেয়ে ভালো ছবি তৈরি করে তা ভেবে পাই না। গুড বাই।'

৫

প্রত্যেক মানুষের দুটি দেশ আছে; একটি তার জন্মভূমি, অন্যটি পৃথিবীর যে-কোনো মহানগর। একমাত্র মহানগরেই অতিথি হ'তে পারে অপ্রবাসী, অচিরস্থায়ী বিদেশীও জীবনস্রোতে গা ভাসাতে পারে। বৃহৎ হ'লেই মহানগর হয় না, সর্বমানবতা তার চরিত্রলক্ষণ, তাকে বলতে পারি নানা দেশের ও নানা ধরনের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বাসভূমি। বলতে পারি এমন এক স্থান যেখানে কোনো মানুষই তার জাতি, গোত্র, বা আর্থিক অথবা সামাজিক মর্যাদার মধ্যে আবদ্ধ নয়, যেখানে রাস্তায় বেরোলে সকলেই ব্যক্তি এবং সকলেই নামহীন। প্যারিস, আকারে ছোটো হ'লেও, জগৎবাসীর এক মিলনস্থল, আর নিন্দুকেরও না-মেনে উপায় নেই যে কলকাতা শুধু বাঙালির রাজধানী নয়, সূচনা থেকেই ছত্রিশ জাতির শ্রীক্ষেত্র। এই মিশ্রণ যেখানে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না, সেগুলোই পৃথিবীর মফস্বল। তফাৎটা স্পষ্ট বুঝেছিলুম সেবার পিটসবার্গ থেকে ন্যুয়র্কে আসামাত্র। পূর্বোক্ত স্থলে পাঁচ মাস কাটিয়েও আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি যে আমি 'এখানকার কেউ নই', কিন্তু মানহাটান আমাকে কয়েক দিনের মধ্যেই আত্মীয় ক'রে নিলে। বাতাস যেন হালকা সেখানে, অনেক সহজে নিশ্বাস নেয়া যায়; রাস্তায় পা চলে দ্রুত; নিজেকে মনে হয় স্বাধীন ও ক্ষমতাপন্ন, পরিবেশের স্বীকরণে দেরি হয় না। সাব-ওয়ে স্টেশনে পথ হারিয়ে, গাড়ি ভুল ক'রে, রকিফেলার-ভবন থেকে বেরোবার চেষ্টায় বিভ্রান্ত হ'য়ে, নগরের নানা অংশে নানা সময়ে নানা জাতীয় রেস্তোরাঁয় আহার ক'রে, সবুজ সংকেতে অসংখ্যের সঙ্গে রাস্তা পার হ'য়ে— এমনি ক'রে মানহাটানকে আমি ভালোবাসতে শিখেছিলুম। কয়েকটি বিম্ব আমার স্মরণে মুদ্রিত হ'য়ে আছে: এক পঁয়ষট্টি তলার জানলা থেকে হঠাৎ দেখা অস্পষ্ট আটলান্টিক, ট্যাক্সিতে অচেনা পাড়ায় যেতে-যেতে একসঙ্গে হাজার জানলায় হীরকতুল্য বৈদ্যুৎদীপ্তি, ফিফথ এভিনিউর বিপণিশ্রেণীতে বাতায়নিক ঐশ্বর্য, আর ফিফথ এভিনিউর ভিড়— ভিড়— ভিড়। আমি ভালোবেসেছিলুম ন্যুয়র্কের স্রোত, তীব্রতা, তার নিদ্রাহীন প্রাণস্পন্দন; অনুভব করেছিলুম যে এখানে কেউ 'বাইরে প'ড়ে' থাকে না, যে-কোনো মানুষ অপ্রয়াসে আপন স্থান খুঁজে পায়। মনে হয়েছিলো, একা থাকতে হ'লে এমন স্থান আর নেই; বোদলেয়ার যাকে বলেছিলেন 'জনতা-

স্নানের উন্মাদনা', সেই বিলাসিতা পাত্র ছাপিয়ে উচ্ছল। মধ্য-মানহাটানে, যেখানে ভুবনবহ আটলাসের মূর্তি স্থাপিত আছে, আর সর্বজাতির পতাকা উড্ডীন, সেখানে দাঁড়ালে ভিড়ে যেন নেশা ধ'রে যায়, মানুষগুলোকে দেখায় এক জীবন্ত, চলমান ও অন্তহীন শৃঙ্খলের মতো। আর তাদের মধ্যে অনেকেই কোনো কাজে বেরোয়নি, শুধু 'শহর দেখছে'। অনেক বিদেশীর সঙ্গে, চোখে-মুখে একই রকম কৌতূহল বা বিস্ময় নিয়ে অসংখ্য জাত-মার্কিনী উপস্থিত, কেননা ক্যানসাসের কৃষক বা ওক্লাহোমার দোকানির পক্ষে ন্যুয়র্ক প্রায় ততটাই লোমহর্ষক, যতটা ছিলো মৈমনসিংহের মহাজনের পক্ষে কলকাতা, বা উনিশ-শতকী 'কালেজে'-পড়া বাঙালির পক্ষে 'বিলেত'। তাছাড়া এই বহুমিশ্র জাতির মধ্যে গাত্রবর্ণ, অবয়ব ও নামকরণের বৈচিত্র্য এত বেশি দেখা যায় যে বিদেশীর বিদেশীত্ব অনেক সময়ই লক্ষণীয় হয় না। আগন্তুক ও দৈশিকের মধ্যে প্রভেদ এই নগরে নানা কারণে অস্পষ্ট।

ন্যুয়র্কের আর-এক রূপ দেখেছিলাম সেবারে যখন চ'লে আসি। ঘাটে পৌঁছতে দেরি হয়েছিলো আমার; আমি তক্তা পেরোবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই জাহাজ ছেড়ে দিলে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো বন্দর ও তীরবর্তী মানুষ; এগিয়ে এলেন দীপধারিণী স্বাধীনতা, উল্টো দিকে ধাবমান হ'লো তুঙ্গ ও অসমান সৌধশ্রেণী। অর্ণবপোতের দ্রুতি ছিলো অসামান্য, তবু সেই দৃশ্য রইলো বহুক্ষণ ধ'রে চোখের সামনে— মানহাটান যে কত বিপুল, আর তার স্থাপত্য যে কী-রকম গরীয়ান, তা যেন আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলুম। বিপুল, কিন্তু সমুদ্র থেকে দেখায় যেন নির্ভার, এক ঋজু, কঠিন ও সুমিত ছন্দে উঠেছে এই উচ্চাবচ আকাশ-রেখা, কৃশ, উচ্ছ্বাসহীন, সংহত, ও জ্যামিতিক। 'নগরী, আমার প্রেয়সী, আমার শুভ্রা। তন্বী তুমি, শোনো আমার কথা···শোনো। ···কুমারী তুমি, স্তনহীনা, রজতকান্তি বেণুর মতো ক্ষীণাঙ্গী তুমি, শোনো।··· কবিকল্পনা নয়, পাউণ্ডের এই পংক্তি ক-টিতে ন্যুয়র্কের বাস্তব রূপই ধরা পড়েছে।

যাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তা নির্বিশেষ ও বৈচিত্র্যহীন। আকাশ সর্বত্রই এক, সব দেশেই প্রান্তর, পাহাড়, উপত্যকা একই ভাবে গঠিত। যা মানুষের সৃষ্টি শুধু তারই সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন 'দেশ' ব'লে চেনা যায়— যেমন ভাষা, স্থাপত্য, লোকাচার। যদি যোজনের পর যোজনব্যাপী

প'ড়ে থাকে শুধু ভূমি ও দিগন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রকৃতি, যদি মানুষের কোনো রচনা কোথাও দেখা না যায়, তাহ'লে চীনে ও পেরুতে কোনো পার্থক্য নাও অনুভূত হ'তে পারে, কিংবা যেমন মধ্যসমুদ্রে আটলান্টিক ও প্যাসিফিকের তফাৎ, তেমনি তা গোচর হবে শুধু বৈজ্ঞানিক উপায়ে। কিন্তু কোনো নগরে চব্বিশ ঘণ্টা কাটালেও তা বিঁধিয়ে দেয় মনের মধ্যে কিছু চরিত্রচিহ্ন : অমুক ব্যাঙ্ক থেকে বাঁয়ের মোড়ে হোটেল ; উল্টো দিকে মিনিট দশেক হাঁটলে চিত্রশালা পাওয়া যাবে ; স্থানীয় ভাষায় 'সসেজ'কে বলে 'ব্বর্স্ট'— এই চিহ্নগুলি মনের উপর এমনভাবে কাজ করে যে দিনের শেষে হোটেলে ফিরে মনে হয় যেন 'বাড়ি এলাম', আর স্বগৃহে ফিরেও মনে হয় না সেই দূর নগরে কিছুই কুড়িয়ে পাইনি। এবং যেগুলোকে মহানগর বলছি তাদের আছে রীতিমতো এক-একটি ব্যক্তিত্ব ; তাদের স্পন্দমান প্রাণ নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আগন্তুকের উপর ; যে স্বল্পকাল পরে বিদায় নেবে তাকেও কিছু দেবার আছে তাদের ; ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদনে প্রবল ব'লেই তারা স্মৃতির কাছে বিশেষ-ভাবে স্বীকার্য।

সেবারে ঋতু ছিলো মৃদু, এবার শীত দুর্জয়। বৃষ্টি, কাদা, বরফ-গলা জল— এই সব এলো তথাকথিত বসন্তের দান। মে মাসের আগে সত্যিকার রোদালো দিন পাওয়া গেলো না। তবু ন্যুয়র্ক পৌঁছিয়ে দিলে আমাদের কাছে তার আন্তরিক বার্তা, নিভু লভাবে জানিয়ে দিলে তার চরিত্র। আমাদের এই আজকের পৃথিবীতে যে-ক'টি বিশ্বপুরী গ'ড়ে উঠেছে তার মধ্যে এই নগর অন্যতম বা অগ্রণী। চলতে-ফিরতে নিরন্তর এর প্রমাণ মেলে। যে-নাপিতের কাছে আমি চুল ছাঁটতে যাই সে গ্রীক ; যে-রাস্তায় আমরা বস্ত্রাদি কিনি সেখানে সব দোকানে হিস্পানি ভাষার প্রাধান্য ; শৌখিন রুটি-বিস্কুটের জন্য যেতে হয় পট্টকেশিনী দিনেমার মেয়ের দোকানে ; মাঝে-মাঝে যে-সব রেস্তোরাঁয় আহার করি সেগুলো ইটালিয়ান বা চৈনিক। আমার ছাত্রছাত্রী সহকর্মী ও বন্ধুদের মধ্যে আছেন গ্রীক, ইটালিয়ান, ওলন্দাজ, জর্মান, চেক, ইত্যাদি ; যে-কোনো পার্টিতে গিয়ে দেখি, অতিথিরা এই রকমই বিমিশ্র। তাঁরা অনেকে এই দেশেরই নাগরিক বটে, এবং সর্বতোভাবে তা-ই, কিন্তু জন্মভূমির কিছু-কিছু লক্ষণ তাঁরা রোপণ করেছেন এখানে, আর এমনি ক'রে মার্কিনী জীবন শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে চলেছে। সাব-ওয়ের যাত্রীদের

হাতে প্রায়ই দেখা যায় হিব্রু বা হিস্পানি ভাষার দৈনিকপত্র; রাস্তায় শোনা যায় হিস্পানি অবিরল, অন্যান্য ভাষা মাঝে-মাঝে। একটি তথ্যপুস্তিকায় লেখা দেখছি যে ন্যুয়র্কবাসী মার্কিনীরা পঁচাত্তরটা ভাষায় কথা বলে, আর এখান থেকে যে-সব ভাষায় দৈনিক পত্রিকা বেরোয় তার মধ্যে আছে চৈনিক, গ্রীক, জর্মান, ইটালিয়ান, পোলিশ ও রুশীয়। এবং সাপ্তাহিক ইত্যাদি প্রকাশিত হয় য়োরোপের প্রায় সব ক-টা ভাষায়, তা ছাড়া আরবি, হিব্রু ও জাপানিতে।

সব মার্কিনী এই নগরের প্রেমিক নন। বিভিন্ন রাজ্যের ছোটো শহরে গিয়ে অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছি: 'ন্যুয়র্ক আমেরিকা নয়, ন্যুয়র্ক দিয়ে আমেরিকাকে বিচার করবেন না।' যেন ন্যুয়র্ক যথোচিত নয়, যেন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবার কারণ আছে, তাঁদের মনের ভাবটি এই রকম; আমার সেখানে খুব ভালো লাগছে শুনে তাঁরা একটু অবাক না-হ'য়ে পারেননি। ন্যুয়র্কবাসীর হৃদ্যতা নেই, নেই কোনো পারিবারিক জীবন, তাদের আসক্তি শুধু অর্থে ও প্রমোদে, তাদের ব্যবহার ক্ষিপ্র ও অশালীন— পাঁচশো অথবা বারো শো মাইল দূরে ব'সে এই ধরনের উক্তিও অনেকে ক'রে থাকেন। তেমনি, আমার ছেলেবেলার পূর্ববঙ্গেও অনবরত শুনতুম যে কলকাতা এক ভয়ংকর স্থান, সেখানে রাস্তায় বেরোনোমাত্র পকেট কাটা যায়, আর লোকেদের মুখে মধু থাকলেও হৃদয় শুধু গরলে ভরা। রূপসী নারী ও কৃতী পুরুষের মতো, পৃথিবীর নগরগুলিও অলীক রটনার উপলক্ষ না-হ'য়ে পারে না— সেটা তাদের গৌরবেরই এক প্রমাণপত্র। কিন্তু ন্যুয়র্কের প্রতি যাঁরা বিমুখ, তাঁরা হয়তো এও জানাতে চান যে এক 'খাঁটি' আমেরিকার অস্তিত্ব আছে; যাকে বলে সত্যিকার মার্কিনী জীবন, ঐ বিশ্বধামে তা পরিস্ফুট নয়। শতকরা-একশো-পরিমাণে মার্কিনী কি পেনসিলভেনিয়া, না মধ্য-পশ্চিম, না টেক্সাস, তা বিচার করার সাধ্য অবশ্য আমার নেই; আর শতকরা-একশো পরিমাণে কিছু-একটা যে হ'তেই হবে, বা হ'লেও সেটা প্রশংসনীয়, তাও আমি মানতে পারি না। স্বভাবদোষে আমি নিজেকে এখনো বিশ্বাস করাতে পারিনি যে কলকাতার চেয়ে বীরভূমের গ্রাম বেশি বাংলাদেশ; এবং ধরা যাক, পি. জি. উডহাউস বা রাডিয়ার্ড কিপলিঙের রচনায় যে-ধরনের 'খাঁটি' ইংরেজিয়ানার আলেখ্য আছে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়েও আমি অনুৎসুক। যেগুলি এদের ছোটো শহর— কারো-

কারো মতে 'খাঁটি আমেরিকা', সেখানে— কোনো মানুষ যে 'সভ্যভব্য' হ'য়েও খৃষ্টান নয়, বা পৃথিবীর সমস্ত লোকই যে ইংরেজি বলে না— এ-সব ব্যাপারে এখনো কেউ-কেউ বিস্ময়ের ভাব লুকোতে পারেন না; আর তা দেখে আমরা অবশ্য ততোধিক বিস্ময় অনুভব করি। আমি ভুলে যাচ্ছি না যে মার্কিনীর পক্ষে ন্যুয়র্ক ঠিক তা নয়, যা বাঙালির পক্ষে কলকাতা বা ফরাশির পক্ষে প্যারিস; এই বিশাল দেশ বহু স্থলে ছড়িয়ে দিয়েছে তার স্নায়ুকেন্দ্র; মানহাটানের মাটি না-মাড়িয়েও, অন্তত তাত্ত্বিক হিশেবে, বিবিধ প্রকার উচ্চাশাপূরণ সম্ভব। তাছাড়া, আমেরিকা তার বিপুল যন্ত্রবল ও বাণিজ্যবল নিয়েও ইংলণ্ডের মতো নগরপ্রধান দেশ নয়, বরং কৃষি- ও পল্লীপ্রধান; বিশাল আয়তনের তুলনায় নগরের সংখ্যা এখানে স্বল্প, এবং যেগুলি ছোটো শহর বা আসলে গ্রাম, অথচ যাতে নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে, সেই রকম অসংখ্য জনপদ এই দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবু এ-কথাও তর্কাতীত যে— সর্বস্ব না হোক— আমেরিকার সর্বোত্তম হ'লো ন্যুয়র্ক; একমাত্র এই নগরই মৌলিক অর্থে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি; যা ছিলো হুইটম্যানের 'মার্কিনী স্বপ্ন' তার প্রতিচ্ছবি দেখতে হ'লে এখানে আসা ভিন্ন উপায় নেই। কোনো-এক প্রাদেশিক বা পারিভাষিক অর্থে ন্যুয়র্ক নাও হ'তে পারে আমেরিকা, কিন্তু এই দেশের যা-কিছু ঐতিহাসিক ও অর্জিত চরিত্রলক্ষণ— তার বহুমিশ্র প্রজাবৃন্দ, তার গতিবেগ, তার তারুণ্য, তার সর্বজনীনতার আদর্শ— ব্যক্তির মুক্তি, মানুষের স্বাধীনতা ও নিঃসঙ্গতা— এমনকি তার কুবেরসিদ্ধি— এই সব-কিছুর এক অবিকল চিত্রকল্প এই ন্যুয়র্ক। এবং অন্য দিক থেকেও তাকে বলতে পারি আমেরিকার এক অণুবিশ্ব: কেননা এদের সংস্কৃতির পীঠস্থান যদিও অনেকগুলো, তবু আর কোথাও নেই এত চিত্রশালা, চিত্রশালায় এত ঐশ্বর্য,*

* আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমার কাছে ন্যুয়র্কের একটি বড়ো আকর্ষণ তার চিত্রশালাসমূহ; সবগুলো দেখা আমার সময়ে ও সাধ্যে কুলোয়নি, কিন্তু প্রধান চারটিতে একাধিকবার সঞ্চরণ ক'রে যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে আমার অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল রঞ্জিত থাকবে। প্রাচীন থেকে অত্যাধুনিক পর্যন্ত প্রতীচ্য শিল্পকলার প্রতিটি পর্যায়ের এতগুলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে হ'লে য়োরোপে অন্তত তিনটি দেশে ভ্রমণ করার প্রয়োজন ঘটে। ন্যুয়র্কে ও য়োরোপে প্রবাসকালে আমার বার-বার মনে হয়েছে যে শুধুমাত্র ছবি দেখার জন্যই আমাদের পক্ষে প্রতীচ্য ভ্রমণ সার্থক।

এত রঙ্গমঞ্চ ও গীতমঞ্চ, এত বইয়ের দোকান, গ্রন্থাগার, ও ম্যুজ়িয়ম, আর কোথাও নেই দেশজ, বৈদেশিক ও সন্ত-দৈশিকতাপ্রাপ্ত এত রসজ্ঞ ও গুণীজন। যে-আদর্শ নিয়ে এই দেশ স্থাপিত হয়েছিলো তা মনে রেখে বলা যায় যে ন্যুয়র্ক সবচেয়ে আন্তর্জাতিক ব'লেই সবচেয়ে মার্কিনী।

এখন ভেবে দেখছি যে ন্যুয়র্কে প্রবাসকালে আমরা যতটা মার্কিনী উচ্চারণ শুনেছি, প্রায় ততটাই শুনেছি য়োরোপীয় ইংরেজি: সদয় বন্ধুরা যে-সব গুণীদের আহ্বান করেছেন আমাদের সঙ্গে দেখাশোনার জন্য, তাঁরা অনেকে য়োরোপ ছেড়েছেন এই শতকেরই প্রথমার্ধের কোনো সময়ে, এবং অনিবার্য-ভাবে বাসা বেঁধেছেন ন্যুয়র্কে। মনে পড়ে একটি বৃহৎ ভোজের সভা, সেখানে অতিথির সংখ্যা এত বেশি যে আমার কাছে অধিকাংশ নাম অস্পষ্ট থেকে গেলো। আমি আসন পেলুম এক সুশ্রী যুবকের পাশে, তিনি সফোক্লেস অনুবাদ করেছেন। এই নগরে যা অপ্রত্যাশিত, তাঁর মুখে সেই ইংরেজ উচ্চারণ শুনে আমি না-ব'লে পারলুম না, 'একটা কথা জিগেস করি, আপনি কি ইংলণ্ডে পড়াশুনো করেছিলেন?' 'হ্যাঁ, তা-ই।' 'আপনার উচ্চারণ দেখছি একেবারে ইংরেজ হ'য়ে গেছে।' এর উত্তরে যুবকটি বললেন, 'আমি ইংলণ্ডেই জন্মেছিলুম।' আমাদের কাছাকাছি ছিলেন একটি মার্কিনী তরুণী— আমরা, বোধহয় বয়সের সামীপ্যের জন্য, তাঁকে ইংরেজ যুবকটির স্ত্রী ব'লে ভেবেছিলুম, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে তরুণীটি আমাদের ভুল ভাঙিয়ে দিলেন। 'ঐ যে প্রৌঢ় পুরুষটিকে দেখছেন—উনি আমার স্বামী।' যাঁকে 'প্রৌঢ়' বলা হ'লো, তাঁর বয়স অন্তত সত্তর, কিন্তু দেহ যেমন বলিষ্ঠ তেমনি মেধাবী তাঁর মুখশ্রী। ক্রমশ জানতে পারলুম, তিনি আর্চিবল্ড আর্চিপেঙ্কো, কীর্তিমান ভাস্কর: জন্মেছিলেন রাশিয়ার উক্রাইন প্রদেশে, যৌবনকালে প্যারিসে ও য়োরোপের নানা দেশে কাটিয়ে, প্রায় চল্লিশ বছর ধ'রে আমেরিকায় আছেন। প্রথম স্ত্রী ছিলেন জর্মান; তাঁর মৃত্যুর পরে সম্প্রতি বিবাহ করেছেন এক তরুণী ছাত্রীকে; ছাত্রীটিও ভাস্কর্যবিদ্যায় নিপুণ। আর্চিপেঙ্কোকে 'খাঁটি' মার্কিনী বলা যাবে না, কিন্তু মার্কিন দেশের ঋদ্ধির একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে তিনি— ও তাঁর মতো আরো অনেকে— এখানে পেয়েছেন গৃহ, স্বীকৃতি ও সম্মান।

সেই সন্ধ্যার আর-একটি স্মৃতি উপস্থিত করি। ডিনারের পরে, গৃহস্বামীর

অনুরোধে, আমাকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দু-চার কথা বলতে হ'লো। আমার বলা হ'য়ে যাবার পর কিছু প্রশ্ন করলেন— আর্চিপেঙ্কো নন, অন্য এক প্রাচীন পুরুষ। অত্যন্ত ভঙ্গুর ইংরেজিতে, সশ্রমভাবে, মিনিট পাঁচেক কথা বললেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টলস্টয়ের কিছু সাদৃশ্য আছে— এই ধারণা কি সার্থক? আমি যথাসাধ্য তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলুম। পরে, দুই মার্কিনী বন্ধুর সঙ্গে যখন বাড়ি ফিরছি, আমি জিগেস করলুম—'উনি কে, জানেন? যিনি টলস্টয়ের কথা তুললেন?' 'উনি কেরেনস্কি।' 'কেরেনস্কি? নামটা চেনা মনে হচ্ছে।' 'তা হ'তেই পারে— উনি তো রুশ বিপ্লবে—' 'বলেন কী! রুশ বিপ্লবের কেরেনস্কি উনি?' আমার ভাবতে খুব অদ্ভুত লাগলো যে আমি কিছুক্ষণ আগে কেরেনস্কির সঙ্গে কথা বলছিলুম, কেননা— — তিনি এখন কোথায় আছেন তা জানা দূরে থাক, তিনি যে এখন পর্যন্ত জীবিত তা সুদ্ধ আমার ধারণায় ছিলো না। কেরেনস্কি— তা আমার কাছে ইতিহাসের একটি নাম মাত্র; তাঁর বিষয়ে পুস্তকে পড়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্পনীয় নয়। কোনো পার্টিতে কেউ যদি বলতেন, 'ইনি হিণ্ডেনবুর্গ' বা 'ইনি ক্লেমেসোঁ'— তাহ'লে যেমন হ'তো, সেই রকমের ব্যাপার এটা। এমনি সব ছোটো-বড়ো বিস্ময় ন্যুয়র্ক সাজিয়ে রাখে তার অতিথির জন্য।

৬

নিঃসঙ্গ এ-দেশের মানুষ। সব মেয়ের স্বামী মেলে না, অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকেন ; আর তরুণদের মধ্যে সম্প্রতি যদিও বাল্যবিবাহ ও প্রজননের প্রতি আসক্তি দেখা যাচ্ছে, প্রৌঢ় দম্পতিরা অনেকেই নিঃসন্তান। আর সন্তানের সঙ্গেও, আমাদের অর্থে, ঘনিষ্ঠতা এদের অভিপ্রেত নয় ; শিশুদের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর তা ষোলো ছেড়ে আঠারো আনা করা হবে, কিন্তু আমরা যাকে আদর বলি, সেটা নিষিদ্ধ। নিচের ঘর থেকে ভেসে আসছে বয়স্কদের হাস্যালাপ, পানভোজন ও নৃত্যগীতের শব্দ, আর বিনিদ্র শিশু একা শুয়ে-শুয়ে ভাবছে কখন তার সুগন্ধি মা তাকে ঘুমের আগে চুমু খেয়ে যাবেন— এই ছবিটি পশ্চিমী সাহিত্যের ততটাই অঙ্গ, যতটা শরৎচন্দ্রে মাতৃস্নেহের ফেনিলতা। বঙ্গরমণীরা এটাকে হয়তো নিষ্ঠুর বলবেন, কিন্তু এইভাবে লালিত প্রতীচ্য মানুষই আধুনিক জগতের স্রষ্টা ও বিজেতা, সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না। অবশ্য মার্কিন দেশের অন্যতম প্রবাদ এই যে পিতামাতারা সন্তানের সেবার জন্যই বেঁচে থাকেন, শিশুদের যত্ন বলতে যা বোঝায় তা এখানে ত্রুটিহীনভাবে বিধিবদ্ধ, পত্রিকাদির বিজ্ঞাপন দেখে এমনও ধারণা হ'তে পারে যে অষ্টবর্ষীয় পীট অথবা জুলিয়ার ইচ্ছা অনুসারেই মা-বাবারা বেছে নেন কোনো বিশেষ মার্কার ভুট্টা অথবা মোটরগাড়ি। কিন্তু এই সব-কিছুরই পিছনে আছে সেই নিষ্কম্প্র শৃঙ্খলা, যা সারা প্রতীচীর জীবনধর্ম ; সন্তান যাতে সুস্থ, সক্ষম ও স্বাবলম্বী হ'য়ে বেড়ে ওঠে, সব প্রযত্ন প্রথম থেকে সেই দিকে ধাবিত। মা-বাবার সঙ্গে বেশি মেলামেশার স্থান নেই এই ব্যবস্থায় ; ছেলেমেয়েরা বড়ো হয় আবাসিক বিদ্যালয়ে, বা যদি বাড়িতেও থাকে, দিনমান তাদের স্কুলেই কেটে যায় ; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটির অনেকখানি দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয়-গুলিতে অর্পিত হয়েছে। ছুটিতে পুনর্মিলনও নিয়ম হিশেবে ধ'রে নেয়া যায় না, কেননা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পও অগুনতি। এ-ই হ'লো শৈশবকালীন বিধান ; তারপর সন্তান যেই যৌবনে পা দিলে, তখনই মা-বাবার সঙ্গে তার বসবাস ফুরোলো। যদি সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তাহ'লে, অবিবাহিত হ'লেও, সে আলাদা থাকবে ; আর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে চায়, তাহ'লেও তাকে স্থানান্তরে পাঠানো সুপিতার কর্তব্য। বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত পিতামাতা তাদের ব্যয়ভার বহন করবেন— এমনকি পুত্রকে (যদিও

সাধারণত কন্যাকে নয়) গাড়িও কিনে দেবেন, কিন্তু তার পরে উচ্চতর উপাধি অর্জন করতে চাইলে লক্ষপতির সন্তানকেও স্বাবলম্বী হ'তে হবে। এবং এই অবস্থায়— পিতা বা মাতা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক হ'লেও, সন্তান পড়তে যাবে অন্য শহরে অন্য বিদ্যালয়ে : এটা দু-দিক থেকেই সামাজিক কর্তব্য ব'সে স্বীকৃত। পুত্রকন্যা সাবালক হ'লেই সব অর্থে স্বতন্ত্র হ'লো, স্বীকৃত হ'লো তাদের স্বাধীন সত্তা ; তারপর যা থাকে তা স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ, কিন্তু আমাদের ধরনের সংসক্তি কল্পনাতীত। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার অভাবে এমনও হ'য়ে থাকে যে ছেলেমেয়েদের স্নেহের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায় ; আর সেইজন্যই, আজকাল অনেকে বলছেন, এ-দেশে কৈশোরক অপরাধপ্রবণতার প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তেমনি, বন্ধনহীন ব'লেই, এরা বেরিয়ে পড়তে পারে খেয়ালখুশিমতো পৃথিবীর পথে, কোনো সজল চোখ বা নির্ভরশীল আত্মীয় এদের পিছনে টানে না, কেউ যদি চায় ব্রেজিলে বা বালীদ্বীপে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে, সেই ইচ্ছে চরিতার্থ করার হার্দ্য কোনো বাধা নেই। শুধু আর্থিক হিশেবে নয়, মনের দিক থেকেও স্বাধীন এরা। 'যে যার পায়ে'— এই হ'লো প্রতীচীর মূলনীতি।

যে-কোনো সমাজে সব ব্যবস্থা পরস্পর-সম্পৃক্ত। প্রতীচীর অন্যান্য লক্ষণ চিন্তা করলে মুহূর্তে বোঝা যায় কেন এখানে স্বনির্ভরতা আশৈশব শিক্ষণীয়। পার্থিব জীবনে কৃতী হ'তে হ'লে ঐ গুণটি চাই, কষ্টের অভ্যাসও প্রয়োজন। এক ইংরেজ কবি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন লণ্ডনে, তাঁর কিশোর পুত্র সেখানে উপস্থিত। আমি লক্ষ করলুম, পিতা একটু বিশেষ যত্ন নিয়ে পুত্রকে খাওয়ালেন— 'ওটা আর-একটু নাও, ওয়াইনটা বরং আর না-খেলে, ট্রেনে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে পাব্লিক স্কুলে পড়ে, এখনই ফিরে যাবে সেখানে— আর ওদের স্কুলে খাওয়া বড্ড খারাপ।' 'তা-ই নাকি ?' 'ব্যাপারটা হ'লো— ছেলেবেলায় যারা কষ্ট করে, তারাই বড়ো হ'য়ে স্থাপন করে উপনিবেশ, আমাদের পাব্লিক স্কুলগুলিতে এই ধারণা এখনো চলছে,' ব'লে একটু হাসলেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা। তাঁর এই কথাটিতে আমি অনুভব করলুম প্রতীচীর চরিত্রের এমন একটি দিক, যা আমাদের পরিচিত হ'লেও স্মরণযোগ্য। তিন ভাই-বোনের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ায়, আর-একজন ভারতে, আর বোন বিয়ে ক'রে চ'লে গেছে মন্ট্রিয়ালে— এদের পক্ষে

সামান্য এ-রকম ঘটনা। পরস্পরে ক-বার দেখা হয় জীবনে? বা বৃদ্ধ পিতা-মাতা ক-বার দেখতে পান সন্তানদের? কিন্তু প্রত্যেকে যে সম্পন্ন জীবন পেয়েছে সেটাই বড়ো কথা, এবং তার জন্য অন্য দিকে ত্যাগ করতে এদের আপত্তি নেই।

প্রথম যখন পিটসবার্গে গিয়েছিলুম, কলেজের এক কর্মিণী আমার নির্দেশমতো কিছু বাসনপত্র আমাকে দিতে এলেন। 'ঠিক আছে সব?' 'মনে তো হচ্ছে।' 'আর-কিছু দরকার হ'লে বলবেন— you must speak up'. এ-দেশে শোনা যে-সব উক্তি আমার মনে গ্রথিত হ'য়ে আছে, এটি তার অন্যতম। আপনার কোনো প্রয়োজন কেউ অনুমান ক'রে নেবে না— সে-রকম সময় কারো নেই, অভ্যেসও নেই— সব একেবারে খোলাখুলি বলতে হবে। মার্কিনীরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল, এদের পক্ষে দেখাশোনা মানেই আহারে নিমন্ত্রণ, ব্যবসায়িক নিয়োগও অনুষ্ঠিত হয় লাঞ্চে, বা অন্তত পানশালায় বা কফিখানায়। পক্ষান্তরে, কোনোরকম বিশৃঙ্খলা যা ঘটাতে পারে, তা কেউ কল্পনায় স্থান দেবে না; দিনের প্রতিটি ঘণ্টা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে স্বল্প আতিথেয়তার জন্যও অগ্রিম ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাড়িতে অবেলায় কোনো অতিথি এলে তাকে যে-কোনোরকমে ছুটো ভাত ফুটিয়ে দেয়া— এটা হয়তো বঙ্গমহিলাদের পক্ষে এখনো অসাধ্য হয়নি, কিন্তু এখানে তা সম্ভবপরতার পরপারে; নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে, অতিথি অভুক্ত কিনা তা জিগেস করাও অবান্তর; তাঁকেই মুখ ফুটে বলতে হবে তিনি বুভুক্ষু, তখন কোনো আহারস্থলের নিশানা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এর কারণ উদারতার অভাব নয়, অনম্য বিধিবদ্ধতা। মার্কিনীরা যাকে বলে 'টাইট স্কেজল', মানে, নিবিড় কর্মসূচি, তা এখানে অনেকেরই নিত্যসঙ্গী; হঠাৎ এক ঘণ্টা সময় ফাঁকা পাওয়া গেলে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসার উপায় নেই, বা আগে কিছু না-জানিয়ে কোনো প্রিয়জন কখনো টোকা দেবে না দরজায়; বাড়িতে কাউকে খেতে বলতে চাইলে কুড়ি দিনের আগে কোনো তারিখ পাওয়া নাও সম্ভব হ'তে পারে। সকলেই এতদূর পর্যন্ত ব্যস্ত ও সচল যে সব-কিছুই আয়োজিত ও প্রত্যাশিত হওয়া চাই, কোনো স্থান নেই দৈনন্দিন জীবনে আকস্মিকের।

এবং এদের সমাজে প্রতিযোগিতাও তীব্র। অবশ্য জীবিকার জন্য

কাউকেই ভাবতে হয় না, কিন্তু যে-কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হ'লে, বা বন্ধু পেতে হ'লে, বা এমনকি বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের দিক থেকে, সব সময় থাকতে হবে সজাগ, সচেষ্ট ও উদ্যোগী। যে-মানুষ লাজুক, বা বেশি আত্ম-সচেতন, বা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে যার স্বভাব, তাকে 'পেছিয়ে' পড়তে হয়। দৈনিক-পত্রের মহিলা-বিভাগে প্রশ্ন বেরোয়, 'আমার বয়স ষোলো, চেহারা মোটামুটি ভালো, কিন্তু এখনো আমার কোনো ছেলে-বন্ধু জুটলো না। আমার কী করা উচিত?' উপদেশদাত্রীর উত্তর: 'তুমি বোধহয় অমিশুক, ছেলেদের সামনে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকো, তাদের কথাবার্তায় যোগ দিতে পারো না। তোমাকে এই সংকোচের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে।' ধরনটা য়োরোপেও একই, কিন্তু ইংলণ্ডে এখনো একটি শ্রেণী জন্মসূত্রে কিছু সুবিধে পেয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে মনোহরভাবে লাজুক হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমেরিকার শ্রেণীভেদহীন উন্মুক্ত সমাজে প্রতিযোগিতার আয়তন এমন বিপুল যে তার প্রভাব খুব অল্প লোকই কাটাতে পারে। সব মিলিয়ে মনে হয় যে মার্কিনী সমাজ দক্ষ ও গুণীজনের পক্ষে উত্তম, কেননা তাঁরা অন্যদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত, তাঁদের জন্য দিকে-দিকে দরজা খোলা রয়েছে; কিন্তু যারা সাধারণ লোক— আর তারাই অসংখ্য— তারা সমস্ত জৈব তৃপ্তির অধিকারী হ'য়েও এড়াতে পারে না নিঃসঙ্গতা, আর হয়তো ভিতরে-ভিতরে এক ধরনের ব্যর্থতাবোধ।

এর স্পষ্টতম ছবি মেয়েদের জীবনে দেখা যায়। আধুনিক প্রতীচীর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো নিঃসঙ্গ নারী। দামি রেস্তোরাঁয় মহিলা এসেছেন প্রকাণ্ড কুকুর নিয়ে, জন্তুটিকে সোফার উপর পাশে বসিয়ে নিজেও খাচ্ছেন তাকেও খাওয়াচ্ছেন, বা নেহাৎই সময় কাটাবার জন্য তিন প্রৌঢ়া নিঃশব্দে ব'সে আছেন পার্কের বেঞ্চিতে— য়োরোপের রাজধানীগুলিতে এ-রকম দৃশ্য বিরল নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটিও আমেরিকায় যেন চরমে পৌঁচেছে। বিয়ে হয়নি, বা বিধবা বা পতিবিচ্ছিন্না, বা সধবা হ'য়েও আর্থিক সাচ্ছল্যবশত অনেকখানি অবসর যাঁদের আছে— এমন মেয়েরা এই দেশের নাগরিকসংখ্যার একটি অগৌণ অংশ। এঁরা ছিলেন না সেই কবির কল্পনায়, যাঁর প্যারিসে নানা ধরনের নিঃসঙ্গতা বিরল এক-একটি পুষ্পের মতো বিকশিত; নিঃসঙ্গতার দ্বিতীয় পুরোহিত রিলকেও এঁদের প্রত্যক্ষ করেন নি; এঁরা বিশেষভাবে

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সৃষ্টি। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এঁরা ছড়িয়ে আছেন, ভালো-ভালো হোটেলে ও অ্যাপার্টমেন্টে ; জানলা থেকে দেখা যায় ঈস্ট নদী বা প্রশান্তসাগর ; ঘরে আছে কাশ্মীরি কার্পেট, ড্রেসডেনের চীনেমাটি, রুশীয় খৃষ্ট, ভাঁড়ারে আছে কালো, সবুজ, জুঁইগন্ধি ও গোলাপগন্ধি চা, এবং বাছা-বাছা হিস্পানি ও ফরাশি মদ ; আছে বলতে গেলে সবই, কিন্তু হয়তো বা মনের কোনো অবলম্বন নেই। নিঃসন্তান, বা সন্তানেরা বড়ো হ'য়ে দূরে স'রে গেছে, বিত্ত পেয়েছেন স্বামী অথবা পিতার, গৃহকর্ম বা উপার্জনের দাবি নেই ; ফ্যাশনের অনুশীলন, বিবিধ বিনোদ, মাঝে-মাঝে য়োরোপে বা জগৎজোড়া ভ্রমণ— এ-সবের পরেও উদ্বৃত্ত থাকে সময়। এই অবস্থায় সার্থকতা খুঁজে পান শুধু তাঁরা, যাঁরা গুণী বা ব্যক্তিত্বশালিনী বা কোনো আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ; এ-রকম কোনো-কোনো মহিলা আমার পক্ষে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। কিন্তু অন্যেরা— যাঁরা নিরুপায় হ'য়ে সংগীত অথবা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন, বা চেষ্টা করেন 'বুদ্ধিজীবী' হ'তে, তাঁদের বেদনা জানি না কোনো মার্কিনী কবি ব্যক্ত করেছেন কিনা। এঁরা স্থাপন করেন প্রতি জনপদে মহিলা-ক্লাব ; যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়ে বক্তৃতা শোনেন ট্যাং শিল্প, সামোয়া দ্বীপের সমাজব্যবস্থা, মধ্য-প্রাচীর ইতিহাস, ও ভারতীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ে ; যেমন তৃপ্তিহীন এঁদের জ্ঞানের পিপাসা, তেমনি জ্ঞানের সিকি-দুয়ানিগুলো এঁদের জীবনে নির্বীজ। এঁরা অনেকেই কবিতা লেখেন, নিজের খরচে বই ছাপান, স্থানীয় কোনো মফস্বলি কাগজে হয়তো এঁদের সচিত্র জীবনীও বেরোয় ; কিন্তু কবিতা লেখার চেষ্টা থেকে এঁদের বিরত করার মতো কোনো হিতৈষী বন্ধু এঁদের জোটে না। যে-কোনো প্রকার বুদ্ধিজীবী চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে এঁদের ; যে-কোনো প্রকার খ্যাতিমানের সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলার চেষ্টায় এঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে থাকেন। এঁরা স্বাভাবিক শিকার সেই সব সাহিত্যিকদের, যাঁদের বিবেকের বালাই অল্প এবং জীবিকার নিশ্চয়তা নেই। সে-রকম যোগাযোগ ঘটলে, ক্ষতিস্বীকার ক'রেও, এঁরা তবু একজন মানুষের সঙ্গলাভ করেন। কিন্তু তাও সব সময় ঘটে না ; তখন থাকে দিনে পাঁচবার আহার, তা হজম করার জন্য পদচারণা ও সমুদ্রস্নান, সচিত্র পত্রিকাগুলোর পাতা ওল্টানো, যেখানে যা-কিছু 'ঘটছে' সাধ্যমতো সেগুলোতে উপস্থিত থাকা, নতুন বেশবাস, নতুন গৃহসজ্জা— এই

সব। কেউ যাতায়াত শুরু করেন হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে, কেউ হন রুডলফ ষ্টাইনারের ভক্ত; কেউ বা শিক্ষা নিতে যান জ়েন তত্ত্বে। কিন্তু অবশেষে সেই নিরলম্ব নিজের কাছেই ফিরে আসতে হয়।

ন্যুয়র্কে, যেদিন এপ্রিল ছড়িয়ে দেয় রোদ্দুর, পার্কের বেঞ্চিগুলো বৃদ্ধায় ভ'রে যায়। বৃদ্ধও থাকেন, কিন্তু আমার চোখে যে-ছবি আছে তাতে মহিলাদেরই আধিক্য। দেখে মনে হয় না এঁদের অবস্থা সচ্ছল, গায়ের কোটটি যেন পুরোনো, খুব সম্ভব শস্তা পাড়ায় একখানা মাত্র ঘরে এঁদের বাসা। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাৎনি নিয়ে মন্তব্য বিনিময় করেন এঁরা— তারা দূরে আছে— ক্রিসমাসেও সব সময় দেখা হয় না; হয়তো স্বামীদের কথাও ওঠে এক-আধবার— সম্ভবত তাঁরা আরো দূরে। প্রকৃতির দান এই রৌদ্রটুকু এঁরা প্রগাঢ়ভাবে ভোগ করেন, কিন্তু আবার হয়তো ছায়া ক'রে আসে, ধারালো হয় বাতাস— তখন উঠে মন্থর পায়ে এঁরা যে যার বাড়ি ফেরেন— সেখানে আছে রান্না, খাওয়া, খাওয়ার পরে বাসন ধুয়ে রাখা: আর-কিছু নেই।

সেবারে যখন জাহাজে যাচ্ছি ন্যুয়র্ক থেকে লণ্ডন, ভোজনশালায় আমার স্থান পড়েছিলো একটি পাঁচ-আসনের টেবিলে। অন্য চারজনের মধ্যে সকলেই মার্কিনী, সকলেই মহিলা, ষাট থেকে তিরিশের মধ্যে তাঁদের বয়স। জাহাজের প্রথা অনুসারে এঁরা নিজ-নিজ নাম বললেন আমাকে, আমাকে বিনিময় করতে হ'লো। এঁরা উপচে পড়ছেন খুশিতে, এক ঝাঁক পাখির মতো কাকলিকণ্ঠে কথা বলছেন, এত আনন্দ শুধু দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন ব'লে নয়, পরস্পরকে বন্ধু পেয়েছেন ব'লেও। খুব সম্ভব ক্ষণিকের বন্ধুতা— হয়তো য়োরোপে পৌঁছেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বেন এঁরা, স্বদেশে ফিরে আর দেখা হবে না, কিন্তু— স্পষ্ট বোঝা গেলো— এই পাঁচটি দিন থেকে এঁরা যতটা সম্ভব সঙ্গসুখ নিংড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। খেতে-খেতে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন আমার উদ্দেশে: আমার অনতিদীর্ঘ উত্তরে এঁরা নিরাশ হলেন তা আমার দৃষ্টি এড়ালো না। এঁদের আগ্রহ সত্ত্বেও আমি পারলাম না এঁদের সঙ্গে মিশে যেতে— কেননা এঁদের আলাপের যেগুলো বিষয় আমি তাতে স্বভাবত অনুৎসুক— কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত-মতো ব'সে রইলুম। পরের দিন আমার মনে হ'লো যে আমার অনুচ্ছল উপস্থিতি এঁদের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটাতে

পারে ;— কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ক'রে এক কোণে একলা একটি টেবিল নিলুম।

মানুষের কাছে মানুষের মতো বাঞ্ছনীয় আর-কিছু নেই। আমাদের দেশের যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে— আর তাতে মঙ্গল হয়নি আমি তা কিছুতেই বলবো না— কিন্তু এখনো প্রায় সকলেরই আছে একটি আত্মীয়মহল, তা সব সময় প্রীতিকর না-হ'লেও অন্ততপক্ষে নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধক। তাছাড়া, সময়ের তত ধরাকাট নেই ব'লে, কিছু-না-কিছু বন্ধুবান্ধব, অন্তত শহরগুলিতে, অধিকাংশেরই জুটে যায় ; সংস্থা নয়, পার্টি নয়, বিশুদ্ধ আড্ডা এখনো সপ্রাণ আমাদের মধ্যে। প্রবীণ মহিলারা, মাসি-পিসি দিদিমার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে প্রচুর মানসিক তৃপ্তি আহরণ করেন, তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, আমরা যা সহজে পাই, আর পাই ব'লে যার মূল্য হয়তো বুঝি না, তা প্রতীচীর জনসাধারণের পক্ষে অনেক সময়ই দুর্লভ। অসংখ্য সংস্থা ও কলাকেন্দ্র, হাজার ধরনের ক্লাব, বিচিত্র ও বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি— অনেকের পক্ষে এগুলোই উপায়, যার দ্বারা মানুষের সংসর্গলাভ ঘটতে পারে। অর্থব্যয় ক'রে এগুলোতে যোগ দিলে, কোনো বন্ধুলাভের আশা আর সুদূরপরাহত থাকে না। বৈবাহিক সম্বন্ধের ঘটক হিশেবে কোনো-কোনো দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি আছে ; এবং সহপাঠী বা পাঠিনীর সঙ্গে প্রণয় বা পরিণয়সূত্রে যাঁরা আবদ্ধ হন, তাঁরা যে শুধু তরুণ-তরুণী তাও নয়। ন্যুয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাশে আসতেন দুই প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া ; কয়েকদিন তাঁদের দেখলুম পাশাপাশি আসনে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসতে, পাঠ্যবিষয়ের চাইতে পরস্পরের দিকেই বেশি মনোযোগী যেন, তারপর একদিন ক্লাশের পরে তাঁরা উৎফুল্ল মুখে আমাকে জানালেন যে তাঁরা আজ রাত্রেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন— আর ক্লাশে আসবেন না। আমি মনে-মনে তাঁদের মিলিত জীবনকে শুভ কামনা জানালুম।

বিবাহ হ'লো : বর-কন্যা উভয়েরই বয়স ষাট, সত্তর বা এমনকি আশি পেরিয়ে গেছে— এই কথাটা কলকাতায় ব'সে শুনতে হঠাৎ খুব অবাক লাগে, কিন্তু অল্প একটু তলিয়ে দেখলেই এর অর্থ বুঝতে দেরি হয় না। এ-সব বিবাহের উদ্দেশ্য— আর-কিছু নয়, শুধু একজন সঙ্গী পাওয়া, একজন মানুষ, যার সঙ্গে কথা বলা যাবে, ঝগড়া করা যাবে, বিনিময় করা যাবে স্মৃতি ও

বিবিধ বিষয়ে মতামত, বেরোনো যাবে সিনেমায়, বা রেস্তোরাঁয়, বা দেশভ্রমণে। একজন সারাক্ষণের সঙ্গী, যার জন্য সকালে উঠে তৈরি করা যাবে ব্রেকফাস্ট, বা দোকানে গিয়ে পছন্দ করা যাবে জামা-কাপড়, বা যার হাতে হাত রেখে চুপচাপ ব'সে থাকা যাবে পার্কে জুন মাসের সুদীর্ঘ সন্ধ্যায়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ দম্পতিরা এ-দেশে পরস্পরনির্ভর বা পরস্পর-সম্পূর্ণ— আর এ থেকে তাঁরাও বাদ যান না যাঁরা যৌবনে বিবাহ করেছিলেন এবং একবারের বেশি করেননি। পারিবারিক জীবনে ব্যাপ্তি নেই ব'লে, এঁরা মনের দিক থেকেও একে অন্যের অনন্য অবলম্বন হ'য়ে পড়েন ; পুত্রকন্যা পরিজনের সঙ্গে যে-পরিমাণে সম্বন্ধ হয় শিথিল, ঠিক সেই পরিমাণে নিবিড় থাকে দাম্পত্য। নিতান্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ধরনের সংলিপ্তি এখানে নিয়ম, আমরা তাতে এখনো অনভ্যস্ত আছি। আমাদের দেশে প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পটভূমিকায় পর্যবসিত হন, রঙ্গমঞ্চ অধিকার ক'রে নেয় পুত্রকন্যা ও তাদের সম্পৃক্তজনেরা ; প্রতীচ্য মানুষের মনে হ'তে পারে আমাদের দাম্পত্য জীবনে ঘনিষ্ঠতা নেই, আর আমরা হয়তো এদের ব্যবহারে দেখতে পাই আতিশয্য। আসল কথা, এঁদের বিবাহের মূল কথা হ'লো পারস্পরিক সঙ্গদান ও সঙ্গলাভ, আর আমাদের— সংসারযাত্রা। এদের মধ্যে, বিবাহ যতদিন টিকে থাকে, ততদিন তার আদর্শ হ'লো ঐকান্তিকতা ; কর্মস্থলে ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সর্বদা একত্র থাকা বিধেয় ; কখনো-কখনো, এমনকি, বিচ্ছেদ হ'য়ে যাবার পরেও, প্রাক্তন দম্পতি বন্ধু হিশেবে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। আর আমাদের বিবাহ প্রথম থেকেই বহুজনবেষ্টিত ও বহু কর্তব্যে জটিল, তার একটিমাত্র অংশ হ'লো দাম্পত্য জীবন। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে, যেমন সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি, তেমনি বিবাহের প্রতি, এদের মনোভাব যৌবনোচিত, যৌবনের প্রকাশে কোনো সংকোচ নেই এদের, এবং তাকে দীর্ঘায়িত করার জন্যও এরা অনবরত প্রয়াসী ; আর আমাদের জীবননাট্যে একটির বেশি অঙ্ক জোড়ে না যৌবন, আর তখনও তার গোপনতাকেই মনোজ্ঞ ব'লে ধরা হয়।

যাকে বলছি যৌবনোচিত মনোভাব তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত এদের তৃপ্তিহীন নূতনত্বপ্রীতি। নতুন ছেড়ে নতুনতরর আকর্ষণে এরা বিপুলবেগে অনবরত ধাবমান। সদ্যতনটা বেশি ভালো না-ই বা হ'লো, সেটা যে আনকোরা, তা-ই যথেষ্ট। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রীর বছর-বছর হালচাল

বদলাচ্ছে, যাঁরা ফ্যাশনের তরঙ্গশীর্ষে ভাসমান, সেই মেয়েরা দেখা দিচ্ছেন কোনো ঋতুতে পিঙ্গল এবং অন্য কোনো ঋতুতে হয়তো নীলবর্ণ কেশদাম ধারণ ক'রে। হেনরি মিলার আক্ষেপ ক'রে বলেন, সারা আমেরিকায় এমন কোনো গৃহস্থ নেই, যে বলতে পারে— 'ঐ চেয়ারে আমার পিতামহ বসতেন।' যাকে আমরা প্রাকৃত বাংলায় 'মায়া' বলি, সেই ভাবটি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ; জিনিশ একটু পুরোনো হ'লেই ফেলে দেয় এরা, না-দিয়ে উপায়ও থাকে না, কেননা জীবনযাপনে সমকালীনের দাবি অমোঘ, বাড়িতেও জায়গা অল্প, এবং আজ কেউ ওয়াশিংটনে আছে ব'লে পরের সপ্তাহে যে ফ্লরিডায় চ'লে যাবে না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অগত্যা অনেক স্মৃতিচিহ্ন জঞ্জাল-স্তূপে বিলীন হ'য়ে যায়। ন্যুয়র্কে যে-রকম বেগে নূতন অট্টালিকা নির্মিত হয় তা ভারতবাসীর পক্ষে চমকপ্রদ ; আমাদের চোখের সামনে একটা বারোতলা একশো ফ্ল্যাটের বাড়ি চার মাসে প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। কিন্তু এগুলোকে স্থান দেবার জন্য যে-সব পুরোনো বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়, তার মধ্যে অনেক থাকে স্মৃতিজড়িত বা যশস্বীর সুঘ্রাণে ভরা ;— গ্রীনিচ গ্রামের যে-সব সেকেলে বাড়িতে উনিশ ও প্রথম-বিশ-শতকী বিখ্যাত লেখকেরা বাস ক'রে গেছেন, তার কয়েকটিমাত্র টি'কে আছে এখনো, অন্যগুলির ভূমিতে উঠেছে উচ্চ, উজ্জ্বল ও আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট-ভবন। এডগার পো-র কুটিরের উল্লেখ দেখেছি তথ্যপুস্তিকায়, কিন্তু ন্যুয়র্কে হুইটম্যানের কোনো স্মরণিক আছে ব'লে জানতে পারিনি। কোথায় সেই গরিব পানশালা, যেখানে যুবক ওঅল্ট আড্ডা দিতেন? সেই রেস্তোরাঁ, যেখানে ডীন হাওয়েলস-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়? সেগুলো নেই ব'লে ধ'রে নিচ্ছি, কেননা থাকলে তার আওয়াজ শোনা যেতো। এই তথ্যগুলো মনে রাখলে আর অবাক লাগে না, যখন দেখা যায় এই যন্ত্রেশ্বর দেশে ছোটোখাটো মেরামতের কোনো ব্যবস্থা নেই— বা কোথায় আছে তা আবিষ্কার করা গবেষণাসাপেক্ষ। প্র. ব.-র একপাটি জুতোর বন্ধনী ছিঁড়ে গেলো, তার সংশোধন কর্ম হিশেবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু— অথবা সেইজন্যেই— কাছাকাছি সব ক-টা সম্ভবপর দোকানে ঘুরেও নিষ্ফল হ'তে হ'লো। সিগারেটের লাইটার কোথাও সারানো যায় কিনা, সে-বিষয়ে সন্ধান ক'রেও আমি ব্যর্থ হয়েছি ; সারাতে চাই শুনে সদালাপী সিগারেট-বিক্রেতাটি বরং একটু অবাক হ'য়ে তাকিয়েছে আমার দিকে। 'সারিয়ে কী হবে? এটার

দাম বড়োজোর দেড় ডলার— ফেলে দিয়ে আর-একটা কিনুন না।' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম না যে কথাটা দেড় অথবা দশ ডলার নিয়ে নয়, জিনিশটি আমি টোকিওতে কিনেছিলুম, একটি বৈদেশিক স্মৃতি হিশেবে আরো কিছুদিন ব্যবহার করতে পারলে মন্দ লাগতো না। জড় বস্তুর সঙ্গেও ব্যবহারের দ্বারা এক ধরনের আত্মীয়তা জন্মে— অন্তত আমাদের তা-ই মনে হয়— একটি পুরোনো কলমের মেরামতে আমরা যতটা অর্থব্যয় করি তা দিয়ে হয়তো নতুন দুটো কেনা যেতো— কিন্তু জিনিশটা যে পুরোনো ব'লেই মূল্যবান, এই কথাটা সাধারণ মার্কিনী মানসের অন্তর্ভূ'ত নয়। জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর পরিবর্তন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে কিছুটা বেশি প্রচলিত, হয়তো তারও একটা কারণ এই নূতনের সম্মোহন, ও স্মৃতির প্রতি অনাসক্তি। তারুণ্যই মার্কিন দেশের জীবনধর্ম।

পরম ভালো বা পরম মন্দ ব'লে পৃথিবীতে কিছু নেই ; সবই আপেক্ষিক ; সব প্রথা, ব্যবস্থা ও মনোভাব সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনেরই অনুগামী, এবং এমন কোনো সমাজও নেই, যাতে কালোচিত পরিবর্তন না ঘটে। আমাদের সমাজও যে-ভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে মনে হয় আমার এই তুচ্ছ লেখাটা কোনো শত-কান্তিক বাঙালি তরুণের চোখে পড়লে তিনি হয়তো কৌতুক বোধ করবেন। তাতে আমার অনিকেত আত্মা বিক্ষুব্ধ হবে না, সে-কথা এখনই জানিয়ে রাখছি। তারুণ্য আমাকে আকর্ষণ করে ; আমাদের দেশে তার ব্যাপ্তি আমি কামনা করি কিন্তু তার অতিব্যাপ্ত মার্কিনী প্রকাশে অভ্যস্ত হ'তে সময় লাগে আমাদের। 'বৃদ্ধ' শব্দটি এদের কথ্যভাষা থেকে নির্বাসিত হয়েছে, বড়ো জোর এরা 'সাবালক' বা 'বয়স্ক' অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছয়। পিটসবার্গে এক নিমন্ত্রণে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিলাম ; তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'I was young then,' কিন্তু তক্ষুনি, এক সেকেণ্ড মাত্র থেমে, আবার বললেন, 'I mean—younger,' অথচ বয়স তাঁর নিঃসন্দেহে উত্তরপঞ্চাশ, কেশ রজতস্পৃষ্ট ; জীবনের এই পর্যায়ে আমরা বরং কিছুটা জাঁক ক'রে ব'লে থাকি যে আমাদের 'বয়স হয়েছে।' আমাদের মুগ্ধ না-হ'য়ে উপায় থাকে না, যখন দেখা যায় সপ্ততি বা অশীতি-বর্ষীয়ারা অঙ্গরাগে ও বেশভূষায় তাঁদের পৌত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন ; দাঁড়াচ্ছেন যথাসম্ভব সোজা হ'য়ে, সূক্ষ্ম বলিরেখাযুক্ত নয়নে ফুটিয়ে তুলছেন চটুলতা; মোহন হাস্যে বিকশিত করছেন তাঁদের উজ্জ্বল ও কৃত্রিম দশন-

পঙক্তি ; ভ্রূবিলাস, পরিহাস ও বাহুভঙ্গি যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত ক'রে যাচ্ছেন। 'বার্ধক্যে সুখী হ'তে হ'লে এশিয়াতে জন্মানো উচিত,' এ-রকম কথা প্রতীচীবাসীরা মাঝে-মাঝে ব'লে থাকেন, এবং সুখ মানে যদি প্রশান্তি হয়, বা স্নেহের তৃপ্তি, বা মানসিক নির্ভরলাভ, তাহ'লে— দারিদ্র্য সত্ত্বেও, আমাদের দেশে শাশুড়ি-পুত্রবধূর আবহমান বিবাদ সত্ত্বেও, এই কথাটা স্বীকার্য হ'তে পারে। যাঁরা বয়সে বড়ো তাঁরা শুধু ঐ কারণেই শ্রদ্ধেয়, যে-কোনো লোকের চুলের রং বদল হ'লে তার একটি আলাদা সম্মান প্রাপ্য হয়, এই সংস্কার— যা অদূর অতীতে য়োরোপেও ছিলো আর আমরা এখনো কাটাতে পারিনি— মার্কিনদেশে তার প্রতিষ্ঠা নেই। এখানে বাস করে তিন স্তরের মানুষ : শিশু, সদ্যতরুণ ও স্থায়ী তরুণ, আর শেষোক্ত স্তর দুটি সমাজের চোখে নির্ভেদ। ফলত, যত বাড়ে বয়স, তত কঠিন চেষ্টা করতে হয় যৌবনের প্রচ্ছদ টিকিয়ে রাখতে ; সেটা আরামপ্রদ নাও হ'তে পারে, কিন্তু তাতে অন্য দিক থেকে এটুকু লাভ হয় যে লোকেরা, কখনোই নিজেদের 'বৃদ্ধ' ভাবে না ব'লে, হয়তো মনের দিক থেকে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে না, প্রাকৃত পতনে এলিয়ে দেয় না নিজেকে। আমরা যেমন, দেহে নয়, মনোধর্মে, কিছুটা অকালেই বার্ধক্যদশায় উপনীত হই, হ'তে ভালোবাসি— বা অন্তত এক পুরুষ আগেও তা-ই ছিলো আমাদের লোকাচার— এখানে তেমনি প্রতিজ্ঞা উঠছে উদ্ধত হ'য়ে: 'না, মানবো না হার, শেষ পর্যন্ত সতেজভাবে বেঁচে থাকবো।' এই ভাবটিও গুণীজনের পক্ষে যত অনুকূল, সামান্যের পক্ষে তা নয়। এক বিশিষ্ট মহিলার কথা শুনলুম, যাঁর চার স্বামীর মধ্যে একজন ছিলেন জর্মান কবি, আর-একজন ইটালিয়ান গীতস্রষ্টা, অন্য দু-জনও খ্যাতিমান ফরাশি ও মার্কিন। তিনি বৈধব্যদশায় সম্প্রতি আশি পেরিয়েছেন, এবং জীবনসম্ভোগের ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাঁর এখনো অক্লান্ত। একবার কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ ক'রে তিনি এক বন্ধুকে বললেন, 'যে-কোনো হাবা ম'রে যেতে পারে, বেঁচে থাকতে হ'লে ঘটে বুদ্ধি চাই!' এই মহিলা— জ়র্জ়, সাঁ-র সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী— এঁকে আধুনিক প্রতীচ্য মানসের পরাকাষ্ঠা বললে ভুল হয় না।

কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা কোনো গুণপনা সকলের থাকে না ; আর সেই সব বৃদ্ধবৃদ্ধার জন্য আছে নানা স্তরের 'জরা-ভবন', আর অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের জন্য নগরগুলিতে অ্যাপার্টমেন্ট-হোটেল। বস্টনে একবার একটি

জরা-ভবনে সান্ধ্য অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিলো আমার ; যথাসাধ্য সুসজ্জিত হ'য়ে জরিষ্ণুরা সমবেত হয়েছেন, বদ্ধপরিকরভাবে প্রফুল্ল ও যূথবদ্ধভাবে সজীব ; এঁদের মধ্যে যে-দু'জন সেই সন্ধ্যার 'রাজা' ও 'রানী'রূপে বৃত হলেন তাঁরা ক্যামেরাশোভন হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে, কিঞ্চিৎ নৃত্যগীতেরও প্রচেষ্টা হ'লো। চ'লে আসার সময় দেখলুম পাশের একটি ছোটো ঘরে এক বৃদ্ধ একা ব'সে আছেন ; তিনি অসমান পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে, আকর্ণ হাসি টেনে, স্খলিত ভাষায় সম্ভাষণ করলেন আমাদের ; তাঁর সামনে গ্লাশ দেখে অনুমান করা শক্ত হ'লো না যে তাঁর বিলোল অবস্থার অনন্য কারণ, অন্তত এই মুহূর্তে, জরা নয়। হয়তো প্রত্যহ সুরাপানের অনুমতি নেই এখানে ; আজকের এই সুযোগটি তাঁর পক্ষে মহার্ঘ।

অ্যাপার্টমেন্ট-হোটেলগুলিতে এমন অনেকে শেষ আশ্রয় খুঁজে নেন, যাঁদের অবস্থা সচ্ছল, আর যাঁরা সম্ভবত বিধবা বা বিপত্নীক, বা বিবাহ-বিশ্লিষ্ট। প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই তাঁদের, চলতে গিয়ে পা কাঁপে, কথা বলতে গিয়ে অনভিপ্রেতভাবে মাথা ন'ড়ে ওঠে ; আহারের সময় দরোয়ান ধ'রে-ধ'রে নিয়ে বসিয়ে দেয় রেস্তোরাঁয়, আবার ফিরিয়ে আনে ; অসুখ করলে এরাই হয়তো পৌঁছিয়ে দেবে হাসপাতালে, অকস্মাৎ মৃত্যু হ'লেও এদেরই দায়িত্ব। কেউ আশি পেরিয়েছেন, কেউ বা নব্বুই ; তবু—হয়তো মনোযোগ দেবার মতো অন্য কোনো বিষয় নেই ব'লেই— নিজেদের বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী এঁরা ; কেউ দু-বেলা নেকটাই বদল করছেন, মহিলাদের মাথায় ফ্যাশনদার টুপি, ধ্বস্ত অঙ্গে অলংকার ; পরস্পরকে 'ভালো দেখাচ্ছে' ব'লে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁরা, লাউঞ্জে ব'সে নিজেদের মধ্যে হাস্যালাপের চেষ্টা করছেন, কেউ ঘুমিয়ে পড়ছেন ব'সে-ব'সে ; কিছু নেই কর্তব্য বা চিন্তনীয়, আশা করার, বা আশা ক'রে ব্যর্থ হবার মতো কারণ আর ঘটে না— এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন, হয়তো বছরের পর বছর। এই যৌবনধর্মী যৌবন-বহুল দেশে বার্ধক্যও সুবিস্তীর্ণভাবে উপস্থিত, কেননা পুষ্টিকর পথ্য ও উত্তম চিকিৎসার ফলে অধিকাংশই আজ অসামান্য দীর্ঘজীবী।

অবশ্য এই সব-কিছুর পিছনে একটি তিমিরবর্ণ তথ্য লুকিয়ে আছে, তা— মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয় কার বা নেই, কিন্তু বহু যত্নে, অনেক আগে থেকে, সেই অনিবার্য পরিণামের বিরুদ্ধে দেয়ালের পর দেয়াল তোলার চেষ্টা— তা এই

দেশের ও যুগের একটি নূতন মনোভঙ্গি। এঁরা অনেকে আহার করেন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতে ; দুগ্ধপানে বয়স্কদের রুচি ও ক্ষমতা আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছে ; মেয়েরা কেউ-কেউ ওজন-বৃদ্ধির প্রথমতম লক্ষণেই, স্বাদু ও স্বাভাবিক আহার ত্যাগ ক'রে চার বেলা গলাধঃকরণ করেন একটি টিনে-পোরা পদার্থ— যাতে স্নেহগুন একেবারেই নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য সব উপাদান নাকি অক্ষুণ্ণ। সেবারে দেখেছিলুম, প্রায় এমন কোনো সাবালক স্ত্রী বা পুরুষ নেই যিনি সিগারেট খান না, কিন্তু সকলেই কর্কটরোগের সঙ্গে এই অভ্যাসের সম্বন্ধ নিয়ে ভাবিত ; এবারে, সেই সম্বন্ধ 'প্রমাণ' হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে, অনেকেই দেখি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন— আর কারো-কারো হয়তো তিরিশ বা চল্লিশ বছরের অভ্যাস ছিলো! প্রায় অতি-মানবিক এই সংযম ও মনোবল— আমি অন্তত, অনুকরণে অক্ষম ব'লে, শতমুখে এর প্রশংসা না-ক'রে পারি না ; এবং এমন অনুমানও সংগত যে পরবর্তী গবেষণার ফলে এই মত যদি বাতিল হ'য়ে যায়, বা তাতে দেখা দেয় সংশয়, তাহ'লে তখনই সিগারেটের কাটতি আবার আকাশে ঠেকবে। হোক বিজ্ঞান, হোক বিজ্ঞাপন— কোনো স্বাস্থ্য-সম্মত নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলায় মার্কিনীদের জুড়ি নেই জগতে। নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ও আয়ু সকলেরই কাম্য, তা অর্জনের প্রয়াসও সাধু, কিন্তু এ-দেশে কারোরই কি কখনো মনে হয় না যে 'মারের সাবধান নেই ?'

জরা, ব্যাধি, মৃত্যু— বিশেষত মৃত্যু— এই বিষয়গুলি আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু সাহিত্যে যা উন্মুখর, জীবনে তা অনুচ্চারিত ; কবিরা যে-ভীষণ পাতালে বার-বার অবতরণ করেছেন তাকে তথ্য হিশেবেও স্বীকার করা শিষ্টাচার নয়। সামাজিক জীবনে নিষিদ্ধ এ-সব বিষয়, পারতপক্ষে শব্দগুলো কেউ মুখে আনে না। যেন মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই, এই ভান সার্বিকভাবে স্বীকৃত ; কখনো সেই গুণ্ঠন ছিন্ন হ'লে সাধারণ মানুষ কী-ভাবে সাড়া দেয় তার একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। একটি খুচরো খাবারের দোকান ছিলো আমাদের হোটেলের পাশেই, একদিন সেখানে গিয়ে শুনি, দোকানি তার এক বাঁধা খদ্দেরকে একটি মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছে।

'Remember that big burly fellah who used to drop in here for bottles of Guiness— that big hulk of a guy? He

has *kicked the bucket !* You know, I met his wife round the corner— near the bank— and you know what she told me ? "My man has *popped off !*" "You know, my ole man has *popped off !*" she said. "It's Guiness did it." That big hulk of a fellah who used to drop in here— remember ? He has *kicked the bucket !*'

পর-পর তিনজন খদ্দেরকে খবরটা জানালে লোকটি— একই ভাষায় ও ভঙ্গিতে; আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলুম। সে যে বার-বার কথাটা বলছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে তার বেদনা, কিন্তু বেদনাপ্রকাশের এই ভাষা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত। লোকটি অবশ্য শিক্ষিত নয়, কিন্তু কলকাতার কোনো ক্ষুদ্র দোকানদার অনেকদিন ধ'রে দেখা কোনো মানুষের মৃত্যু বিষয়ে তুলনীয় ভাষায় কথা বলছে, তা কল্পনা করা শক্ত। কলকাতায় বরং অনেকবার দেখেছি, রাস্তায় যখন মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে, কোনো বস্তিবাসিনী চলা থামিয়ে জোড়হাতে নমস্কার করেছে সেই দেহকে— এটাকে কেউ-কেউ হয়তো কুসংস্কার বলবেন, কিন্তু এতে অন্তত এই বোধটুকু প্রকাশ পায় যে মৃত্যু এক মহান আবির্ভাব— শ্রদ্ধেয়, রহস্যময়, দেবতার মতো।

অনেকদিন আগে ইভলিন ওয়া-র একখানা উপন্যাস পড়তে শুরু করেছিলুম। হলিউডের এক প্রবীণ চিত্রনাট্য-লেখক আপিশে গিয়ে দেখলে তার চাকরি গেছে, তখনই বাড়ি এসে আত্মহত্যা করলে, লোকেরা খবর পেয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করতে এলো। এতখানি ঘটনা প্রথম দু-তিন পৃষ্ঠার বেশি জায়গা জোড়েনি, তারপর অনেকটা অংশ জুড়ে ছিলো মার্কিনী 'মরণ-শিল্পে'র সানুপুঙ্খ বিবরণ। কেমন ক'রে মৃতদেহকে সাজায়, অঙ্গরাগলেপনে ক'রে তোলে মনোহর, ফিরিয়ে আনে বৃদ্ধার তরুণী রূপ, অপসৃত করে জরার চিহ্ন, রোগের চিহ্ন, যাতনার ছায়া, ফুটিয়ে তোলে মুখে এমন প্রফুল্লতা যে মৃত ব'লে আর মনেই হয় না— পাতার পর পাতা এ-সব বর্ণনা বিস্তারিত দেখে আমি, স্বীকার করছি, উপন্যাসটি শেষ করার মতো উৎসাহ পাইনি। কিন্তু তার সাহায্যে আমি প্রথম জেনেছিলুম যে আমেরিকায় যে-সব নতুন শব্দের উদ্ভব হয়েছে তার একটি হ'লো 'mortician'। 'Beautician, mortician'— রূপশিল্পী, শবশিল্পী : বলতে গেলে একই পেশা, শুধু দ্বিতীয় দলের 'মক্কেল' হলেন— সপ্রাণ বনিতারা নন, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মৃতেরা। কিন্তু এই শিল্পীদের অভিধানে 'মৃত' শব্দের অস্তিত্ব

নেই, এঁরা তাকে বলেন 'প্রিয়জন'— 'the loved one'— এমনি আরো অনেক পরিভাষা বা ছদ্মভাষা রচিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হ'লো মৃত্যুকে একেবারে মৃদু ও মোলায়েম ক'রে তোলা, এই ঘটনায় স্বভাবত যারা শোকার্ত হ'তে পারে, তাদের মনে এমন একটি মোহসঞ্চার, যেন এতে কষ্টের কোনো কারণই নেই। একবার ক্যালিফর্নিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্-এ ভ্রমণ করেছিলুম; পথে যে-ক'টা গ্রাম বা ছোটো শহর পড়লো, সর্বত্র দেখলুম, যেমন অনিবার্যভাবে মুদিখানা ও ড্রাগস্টোর আছে, তেমনি শোভা পাচ্ছে শবশিল্পীর ফলকচিহ্ন।

লস এঞ্জেলেসের এক প্রান্তে একটি বিখ্যাত, কুখ্যাত ও বিশাল গোরস্থান আছে, তার নাম 'ফরেস্ট লন' বা কাননপ্রান্তর। 'মৃত্যু নেই—' এই মোহ অথবা অভিনয়কে কতদূর পর্যন্ত টেনে নেয়া যেতে পারে, এই স্থানটি তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এটি চোখে দেখার চেষ্টা আমি করেছিলুম; কিন্তু স্থানীয় লোকেরাও সকলে তার পথ চেনে না; দু-বার রাস্তা ভুল ক'রে, ম্যাপ দেখে-দেখে, আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে যখন পৌঁছলেন, তার একটু আগে প্রবেশ-দ্বার বন্ধ হ'য়ে গেছে। বাইরে থেকে যেটুকু আভাস পেলুম তাতে মনে হ'লো, এর যে-সব জমকালো বর্ণনা পড়েছি তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো গরমিল নেই। বাইরে থেকে, বা ভিতরে গিয়েও, হঠাৎ কারো মনে হবে না এটি গোরস্থান: বন, বীথিকা ও জলাশয়, কৃত্রিম পাহাড় ও রমণীয় মর্মর-মূর্তি— যেন এক প্রমোদ-উদ্যান ছড়িয়ে রেখেছে আমন্ত্রণ— কোথাও ফোয়ারার কলস্বর, কোথাও বা অদৃশ্য যন্ত্রে নিঃসৃত হচ্ছে সুকোমল সংগীত, যেন পরলোকের পরপার থেকে। গান হয়তো বলছে: 'এই যে, কেমন আছো তোমরা? আমি ভালো আছি, তোমাদের সঙ্গেই আছি— তোমরা ভালো থেকো।' কোথাও এমন কিছু নেই যা আশা ও সুখভোগের পক্ষে উৎসাহজনক নয়: ভয় থেকে, দুঃখ থেকে, আঘাত থেকে অতি যত্নে বহু দূরে সরিয়ে, মৃত্যুকে যেন মিশিয়ে দেয়া হয়েছে জীবনের অন্যান্য সাধারণ, সহনীয়, এবং এমনকি উপভোগ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। যারা মাটির তলায় চ'লে গেছে তারা যে সেখানে বেশি 'ভালো আছে', তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে, কিন্তু যারা আসে 'প্রিয়জনে'র সঙ্গে 'দেখা করতে' তারা যাতে সুখী ও তৃপ্ত মনে ফিরে যেতে পারে, বসতে পারে প্রফুল্ল মুখে ডিনারে, তারই জন্য এই বিপুল আয়োজন।

এই গোরস্থানে ভূমি অগ্নিমূল্য; চিত্রতারকা ও অন্যান্য ধনীরা অগ্রিম তা কিনে রাখেন, তাঁদের অন্তিম বাসস্থানও 'শ্রেষ্ঠ' হওয়া চাই। অবশ্য এই ধরনের দ্বিতীয় কোনো গোরস্থান আছে ব'লে আমি শুনিনি, বরং আমার মুখে 'ফরেস্ট-লন'-এর উল্লেখ শুনে অনেকেই হেসে বলেছেন— 'ও, হলিউডের সেই পাগলামি! ও-সব ছেড়ে দিন!' শবশিল্পীদের প্রাদুর্ভাবও, আমার যতদূর ধারণা, ক্যালিফর্নিয়া ছাড়া অন্য কোথাও নেই অথবা প্রবল নয়: অন্তত ন্যুয়র্কে ঘোরাঘুরি ক'রে ও-রকম একটিও ফলকচিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। সমগ্র মার্কিনীদের বিষয়ে এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে, তবে মৃত্যু বিষয়ে বিশেষ একটি মনোভাব— যা এই দেশেই উদ্গত হয়েছে— তার চরম ব্যঞ্জনা হিশেবে 'ফরেস্ট-লন' উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক নিমন্ত্রণে এসেছি আমরা; গৃহস্বামী বুদ্ধিজীবী, বন্ধুবৎসল ও গণ্যমান্য। পার্ক এভিনিউর দশতলায় তাঁর অ্যাপার্টমেণ্ট; ঘরে আছে খাঁটি রেনেসাঁস আসবাব, ষোলো শতকের মূল ইটালিয়ান ছবি; অতিথিদের মধ্যে আছেন জর্মান কবি, নামজাদা মার্কিনী সমাজতত্ত্ববিদ, কোটিপত্নী প্রৌঢ়া, ব্লণ্ড রূপসী, এবং অন্য অনেক বিশিষ্ট জন। কিছুক্ষণ আগে উত্তম ডিনার খাওয়া হয়েছে; এখন কনিয়াক বা কির্শ্ বা বেনেডিক্টিন, হাভানা চুরোট, সোনামুখ সিগারেট— আর গল্প-গুজব। কেউ ব'সে, কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ আবৃত্তি করছেন কবিতা, কেউ নতুন কোনো শিল্পীর সুখ্যাতি করছেন, কোথাও বা কথা হচ্ছে শাড়ির সৌন্দর্য ও অসুবিধে বিষয়ে। এর মধ্যে গৃহস্বামী হঠাৎ একজন অতিথিকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। এক মিনিট পরে ফিরে এলেন অতিথিটি, কিন্তু তারপর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না, স্ত্রীকে নিয়ে চ'লে গেলেন একবার 'গুড-নাইট' পর্যন্ত উচ্চারণ না-ক'রে। আমরা শুনলুম, তাঁর টেলিফোন এসেছিলো শিকাগোর এক হাসপাতাল থেকে; তাঁর কন্যার সেখানে একটু আগে মৃত্যু হয়েছে: তাঁরা এখনই শিকাগোর প্লেন ধরবেন।

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দ রইলো ঘর; এক টুকরো মেঘ দেখা দিতে-দিতেই মিলিয়ে গেলো। তারপর আবার শুরু হ'লো কথাবার্তা— কবিতা নিয়ে, আলজেরিয়ার সমস্যা নিয়ে, সাম্প্রতিক ভারতে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে। যেন কিছুই হয়নি, যেন কারোরই মন স্পৃষ্ট হয়নি বিষাদে, সব আছে সুস্থ ও অটুট।

এটাই সভ্য আচরণ ; সব দেশে, যেখানেই আধুনিক সভ্যতা প্রভাবশালী, সেখানেই এই রকম হ'তে হ'তো ; আর এটাই যে সত্য আচরণ নয় তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। অন্তত এর ব্যতিক্রম ঘটানো সন্ন্যাসী না-হ'লে সম্ভব নয়।*

---

*আরো এক স্মৃতি এখানে উপস্থিত না-ক'রে পারছি না। ১৯৬৩-র বাইশে নবেম্বর সেদিন, আমি ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে এসেছি। প্রথম বক্তৃতা হ'য়ে যাবার পর লাঞ্চে আমার সঙ্গী হলেন স্থানীয় এক তরুণ অধ্যাপক। ভোজনশালাটি অনাড়ম্বর ও নিতান্ত মফস্বলি, কিন্তু একটি রেডিও চলছে। সেই যন্ত্রে হঠাৎ একটি খবর শুনে আমার সঙ্গী উৎকর্ণ হলেন। মিনিটখানেক পরে আমারও কানে এলো যে জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি কোনো-এক আততায়ীর গুলিতে টেক্সাসের ড্যালাস শহরে গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। কয়েক মিনিট পরেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেলো।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার জন্যে ভোজ ছিলো ; ভারতীয় অভ্যাসবশত আমি ধ'রে নিয়েছিলুম সেটা বাতিল হ'য়ে যাবে। কিন্তু ডিনার হ'লো, ভারতীয় ও মার্কিন ছাত্রদের অবস্থার তুলনা ক'রে কিছু বলতেও হ'লো আমাকে ; সভাস্থলে বা সভার বাইরে কেনেডির প্রতি কেউ কোনো উল্লেখ করলেন না, অথবা উপস্থিত কারো ব্যবহারেই মনে হ'লো না কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে। পরের দিন স্বস্থানে ফিরে এসেও বিশ্ববিদ্যালয়িক জীবনযাত্রায় কোনো ভাবান্তর দেখলাম না। ইণ্ডিয়ানা রাজ্য-সরকার থেকে একদিন ছুটি ঘোষিত হ'লো, কিন্তু ছুটির পরে ক্লাশে গিয়ে দেখি, ছাত্রছাত্রীদের মুখে-চোখে কোনো লক্ষণীয় চাঞ্চল্য নেই, তারা প্রত্যেকেই শান্ত ও অভ্যস্তভাবে পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগী। সহকর্মী বা অন্য কারো মুখেও এই জগৎ-কাঁপানো ঘটনাটি উল্লিখিত হ'তে শুনলাম না। আমি মনে-মনে ভাবলাম— কলকাতায় খবরটি পৌঁছনোমাত্র না জানি কী-রকম হুলুস্থূল প'ড়ে গিয়েছিলো : স্কুল-কলেজ ছুটি, আপিশ ছুটি, অসংখ্য লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, উপচে পড়ছে চায়ের দোকান ও কফি-হাউসগুলি ; তর্ক, আলোচনা, শোকসভা— কয়েকদিন পর্যন্ত কেনেডি (আর অজ্ওঅল্ড ও জ্যাক রুবি) ছাড়া কারো মুখে কোনো কথা থাকবে না। অথচ যাদের পক্ষে এই ঘটনা সবচেয়ে মর্মান্তিক, সেই মার্কিনীরা কী নিঃশব্দে ও অনুদ্বেলভাবে ঠিক সেই তারিখেও যে যার নির্দিষ্ট কাজ নিভুলভাবে সম্পন্ন ক'রে গেছে!

এর কারণ— হৃদয়হীনতা নয়, উদাসীনতা নয়, সমগ্র মার্কিনজাতির অবিচল, অনম্য ও অনাক্রমণীয় নিয়মনিষ্ঠা, এবং মৃত্যুর প্রতি এদের একটি ভিন্ন মনোভাব। মৃত্যু চরম, সব মন্তব্যের অতীত, এই সত্যটাকে এরা যেন মনের মধ্যে গ্রথিত ক'রে নিয়েছে, তাই কোনো বৃহৎ শোকের দিনেও এদের সামাজিক সংযম ও শৃঙ্খলা ট'লে ওঠে না। জগতে যা-ই ঘটুক, জগৎ যতক্ষণ টি'কে আছে আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে, এই শিক্ষা এদের জীবনে বদ্ধমূল। আর-একটি কারণ, যার জন্যে কেনেডি-হত্যার মতো ঘটনাতেও এরা অনুচ্চার থাকতে পারে, তা, আমার মনে হয়— অন্তত সেই সময়ে মনে হয়েছিলো— এদের সুবিস্তীর্ণ ও সুদক্ষ সাংবাদিকতা, খবর-কাগজ, রেডিও ও টেলিভিশনের

অক্ষৌহিণী সম্প্রচার। ঘরে-ঘরে যে-সব অসংখ্য মার্কিনী তখন শোকাত উত্তেজনায় ঘণ্টা-মিনিট যাপন করছিলেন, তাঁদের কাছে সান্ত্বনা নিয়ে এসেছিলো এই সব মুদ্রিত, চিত্রিত ও শব্দায়মান সংবাদ-পর্যায় ও সময়োচিত মন্তব্য। সেই তিন দিন— যতক্ষণ না কেনেডির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো— মার্কিনী টেলিভিশনগুলিতে স্থগিত ছিলো সব বিজ্ঞাপন ও আমোদপ্রমোদ— কেনেডি-কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছুই বর্ণিত হয়নি ; এবং তারই সাহায্যে কোটি-কোটি মানুষ তাদের শোকের আবেগ প্রশমিত করতে পেরেছিলো ; সেটাই ছিলো তাদের পক্ষে আলাপ, আলোচনা, মিছিল ও অগুনতি শোকসভার বিকল্প। আমরা ভারতীয়রা— অন্তত বাঙালিরা— কিছুটা বেশি 'হুজুগপ্রিয়' বা উচ্ছ্বাসী হ'তে পারি ; কিন্তু মানবস্বভাব যদি মৌলিকভাবে সর্বত্রই এক হয় তাহ'লে শোকের অনুভূতিও সর্বত্রই সমান ব'লে ধ'রে নিতে হবে— শুধু সামাজিক ব্যবস্থা ও লোকাচার অনুসারে প্রকাশভঙ্গি বদলে-বদলে যায়। কেনেডির মৃত্যুর দিনে আমি যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি ছিলুম, সেখানেও একটি ছাত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাতের নিয়োগ করার পরে তা রক্ষা করতে পারেনি— তার এক বন্ধু এসে আমাকে জানিয়েছিলো যে সে শোকে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই এই তরুণীটি ব্যতিক্রম নয়, ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য মানুষ তারই মতো বেদনায় বিকল ছিলো সেদিন ; কিন্তু কোথাও দেখা যায়নি সেই সামাজিক ও প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস, যা আমাদের দেশে অনিবারণীয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে, এমনকি অধুনা যে-নিরয়বাসীর নাম অনুচ্চারণীয়, সেই তৎকালীন বাম-গণদেবতা স্টালিনের মৃত্যুতে কলকাতায় যে-দৃশ্য আমরা দেখেছি, তা আমেরিকায় 'কল্পনাতীত ; কিন্তু কল্পনাতীত এইজন্যে যে শোকটাকে হজম ক'রে নেবার অন্য উপায় হাতে আছে এদের, এবং— উপলক্ষটা যতই মর্মঘাতী হোক না— অকস্মাৎ কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দেয়া বা রাজপথে ট্র্যাফিকে বিঘ্ন ঘটানো, এগুলো এদের পক্ষে শুধু বেআইনি নয়, আমরা যাকে অধর্ম বলি, তা-ই। এমনকি, যে-শোক সর্বজনীন নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত, তারও সঙ্গে এদের ব্যবহারে যে-সংযম দেখা যায় তা আমাদের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। আমার এক যুবক সহকর্মীর পত্নীবিয়োগ হ'লো— ঘটনাটা তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত ছিলো না— তবু যে তিনি পরের দিনই যথাসময়ে কলেজে এলেন এবং ক্লাশ পড়ালেন, তাতে আমি মার্কিনী নিয়মনিষ্ঠার একটি চরম ব্যঞ্জনা দেখতে পেয়েছিলাম। আমি বলছি না যে অনুরূপ অবস্থায় প্রত্যেক মার্কিনী একই ভাবে অবিচল থাকতেন, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথা সত্য যে এদের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ। হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ারূপে সম্প্রতি এ-দেশে বীটবংশের উদ্ভব হয়েছে।

৭

সপ্তাহে অন্তত তিন দিন, কখনো বা একই দিনে দু-বার, আমাকে আসতে হয় এখানে। এই যেখানে ফিফথ এভিনিউ আরম্ভ হয়েছে, পার্কের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পাঁচ নম্বর বাস্‌গুলো, গারিবাল্ডির মূর্তির তলায় খেলা করছে কুকুরের সঙ্গে বালক, আর রাস্তায় চলেছে ছাত্রছাত্রী— মুখর দলে, ঘনিষ্ঠ যুগলে, বা হয়তো কোর্তার তলায় কবি হবার উচ্চাশা নিয়ে, একা। এ-ই ওয়াশিংটন স্কোয়ার, যাকে হেনরি জেমস বিখ্যাত ক'রে গেছেন, যার তিন দিক জুড়ে ন্যুয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সারি-সারি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে, আর যার দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীনিচ গ্রাম এঁকে-বেঁকে ছড়িয়ে আছে। এর এক বর্গ মাইলের মধ্যে ন্যুয়র্কের অধিকাংশ পুস্তক-প্রকাশের দপ্তর, যে-সব পত্রিকা অগ্রণী বা 'আভঁ-গার্দ' তাদেরও আস্তানা এখানে ; শিল্পী, সাহিত্যিক, বিদ্রোহীদের পাড়া এটা ; দরিদ্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবীর ; যাদের সব পারিবারিক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে সেই সব নিঃসঙ্গ মানুষের ; কিংবা যারা বিবাহিত ও আয়ের দিক থেকে সুস্থির হ'য়েও কম খরচে মনঃপূত আবহাওয়া পেতে চায়, তাদের পাড়া। অন্তত এই 'গ্রাম' সম্বন্ধে এটাই কিংবদন্তী।

আমার কর্মস্থল এটা, যারা বেড়াতে আসে তাদের নর্মস্থল। বছর যখন বসন্তে পা দিলো তখন থেকে দেখছি বাস্‌-বোঝাই ট্যুরিস্ট চলেছে এ-সব পথ দিয়ে ; ক্যানসাস, টেক্সাস, কলোরাডো বা আইডাহো থেকে এসেছে তারা, কেউ-কেউ হয়তো এই প্রথম 'বড়ো শহর' দেখলো। ন্যুয়র্কের তারকাচিহ্নিত দ্রষ্টব্যের মধ্যে এও একটি— এই 'গ্রাম' ; কেননা 'দি ভিলেজ' মানেই বোহেমিয়া, প্যারিসের 'বাম তীরে'র ইয়াঙ্কি প্রকরণ, কেননা জীবন এখানে প্রথামুক্ত, আচরণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন, বেশবাস আলুথালু, শ্বেত-কৃষ্ণে বা ধনী-দরিদ্রে ভেদ নেই, শিল্পকলার মর্যাদা স্বপ্রকাশ ; এখানে ছত্রিশ জাত একই টেবিলে কালো কফি বা নিছক ভডকা পান ক'রে থাকে, আর ঘড়িতে রাত এলিয়ে পড়লেও কাফের দরজা বন্ধ হ'য়ে যায় না। তাছাড়া, এটাই সেই বিচরণভূমি, যেখানে বীটবংশের মুমুক্ষুরা ধ্যানে বসেন, কবিতা লেখেন ও জ্যাজ়-বাদ্য সহযোগে তা প'ড়ে শোনান, অবস্থা বুঝে জ়েন অথবা মারিয়ুয়ানার শরণ নেন— এবং কদাচিৎ হয়তো আহার ক'রে নিদ্রাও যান। অন্তত, এই সবই এর বিষয়ে কিংবদন্তী।

যা-কিছু শোনা যায় তা সত্য নাও হ'তে পারে, কিন্তু মানতেই হবে এই পাড়ার চরিত্র আলাদা। তিনটে এভিনিউ আর অনেকগুলো স্ট্রীট জড়িয়ে এর ব্যাপ্তি, কিন্তু মানহাটানের অন্যান্য অংশের মতো এর ভূগোল জ্যামিতিক নয়: আট স্ট্রীট, সাত স্ট্রীট…পাঁচ…তিন— তারপরেই নম্বরের বদলে রাস্তার নাম শুরু হ'য়ে গেলো, দেখা দিলো ঋজুতার বদলে বঙ্কিমা; এভিনিউ ছেড়ে ভিতরে এলে অলিগলি বেশ জটিল, আর নামকরণ এমন খেয়ালি যে অনেক সময় ট্যাক্সিওলাও ঠিকানা খুঁজে পায় না।…বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিলো আমাকে, আট বছর আগে এক সন্ধ্যায়, এই 'গ্রামে' ই.ই. কামিংস-এর বাসা আবিষ্কার করতে। কেউ জানে না প্যাচিন প্লেস কোথায়, কেউ তার নাম পর্যন্ত শোনেনি, কানামাছির মতো একই পথে ঘুরছি; অবশেষে ট্যাক্সিওলা যখন অসহিষ্ণু আর আমি প্রায় হতাশ, তখন বলতে গেলে দৈবাৎ তার খোঁজ পাওয়া গেলো। প্রায় ডিনারের সময়ে, প্রাচ্য জাতির সময়জ্ঞানহীনতার আবহমান অপবাদ মাথায় নিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণে পৌঁছলুম। ন্যুয়র্ক শহরে, যেখানে শুধু গুনতে জানলে আর দিক চিনলে যে-কোনো ঠিকানা বের করা যায়— সেখানে এই!

আর সত্যিও, খাশ ভিলেজে ঢুকলে হঠাৎ প্রায় মনে হয় না ন্যুয়র্কে আছি। সরু-সরু পথ, বাড়িগুলো দোতলা বা তেতলা মাত্র উঁচু, কোনো-কোনোটা দেড়শো বা দু-শো বছরের পুরোনো, কোনোটায় হয়তো অ্যালেন পো একবার এসে উঠেছিলেন। স্টুডিও, বইয়ের দোকান, কফির আড্ডা, ঘরোয়া চেহারার রেস্তোরাঁ, কিছুটা উন্নাসিক ও সাহিত্যিক ধরনের নাইট-ক্লাব, আর ছোটো-ছোটো শৌখিন দ্রব্যের দোকান, যেখানে হয়তো সাজানো আছে জাপানি মাদুর, তিব্বতি ঘণ্টা, আফ্রিকার মুখোশ, দিনেমারদেশের কাঠের কাজ, আর সবচেয়ে হালফ্যাশনের ভারতীয় তাঁতে-বোনা রেশম— এমন মোটা আর আকাঁড়া তার চেহারা যে দেখলে চট ব'লে মনে হয়। আর রাস্তায়— শিথিল, অলস, উদ্দেশ্যহীন, যথেচ্ছচারী ভিড়।

ভিড়ের মধ্যে বীটবংশকে শনাক্ত করা সহজ। মেয়েরা পরে কালো মোজা, লম্বা চুল রাখে, লিপস্টিক মাখে না; আর পুরুষেরা রাখে দাড়ি আর ঘাড়-বেয়ে-নামা লম্বা চুল, তীব্রতম শীতে ছাড়া টুপি কিংবা ওভারকোট পরে না; জামা, জুতো বা দেহের পরিচ্ছন্নতাসাধন তাদের হিশেবে অনাচার। কুলপি-

বরফের থাপের মতো সরু আর আঁটো তাদের পাৎলুন, উর্ধ্ববাস একটা মোটা চেনটানা কোর্তায় সীমিত : চুল চিরুনির সম্পর্করহিত। এ-ই হ'লো শাস্ত্রীয় বা ঠিকুজি-মেলানো বীট, গ্রীনিচ গ্রামে যে-কোনো সময়ে এদের দেখা যায়, কিন্তু শুধু এদেরই দেখা যায় না। আছেন তাঁরাও, যাঁদের বয়ঃপ্রভাবে মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকলেও স্বভাবদোষে কৌতূহল মেটেনি, কিংবা যাঁরা আপেক্ষিক তারুণ্য সত্ত্বেও এখনো 'ভদ্রলোক' হ'তে লজ্জিত নন। আর আছে, এই দুই প্রান্তের মধ্যে অনেকগুলো সূক্ষ্ম স্তরভেদ : আধা-বীট, হবু-বীট, ছিলুম-বীট, ছদ্ম-বীট, হ'তে-পারতুম-বীট, ইত্যাদি ; আর সংখ্যায় এই মাঝারিরাই বৃহত্তম। এদের মধ্যে সকলেই চুল-দাড়ি রাখে না, কারো বা মস্তক নিষ্কেশ, কেউ এমনকি নেকটাই পর্যন্ত বাঁধে ; কিন্তু এদের চলাফেরা ও দৃষ্টিপাতের উদাসীন ভঙ্গি দেখেই চেনা যায় এদের ; কাফেতে ব'সে নতনেত্রে সুগভীরভাবে চিন্তা করে এরা, কিংবা এক পেয়ালা রাম্‌গন্ধী চা সামনে রেখে বেদান্তের সূত্র আওড়ায় ;— শুধু যে পরমাত্মাই সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এই কথাটা সদ্য আবিষ্কার ক'রে এরা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে, ভাবখানা কিছুটা এই রকম।

এই সেদিনও ঢিলেঢোলা কাপড় ছিলো ফ্যাশন : আঁটো পাৎলুনের উদ্ভব হ'লো কোথায় এবং কবে থেকে ? অনুসন্ধান ক'রে এই প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব পাইনি। কেউ বলেছেন, সূক্ষ্মমুখ জুতোর মতো এরও জন্মস্থল সাম্প্রতিক ইটালি, আবার অন্য কারো মতে এটা ন্যুয়র্কেরই আবিষ্কার। সে যা-ই হোক, ফ্যাশনটা আজ নিখিলপশ্চিমে স্বীকৃত ; আটলান্টিকের দুই তটবর্তী দুই মহাদেশে যেখানেই গিয়েছি এর ব্যত্যয় দেখিনি ; ছাত্র ও যুবকদের পাৎলুন সর্বত্র কৃশ ও ঋজু, অনেক সময় কটিতে বা গুল্‌ফেও ভাঁজ থাকে না, তাদের খাটো কোর্তা কণ্ঠপ্রকাশক, আর উচ্ছল চুল অবিন্যস্ত। চল্লিশের উর্ধ্বে যাঁদের বয়স তাঁদেরও পরিচ্ছদ পূর্বের তুলনায় অপরিসর ; বয়স্করা কিছুটা রক্ষণশীল হ'লেও কালস্পর্শ ঠেকাতে পারেননি। প্রথম গিয়ে একই রকম চমক লাগে মহিলাদের মাথার দিকে তাকালে : হঠাৎ মনে হয়, আট ঘণ্টা সুখনিদ্রার পরে আয়নার দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে এইমাত্র তাঁরা উঠে এসেছেন, কিংবা কেশপ্রক্ষালনের পর ভুলে গেছেন প্রসাধন করতে। অনভিজ্ঞের এমনি ভুল হয় প্রথমে, কিন্তু মনোযোগী হ'লেই ধরা পড়ে যে এই আপতিক অবিন্যাসই তাঁদের পরম বিন্যাস ; এই যে হেলাফেলার ভঙ্গি, এই যে ঈষৎরুক্ষ,

পীতাভ, তাম্র বা পট্টবর্ণ অলকদামের বিশৃঙ্খলা, এই যে এলোমেলো গ্রন্থি, ঘূর্ণি ও কুঞ্চন— যার ফলে কারো হয়তো একদিকে কপাল প্রায় ঢেকে গেছে, আর অন্য কারো চাঁদির উপরে অপ্রত্যাশিত ফণা তুলছে মনে হয়— বুঝতে দেরি হয় না যে এই সবই সুচিন্তিত ও বহুযত্নসাধিত, এ-ই হচ্ছে সর্বাধুনিক 'হেয়ার-ডু', রূপচর্চার পরাকাষ্ঠা, কেশশিল্পীর মূল্যবান পরিচর্যার দ্বারা সম্পন্ন। এতেও আছে ছন্দ, আছে শ্রী, আর তা আছে ব'লেই ধ'রে নেয়া যায় যে জাপানি অথবা বঙ্গীয় ললনার ভূতপূর্ব বিরাট কবরীর মতোই এটা একটা বিশেষ শৈলী— যা মানুষের বুদ্ধি ও প্রযত্ন ভিন্ন সাধিত হ'তে পারে না।

তাহ'লে কি বীটবংশীয়রা প্রবর্তক, না অনুকারক ; তাদেরই সংক্রাম কি সমাজের সব স্তরে পৌঁচেছে, না কি তারাও অন্য সকলের মতো সেই সব নিয়ন্তাদের অধীন, যারা অদৃশ্য ও অনেক সময় অনামা থেকে ফ্যাশনের ফর্মান জারি করেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু এটুকু বুঝি যে বীটনিকরা প্রক্ষিপ্ত নয়, এবং ফ্যাশন জিনিশটা শ্রদ্ধেয়। স্থান, কাল ও অবস্থার এক বিশেষ সন্নিপাতের ফলে সমাজের মধ্যে যখন যে-বিশেষ হাওয়া দেয়, চলতি ভাষায় তাকেই বলে ফ্যাশন ; সেটাকে বলতে পারি যুগের মেজাজ, ইতিহাসের তরঙ্গ, সেটা বুদ্বুদের মতো দু-দিন পরে মিলিয়ে যাবে ব'লে আজকের দিনে কম সত্য নয়, আর মিলিয়ে গিয়েও তা আগামী দিনে কিছু উদ্বৃত্ত রেখে যাবে। আমাদের তুলনায় পশ্চিমী সমাজ অনেক বেশি সচল ও পরিবর্তনশীল, ব্যক্তিরাও অনেক বেশি আত্মচেতন, তাই ফ্যাশনের প্রভাব এখানে দুর্জয় ; জীবনের ছোটো-বড়ো এমন-কোনো বিভাগ নেই যেখানে তা ব্যাপ্ত হ'য়ে না পড়ে ; কাপড়ের ছাঁট, চুলের কায়দা, আসবাবপত্র, লোকাচার, কবিতার ছন্দ— এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে যেন, এবং যে-অবিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য সূত্রটি এদের সম্পৃক্ত ক'রে রাখে তারই নাম ফ্যাশন বললে ভুল হয় না। তা আপনার আমার পছন্দ হয় কি না হয় সে-কথা অবান্তর, কেননা সেটাকে উপেক্ষা করলে যা বাকি থাকে তা কতকগুলো নির্বস্তুক ধারণা শুধু ;— সেই ধারণাগুলো— অর্থাৎ লোকেরা অস্পষ্টভাবে যা ভাবছে, যা চাচ্ছে অথবা হ'তে চাচ্ছে— সেগুলোকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভাষায় এরাই তর্জমা ক'রে দেয়— এই চুলের ডৌল, কাপড়ের কায়দা, গ্রীনিচ গ্রামে বীটবংশের মিছিল।

মানতেই হবে যে ফ্যাশনের জন্যও লি পো-র কবিতা পড়া ভালো, মডিগলিয়ানির ছবি দেখা ভালো, ফ্যাশনের জন্যও স্বীকার করা ভালো যে মানুষের আত্মা আছে আর তার তৃপ্তির পক্ষে আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট নয়। এবং এই স্বীকৃতি গ্রীনিচ গ্রামে অবিরল ও অপর্যাপ্তভাবে দৃশ্যমান। এই ছোটো পাড়াটুকুর মধ্যে বইয়ের দোকান যত আছে, আমার বিশ্বাস অবশিষ্ট সমগ্র ন্যুয়র্কে ততগুলো নেই; সপ্তাহে প্রতিদিন রাত্তির বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে এই দোকানগুলো, তাদের কর্মীরা প্রায় সকলেই বীটবেশধারী ও বয়সে তরুণ, হয়তো তারা ছাত্রছাত্রী, বা কেউ হয়তো দুটো-চারটে পদ্য লিখে ফেলেছে। এ-সব দোকানের ভিতরে ঢুকলে, বা বাইরে দাঁড়িয়ে কাচের জানলায় তাকালেও, স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকে না যে সমকালীন জগৎ-সভ্যতায় আমেরিকার যা অন্যতম প্রধান ও গরীয়ান দান, তা এই পেপারব্যাক্ পুস্তকমালা, আবহমান বিশ্বসাহিত্যের সুলভ সংস্করণ, বহু দেশ ও শতাব্দীব্যাপী এই সর্বজনভোগ্য শ্রীক্ষেত্র। বিশেষত আমার মতো কেউ, যার নানা দেশের সাহিত্যে হানা দেবার অভ্যেস আছে, অথচ হানা দেবার মতো উপযুক্ত নতুন বই স্বদেশে যে তেমন বেশি খুঁজে পায় না— পথের ধারে এ-রকম কোনো দোকান দেখলে তার চলা স্তব্ধ হ'য়ে যায়, চোখ বিস্ফারিত, মন কম্পমান। যে-সব বই বহুকাল ধ'রে পড়তে চেয়েছি কিন্তু হাতের কাছে পাইনি, যে-সব বইয়ের শুধু নাম শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি কখনো, বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানে যে-সব বইয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম— সব আছে এখানে, সাহিত্যের কোনো বিভাগ বাদ পড়েনি, মৃত ও জীবিত প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষার রত্নগুলি ইংরেজিতে সংকলিত হ'য়ে পর্যায়বদ্ধ— অল্প কিছু সিকি-আধুলি পকেটে থাকলেই দু-একখানা সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরা যায়। চলতিকালের বই— যা নিয়ে সবাই কথা বলছে বা ভাবছে বলা উচিত; বা চিরায়ত বই— সফোক্লিস বা দান্তে ধরা যাক— যাকে 'ভালো' ব'লে মানতে হলে প'ড়ে দেখারও দরকার হয় না আর: এই ভাণ্ডার এদেরই মধ্যে আবদ্ধ নয়; যা গুপ্ত, যা বিশেষ, যার দোকানপাট অনেকদিন আগে উঠে গেছে, কিংবা অন্য কোনো অনুরাগ বা চর্চার ফলেই যা নিয়ে কৌতূহলী হওয়া সম্ভব, এমন পুঁথিও অগুনতি আছে ছড়িয়ে: এক বাটি আইসক্রীমের দামে ভাসারির 'শিল্পীদের জীবনী', বা মধ্যযুগের 'পশুতত্ত্ব' হয়তো; কফি-আর-স্যাণ্ডউইচের খরচে শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি-কাহিনী', বা

পিসেম্‌স্কির 'এক হাজার আত্মা'। আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য এই প্রাচুর্য, এবং প্রায় দুঃসহ ; কেননা আমার চোখ যতক্ষণে মলাটগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ে যায়, ততক্ষণে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে অনেক ছেঁড়া সুতো, হারানো গরজ, ভুলে-যাওয়া ভাবনা : জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যত আগ্রহ অনুভব করেছিলাম, এবং যেগুলো খাদ্য না-পেয়ে ম'রে গিয়েছিলো— সব ফিরে এসে একসঙ্গে দংশন করে আমাকে, ভেবে পাই না কোনটাকে ফেলে কোনটার দাবি মেটাই। এখন কথাটা এই : এই কাগজের নৌকোগুলো কিছু-কিছু নতুন যাত্রীকে কি নতুন দেশে অনবরত ভিড়িয়ে দিচ্ছে না ? যত লক্ষ পাঠক এদের প্রতি বছর জোটে, তা থেকে, আমরা নিশ্চয়ই ধ'রে নিতে পারি, এক হাজার, বা একশো, বা পঞ্চাশ, বা অন্তত দশজন মানুষ সত্যি ধরা প'ড়ে যাবে কবিতার চক্রান্তে, নতুন ছন্দে বাজবে তাদের হৃৎপিণ্ড, নতুন চোখে দেখবে তারা জগৎটাকে— আর হয়তো নিজেদেরকেও ? অতএব, এই গ্রীনিচ গ্রামে যদি শিল্পকলাই 'ফ্যাশনেবল' হয়, যদি এটাই হয় ন্যুয়র্কের সেই পাড়া যেখানে কবিতার বই থরে-থরে অলজ্জিত, আর রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, হল্লার বদলে ব্রেখ্‌ট আর আন্টন চেখভ উন্মীল— তাহ'লে আর ফ্যাশনের নিন্দে করি কেমন ক'রে ?

টাইমস স্কোয়ার ভালোই লেগেছিলো আমার, প্রথম যেবার সেপ্টেম্বরের এক রাত্রি ন্যুয়র্কে কাটিয়েছিলাম। তার উগ্রতা, আলো আর বিজ্ঞাপনের চীৎকার, তার দুর্ধর্ষ দেখানোপনা— এগুলোকে, আমার মনে হয়েছিলো, অর্থ দিয়েছে ব্রডওয়ের জনস্রোত— ঘন, অনবচ্ছিন্ন, রাত্রি-দিনের বিভেদভঞ্জন জনস্রোত। অন্যান্য অসংখ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আমি যেন এই বিরাট, চঞ্চল, নিদ্রাহীন নগরের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারবো— এমনি আমার মনে হয়েছিলো তখন। কিন্তু এবার আমাকে টাইমস স্কোয়ার নিরাশ করলে। সব তেমনি আছে : শুধু পথে নেই লোক, নেই উৎসাহ, জঙ্গমতা। শীতের তরাসে সবাই কি আশ্রয় নিয়েছে ঘরে, ড্রাগ-স্টোরে, বা সাব-ওয়ের বিবরে ? না কি শনিবার মানে প্রমোদ আর নেই, অনেকেই বাসা নিচ্ছে ঘণ্টাখানেক ট্রেনের আন্দাজ দূরে, বা নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেননা সন্তানসমেত দম্পতির পক্ষে মানহাটানে ফ্ল্যাট পাওয়া প্রায় অসম্ভব ?...কিন্তু যেদিন, দু-তিন সপ্তাহের ব্যবধানে, একটু বেশি রাত্রে 'গ্রামে' এলাম, সেদিনও ছিলো শনিবার, ঠাণ্ডাও

কনকনে, তবু দেখলাম রাস্তায় ভিড় নিবিড়, চারদিকে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি: যেন এক অনুচ্চারিত নিমন্ত্রণের উত্তরে দলে-দলে নানা রকম মানুষ এসে মিলেছে এখানে, আমাদের দেশের খোলা হাওয়ার মেলার মতো আবহাওয়া যেন, কারো কিছু বাধ্যতা নেই, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই, হাসছে, কথা বলছে, বা দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাচে তুলুস-লোত্রেকের কোনো ছাপা ছবির দিকে তাকিয়ে। একটি তরুণী নিয়ে এসেছে পিঠে বেঁধে তার শিশুকে; একজন লোকের কাঁধের উপর খেলা করছে এক ক্ষুদ্রকায় বাঁদর:— এই শহরে, যেখানে শিশু বিরল, আর পশুরা সব চিহ্নিত ও মর্যাদাবান সেখানে ছুটি অপ্রত্যাশিত অবোধ প্রাণীর বিহ্বল চোখ যেন এক হারানো স্বর্গের স্মৃতি এনে দিচ্ছে তাদের মনে, যারা ক্লান্ত আজ নিয়মে ও নিরাপত্তায়, অথচ তার অভাবও ঠিক সইতে পারে না। হয়তো অনেক বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে এই ফুটপাতে: নষ্ট আশা, ভাঙা বাসা, দীর্ণ জীবন;— কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে এরা যেহেতু সাহস ক'রে মেনে নিচ্ছে ও প্রকাশ করছে, তাই মনে হয় প্রাণ এখানে ব'য়ে চলেছে অবাধে, ভিড়ের মধ্যে, পথের মোড়ে-মোড়ে, উচ্ছল।

সন্দেহ নেই, এখানকার পথে, দোকানে, রেস্তোরাঁয় সঞ্চরণ করলে ভিন্ন একটা স্বাদ পাওয়া যায়, যা বিশেষভাবে ন্যুয়র্কীয় ও চলতি কালের, অথচ যা বিদেশীর অভিজ্ঞতার মধ্যে সহজে ধরা দেয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, বরং কাছে টেনে নেয়, এটাই এর প্রধান গুণ। ঋতু যখন মৃদু হ'য়ে এলো, তখন দেখেছি গ্রীনিচ গ্রাম চিত্রকলার অনুশীলনে উচ্ছল; যেন সারা পাড়া জুড়ে বসেছে আঁকিয়ে ছেলেমেয়েরা; কেউ তারা স্টুডিওতে ব্যস্ত, তাদের সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে পেশাদার মডেলরা স্থির, আরো অনেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে; কেউ তারা ফুটপাতেই চেয়ার পেতে ব'সে গেছে; এক ডলার বা দেড় ডলার দিলে তক্ষুনি আপনার পোর্ট্রেট এঁকে দেবে প্যাস্টেলে, কিছু অধিক মূল্যে তামার ফলকে সাদৃশ্য তুলে দেবে। স্টুডিও, ছবির দোকান, প্রদর্শনী; শিল্পগুরুদের শস্তা প্রিণ্ট, নব্যতম মার্কিনীদের মৌলিক নমুনা, একপাশে হয়তো কফির কাউণ্টার, সিগারেটের কল, ঘোরানো তাকে পেপার-ব্যাক বই, আর সর্বত্র অলস ভিড় কৌতূহলে ছড়ানো: ফাঁকে-ফাঁকে কাফে, ইটালিয়ান আর হিস্পানি রেস্তোরাঁ, রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে কোনো অদ্ভুত নামের নাইট-ক্লাব; ঢুকলে হঠাৎ অন্ধকারে মনে হয় কোনো ডাইনির গুহা বুঝি এটা;

কিন্তু ভয় পাবেন না, জায়গাটা আসলে খুব নিরীহ, কাব্যরোগে আক্রান্ত ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা আরকি, সেইজন্যেই টেবিলে নেই কাপড়, চেয়ারগুলো নড়বড়ে, দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোতে আপনি যাকে অর্থ বলেন তা খুজে পাবেন না ; একটু বসুন, ইচ্ছে হয় তো কান পাতুন ওদের গান-বাজনায় বা কবিতা পড়ায়, যদি এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না-নিয়ে উঠে চ'লে যান তো কেউ কিছু বলবে না ; সব মিলিয়ে, রাত্রিটি বেশ সজীব ও স্বচ্ছন্দ। শুনতে বেশ ভালো লাগছে তো ? কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হ'লো যে এই ছবির উল্টো পিঠও আছে। 'দি ভিলেজে'র মধ্যেই এমন কফিখানা পাবেন যেখানে এক পেয়ালা কফির মূল্য আধ ডলার, এবং আরো আধ ডলার পারিতোষিক দেয়া নিয়ম ; এই অগ্নিমূল্যের কারণ বোধহয় এই যে কফির বাটি আপনার টেবিলে যারা এনে দেয় সেই মেয়েদের পরনে থাকে আঁটো, স্বচ্ছ, তিমিরকৃষ্ণ ইজের, মুখে গাঢ় পাণ্ডুতার প্রলেপ, আর চোখে— ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু মনে হয় সুর্মার কালিমা। এবং এখানেও আছে এমন নাইট-ক্লাব (অন্তত নামত তা-ই), যাতে ঢুকতে হ'লেই কিছু মূল্য দিতে হয়, আর ঢোকার পরে, কিছু খান বা না খান, মাথা-পিছু একটা খরচ ধ'রে নেয় ; কিংবা যেখানে একপাত্র অপেয় কফির সঙ্গে বস্তাপচা রসিকতা শোনার জন্য মাশুল দিতে হয় মাথাপিছু তিন-তিন ডলার। এক বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে এমনি একটি জায়গায় গিয়ে দেখি, দেয়ালগুলো কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে, পরিচারিকারা কৃষ্ণবসনা, শ্লথগমনা ও স্তব্ধবদনী, একদিকে প্রায় পুরো দেয়াল জুড়ে যে-কালিমা-লিপ্ত ছবিখানা ঝুলছে তার উদ্দেশ্য যেন অতিথির মনে ভীতিসঞ্চার। আর অতিথিরা প্রায় সকলেই নীরব ও নতদৃষ্টি, যেন কোনো শোধনাগারে আত্মার ক্ষালন করা হচ্ছে, এমনি আবহাওয়া সেখানে, আর ঐ যে নিগ্রো যুবকটি মাইক্রোফোনের সামনে খাতা খুলে স্বরচিত কবিতা প'ড়ে যাচ্ছে, তাও বোধহয় আমাদের কোনো অজ্ঞাত পাপের জন্য শাস্তিবিধান। বোঝা অবশ্য শক্ত নয় যে ঐ শোকাচ্ছাদ, আলোর ম্লানিমা ও চিত্রিত সন্ত্রাস, ঐ অন্তহীন ও ক্লান্তিকর কবিতা— এ-সবই জায়গাটার আকর্ষণ ; লোকেরা অধিক ব্যয়ে নারাজ হচ্ছে না যেহেতু তারা 'আর্ট'-এর উপাসক, অন্তত নিজেদের বিষয়ে তাদের এই ধারণা এমন মজবুত যে 'আর্ট' নামাঙ্কিত অদ্ভুতেও তাদের আপত্তি নেই। এমনি কয়েকটা লক্ষণ দেখে সন্দেহ জাগে, বুঝি গ্রীনিচ গ্রামও দেখানোপনা বা

ব্যাবসাদারি থেকে মুক্ত নয় : এর যে কোনো ব্রডওয়ে-মার্কা বাবুগিরি নেই সেটাই এর জৌলুশ, কিংবা যেন এর অনুশীলিত অনটনই এর আড়ম্বর : সন্দেহ জাগে, এখানে শিল্পকলার চর্চা যেটুকু আছে তার চেয়েও বেশি আছে কিনা ভান, যাকে সরল বাংলায় 'কাব্যিয়ানা' বলে। কিন্তু— যদি ভান কিছুটা থাকেও, তাতেই বা কী এসে যায় ? আবার বলি : ভালো জিনিশের ভানও অ-ভালো নয়, তবে মার্কিন জীবনের একটা অসুবিধে এই যে কোনো ভালোই অবহেলিত হ'তে পারে না, পারে না নিজের মনে ও নিজের ধরনে প'ড়ে থাকতে বা গ'ড়ে উঠতে ; তা চোখে প'ড়ে যায় যূথের, আশ্রিত হয় সংঘের দ্বারা ; ফলত, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরম্ভ হয়েছিলো তার পরিণতি ঘটে— অন্য অনেক-কিছুর মতোই— একটি বহুল-প্রচারিত 'আকর্ষণে' বা পণ্যদ্রব্যে। এর উদাহরণ আমাদের গ্রীনিচ গ্রাম, যে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে সে রমণীয়, যার মুখপাত্র-স্বরূপ দু-দুটো সাপ্তাহিক কাগজ চলছে আজ, যার ইতিহাস-ভূগোলের বিবরণপূর্ণ অনেকগুলো বই পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। আর-এক উদাহরণ ; খাঁটি বীটবংশের কবিরা ;— অন্তত গিন্সবার্গের সঙ্গে দেখা হবার পর তা-ই আমার মনে হ'লো।

* * *

লম্বা নন, বরং বেঁটের দিকে, ছিপছিপে শরীর, গয়ের রং হলদে-ঘেঁষা ম্লান, চোখে চশমা, নেহাৎ 'ভদ্রলোক'দের মতোই দাড়িগোঁফ কামানো, পরিষ্কার সিঁথি-কাটা চুল কিন্তু মাথা নোওয়ালে ছোট্ট টাক দেখা যায় : অর্থাৎ চেহারায় শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ একটিও নেই, যদিও পালিশহীন জুতো, ইস্ত্রিহীন প্যাণ্ট আর গায়ের গলা-খোলা কোর্তায় গোষ্ঠীচেতনার পরিচয় আছে।— এ-ই হলেন অ্যালেন গিন্সবার্গ, বীটবংশের এক নম্বর কবি, কেরুয়াকের পরেই আদি বীট যিনি, আর কেরুয়াকের সঙ্গে এই উন্মুখর আন্দোলনের স্রষ্টা। এঁর সঙ্গে আমার প্রথম যেখানে দেখা হ'লো, সেখানে গুণী-মানী অতিথি ছিলেন অনেক, আর গৃহকর্ত্রী ছিলেন এমন এক মহিলা যাঁর বন্ধুতা তিন মহাদেশে পরিকীর্ণ, এবং যাঁর ড্রয়িংরুমে অনেক, অনেক নতুন বন্ধুতার সূত্রপাত হয়েছে। এই রকমের বড়ো পার্টিতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু অনেকের সঙ্গেই কথা বলা সম্ভব হয় না ; গিন্সবার্গ যখন ভাং অথবা চরস নিয়ে তর্ক ক'রে-ক'রে উত্তেজিত হচ্ছেন, বা প্রতিপক্ষীয় কোনো মহিলার পৃষ্ঠে কুশান তুলে আঘাত করছেন যখন, আমি ততক্ষণে জাপানি সাহিত্য বিষয়ে আমার জ্ঞানের অভাব

কিঞ্চিৎ পরিপূরণের চেষ্টা করছি, বা কাউকে হয়তো বোঝাতে চাচ্ছি ভারতীয়ের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনা কেন প্রায় সম্ভবপরতার পরপারে। গিন্সবার্গের সঙ্গে আমার কয়েক মিনিট মাত্র কথা হ'লো সেই সন্ধ্যায়। প্রথমেই তিনি অধুনাবিস্মৃত ভারতীয় সোমরসের প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন: আমি বললুম খুব সম্ভব সেটা ফরাশি বা ইটালিয়ান ওয়াইনের মতোই দ্রাক্ষারসমাত্র ছিলো, কিন্তু আমার এই অনুমানে গিন্সবার্গের তৃপ্তি হ'লো না। শুনলুম, তিনি তিন দিন পরেই য়োরোপে পাড়ি দিচ্ছেন, সেখান থেকে— যে ক'রে হোক— কোনো-একদিন ভারতবর্ষে পৌঁছবেন। 'আমেরিকার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি এখন ভারতের পথে— কেরুয়াক, আমি—' দুঃখের বিষয়, অন্য তিনটি নাম আমার মনে নেই। এই ব'লে, চশমার পিছন থেকে বড়ো-বড়ো সরল চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে পরের দিন রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতে বললুম। 'আমার এই বন্ধুকে নিয়ে আসতে পারি?' 'নিশ্চয়ই।'

গিন্সবার্গকে কখনো কোথাও একা দেখা যায় না; তাঁর সারাক্ষণের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হ'লো পীট, পিটার অর্লভস্কি; শুনেছি ইনিও নাকি কবিতা লেখেন এবং বীটসমাজে 'প্রিমিটিভ' ব'লে আখ্যাত। কেমন ঢিলে আর লম্বা-মতো চেহারা এঁর, মুখেচোখে কোনো সাড়া নেই যেন, মুখের ভাষা ব্যাকরণ মেনে চলে না, উচ্চারণও অস্পষ্ট। এঁর বিষয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু গিন্সবার্গকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে, আমার মন নিঃসাড় হ'য়ে রইলো না; আমাকে মানতে হ'লো যে বীটরা সম্প্রদায় হিশেবে যেমনই হোক না, এই মানুষটির আকর্ষণশক্তি আছে।

'আপনি গাঁজা খেয়েছেন?' গিন্সবার্গের প্রথম প্রশ্ন আমাকে। 'সে কী? কখনো খাননি?...হ্যাঁ, আমি নেশা করি বইকি— মাঝে-মাঝে— যখন মেক্সিকোতে কি দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে যাই— কোথায় পাবো বলুন সে-সব জিনিশ এখানে, এমন দেশ যে হুইস্কির মতো সাংঘাতিক বিষ ঘরে-ঘরে চলতে দেয়, আর ঢুকতে দেয় না দেবভোগ্য মারিয়ুয়ানা! আপনার দেশে তো কত রকম আছে— ভাং, চরস, সিদ্ধি: ও-সব ভালো নয় বলছেন, কেন ভালো নয়? জানেন আমি কী চাই? আমি চাই প্রেরণা, চাই স্বর্গ খুলে যাক আমার সামনে, আমি ভগবানকে চাই। আমার "Howl" কবিতা এক

বৈঠকে লিখেছিলাম, শুক্রবার রাত্তিরে আরম্ভ ক'রে যখন শেষ করলাম তখন রবিবার সকাল। না, আমি যা লিখি তা কখনো কাটি না, বদলাই না কিছু, কোনো মাজা-ঘষা করি না, আমার যখন আসে তখন অমনি আসে। একবার ছেলেবেলায়, আমি কলম্বিয়ার ছাত্র তখন, ব্লেইকের কবিতা পড়ছিলাম ব'সে-ব'সে— "Ah sunflower! weary of time"— অনেকক্ষণ ধ'রে পড়ছি — হঠাৎ আমার মনে হ'লো ব্লেইক নিজে আমাকে তাঁর কবিতা প'ড়ে শোনাচ্ছেন, স্পষ্ট তাঁর গলায় একটি, ছুটি, তিনটি কবিতা শুনলাম আমি। পরদিন বন্ধুদের কাছে যখন সে-কথা বললাম কলম্বিয়ায় হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো, প্রোফেসররা ভাবলে আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি, আমাকে আট মাস এক মানসিক চিকিৎসালয়ে আটকে রাখলে।

'না, আমি "ভিলেজে" থাকি না— ওটা বাজে হ'য়ে গেছে আজকাল, যাকে বলে ব্যাবসাদারি তা-ই চলছে, আমার পক্ষে অসম্ভব খরচ ওখানে। আমি থাকি বাওয়ারির কাছে— আপনারা কখনো সেখানে যান না— নিগ্রো, পুয়ের্টো-রিকান, সত্যিকার গরিবদের পাড়া সেটা— আর আমাদেরও মনোমতো আস্তানা। আমার অ্যাপার্টমেণ্টের ভাড়া পঞ্চাশ ডলার, তিন-চারজন একসঙ্গে থাকি ব'লে আরো অনেক শস্তা পড়ে। না— আমি আর-কোনো কর্ম করি না, কেউই তা করি না আমরা, এইভাবেই থাকি। আমার "Howl" ষাট হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, মাঝে-মাঝে কবিতা প'ড়ে টাকা পাই, মোটের উপর মাসে দেড়শো বা দু-শো ডলার আয় হয় আমার, তাতেই চ'লে যায়, বা চালিয়ে দিই। লোকে বলে আমার কবিতার মানে হয় না— জানেন আমার উত্তর কী? লস এঞ্জেলেসে এক সভায় কবিতা পড়ছি একদিন, শ্রোতাদের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো— "আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝিয়ে বলুন!" "বলতে চাচ্ছি— এই!" ব'লে আস্তে-আস্তে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে ওদের সামনে দাঁড়ালুম আমি। আমার কবিতা কানে শুনতে হয়, কেরুয়াকের গদ্যও তা-ই। এই যে আমার নতুন বই এনেছি আপনার জন্য— "Kaddish"— এটা আমার দ্বিতীয় বই, এইমাত্র বেরোলো, আর এই বীট অ্যান্থলজিটা : আপনি কেরুয়াক পড়েননি? আশ্চর্য গদ্য, আশ্চর্য ছন্দ ভাষায়— একটু প'ড়ে শোনাই আপনাকে, শুনছেন?— এই আমেরিকায় যে-নতুন ইংরেজি ভাষা জন্মেছে, আর সেই ভাষা ঠিক যেমন ক'রে মুখে-মুখে উচ্চারণ করে লোকেরা, তার তাল,

তার ধ্বনি, তার স্পন্দন, সব অবিকল ধরা পড়েছে কেরুয়াকের লেখায়, আর প্রথম তাঁরই লেখায় ধরা পড়েছে।...হ্যাঁ, কেরুয়াকও যাচ্ছেন য়োরোপে, তবে ঠিক এক্ষুনি নয়, পীট আর আমি বুধবারে ছাড়ছি এখান থেকে : প্রথমে প্যারিস, তারপর— জানি না। কিন্তু এ-কথা ঠিক জানবেন যে সারা পথ হাঁটতে হ'লেও ভারতবর্ষে আমরা একদিন পৌঁছবোই, আপনাদের সঙ্গে কলকাতায় আবার দেখা হবে।'

যা বলা হচ্ছে তার জন্যে ততটা নয়, যে-ভাবে বলা হচ্ছে বা যে-মানুষটি বলছেন, তারই জন্যে এঁর সমস্ত কথা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলুম আমি। বীটদের বিষয়ে, আর সবচেয়ে বেশি গিন্সবার্গ বিষয়ে, যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে : তাঁদের সমাজদ্বেষ ; বিবিধ উগ্র ওষধিতে আসক্তি ; তাঁদের সমকামী যৌন আচরণ ;— এগুলিকে তথ্য হিশেবে মেনে নিয়েও এদের সঙ্গে গিন্সবার্গ মানুষটিকে যেন পুরোপুরি মেলানো গেলো না। বরং এই রুশ-ইহুদি-মার্কিন-মিশ্রিত যুবকটিতে আমি যা পেলুম তাকে বলতে পারি প্রায় প্রাচ্য মৃদুতা, এক সুকুমার মুখশ্রী, বড়ো-বড়ো চোখের দৃষ্টি সরল ও নিষ্পাপ, কণ্ঠস্বর নম্র, বাচন শান্ত, অঙ্গভঙ্গি কোমল ; কোনো কথাতেই তিলতম ভান বা আত্মম্ভরিতা নেই, আছে এক স্বভাবসিদ্ধ, হয়তো প্রায় শৈশবধর্মী, বিশ্বাসের আভাস। আমি বুঝতে পারলুম, এঁর মধ্যে অন্ততপক্ষে সন্ধানটা খাঁটি, অন্তত এক ফোঁটা পবিত্র অনল ইনি পেয়েছেন। তাছাড়া এঁর সরল স্বভাব, আর বয়সের তারুণ্য— এই দুয়ের মিলনে গিন্সবার্গকে আমার তেমনি মনে হ'লো যাতে কিনা "ছেলেটি" ব'লে উল্লেখ করলে ভুল হয় না, বাংলায় কথা বলা সম্ভব হ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে "তুমি" বলতুম। অর্থাৎ মানুষটির বিষয়ে আমার যা অনুভূতি হ'লো, বাংলা ভাষায় তাকেই বোধহয় স্নেহ বলে।

* * *

'Beat', 'Beatitude' : এই দুটি শব্দের যমকে এঁদের নামকরণ ; বীটবংশ বলতে চান যে তাঁরা সমাজের কাছে স্বেচ্ছায় হেরে গেছেন, এবং তাঁরা পুণ্যের পিয়াসী। এক সাংবাদিক একবার বিদ্রূপ ক'রে এঁদের যে-আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই 'beatnik'ও এখন মার্কিনী শব্দকোষের অন্তর্ভূত। আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সান ফ্রান্সিস্কোতে, তখন ১৯৫৬ সাল ; মাত্র পাঁচ বছরে এই 'পরাজিত'রা যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহদাকার দেশে যে-রকমভাবে জয়ী হয়েছেন, তার তুলনা

সাহিত্যের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এঁরা নিজেদের বিদ্রোহী বলেন কিন্তু বিপ্লবী বলেন না, আর এখানেই ইংলণ্ডের রাগি ছোকরাদের সঙ্গে এঁদের তফাৎ। যাঁদের বলা হয় রাগি ছোকরা, তাঁদের অস্তিত্ব শ্রেণীভেদনির্ভর; ইংলণ্ডের অনুচ্চ শ্রেণীর প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া, বা প্রতিশোধের বাহন তাঁরা; যে-সব যুবক মেধাবী হ'য়েও জন্মদোষে 'লাল-ইট' বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্বাচীন আঙিনায় আবদ্ধ থেকেছেন, পৌছতে পারেননি অক্সফোর্ডে বা কেম্ব্রিজে, এই গোষ্ঠী তাঁদের দ্বারা গঠিত; এঁদের রাগের লক্ষ্য সমাজ, যা তাঁদের প্রস্তাবিত পথে চলতে রাজি হচ্ছে না: অর্থাৎ, প্রথম যুগের রোমান্টিকদের মতো, এঁরাও সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী। কিন্তু আমেরিকার প্রায় শ্রেণীহীন সমাজে এ-রকম ক্রোধের স্থান নেই, সেখানে বিদ্রোহ শুধু বিমুখতার নামান্তর হ'তে পারে। বীট কবিদের ঘোষণাও তা-ই: সমাজ তাঁদের মতে এতই ঘৃণ্য যে তার সঙ্গে বৈরিতার সম্বন্ধ স্থাপনও অসম্ভব; শুধু বিশেষ-কোনো দেশ-কালের নয়, যে-কোনো সমাজই পরিত্যাজ্য। অতএব তাঁদের সুচিন্তিত নীতি হ'লো সামাজিক অনুজ্ঞালঙ্ঘন: বিবাহ, পরিবার, প্রজনন, গার্হস্থ্য, শিষ্টাচার, রাষ্ট্র অথবা ধর্ম-যাজনার সংস্রব— এই সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পরম প্রত্যাখানই এঁদের ধর্ম। এঁদের বস্তিবাস, মাদকসেবন, পর্যটকবৃত্তি, যৌন অনাচার, অর্থকরী কর্মের প্রতি অনীহা— সবই এই প্রত্যাখ্যানের বিভিন্ন অঙ্গ; এগুলো তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হ'লেও কর্তব্য, কেননা তাঁদের ধারণায় বুদ্ধ ও খৃষ্ট দু-জনেই ছিলেন নগ্নপদ ভবঘুরে 'বীটনিক', অতএব এই পথে ভিন্ন মোক্ষলাভের আশা নেই। যদি দেশ হ'তো ভারত, আর কাল হ'তো কয়েক শতক আগে, তাহ'লে আমার মনে হয়, এঁরা চিহ্নিত হতেন নতুন একটি সাধক-সম্প্রদায়রূপে, হয়তো এঁরা তান্ত্রিক মার্গে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চ'লে যেতেন; নিতান্তই বিশ শতকের প্রতীচীতে জন্মেছেন ব'লে অগত্যা এঁদের ক্রিয়াকলাপ শুধু কাব্যরচনায় আবদ্ধ থাকছে।

সুখের বিষয়, সর্বদাই যা হ'য়ে থাকে, বীট-নীতি ও বীট-ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। গিন্সবার্গ যেমন অশাস্ত্রীয়ভাবে শ্মশ্রুহীন ও কাঁকুই-স্পৃষ্ট, তেমনি তাঁর কাব্যকেও বীটতন্ত্রের বিরোধী বলা যায়। মার্কিন বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম যে বীটরা তাঁদের পিতামাতাকে ঘৃণা ক'রে থাকেন, কথাটার আমি এই অর্থ করেছিলাম যে নিরন্তর নির্বাণকামনার প্রভাবে তাঁরা জন্মেছেন

ব'লে খিন্ন হ'য়ে আছেন, তাই জন্মের হেতুদ্বয়কে ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু গিন্সবার্গের "Kaddish" (ঐ হিব্রু শব্দের অর্থ : শোকার্তের প্রার্থনা)— খুলে দেখি, কবিতাটি আর-কিছু নয় : তাঁর মৃত মাতার স্মরণে এক উদ্বেল শোকোচ্ছ্বাস। আঁরি মিশো, যিনি তিরিশ বছর আগে 'মায়ের ছেলে' বাঙালি জাতিকে ফরাশি ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছিলেন, তিনি এই কবিতাটি পড়লে দেখবেন যে ষাট সালের এক ইয়াঙ্কি কবির কাছে আর্দ্রতম বাঙালিও মাতৃপূজায় পরাস্ত। এবং মা অর্থ যেহেতু গৃহ ও পারিবারিক বন্ধন, তাই কেমন ক'রে বলি যে গিন্সবার্গ সর্বান্তঃকরণে অনিকেত বা উন্মূল ?

আমার নিজের অবশ্য মনে হয় না যে সমাজকে ত্যাগ করলেই আত্মার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এবং মাদকের দ্বারা পশুপতির প্রসাদ যদি বা পাওয়া যায়, সরস্বতীর বরলাভ হয় কিনা সে-বিষয়েও আমার সংশয় দুর্মর। কিন্তু, হয়তো খুব ভুল করবো না, যদি বলি যে বীটতন্ত্রের মূল কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। মার্কিন সমাজ আজ সংঘবদ্ধতার এমন একটি চরমে পৌঁচেছে যে কোনো-একদিক থেকে বিদ্রোহ না-জাগলে অস্বাভাবিক হ'তো। তারই প্রবক্তা এই বীটবংশ : অত্যন্ত বেশি সংস্থা, অত্যন্ত বেশি স্বাস্থ্য, অত্যন্ত বেশি বীমা, ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত বেশি ব্যবস্থাপনা— এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁদের, যা রচনার প্রান্ত ছাপিয়ে জীবনের মধ্যেও ঘূর্ণিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যে এই বিদ্রোহ ব্যাপারটা নতুন নয় ; রোমাণ্টিকদের সময় থেকে ডাডা ও এজ্‌রা পাউণ্ড পর্যন্ত কয়েকটা বড়ো, আর অনেকগুলো ছোটে-ছোটো ঢেউ আমরা উঠতে দেখেছি ; বীটবংশের ধরনধারন তাই চেনা লাগছে ; এদের যন্ত্রপাতিও আগে দেখিনি তা নয়। বিদ্রোহের দ্বারা, পূর্ববর্তী আরো অনেকের মতো, তাঁরা সাহিত্যে কিছু টাটকা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, অন্তত এই কারণে আমার তাঁদের সমর্থন করতে বাধে না।

কিন্তু হায়, এই বিবেকপীড়িত, গুণতান্ত্রিক বিশ-শতকী প্রতীচীতে বিদ্রোহ ক'রে সার্থক হবার উপায় নেই ; যুদ্ধে জেতা বড্ড বেশি সহজ হ'য়ে গেছে। আজকের দিনের সমাজে যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির উপর আস্থা হারিয়েছেন ; ইতিহাস তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে ; এখন তাঁরা পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তে বদ্ধপরিকর। আর অনাহারে মরতে পারবে না কোনো তরুণ কবি, নাস্তিকতা বা মুক্ত প্রেম প্রচার করলেও পারবে না কোনো প্রাচীন

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হ'তে, পূর্বাচরিত প্রতিটি প্রথা লঙ্ঘন করলেও হ'তে পারবে না সনাতনীদের নিন্দাভাজন। 'অবহেলিত প্রতিভা' সম্ভাবনার অতীত হ'য়ে গেছে; বরং কবিত্বশক্তির অঙ্কুরোদ্গম চোখে পড়ামাত্র প্রবীণ মান্যজনেরা বরমাল্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। জাতি, গোত্র, শিক্ষা, বয়ঃক্রম, ছন্দের পটুতা বা অপটুতা, ব্যাকরণের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি— এই সব পুরাতন সূত্রের উপর নির্ভর ক'রে পূর্বযুগের 'কোয়ার্টালি রিভিয়ু'র দলবল যে-ধরনের সমালোচনা লিখতেন— ধরা যাক মূঢ়ের মতো, অন্ধের মতোই লিখতেন— তার একটা ভালো দিক এই ছিলো যে আঘাতের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি বেড়ে যেতো। কিন্তু এখন কোনো অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, যে নিজেকে কবি ব'লে ঘোষণা করছে, তাকে মনে-মনে উন্মাদ ব'লে সন্দেহ করলেও প্রকাশ্যে কেউ পীড়ন করবেন না; বরং, তার রচনা যদি প্রলাপের মতো শোনায়, তাহ'লেই তার রাতারাতি করতালিলাভের সম্ভাবনা বেশি। 'কে জানে— আমরা আজ বুঝতে পারছি না, কিন্তু যদি বা হয় আর-এক ব্লেইক, আর-এক শেলি বা কীটস, বা নতুন এক ডি. এইচ. লরেন্স! নিন্দে ক'রে কি ভাবীকালের জন্য অনপনেয় কলঙ্ক রেখে যাবো!' 'লেডি চ্যাটার্লিজ লভার' ও 'ইউলিসিস'-এর বিরুদ্ধে সমাজের আক্রোশ ও আক্রমণ ছিলো উদ্ধত, আজ সেই আক্রমণকারীদের কৃপার চোখে দেখি আমরা, কিন্তু 'Howl'-এর প্রথম প্রকাশের পরে সান ফ্রানসিস্কোর যে-সব সুনীতিরক্ষক গুরুজন তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন, বিচারকের মন্তব্য আঘাত করলে তাঁদেরই, সর্বসমক্ষে তাঁরা নির্বোধ ও হাস্যাস্পদ ব'লে প্রতিপন্ন হলেন। 'ট্রপিক অব ক্যানসার' সংক্রান্ত মামলাতেও মিলার হলেন জয়ী, একদা-নিষিদ্ধ 'ললিটা', 'ফ্যানি হিল্' ইত্যাদিও পেপার-ব্যাকে সর্বত্র আবর্তমান, তাদের অনুকারক ও প্রতিযোগীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। এ-ই হ'লো, সমকালীন কল্যাণ-রাষ্ট্রে সমাজের ও সমালোচনার ধারা; এঁর দ্বারা প্রথম লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হন ডিলান টমাস, যাঁর সম্বন্ধে এ-রকম সন্দেহ করা যায় যে বিরতিহীন মদ্যপ হ'য়েই তিনি অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সনাতনী গোঁড়ামি, তা ইংলণ্ডের মতো দেশেও এতদূর পর্যন্ত ভেঙে গেছে যে ঐ দ্বীপ আজ ক্ষুদ্র কবিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত, এবং রাগি ছোকরারা আলালের ঘরের দুলাল হ'য়ে বিরাজমান। আর আমেরিকার বীট কবিরা? তাঁরা তো আজ ড্রয়িংরুমের অলংকার,

মিলিয়ন-কাটতি পত্রিকায় তাঁদের জীবনী আর ছবি বেরোয়, 'Playboy' পত্রিকায় এক হাজার শব্দের যে-কোনো রচনা ছাপিয়ে অ্যালেন গিন্সবার্গ— নিতান্ত যখন অর্থাভাব ঘটে— এক হাজার ডলার উপার্জন করেন, তাঁদের রচনার সংকলন সম্পাদনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; আর সেই পুস্তকে থাকে তাঁদের 'জীবনদর্শনে'র ব্যাখ্যা, ব্যবহৃত পরিভাষার নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জি, তাঁদের বিষয়ে প্রকাশিত আলোচনার সূচি, এমনকি ছাত্রদের জন্য সম্ভবপর প্রশ্নমালা। তাঁরা কে কোথায় থাকেন, সপ্তাহে ক-দিন আহার করেন বা করেন না, তাঁদের দেহে অস্নানজনিত দুর্গন্ধের প্রবাদ কতদূর সত্য—এই সবই আজ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত, বলতে গেলে গবেষণার বিষয়। এই সমাজত্যাগী বাউণ্ডুলেদের ঘিরে পূর্ণতেজে বিজ্ঞাপন জ্বলছে।

'মনে প'ড়ে গেলো এক রূপকথা ঢের আগেকার!' ঢের নয়, রূপকথাও নয়, মাত্র একশো বছর আগেকার সত্য ঘটনা। ঋণে ও ব্যর্থতায় জর্জর, শার্ল বোদলেয়ার পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্যারিসের শস্তা ছেড়ে শস্তাতর হোটেলে। ব্রাসেলসে লণ্ডনে প্রণয়ঘৃণার গোপন যুদ্ধ শেষ ক'রে র‍্যাঁবো আবিসিনিয়ায় উধাও, আর ভেরলেন নিম্নতম বোহেমিয়ায় নিমজ্জিত। রোগে ও দারিদ্র্যে নষ্ট হয়েছে এঁদের দেহ-মন, পরিষ্কার বিছানায় শুতে হ'লে হাসপাতালে যেতে হয়েছে ; বহু মিনতি সত্ত্বেও এক ছত্র প্রশংসা লেখেননি স্যাঁৎ-ব্যোভ ; মা, বোন, স্ত্রী যথোচিতভাবে বিমুখ হয়েছেন। এঁদের দিকে ফিরে তাকায়নি সমাজ, সালঁর অধিকর্ত্রীদের স্নেহদৃষ্টি পড়েনি, এঁদের নাম অনুচ্চারিত থেকে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ; এঁদের রচনা ছাপা হয়নি সহজে, বা ছাপা হ'লেও বিক্রি হয়নি, বা কিছু বিক্রি হ'লেও কখনো পায়নি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠাবানের অনুমোদন : ভিক্তর উগোর বিপুল খ্যাতি ও উপার্জন, গোতিয়ের সম্মত নেতৃপদ— তার তুলনায় কী নগণ্য এঁরা, কী রিক্ত ও ধ্বনিহীন। অথচ এঁরাই, এঁদের স্বোপার্জিত দুঃখের নেপথ্য থেকে, জনতার অজ্ঞাতে, বৃত নির্বাসনদশায়, পাশ্চাত্য কবিতার জন্মান্তরসাধন করলেন। এঁরাই : উগো নন, গোতিয়ে নন, সমালোচক স্যাঁৎ-ব্যোভ নন। কিন্তু এই রকমই তো হওয়া উচিত, এটাই ঠিক সংগত, বিদ্রোহী হ'লে সমাজের প্রত্যাঘাত তো সইতেই হবে ; যে-কবি সত্যি নতুন, তাঁর বিষয়ে সমকালীন সমাজের বৈরিতাকেই আমরা স্বীকৃতি ব'লে ধ'রে নিতে পারি। আজকের দিনে পশ্চিমী সমাজ

প্রত্যাঘাতে পরাঙ্মুখ ব'লেই বিদ্রোহের আর অর্থ নেই সেখানে, তার ধার ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে এমন হয়েছে যে সেটাই এখন কৃতিত্বের রাজপথ। অশীতিপর ফ্রস্টের পরেই আজ আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি সবেমাত্র তিরিশ-পেরোনো অ্যালেন গিন্সবার্গ, আর এই খ্যাতির নির্ভর এক-আধুলি দামের একটি মাত্র চটি কবিতার বই। তিনি কোথাও কবিতা পাঠ করলে ঘরে আর ভিড় ধরে না; লোকেরা এখনই বলাবলি করছে যে 'ওয়েইস্ট ল্যাণ্ডে'র পরে 'হাওল'-এর মতো প্রতিপত্তিশীল কবিতা ইংরেজি ভাষায় আর লেখা হয়নি। মজার ব্যাপার, এবং কিছুটা করুণও: যা-কিছু প্রাতিষ্ঠানিক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে এই বীট কবিরা নিজেরাই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন, তাই তাঁদের বিদ্রোহী আর বলা যায় না; আশঙ্কা জাগে, তাঁদের হৃদয়ের 'অকথ্য আগুন' অবশেষে না ব্রডওয়ের নিয়ন-বাতিতে পর্যবসিত হয়, কিংবা দু-চারটি চকমকি জেলেই নিবে যায়। কেননা কবিদের যা সবচেয়ে বড়ো শত্রু, তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়নও নয়— তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন।

১৯৬১-৬২

চতুর্থ খণ্ড

য়োরোপে ও মিশরে

১

জানলার বাইরে খাল, য়োরোপের হিশেবে নদীর মতোই চওড়া, খালের দুই তীর বাঁধানো, উপর দিয়ে মস্ত পুল ঝুলন্ত, জলে চলেছে ফেরি-বোট, মোটর-বোট অগুনতি ; আর দিনের মধ্যে আট-দশবার, দুই দিকে লম্বা ট্র্যাফিক দাঁড় করিয়ে দিয়ে, পুলের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, কোনো গর্বিত শ্লথগামী জাহাজকে পথ দেবার জন্য। জাহাজ চ'লে যায় সমুদ্র বা বন্দরের দিকে, পুলের দুই দিক ধীরে নেমে এসে মুখে-মুখে আটকে যায় ; গতি ফিরে পায় ট্র্যাম, মোটর, স্কুটারের সারি, কোনো ট্যুরিস্ট-বোঝাই সাধের তরণী ঝকঝকে কাচের দেহ নিয়ে জলে ভাসলো। বাইরে এই সব, আর ভিতরে—অনুপম পরিচ্ছন্নতা, আরামদায়ক মনোমুগ্ধকর আসবাব, বোতাম টিপলে যে-পরিচারিকা এসে দাঁড়ায় সে সুশ্রী, মনোযোগী, সেবায় ও ইংরেজি বলায় পটু, প্রাতরাশের সঙ্গে নানা ছাঁদের ও নানা স্বাদের যে-পরিমাণ রুটি এনে দেয়, তাতে আমাদের মতো দশজনের বুভুক্ষা-নিবারণ সম্ভব। এ-ই কোপেনহেগেন, ক্যোবেনহাভন বা বণিকবন্দর : হোটেল য়ুরোপার জানলা থেকে তার সঙ্গে চেনা ক'রে নিচ্ছি ; দেখছি তার আকাশ কেমন ম্লান, রোদ কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে জলের উপর শুয়ে আছে, গাছপালার সবুজ কেমন সবুজতর, আর ভাবছি কেমন ক'রে, ক্ষুদ্র আয়তন ও স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে, পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের দ্বারা অনেকবার নির্জিত হ'য়েও, এই উপনিবেশহীন আত্মসম্বল দিনেমারদেশ এমন সম্পদের অধিকারী হ'লো। হয়তো অটুট স্বাবলম্বিতাই তার কারণ।

মহানগর নয় কোপেনহেগেন ; যদি না আপনি পুরাতত্ত্বে উৎসাহী হন তাহ'লে প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি একদিনেই দেখে নিতে পারবেন। আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলে চিত্রশালা ; সেখানে অবাক হ'তে হয় রদাঁর সংগ্রহ দেখে ; ফরাশি ইম্প্রেশনিস্টরাও সদলে উপস্থিত ; এডভার্ড মুঙ্ক-এর কয়েকটা মূল ছবি দেখতে পেয়ে আমার বহুকালের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হ'লো। ঋদ্ধ, কিন্তু বিশাল নয় চিত্রশালা, ঘণ্টা তিনেকে তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, আর সেই তিন ঘণ্টায় প্রতীতি জন্মে যে দিনেমারদেশ শিল্পচর্চায় পেছিয়ে নেই। আরো দশ মিনিট দূরে টিভলি পার্ক, সেটা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপারে টাউন-হল, আর তার সংলগ্ন চত্বর ; পায়রা, ফোয়ারা, বাহুবদ্ধ তরুণ-তরুণী রোদ পোহাচ্ছে, গৃহিণীরা সওদা ক'রে ঘরে ফিরছেন, রেলিঙে হেলান দিয়ে আড্ডা জমিয়েছে

ছাত্ররা। এই খোলা চত্বর, যাকে প্যারিসে বলে প্লাস, আর রোমে পিয়াৎসা, আর ঐ দুই নগরে যার সবচেয়ে গরীয়ান রূপ দ্রষ্টব্য, তা য়োরোপের একটি নিখিলনাগরিক সামান্য লক্ষণ, আর তার দ্বারা প্রতি দেশের নগরলক্ষ্মী যে কী-পরিমাণে শ্রীমতী হয়েছেন তা কলকাতায় ব'সে কল্পনা করা অসম্ভব। তা নেই শুধু ইংলণ্ডে, অতএব তা কলকাতায় বা বম্বাইতেও নেই, যদিও আমাদের এই উষ্ণমণ্ডলে তার উপযোগিতা স্বতঃসিদ্ধ। কোপেনহেগেনের কেন্দ্র এই নগর-চত্বর, এর এক প্রান্তে দোকানপাটের ভিড়, আশে-পাশে গির্জে অথবা অট্টালিকার মিনার উঠেছে আকাশের দিকে; আর এর গা ঘেঁষে যে-রাজপথটি সোজা চ'লে গেছে তার নাম এইচ. সি. আণ্ডেরসেন বুলভার। আমাদের হোটেলও এই রাস্তারই উপর।

'কুচ্ছিৎ পাতিহাঁস', 'ছোট্ট জলকন্যা', 'নাইটিঙ্গেল', 'রাজার নতুন পোশাক'— এই সব অমর কাহিনী যাঁর রচনা, তাঁর স্বাদেশিক নাম 'এইচ. সি. আণ্ডের-সেন' ; কিন্তু, কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে, ইংরেজ বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখতে হ'লে তিনি 'হান্স ক্রিশ্চান আণ্ডেরসেন' ভিন্ন অন্য কোনো স্বাক্ষর করতেন না। ফলত, ইংরেজিভাষী জগতে (আর দৈবাৎ আমরাও তার অন্তর্ভূত হ'য়ে গেছি) তাঁর নাম দাঁড়িয়ে গেছে হান্স ক্রিশ্চান, বা সংক্ষেপে হান্স আণ্ডেরসেন। যদি কেউ জিগেস করেন, কোন দু-জন সাহিত্যিকের নাম নিখিলভুবনে সর্বসাধারণের সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তাহ'লে শেক্সপীয়রের পরেই এই নামটি উচ্চারণ করতে হবে আমাদের ; আর যদি লোকপ্রিয়তাকে নিরিখ ব'লে মানতে হয়, তাহ'লে এমনকি এঁরই স্থান প্রথম হবে হয়তো। কেননা আণ্ডেরসেনের মৃত্যুর পরে এখনো পুরোপুরি একশো বছরও কাটেনি, অথচ এরই মধ্যে সকলেই মেনে নিয়েছে যে তাঁর রচনা সর্বজাতির সামান্য সম্পদ। অসংখ্য অনুবাদ, অসংখ্য সংস্করণ, নানা দেশের শিল্পীর হাতে চিত্রণ প্রায় অন্তহীন, পাঠকসংখ্যা অনবরত বিবর্ধমান— আর তা শুধু য়োরোপীয় প্রবল ভাষাগুলোতেই নয়, এমন সব প্রাচ্য ভাষাতেও যাতে অনুবাদের সুযোগ এখনো সংকীর্ণ। বাংলাতেই, ধরা যাক না, শেক্সপীয়র আজ পর্যন্ত অনুবাদসাপেক্ষ, তাঁর প্রতিভা বিষয়ে ধারণা পেতে হ'লে বাঙালিকে ইংরেজি (বা জর্মান) ভাষায় ব্যুৎপন্ন হ'তে হবে ; কিন্তু আমাদের পক্ষেও আণ্ডেরসেন আজ ঘরের মানুষ।

সব দেবতার দোহাই দিয়ে বলছি, কোনো পাঠক যেন আণ্ডেরসেন ভাবতে

হলিউডের চলচ্চিত্রটি মনে না আনেন। সেখানে যাঁকে দেখানো হয়েছিলো, তিনি নন এক অসুখী, অকৃতী, উচ্চাভিলাষী, আত্মসচেতন ভাষাশিল্পী, তিনি শতকরা একশো পরিমাণে ড্যানি কে— আণ্ডেরসেন যা-কিছু ছিলেন না, তিনি তা-ই। গরিবের ছেলে, বাবার জীবিকা পাদুকানির্মাণ, মা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাপড় কাচেন ; যেমন সাধারণ তার 'হান্স' নাম, তেমনি সাধারণের চেয়েও খারাপ তার চেহারা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ না-হ'তেই লড়াই-ফেরতা বাপের মৃত্যু হ'লো। মা আবার বিয়ে করলেন ; মা ঠাকুমা দু-জনেই বললেন এবার তাকে কোনো-একটা হাতের কাজ শিখে নিতে— তার অবস্থার হিশেবে সেটাই সুপরামর্শ ছিলো তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু হান্স সে-কথায় কান দিলে না ; স্নেহের বন্ধন, জন্মস্থান ওডেন্সে-র চেনা বাতাস— সব ছেড়ে চোদ্দ বছর বয়সে চ'লে এলো কোপেনহেগেনে। সেখানে আত্মীয়ের আশ্রয় নেই, কিন্তু রয়্যাল থিয়েটার আছে ; জীবিকা সেখানে অনিশ্চিত, কিন্তু সম্ভাবনা বিশাল। তার মনে এক অদ্ভুত অসুখ, এক অবিশ্বাস্য আশা— সে 'বড়ো' হবে, সে বিখ্যাত হবে। পুতুল নিয়ে নাটক-নাটক খেলা করেছে ছেলেবেলায়, গলা ছেড়ে গান গেয়েছে নদীর ধারে একলা দাঁড়িয়ে, একবার 'হ্যামলেটে'র অভিনয় দেখে চমকে গিয়েছিলো। অনেক চেষ্টায় চাকরি হ'লো রাজধানীর থিয়েটারে, কিন্তু টিঁকলো না। অশোভন চেহারা, শিক্ষার অভাবে উচ্চারণ দুষ্ট ;— কেমন ক'রে সে অভিনেতা হবে? কিন্তু কোথাও কোনো একটা স্ফুলিঙ্গ ছিলো ঐ 'ঢ্যাঙা আর অদ্ভুত' ছেলেটার মধ্যে ; থিয়েটারের কর্তাদের মধ্যেই একজনের তা চোখে পড়লো ; তিনি তাকে নতুন ক'রে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন। 'একটু লেখাপড়া শেখো, নয়তো কিছুই হবে না তোমার।' নিচু ক্লাশ, সহপাঠীরা বয়সে অনেক ছোটো, পড়ায় মন বসলো না, কিংবা হয়তো বোকা-সোকাই ছিলো ছেলেটা— স্কুলের পরীক্ষা পাশ করতে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো। এ-রকম ছেলে বই লিখে নাম করতে পারবে, এটাকে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে স্বাভাবিক বলে না, কিন্তু যা অসাধারণ, এমনকি যা অস্বাভাবিক, সেই প্রতিভা বস্তুটিও কালেভদ্রে দেখা দেয় বইকি, আর তা কখন কার মধ্যে কী-ভাবে দেখা দেবে তা কোনো পণ্ডিত গণনা ক'রে বলতে পারেন না। কেননা এর পর থেকেই ছাপার অক্ষরে বেরোতে লাগলো এইচ. সি. আণ্ডেরসেনের লেখা : প্রথমে কবিতা, তারপর হাসির গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কিছু

পাঠকও জুটলো না তা নয়। হান্সের বয়স যখন তিরিশ তখন বেরোলো ছোট্ট একটি চটি বই— 'ছোটোদের জন্য গল্প', তাতে গল্পের সংখ্যা মাত্র চার, কিন্তু তারপর থেকে প্রত্যেক বছর একটি ক'রে 'রূপকথা'র বই বেরোতে লাগলো।

মৃত্যুর আগে আণ্ডেরসেন কি জেনেছিলেন যে তাঁর সেই গেঁয়ো পুকুরপাড়ের কুচ্ছিৎ, নিষ্কর্মা, বাসন-মাজা-ঝিয়ের লাথি-খাওয়া হাঁসের বাচ্চা— গল্পে নয়, বাস্তব জীবনেও দিগন্তজয়ী মরালে রূপান্তরিত হয়েছে? কিন্তু গল্প আর জীবন কি পৃথক? কল্পনা ও বাস্তব কি অনাত্মীয়? তাঁরই আত্মজীবনীর চিত্ররূপ তো ঐ কাহিনী, অনাগতের স্বজ্ঞাপ্রসূত উচ্চারণ। এবং কল্পনার তাপে তাঁর অন্তরে যা প্রতিভাত হয়েছিলো, তাকে উত্তরজীবনে বহির্জগতেও তিনি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য ভাষায় অনুবাদক্রিয়া তাঁর আয়ুষ্কালেই আরম্ভ হ'লো, অনুরাগী বন্ধু পেলেন চার্লস ডিকেন্সকে, জর্মানির রাজন্যেরা তাঁকে অতিথেয়তা দিলেন, স্বদেশের রাজা করলেন সম্মানিত; তাঁর সংবর্ধনার জন্য দীপালোকিত ওডেন্‌সে শহরে মশালবাহী শোভাযাত্রা বেরোলো। কিন্তু এই অভিনন্দিত পুরুষটিকে তাঁর রচনার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই না। যে-মানুষ তিন-তিনবার প্রেমে প'ড়ে ব্যর্থ হলেন, দেশে-বিদেশে পশ্চাদ্ধাবন ক'রেও সুইডিশ গায়িকা জেনি লিণ্ড-এর মন যিনি টলাতে পারলেন না, ছাতা আর লাঠি সম্বল ক'রে বার-বার সারা য়োরোপ ভ্রমণ করলেন যিনি, জীবন ভ'রে কে জানে কী খুঁজে বেড়ালেন, আর, অবশেষে— নিঃসঙ্গ, অনিকেত, স্ত্রীপুত্রহীন, নিজের সার্থকতা বিষয়ে সব সত্ত্বেও অনিশ্চিত— এক বৎসল বন্ধুর গৃহে যাঁর মৃত্যু হ'লো, ঘুরে-ফিরে সেই মানুষেরই সঙ্গেই বার-বার দেখা হয় আমাদের, আমরা যখন তাঁর কাহিনীপর্যায় পড়ি অথবা স্মরণ করি। ভ্রান্তি থেকে প্রতিভাবানেরও মুক্তি নেই; যে-সব উপন্যাস ও নাটকের উপর আণ্ডেরসেন বেশ বড়ো মাপের ভরসা রেখেছিলেন, আর যাদের আপেক্ষিক অনাদর তাঁকে কষ্ট দিয়েছিলো, আজ সেগুলো শুধু তাঁরই নামাঙ্কিত ব'লে ঔৎসুক্য জাগায়; আর যে-সব তথাকথিত রূপকথা তিনি লিখেছিলেন কিছুটা খেলাচ্ছলে, কিছুটা হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, তাঁর মৃত্যুর আগেই জগৎ বুঝে নিয়েছিলো যে সেগুলোই তাঁর অমরতার ভিত্তি।

দিনেমার সমালোচকদের একটি ক্লান্তিহীন অভিযোগ এই যে আণ্ডের-সেনের অনুবাদকেরা তাঁকে পরিণত করেছেন নেহাৎই একজন শিশুপাঠ্য

লেখকে, কিংবা এক লোক-কথার সংকলনকর্তায়। এই অভিযোগে কিছুটা সত্য নেই তা নয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য হ'লে আমরা কি তাঁর গুণগ্রাহীদের তালিকায় ডিকেন্স অথবা হুইটম্যানের নাম খুঁজে পেতাম, না কি অস্কার ওয়াইল্ড তাঁরই অনুকরণে রচনা করতেন ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কাহিনী? আসল কথা, যেমন 'সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি,' তেমনি পাঠকদের মধ্যেও শুধু 'কেউ-কেউ' এমন থাকে যারা চিনতে পারে প্রতিভার বিকিরণ, বুঝে নিতে পারে কবির সংকেত ও গূঢ় অভিপ্রায়; আর তাঁরা, কোনো কালে বা কোনো দেশেই, এই দিনেমার কবির ছদ্মবেশ দ্বারা প্রতারিত হননি। আজকের দিনে এ-কথা বোধহয় না-বললেও চলে যে আণ্ডেরসনের গল্প 'ছোটোদের জন্য' লেখা হয়নি, এবং তা 'রূপকথা'ও নয়। খাঁটি রূপকথা হ'লো মৌখিক লোকসাহিত্য, তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ ক'রে অনেক লেখক বিখ্যাত হয়েছেন; কিন্তু আণ্ডেরসেন লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক বা সম্পাদক ছিলেন না; জর্মানির গ্রিম্‌ভ্রাতাদের দিনেমারি প্রকরণ তিনি নন। তাঁর কাহিনী-সঞ্চয়নের মধ্যে তিনটি— মাত্রই তিনটি গল্প বাদ দিয়ে, সবই তাঁর আপন উদ্ভাবন, তাঁর প্রাতিস্বিক কল্পনার সৃষ্টি। আর-এক লক্ষণ: খাঁটি রূপকথা কখনো শোকান্তিক হয় না, কিন্তু আণ্ডেরসেনের দেশলাইওয়ালি উত্তরদেশের পাখিদের মতোই শীতে ম'রে যায়, জলকন্যা শোণিতের মূল্যেও পায় না তার প্রিয়তমকে, নিজেরই দেহচ্যুত ছায়ার চক্রান্তে বিদেশী পণ্ডিতের প্রাণদণ্ড ঘটে। আমরা তাই অবাক হই না যখন শুনি যে, প্রথম প্রকাশের পর এই 'রূপকথা'গুলিতে স্বদেশীয় সমালোচকেরা আবিষ্কার করেছিলেন অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও ধর্মদ্রোহ। মৌলিকতার সামনে এই হ'লো প্রথম সনাতন প্রতিক্রিয়া, তাই অবাক হই না। শুধু বিস্ময় জাগে এই কথা ভেবে যে যদিও এমন কোনো জাতি নেই যার আবহমান লৌকিক রূপকথা না আছে, পৃথিবীতে এমন লেখক একজনের বেশি জন্মালেন না যিনি পারলেন নতুন রূপকথা সৃষ্টি করতে, তার প্রাচীন প্রচ্ছদে সঞ্চারিত করলেন আধুনিক আত্মার দ্বন্দ্ববেদনা। আর জন্মালেন সেই দেশেই, বাসা বাঁধলেন সেই নগরেই, বেঁচে থাকলেন সেই কালেই— যে-কাল, যে-দেশ ও যে-নগর আধুনিক অস্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠাভূমি। জগতের কাছে দিনেমার দেশের এই দু-জনই আজ প্রতিভূ: কীর্কেগড় ও হান্স আণ্ডেরসেন, কিন্তু যেহেতু আমার রক্তে সেই চিন্তাই সহজে মেশে, যার

প্রকাশের বাহন চিত্রকল্প, তাই কোপেনহেগেনে পা দেয়ামাত্র আমার আণ্ডেরসেনকেই প্রথম মনে পড়লো।

আর সত্যিও, এই নগর যেন আণ্ডেরসেনের ভাবনারই প্রতিচ্ছবি— মানে, রূপ ও শৈলীর দিক থেকে তা-ই। যেমন সবই ধরা দিয়েছে তাঁর কাহিনীতে— পরিণত ও সচেতন মানুষের প্রেম ও অপ্রেম, তার আশা, চেষ্টা, বাসনা ও বাসনাজনিত যন্ত্রণা, কিন্তু ধরা দিয়েছে মৃদু হ'য়ে, মধুর হ'য়ে, একটি কোমল সকৌতুক আচ্ছাদনের মধ্যে সব বয়সের ও সব জাতির পাঠকের পক্ষে সহনীয় হ'য়ে, তেমনি কোপেনহেগেনে সবই যেন ছোটো মাপের, কোনো-কিছুরই খুব উঁচুতে তার বাঁধা হয়নি; অত্যন্ত বৃহৎ নয় কোনো অট্টালিকা, সরণি বা উদ্যান; প্রমোদ নয় তীব্র; ট্র্যাফিক নয় অশেষ ও উতরোল। সব স্নিগ্ধ, আকাশের আলো যেন কুয়াশায় ভেজা, ঋতু করুণাশীল। ব্যবহার ও বিলাসের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট নয় এখানে, অবকাশ ও কর্ম যেন সহবাসী। বিকেলবেলা বন্দরের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি সেটা বন্দর না উদ্যান তা বোঝা যায় না; সমুদ্র ঘিরে আছে গোল হ'য়ে তটরেখাকে, ছোটো, শান্ত, অপরিসর সমুদ্র; জলে জাহাজ, মাটিতে আলো-ছায়া-মাখা বেঞ্চি, ঘাস ঘন ও তরুপল্লব প্রচুর, জলে একটি শিলার উপরে ব'সে আছেন আণ্ডেরসেনের জলকন্যা। শিল্পকর্ম হিশেবে তেমন বিশিষ্ট নয় এই মূর্তি, কিন্তু যেখানে এবং যে-ভাবে তা বসানো আছে, তারই জন্য এটি দ্রষ্টব্য ও স্মরণীয়। খোলা হাওয়ায় শ্যাওলার মতো সবুজ হ'য়ে গেছে তার বর্ণ, যেন জলজ লতাগুল্মে জড়িত হ'য়ে এইমাত্র সমুদ্র থেকে উঠে এলো। তরুণ তার যৌবন, দেহটি ক্ষীণ, পিঠে লুটিয়ে আছে বেণী, বসেছে ভারতীয় গায়িকাদের ধরনে হাঁটু মুড়ে, তার জঙ্ঘা শেষ হয়েছে চরণে নয়, পুচ্ছে; তার দৃষ্টি দূরের দিকে নিবদ্ধ। দেখে মনে পড়ে সেই মুহূর্তটি যখন দূর থেকে নাচিয়ে রাজপুত্রকে দেখে-দেখে নারীর কামনায় প্রহত হ'লো এই মৎস্য-কুমারী; মৃত্যুর মূল্যেও প্রার্থনা করলো সে চরণ, মানবিক প্রেম ও আত্মার জন্য তৃষিত হ'লো।

বন্ধুর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে, আমরা মোটর-বোটে শহরে ফিরলাম। বোঝা গেলো, আমস্টার্ডামের মতো বৃত্তাকারে না হোক, কোপেনহেগেনও জলবেষ্টিত শহর। খালের দুই দিকে সৌধশ্রেণী, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো সাঁকো, মোড়ে-মোড়ে তরণীর ভিড়, নাবিক আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছে কোনটা পার্লামেন্ট, কোনটা বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। লম্বা নর্ডিক চেহারার পুরুষ, চোখ তীক্ষ্ণ ও

নীল, গায়ের রং রোদে জলে গাঢ় হ'য়ে গেছে। আমাদের জিগেস করলে আমরা বম্বাই থেকে আসছি কিনা ; উত্তরে কলকাতার নাম শুনে তার চোখে খুশির ঝিলিক লাগলো। 'Fine city— আমি অনেকবার গিয়েছি সেখানে, একটা রেস্তোরাঁয় খুব যেতাম— সেটা কি আছে এখনো ?— নামটা ঠিক মনে পড়ছে না— হ্যাঁ, ব্রিস্টল! আছে এখনো ?'

খালের ধারে-ধারে কয়েকটা নামজাদা পুরোনো রেস্তোরাঁ ; মাছের রান্না এগুলোর বৈশিষ্ট্য। তারই একটাতে সান্ধ্যভোজ সমাধা করা গেলো। স্ক্যাণ্ডিনেভীয়রা— উত্তর য়োরোপে শুধু তারাই— রন্ধনপটু ও ভোজনবিলাসী ; এদের 'স্মরগাসবড়' ভোজনে পঞ্চাশ রকম মাছ মাংস শাকসব্জি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য টেবিলে থরে-থরে সাজানো থাকে, আপনি যেটা ইচ্ছে যতটা ইচ্ছে তুলে নিতে পারেন ; ভেবে দেখুন ঔদরিকের কী-অপূর্ব সুযোগ, আর যাদের ক্ষুধা ক্ষুদ্র হ'লেও দৃষ্টি বড়ো, তাদেরও চোখ ও মনের পক্ষে কী-রকম তৃপ্তির সম্ভাবনা। বেঁচে থাকার জন্যই আহার, এই শীর্ণ নীতিতে আমার মন সায় দেয় না ; আহার্য বিষয়ে বিকল্পের বাহুল্য আমার মনে হয় সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং এই ব্যাপারে চীনেদের মতো সিদ্ধিলাভ যদিও অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে ঘটেনি, তবু দিনেমারদেশ অন্ততপক্ষে প্রতিযোগীর তালিকায় নাম লেখাতে পারে, কেননা এরা উদ্ভাবন করেছে একশো পঁচাত্তর রকম স্যাণ্ডুইচ, আর কত রকম পনির ও পেস্ট্রি, তা কেউ গুনে বলতে পারে না। এই বৈচিত্র্যের আসল অর্থ— ঔদরিকতা নয়— ব্যক্তিগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রুচিবৈষম্যের স্বীকৃতি ও তার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা ; আর সভ্য জগতে এই চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। আমাদের 'শুক্তো থেকে পায়েস পর্যন্ত' বাঙালি ভোজেও এই ঔদার্য ছিলো না তা নয় ; কিন্তু মানতেই হবে আমাদের রান্নায় সম্প্রতি একটিও নতুন উদ্ভাবন হয়নি, আর পুরোনো অনেক সূক্ষ্ম জিনিশ লুপ্ত হ'য়ে গেছে বা যাচ্ছে ; তার কারণ, মেয়েরা আজকাল সম্ভব হ'লেই— এবং সংগত কারণে— রান্নাঘর পরিহার করছেন, অথচ পেশাদার, বিশেষজ্ঞ, উদ্ভাবননিপুণ ও সম্মানিত পুরুষের হাতেও আমাদের রন্ধনশিল্প এখনো ন্যস্ত হয়নি।

* * *

ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলছে, হিয়ালমার সেই ছবির মধ্যে ঢুকে গেলো। খোলা মাঠ, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে ঝ'রে পড়েছে রোদ্দুর, ঐ দেখা যাচ্ছে

জল। দৌড়ে চ'লে এলো হিয়ালমার সেই জলের ধারে, লাফিয়ে উঠলো ছোট্ট নৌকোটিতে। লাল আর শাদায় রঙিন সেই নৌকো, পালগুলো ঝলমলে; তাকে টেনে নিয়ে চললো ছয়টি সুন্দর রাজহাঁস, তাদের মাথায় একটি ক'রে নীল তারা জ্বলছে, গলায় দুলছে সোনার মুকুটের ঝালর। দুই দিকে সবুজ বন, ফুলেরা বলছে পরিদের গল্প, গাছেদের গল্প ডাকাত আর ডাইনিবুড়ির; জলে সাঁৎরে বেড়াচ্ছে সোনালি মাছ, রুপোলি মাছ; পাখিরা সার বেঁধে উড়ছে দুই দিকে, লাল পাখি, নীল পাখি, অনেক পাখি; পোকার দলও নেচে-নেচে সঙ্গে চলেছে, তাদেরও আছে গল্প, তারাও চায় গল্প শোনাতে। কখনো বন আঁধার হ'য়ে আসে, কিছু দেখা যায় না; আবার কখনো রোদ, ফুল, সুন্দর বাগান; কাচে আর পাথরে তৈরি প্রাসাদ কখনো দেখা যায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন রাজকন্যারা, রাজার ছেলেরা পাহারা দিচ্ছেন সোনার তলোয়ার হাতে নিয়ে— তাঁরা ছুঁড়ে দিচ্ছেন হিয়ালমারকে টফি, টিনের সেপাই, মিষ্টি কেক; আবার অরণ্য আসে কালো হ'য়ে, মস্ত শহর পার হ'য়ে এলো, অবশেষে তার দাই-মার বাড়ি, যে তাকে ছেলেবেলায় দোল দিয়ে-দিয়ে ঘুম পাড়াতো।...

এ-ই হচ্ছে আণ্ডেরসেনের মায়াপরশ, যাকে বলা যায় তাঁর জাদুবিদ্যা, এই যে তাঁর কাহিনীতে জড় হ'য়ে ওঠে চেতন, ইচ্ছাশক্তি থেকে পেন্সিল কিংবা মটরশুঁটিও বঞ্চিত হয় না, এই যে পটে-আঁকা দৃশ্য চঞ্চল হ'য়ে উঠে শিশুর স্বপ্নে শিশু-স্বর্গের অবিকল উদ্ভাস এনে দেয়। আর যেন এই কল্পনাই পুঁথির পাতা ছেড়ে, আমাদের চোখের সামনে জাজ্বল্যমান দৃশ্য হ'য়ে উঠেছে— রাত্রে টিভলি পার্কে এসে তা-ই মনে হ'লো আমার। দিনের বেলায় এই উদ্যান যা, তার জুড়ি অনেক দেশে অনেক আছে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে এর রূপান্তর দেখে বিদেশীকে বিস্মিত হ'তে হয়। আলো, সারি-সারি আলো, স্তরে-স্তরে পরতে-পরতে সাজানো, বিচিত্র তার বর্ণ ও বিন্যাস, শুধু আলো দিয়ে আঁকা হ'য়ে আছে এক-একটি প্রমোদভবনের পরিলেখ, দেয়াল আর ছাদ প্রায় চোখেই পড়ে না। ছেলেবেলায়, আমার ছোটো শহরে, আমার অজ্ঞান শৈশবের চোখে, দেয়ালির রাত্রিটি যেমন প্রায় অলৌকিক লাগতো, যেমন মনে হ'তো মানুষের দীপ আকাশ পর্যন্ত জ্বলছে, এর প্রথম অভিঘাত কিছুটা যেন সেই রকম। অথচ এটি বিশেষ কোনো উৎসব নয়, এদের প্রাত্যহিক আয়োজন, সর্বসাধারণের অবকাশরঞ্জনের ব্যবস্থা। লোকেরা

আসছে, যাচ্ছে, বসছে, দাঁড়িয়ে থাকছে, তাদের এই স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের পথে-পথে আকর্ষণও কিছু কম ছড়িয়ে নেই। আছে ফোয়ারা, কুঞ্জ, জলাশয়, জলের উপর নানা রঙের আলোর খেলা, জলের ধারে-ধারে ছোটো-বড়ো শস্তা-দামি নানান ধরনের পানশালা ও রেস্তোরাঁ, আছে পুতুল-নাচ, কৌতুক-অভিনয়, গীতবাদ্য ; আছে নৌকো, নাগরদোলা, মোটর-দৌড়, আরো যে কত রকমের ক্রীড়া ও আমোদের আমন্ত্রণ, আমাদের পক্ষে অল্প সময়ে তার দিশে পাওয়াই দুঃসাধ্য হ'লো। কোনো আমোদই উগ্র নয়, নয় প্যারিসের মতো ফেনোচ্ছল বা লণ্ডনের মতো বিবেকপীড়িত ; কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্ভাবনে নিপুণ, প্রসাধনে পরিচ্ছন্ন, ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিহীন। আমরা একটা যন্ত্রচালিত নৌকোতে চ'ড়ে বসলুম, সেটা চললো এঁকে-বেঁকে পাতালের পথে, গুহা কোথাও অন্ধকার, কোথাও বা নীলচে আলো চুঁইয়ে পড়ছে, জলে ভাসছে প্রকাণ্ড বড়ো-বড়ো শালুকপাতা, ফুটেছে লাল রঙের ফুল, কাচের মতো গা নিয়ে মস্ত বড়ো ফড়িং ব'সে আছে, বিকট সাপ হাঁ ক'রে আছে ওখানে, এবার বুঝি ঠোক্কর খেয়ে নৌকো উল্টেই গেলো ;— কিন্তু ভয় নেই, এই আমরা বেরিয়ে এসেছি, খেলা শেষ হ'লো। আর-এক জায়গায় মোটরগাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে, কিংবা তাকে তাড়া করেছে নেকড়ে বাঘ, সে-বিপদ যদি বা উদ্ধার হ'লো সামনে দেখা গেলো দাউ-দাউ আগুন, আবার তার-পরেই বনের মধ্যে পাখির কাকলি শোনা গেলো— এমনি কিছুক্ষণের উত্তেজনার পরে আমরা হিয়ালমারের মতোই স্বপ্ন থেকে বাস্তবে জেগে উঠি। সব মিলিয়ে একটু ছেলেমানুষি তা বলতেই হবে (কেননা সাহিত্যকে যা মূল্য দেয় সেই ইঙ্গিতের কোনো স্থান নেই এখানে, যা চোখে দেখা যাচ্ছে এটা শুধু সেটুকুই), কিন্তু ছেলেমানুষিটা ভারি উজ্জ্বল ও মনোহর ; দীপমালার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন এই প্রমোদস্থল বিকশিত হ'লো এক বিশাল ক্রিসমাস-তরুতে, যেন সুখে ও আশ্বাসে ঝলমল করছে তার সর্বাঙ্গ, ডালে-ডালে ঝুলে আছে উপহার ; সেই উৎসবদীপ্ত তরুর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে উত্তরের শীতের রাত্রে শিশুদের চোখ যখন ঘুমে ঢুলে আসে, ঠিক সেই পলাতক, অস্পষ্ট ও স্বপ্নগর্ভ মুহূর্তটিকে যেন দীর্ঘায়িত ক'রে তোলা হয়েছে এই আলো, বর্ণ, ছায়া ও প্রতিচ্ছায়ার সমন্বয়ে।

*   *   *

পথ তেলের মতো মসৃণ, দুই দিকে বড়ো-বড়ো গাছের সারি মাথার উপরে তুলে দিয়েছে তোরণ, কাচের বাইরে অরণ্য স'রে-স'রে যাচ্ছে। যত সবুজ কল্পনা করা যায় তত সবুজ, যত স্নিগ্ধ কল্পনা করা যায় তত স্নিগ্ধ, সবুজ আভা, সবুজের ছায়া, কিংবা যেন এক স্বচ্ছ, সবুজ অন্ধকার ছড়ানো। বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছি অনেকক্ষণ হ'লো। রেডিওর বক্তৃতা, এক সাহিত্যিকের বাড়িতে আধ ঘণ্টা, 'মৃগ-কাননে' উনিশ-শতকী ঘোড়ায় টানা ল্যাণ্ডোতে ভ্রমণ, লুইসিয়ানাতে সমুদ্র দেখতে-দেখতে চা। এক ধনী তাঁর পল্লীভবন শিল্পচর্চার জন্য দান ক'রে গেছেন, তারই নাম লুইসিয়ানা। সামনে বাঁকারেখা সমুদ্র, চারদিকে ব্যাপ্ত উদ্যান, উদ্যানে নানা দেশের বিরল গাছ, কাঠ, কাচ আর ইটের তৈরি বাড়িটিতে দিনেমার শিল্পের ক্রমবিকাশ উৎকলিত। এবং, বলা হয়তো বাহুল্য, বাড়িটি নিজেই একটি শিল্পকর্ম। এর আগে আমেরিকায় দেখেছিলুম লয়েড রাইটের দু-একটি স্থাপত্যের নমুনা: প্রকাণ্ড এক পাখি যেন এইমাত্র পাখা মেলে উড়ে যাবে, উইস্কনসিনে এমনি চেহারার গির্জে, ক্যালিফর্নিয়ার যে-স্থলটিকে 'প্যাসিফিক বাঁক' বলে, ঠিক সেই মোড়ে, মহা-সমুদ্রের মুখোমুখি, কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক নিরাভরণ উপাসনা-ভবন। সে-সব কাজ দূর থেকে চোখে পড়ামাত্র চোখ বিস্মিত হয়, কিন্তু লুইসিয়ানা বাইরে থেকে ধারণা দেয় যেন সে নিতান্ত সাধারণ, আর ভিতর থেকে ধীরে-ধীরে মনের উপর পাপড়ি মেলে ধরে। প্রথমে মনে হয় যেন যেখানে-সেখানে যা খুশি তা-ই ফেলে রেখেছে, কিন্তু তার বিন্যাসের প্রতিভা বেশিক্ষণ গোপন থাকে না; আমরা বুঝতে পারি দিনেমারি গৃহসজ্জার এত খ্যাতি কেন, আর কী হিশেবে তা বিশেষভাবে বিশ-শতকের প্রতিভূ। আধুনিক শিল্পীরা যেমন জগৎটাকে ভেঙে দিয়ে, তারপর— সাদৃশ্যের দ্বারা নয় — শুধু ছন্দের দ্বারা তাকে বেঁধে রেখেছেন, তেমনি এখানেও কোথাও কোনো প্রতিসাম্য নেই, কোনো-একটা জিনিশ অন্য কোনোটার সঙ্গে মেলে না, আলাদা ক'রে দেখলে প্রতিটি বস্তু যেন খাপছাড়া ও একলা— অথচ সব মিলিয়ে যে-প্রভাব পাচ্ছি সেটা সংহতির, সেটা এক বিনয়ী কিন্তু নির্ভুল সামঞ্জস্যের। ঘর যেন দৌড়ে যাচ্ছে বারান্দাকে ধরতে, বারান্দা ঝুঁকে পড়েছে চাতালে, চাতাল ছাড়িয়ে গেলো উদ্যানে, উদ্যান বাইরের ভূদৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্য হ'লো, আর ভূদৃশ্য ধীরে-ধীরে গ'লে গেলো সমুদ্রে, আর উপরের আকাশে আর

ওপারের দিগন্তরেখায়। তেমনি, দেয়াল আর দেয়ালের ছবি, জানলা আর জানলার বাইরে পুকুর ও গাছপালা, মেঝে আর মেঝেতে রাখা চেয়ার অথবা ভাস্কর্যকর্ম, এগুলো যেন পরস্পরকে অবলম্বন ক'রেই স্থিরতা পেয়েছে ; যেমন শাগালের ছবিতে গির্জে চাঁদ মানুষ মাটি সব-কিছু টলমল করছে অথচ কিছুই প'ড়ে যাচ্ছে না, ভাবখানা কিছুটা সেই রকম। ঘরের সঙ্গে বাইরের ভেদ স্পষ্ট নয়, শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির ভেদও দমিত, কিংবা প্রকৃতিকেই শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে ; কোথায় মানুষের তৈরি উদ্যান শেষ হ'য়ে স্বাভাবিক নিসর্গ আরম্ভ হয়েছে তা ঠাহর করা যায় না, যা-কিছু শিল্পিত তারও চেহারা আকাঁড়া ও আপাতদৃষ্টিতে অর্ধসমাপ্ত ;— অর্থাৎ, যা-কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে, দেয়াল মেঝে ছবি মূর্তি আসবাব থেকে আরম্ভ ক'রে গাছপালা জল আকাশ দিগন্ত পর্যন্ত— সব মিলিয়ে একটাই ঘটনা যেন, এক চতুর ও গোপন শিল্পে সব-কিছুকে একই পরিকল্পনার অন্তর্ভূ্ত করা হয়েছে।

একদিকে সারি-সারি বাড়ি— উদ্ধত নয়, কিন্তু মনোরম ও মূল্যবান, আর-একদিকে সমুদ্র, কোপেনহেগেন শহর থেকে বেরোবার পর এমনি কিছুক্ষণ পথ চলেছিলো আমাদের। লুইসিয়ানার পর থেকে অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু যাকে অরণ্য বলছি তা যে এদের 'মৃগ-কাননে'র মতোই উদ্যান নয় তা কেমন ক'রে বলবো ? এরা তো কিছুই স্বাধীন প্রকৃতির হাতে ফেলে রাখেনি, মানুষের বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে সর্বত্রই প্রয়োগ করেছে— বলতে গেলে পুরো দেশটাকেই ক'রে তুলেছে এক সাজানো বাগান। শুধু ডেনমার্ক নয়, মোটের উপর সমগ্র প্রতীচী বিষয়ে, আর জাপান বিষয়েও, এ-কথা সত্য ; সবখানেই দেখেছি, মানুষের হাতের পরিচর্যার ফলে প্রকৃতি কেমন নম্র ও স্থমিত হ'য়ে বিরাজ করছে। দৃশ্য যেখানেই নয়নমোহন— তা শহর থেকে যত দূরেই হোক না, হোক না যাকে বলে একেবারে 'প্রকৃতির মাতৃক্রোড়ে'— সেখানেই হোটেল আছে, রেস্তোরাঁ আছে, আছে সচিত্র কার্ড ও অন্যান্য স্মরণীর দোকান ; পথিক সেখানে ক্লান্তি কাটাতে পারে, রাত হ'য়ে গেলে ঘুমোতে পারে আরামে, পারে দু-আনার একটা ছবি কিনে দেশে কাউকে পাঠিয়ে দিতে। একে 'ব্যাবসাদারি' ব'লে নিন্দে করতে গেলে ভুল হবে, কেননা এটা সেই ধরনের বাণিজ্য, যাতে মানুষ নিজেও লাভবান হয়, এবং অন্যকেও উপকৃত করে। আমরা যারা হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী নই, আমাদের

মানতেই হবে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য তখনই সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, যখন আমরা বিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসারহিত, অতএব দেশে-দেশে সেই স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ভার যারা নিয়েছে তারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আমাদের যাত্রার শেষ লক্ষ্য হেলসিংগর, বা এলসিনোর, আর সেখানে আমরা যাচ্ছি শুধুমাত্র এই কারণে যে শেক্সপীয়র 'হ্যামলেট' নামে একখানা নাটক লিখেছিলেন। দিনেমার ইতিবৃত্তে যে-রাজার নাম হাম্মেট বা হামনেট, তাঁর দুর্গ অবশ্য এলসিনোরে ছিলো না, প্রোফেসরের কাছে পরীক্ষা দিতে হ'লে অতথ্যের জন্য শেক্সপীয়রের নম্বর কাটা যেতো; কিন্তু জগতের লোক এই ভুলটাকেই সত্য ব'লে মেনে নিয়েছে, লোকের মুখে-মুখে এর নাম হ'য়ে গেছে 'হ্যামলেটের প্রাসাদ'। এই দুর্গের নির্মাণক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন শেক্সপীয়রের বয়স ছিলো দশ; সমাপ্তির আঠারো বছর পরে তাঁর 'হ্যামলেট' ছাপা হ'য়ে বেরোলো। যে-রাজা সেটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর নাম আজকের দিনে অল্প লোকেই জানে; এলসিনোর বলতে এক বিবেকপাণ্ডুর, চিন্তামগ্ন, চৈতন্যপীড়িত, আর্তিময় যুবরাজকেই আমাদের মনে পড়ে।

খালে ঘেরা, মস্ত উঁচু লাল রঙের দেয়ালে ঘেরা, অংশত রেনেসাঁস ও অংশত মধ্যযুগধর্মী এই দুর্গ বা প্রাসাদ। এ-ধরনের দুর্গ সাধারণত যা হ'য়ে থাকে— গম্ভীর, কঠিন ও বৃহৎ, এও তা-ই, কিন্তু এডিনবরা দুর্গের মতো ভীষণ ব'লে মনে হ'লো না। খালে টলমল করছে জল, জলে খেলছে রাজহাঁস, গাছগুলো নুয়ে আছে ধারে-ধারে, সরু সবুজ ওলন্দাজি মিনারগুলোতে শাসন খুব সোচ্চার নয়। সিংহদ্বারে শেক্সপীয়রের প্রাচীর-চিত্র ও স্মারকলিপি পেরিয়ে আমরা ভিতরকার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। প্রাসাদটি এখন দিনেমারি নৌবিদ্যা ও বাণিজ্যের জাদুঘর হিশেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই প্রাঙ্গণটি অমর কবির উদ্দেশে উৎসর্গিত। ইংলণ্ড থেকে, য়োরোপের নানা দেশ থেকে, প্রতি বছর এখানে আসেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা, যুবরাজের তৃপ্তিহীন বিলাপ তৃপ্তিহীনভাবে আবৃত্তি করেন— নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে, শ্রোতাদের হৃদয়তন্ত্রীতে নূতনতর মূর্ছনা তুলে। সেই প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে, বন্ধু আমাদের যেখানে নিয়ে এলেন সেটা একটা উঁচু, খোলা, চতুষ্কোণ, রেলিঙে-ঘেরা মণ্ডপ, তার ঠিক তলাতেই সমুদ্র। ঠিক সমুদ্র নয়, নোনা জলের সরু একটা ফালি, যেন উত্তরসাগর আঙুল চালিয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার

মূল দেহ থেকে ডেনমার্ককে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে, আবার ডেনমার্কের মূল দেহ থেকে এই জ়ীল্যাণ্ডকে। কাছেই সুইডেন, তার তটে বাড়িঘর পর্যন্ত দেখা যায়, আর-একদিকে নরোয়ের উপকূল। মণ্ডপে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক সান্ত্রী, কয়েক মিনিট পর-পর দূরবীন তুলে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখছে ; ভাবখানা এই রকম— কোনো শত্রু জাহাজ এগিয়ে আসছে না তো? বলা বাহুল্য, এই সতর্কতা এখন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, এটা একটা অনুষ্ঠানমাত্র, পুরোনো প্রয়োজনীয় প্রথার প্রতীকী উদ্বৃত্ত। কিন্তু এই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে, সমুদ্র আর সান্ত্রীটিকে দেখতে-দেখতে, আমার মন বিস্ময়ে ভ'রে গেলো।

বিস্ময় এইজন্যে যে জায়গাটা যেন অবিকল শেক্সপীয়র থেকে উঠে এসেছে। এটাই সেই 'প্ল্যাটফর্ম', যেখানে উত্তোলিত হ'লো যবনিকা, উন্মোচিত হ'লো অকথ্য ইতিহাস। অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো, কয়েক মিনিটের জন্য আমি যেন 'হ্যামলেটে'র প্রথম দৃশ্যটিকে মনে-মনে প্রত্যক্ষ করলুম ; তাকে বাস্তবের স্পর্শ দিলে বাতাসের বেগ, নির্জনতা, আর ঐ দাঁড়িয়ে-থাকা তরুণ সান্ত্রীটি। বেলা তখন বিকেলের দিকে আনত, আকাশ ঝাপসা, জলের উপর আলো অস্থির। দূরে দিগন্ত ম্লান, সামনে দুর্গের পাষাণময়, রহস্যময় স্তব্ধতা। এখানকার চাইতে আর কোন স্থান প্রেতের আবির্ভাবের পক্ষে অধিক উপযোগী? শুধু এই সমুদ্রের সামীপ্য ও প্রান্তিক অবস্থান নয়— মনে হয় যেন এর নির্জনতা ও রহস্যে মেশানো বিশেষ আবহটি শেক্সপীয়রে ধরা পড়েছে— না কি আমরা 'হ্যামলেট' নাটকের আবাল্যসঞ্চিত স্মৃতিকেই আরোপ করছি বাস্তব এলসিনোরে? শেক্সপীয়র তাঁর 'দৃশ্যে'র বর্ণনা করতেন না— তা অনর্থক হ'তো তাঁর কালের অপরিণত মঞ্চশিল্পে— কিন্তু সংলাপের মধ্য দিয়েই পরিবেশকে এমন জীবন্ত ক'রে তুলতেন যে আজ তাঁকে স্মরণ না-ক'রে ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। এডিনবরা থেকে হাইল্যাণ্ডের দিকে যেতে-যেতে কার না মনে পড়বে ম্যাকবেথকে ; পাহাড়, হ্রদ, জলা, বিস্তীর্ণ অমিত্র চেহারার 'হীথ', গ্রীষ্মের দুপুরেও আলো অস্পষ্ট, আমাদের মনের ডাইনিকে বাইরে দেখতে হ'লে এ-ই তো ঠিক পটভূমিকা। আরো আশ্চর্য : সুদূর নীল-নদী, মিশরের আলো আর আকাশের বিস্তার, ধূমলত্বক্ লাস্যময়ী নারী— এই সব অনুষঙ্গ শেক্সপীয়র আমাদের এমন ক'রে জপিয়েছেন যে কাইরোর অত্যাধুনিক

হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গী ও কৃষ্ণনয়না পরিচারিকাকে দেখামাত্র আমাদের দুর্বারভাবে ক্লিওপ্যাট্রাকেই মনে প'ড়ে যায়। কী আশ্চর্য মানুষ এই শেক্সপীয়র; অতীত ও সমকালীন জগৎটাকে কেমন ক'রে তিনি শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন, ষোলো-শতকের মফস্বলি লণ্ডনে ব'সে-ব'সে, মনে হয় যেন বিনা চেষ্টায়, মনে হয় যেন নিজেরই অজান্তে! তাঁর তল্পি ছিলো মাত্র কয়েকখানা পুঁথি, কিছু ইতিহাস, তার চেয়ে বেশি কিংবদন্তী ও নাবিকদের গালগল্প; অথচ তাঁরই রচনায় জীবন্ত হ'য়ে উঠলো স্কটল্যাণ্ড থেকে মিশর পর্যন্ত পৃথিবী। কিন্তু আসলে এই 'অথচ'টাই ভুল কথা; তাঁর যে আরো বেশি জানবার সুযোগ ছিলো না সেটাই তাঁর সুবিধে ছিলো হয়তো; জানা ও অজানার মধ্যবর্তী এক অস্পষ্টতা তাঁকে ঘিরে ছিলো ব'লেই তাঁর কল্পনা এমন সাবলীল ও বিশ্বস্তর হ'তে পেরেছিলো। আধুনিক কবির বেশি না-জেনে উপায় নেই, সেই বেশিটা তাঁর পক্ষে বড্ড বেশি; অনবরত তাঁকে পরিশ্রম করতে হয় জ্ঞানের বোঝা ফেলে দেবার জন্য, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে হ'তে হয় কবি। এরই জন্য আধুনিক কবিতা এমন ঘন, এমন কুটিল, আর পূর্বের তুলনায় এমন স্বল্পভাষী ও ও অপ্রচুর।

২

পাঁচ মিনিট আগে পৌঁচেছি হোটেল ক্রাস্নাপোলস্কিতে। ঘরে ঢুকেই প্র. ব. শুয়ে পড়েছেন সোফায়, বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্যেই এ-মুহূর্তে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। ক্লান্ত আমিও— আমাদের সাম্প্রতিক অবস্থায় শরীরের ক্লান্তি অনিবার্য। সেই যে এক বৃষ্টি-পড়া মলিন সন্ধ্যায় ন্যুয়র্ক ছেড়েছিলুম, তারপর থেকে দু-সপ্তাহ ধ'রে অনবরত ঘুরছি— স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, হোটেল থেকে প্লেন, এবং প্লেন থেকে আবার এক অন্য হোটেলে। মন চায় জগৎটাকে গ্রাস করতে, কিন্তু দেহের সাধ্য সীমিত। রাস্তায়, চিত্রশালায়, আর মালবাহী অবস্থায় বিমানবন্দরগুলোতে মাইলের পর মাইল হেঁটে-হেঁটে আমার একটা পা খোঁড়া হ'য়ে গেছে, প্যারিসে এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি পায়ে, কিন্তু এখনো স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছি না। গত দুই রাত্রি প্যারিসে প্রায় নিদ্রাহীন কাটিয়েছি, সেখানে একটি চমৎকার দল জুটেছিলো আমাদের— কলকাতা-বাসিনী বন্ধুপত্নী, দেশত্যাগী ভবঘুরে ভটচায ব্রাহ্মণ, পূর্ব-পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যপ্রেমিক, শেষোক্ত দু-জনের বিদেশিনী বান্ধবীরা— এই যোগাযোগের ফলে এবং জুন মাসের রেশম-কোমল বাতাসের উৎসাহে, কাফেতে ঘুরে-ঘুরে রাত্রিযাপন না-করা অসম্ভব হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো সারা প্যারিসই কাফেতে ব'সে আছে, কেউ ঘুমোচ্ছে না ; আড্ডার এই রমণীয় রাজধানীতে ঘুম জিনিশটাকে মনে হয় নিতান্তই সময়ের অপব্যয়। আজ কাক-ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হয়েছে ; এক ঘণ্টায় আমস্টার্ডাম, নগরের কেন্দ্রস্থলে এই হোটেল, সামনে চওড়া চত্বর, রাজবংশের অন্যতম প্রাসাদ। এখন বেলা দশটা : আকাশ ঈষৎ মেঘলা, ভেজা-ভেজা অনুজ্জ্বল রোদ জানলা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে আসবাবে ও গালিচায়, রাস্তায় একটি রক্তবর্ণ পুষ্টদেহ লোক বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে, আমরা তাকে কয়েকটি মুদ্রা জানলা থেকে ছুঁড়ে দিয়েছি— আমি টেলিফোন তুলে বলেছি আমাদের ঘরে চা দিয়ে যেতে।

আমিও ক্লান্ত, কিন্তু আমার মনের উত্তেজনায় শরীরের ক্লান্তি চাপা প'ড়ে আছে। এই হোটেলে পা দেয়ামাত্র নিরাশ হয়েছিলুম আমি— কেননা এই মধ্য-নাগরিক অবস্থান আমার অভিপ্রেত ছিলো না। ন্যুয়র্কের আমেরিকান এক্সপ্রেসকে আমি বিশেষভাবে বলেছিলুম, আমরা এমন এক হোটেল চাই যেটা খালের ধারে অবস্থিত, আর চাই এমন ঘর যার জানলা দিয়ে খালের জল দেখা

যায়। বিদগ্ধ পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে বোদলেয়ারের 'ভ্রমণের আমন্ত্রণ' কবিতার দৃশ্য ও আবহকে প্রত্যক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো। পুরোনো কোনো হোটেল, খাঁটি ওলন্দাজি ধরনে সাজানো একটি ঘর, মেঘে মাস্তুলে চিহ্নিত একটি সান্ধ্য আকাশ, জলে সূর্যাস্তের আভা— এই সব প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম। তার বদলে এই ভিড়াক্রান্ত, আনকোরা-বিশশতকী, চিক্কণ ও নিশ্চরিত্র হোটেল দেখে মনটা দ'মে গিয়েছিলো— আমেরিকান এক্সপ্রেসের কর্মিকটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিনি। কিন্তু এই ক-মিনিটে সেই আশাভঙ্গজনিত অসন্তোষও আমি কাটিয়ে উঠেছি। আমার মন-খারাপ করার সময় নেই, ক্লান্তি অনুভব করার সময় নেই, বিশ্রাম উপভোগ করার সময় নেই। আমি কোনো সাহিত্যিক বা সামাজিক কর্তব্য নিয়ে আমস্টার্ডামে আসিনি, কোনো প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রিত আমি নই এখানে; আমি এখানে এসেছি সম্পূর্ণ নিজের গরজে, আমার প্রিয় ও পরিচিত একটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে। যত শিগগির সম্ভব তাঁর কাছে আমি উপস্থিত হ'তে চাই।

প্র. ব. কিছুতেই আজ বেরোতে রাজি নন, লাঞ্চের পর আমি একাই বেরিয়ে পড়লুম। আমার দিন কাটলো রাইক্সম্যুজ়িয়মে, আমাকে সঙ্গ দিলেন সারাক্ষণ রেমব্রাণ্ট।

স্পিনৎসাকে বাদ দিলে যিনি হল্যাণ্ডের প্রধান পুরুষ, যাঁর কর্মজীবন নিরন্তর আমস্টার্ডামে কেটেছিলো, এই নগরের প্রধান চিত্রশালা সংগতভাবে তাঁরই দ্বারা অধিকৃত। অন্যান্য প্রতিভাবান শিল্পীরা তাঁর প্রতিবেশে যেন ম্লান এখানে; আজ অন্তত অন্য কারো জন্য আমার সময় নেই। এখানেই আছে সেই আলেখ্য, যা 'নৈশ পাহারা' নামে বিশ্ববাসীর বৃত হয়েছে: সবার আগে সেটি আমি দেখতে চাই। চোখের লোভ সামলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পার হ'য়ে এলাম, তারপর একটি শূন্য গলির শেষে মেরুন রঙের মখমলের পর্দা ঠেলে একটি বিশাল কক্ষ পাওয়া গেলো। সামনের দেয়াল সম্পূর্ণ জুড়ে আছে 'নৈশ পাহারা'— বিরাট পট, একটি বিজ্ঞপ্তি প'ড়ে জানলাম একটি অংশ ছেঁটে ফেলে তবে ঐ প্রকাণ্ড দেয়ালে ধরানো গিয়েছিলো। অন্য দেয়ালে ভ্যান ডের হেল্স্ট-এর একটি পট— যিনি সতেরো শতকে রেমব্রাণ্টের চেয়ে অনেক বেশি লোকপ্রিয় ছিলেন, আর আজ যাঁর নাম বিশেষজ্ঞ ছাড়া

কেউ জানে না। এই কক্ষে এ-দুটি ভিন্ন ছবি নেই। দ্বিতীয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করে লোকেরা, প্রথমটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমিও দাঁড়িয়েছি এই ছবির সামনে— দূর থেকে, কাছে থেকে, কোণ থেকে, কেন্দ্র থেকে— বিভিন্নভাবে দেখে-দেখে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি। অসাধারণ ভাগ্যরেখা নিয়ে এর জন্ম হয়েছিলো। রচনাকালে প্রত্যাখ্যান ও অমানিত, পরবর্তীকালে জগৎ-জোড়া যশের অধিকারী, আঠারো শতক থেকে 'নৈশ পাহারা' নামে পরিচিত— যদিও তথ্যের হিশেবে ছবিটি নৈশ নয়, এবং এতে কোনো পাহারাও নেই। শুধু নামে নয়, রচনাশিল্পেও অসংগতি এর লক্ষণ— এর ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচকেরা যুগে-যুগে তর্কপরায়ণ, যেন এতে চিত্ররচনার কোনো-একটি গোপন সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে যা কোনো প্রামাণিক আদর্শের মধ্যে পড়ে না। রেমব্রাণ্টের একটি শ্রেষ্ঠ কৃতি একে। হয়তো বলা যায় না, অথচ এটি 'মনা লিসা'র মতোই অফুরন্তভাবে আলোচিত কেন এত তর্ক এই ছবি নিয়ে, কেন এর খ্যাতি এমন অসামান্য?

তার কারণ, এই চিত্র রহস্যময়— হয়তো বা য়োরোপীয় চিত্রকলায় রোমাণ্টিক ধারার প্রবর্তক, যে-অর্থে শেক্সপীয়র রোমাণ্টিক, সেই অর্থে। আমস্টার্ডামের তেইশ জন নগররক্ষী রেমব্রাণ্টের কাছে চেয়েছিলেন নিজেদের যৌথ প্রতিকৃতি, কিন্তু যা রচিত হ'লো তাতে 'শবব্যবচ্ছেদ'-এর নিখুঁত বাস্তবতা দেখা গেলো না : প্রত্যেকে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত হবেন, এই দাবি উপেক্ষিত হ'লো। অতএব তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন ছবিটিকে— তাঁদের দিক থেকে ভুল করলেন না, কেননা তুলির দ্বারা তখন-পর্যন্ত-অজাত ক্যামেরার কর্ম করতে পারেন, এমন শিল্পীর অভাব ছিলো না হল্যাণ্ডে— পরে দলপতি কক্ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভ্যান ডের হেল্স্ট-এর আঁকা প্রতিকৃতি পেয়ে। রেমব্রাণ্ট নিজেও পারদর্শী ছিলেন সেই বিদ্যায়, কিন্তু 'নৈশ পাহারা'য় নিজেকে তিনি অতিক্রম করলেন— এই ছবি থেকেই শুরু হ'লো তাঁর সংসারভাগ্যের পতন, আর শিল্পী হিশেবে তাঁর মহত্তর পর্যায়।

ছবিটির সামনে দাঁড়ানোমাত্র আমরা যা অনুভব করি, তা গতি, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। 'শবব্যবচ্ছেদ'-এর আঁটো বাঁধুনি— প্রতিটি মুখের উপর সমতল আলো, শবের সুনিশ্চিত শবত্ব, চিকিৎসকবৃন্দের স্পষ্ট জ্ঞানস্পৃহা— এ-সবের সঙ্গে এই অস্থিরতার প্রতিতুলনা কতই না সহজ! 'নৈশ পাহারা'য়

বাস্তবতা নেই, যাকে আমরা স্বাভাবিকতা বলি তাও নেই ; যেন অনেক বিবাদী সুরের সমন্বয়ে, অনেক স্ববিরোধের ছন্দোবন্ধে এর রচনা। এর অজ্ঞাত-উৎস নামকরণ আসলে ভ্রান্ত নয়, কেননা এই বিরাট পট রেমব্রাণ্টীয় নৈশ আবহে লিপ্ত হ'য়ে আছে। প্রতিবেশীর জামার উপরে ক্যাপ্টেন কক্-এর হাতের ছায়া দেখে সমালোচকেরা যদিও নিঃসংশয়ে বলেছেন যে সূর্য প্রায় মধ্যগগনে, তবু আমাদের চোখের ও মনের কাছে ঘটনাকাল রাত্রি ব'লে প্রতিভাত হয়। এমনকি আমরা উদ্ধত বর্শাগুলোকে মাঝে-মাঝে মশাল ব'লে ভুল করি, পুরোভূমির আংশিক উজ্জলতায় যেন পটভূমির নৈশ তিমির দৃশ্যমান হ'লো। যে-আলো-আঁধারিতে রেমব্রাণ্ট তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, যে-ভাবে, রাফায়েলের বিরুদ্ধে, রুবেন্স-এর বিরুদ্ধে, সমগ্র ইটালীয় রেনেসাঁস-শিল্পের বিরুদ্ধে তিনি পটের অধিকাংশ অন্ধকারে রেখে শুধু একটি বা কোনো-কোনো নির্বাচিত অংশকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতেন— তাঁর সেই মায়াজাল 'নৈশ পাহারা'তেও প্রত্যক্ষ করি আমরা। যেমন তাঁর অন্য অনেক স্মরণীয় চিত্রে, তেমনি এখানেও অন্ধকারই প্রধান ও ব্যাপ্ত, যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারেরই হৃদয় থেকে উৎসারিত। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি প্রতিকৃতি আঁকার ফরমাশ নিয়েও বাস্তবধর্মী হবার কোনো চেষ্টাই করেননি রেমব্রাণ্ট— লোকগুলোর মধ্যে কেউ অত্যন্ত ঢ্যাঙা, কেউ এত বেঁটে যে প্রায় কুঁজো মনে হয়, কেউ অস্বাভাবিক স্থূলকায়, কারো-কারো শুধু মুখ, একজনের শুধু একটি চোখ দেখা যাচ্ছে, কোনো-কোনো মুখ ভৌতিক ধরনে অস্পষ্ট, অনেকে অন্ধকারে অর্ধলীন — আর সব সুদ্ধ এমন ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় যে তেইশ জনকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় ছবির অনন্য নারীমূর্তিটি— খর্বকায়, প্রোজ্জ্বল, অসুন্দর, প্রায় অতিপ্রাকৃত— এই বীরবৃন্দের মধ্যে কী করছে সে, কেন সারা ছবিতে একমাত্র সে-ই পূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত, তার কোমর থেকে একটা মুর্গি ঝুলছে কেন? সে কি ইহুদি-পাড়ার কোনো দীন রমণী, কোনো পরি, কোনো রূপকথার নায়িকা, ছবির ডান দিকের ছায়াচ্ছন্ন কুকুরটির সঙ্গে তার কি কোনো সম্পর্ক আছে? কিন্তু— সে যে-ই হোক, এই ছবিতে তাকে কেন স্থান দেয়া হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু এই রমণীর সূত্র ধ'রে হয়তো রেমব্রাণ্টের অভিপ্রায় অনুমান করা যায়। তিনি কি চেয়েছিলেন এই

আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করতে— যারা যুগধর্ম ও দেশাচার অনুসারে নিজেদের চাটুকারী প্রতিকৃতি দেখতে চেয়েছিলো— আর সেইজন্যেই এত অসংগতি মিশিয়েছিলেন? এর উল্টোটাই সত্য ব'লে মনে হয় আমার: রেমব্রাণ্ট চেয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষগুলোকে স্বপ্নের স্তরে, কবিতার স্তরে উন্নীত করতে, কোনো নাটকের চরিত্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। হয়তো সেইজন্যেই, একটুখানি লোকোত্তর আভাস দেবার জন্যেই, ঐ আকস্মিক ও দুর্বোধ্য নারীমূর্তির অবতারণা। ইতিহাস হিশেবে আমরা জানি যে ছবিটির বিষয় হ'লো 'ক্যাপ্টেন কক্-এর শোভাযাত্রা'— অর্থাৎ দলপতি তাঁর কার্যালয় থেকে সদলে বেরোচ্ছেন অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতে— কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়কে কোন সুদূরে ঠেলে এনেছে রেমব্রাণ্টের কল্পনা। ছবিতে আমরা যা পাচ্ছি তা এক তীব্র সংকটের মুহূর্ত— এত অস্থিরতা ও অবিন্যাস সেইজন্যেই, সেইজন্যেই বসনভূষণের অঙ্কন এমন যত্নহীন, আর মানুষগুলোর বিন্যাসেও প্রথাবদ্ধ শৃঙ্খলা নেই। যেন বিরাট কোনো ঘটনা মুহূর্তকাল পরেই ঘটবে, বা মুহূর্তকাল আগে ঘ'টে গেছে, যেন নিশীথকালে অকস্মাৎ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে নগর, বা আশাতীত কোনো সুসমাচার এসে পৌঁছলো— মানুষগুলো যে যেমন ছিলো তেমনি বেরিয়ে এসেছে বর্শা বন্দুক দামামা আর পতাকা নিয়ে, সুপ্রসাধিত হবার জন্য অপেক্ষা করেনি; যে যেখানে জায়গা পেয়েছে দাঁড়িয়ে গেছে, চেষ্টা করেনি শোভনভাবে বিন্যস্ত হ'তে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকের মুখের পেশী টান হ'য়ে আছে, উৎকণ্ঠিত তারা, কিসের যেন প্রতীক্ষা করছে, প্রস্তুত হচ্ছে যুদ্ধের অথবা অভ্যর্থনার জন্য, যেন দাঁড়িয়েছে এক স্মরণীয় মুহূর্তের মুখোমুখি। কী হচ্ছে, বা হ'তে চলেছে তা আমরা কেউ জানবো না কোনোদিন— কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ নেই, এক অনিশ্চিত অনির্ণেয় জগতে, এক রাত্রিপ্রতিম দিবালোকের প্রদোষে কতগুলো মানুষ যেন একাধিক অর্থে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যাপ্ত উত্তেজনার মধ্যে শুধু মুর্গিধারিণী মেয়েটির মুখ নিতান্ত ভাবলেশহীন; তাকে মনে হয় যেন মানুষ নয়, পুতুল, মানবী নয়, প্রতিমা; এই ঘটনায় কোনো অংশ নেই তার— পট জুড়ে যে-বহুমিশ্র নিনাদ ধ্বনিত হচ্ছে তার মধ্যে সে একা শুধু শব্দহীন সাক্ষী।

'নৈশ পাহারা' রচনার সময় রেমব্রাণ্টের বয়স ছিলো ছত্রিশ। পূর্ণ

যৌবন, আদরিণী বিত্তশালিনী স্ত্রী সাস্কিয়া, তুলি চালিয়ে বিবর্ধমান খ্যাতি ও উপার্জন— নানা দেশের ছবি, মূর্তি ও কারুকলার সংগ্রহে সমৃদ্ধ তাঁর পরিবেশ। একজন শিল্পীর পক্ষে যা-কিছু কাঙ্ক্ষণীয় হ'তে পারে, প্রায় সবই তাঁর ছিলো তখন। কিন্তু 'নৈশ পাহারা'র স্বল্পকাল পরে সাস্কিয়ার মৃত্যু হ'লো, ঐ ছবির প্রত্যাখ্যানের ফলে মন্দা লাগলো ব্যবসায়িক পসারে। স্ত্রীকে হারিয়ে, ক্রেতা হারিয়ে, ছবি আঁকা একদিনের জন্যও থামালেন না, সাস্কিয়ার অর্থের উত্তরাধিকারী হ'য়ে তাঁর স্বভাবসংগত অমিতব্যয়িতাও বজায় রাখলেন। নিজের ভোগ ও বিলাসিতার জন্য নয়, শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য এই অমিতব্যয়। ১৬৫৬ সালে— 'নৈশ পাহারা'র চোদ্দ বছর পরে— ঋণজর্জর হ'তে-হ'তে অবশেষে লাল বাতি জ্বালতে হ'লো, পাওনাদারেরা নিলেমে তুললো রেমব্রাণ্টের যাবতীয় সম্পত্তি। সেই একই বছরে অন্য এক কঠিনতর আঘাত পেলেন: তাঁর দ্বিতীয়া প্রেয়সী হেনড্রিকিয়েকে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সশরীরে উপস্থিত হ'য়ে কবুল করতে হ'লো যে তিনি 'চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্টের সঙ্গে বেশ্যার মতো বসবাস করছেন।' সাস্কিয়ার উইলে একটি শর্ত ছিলো যে রেমব্রাণ্ট আবার বিবাহ করতে পারবেন না, কিন্তু— যেমন অন্য অনেক শিল্পীর জীবনে— তেমনি রেমব্রাণ্টের পক্ষেও নারীর প্রেম ও সঙ্গ ছিলো অপরিহার্য— অতএব এক সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী প্রাক্তন পরিচারিকার সঙ্গে বিনা-অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হলেন। খুব সম্ভব রেমব্রাণ্ট ভেবেছিলেন যে ভগবানের চোখে বিবাহ ব'লে কিছু নেই, এবং পারস্পরিক প্রণয়ের দ্বারাই স্ত্রী-পুরুষের মিলন পুণ্য হয়— কিন্তু এ-সব যুক্তি যেহেতু সমাজপতিরা সাধারণত উপেক্ষা ক'রে থাকেন, তাই নিগ্রহভোগ করতেই হ'লো। হেনড্রিকিয়ে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা তখন; ধর্মপিতারা শাসালেন যে তিনি তাঁর 'পাপ' প্রকাশ্যে স্বীকার না-করলে তাঁরা তাঁর অজাত সন্তানের আত্মাকে অনন্তকালের জন্য নরকে পাঠাবেন। সন্তানের আত্মাকে বাঁচাবার জন্য হেনড্রিকিয়ে মেনে নিলেন নিজের ধর্মচ্যুতি, 'বেশ্যাবৃত্তি'র শাস্তিস্বরূপ যীশুর করুণালাভের সম্ভাবনা থেকে তিনি চিরকালের মতো বঞ্চিত হলেন— অন্তত-পক্ষে চার্চের তা-ই ফতোয়া বেরোলো; তবে যীশু তাঁর স্বনিয়োজিত মর্ত্য প্রতিভূদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

যুগপৎ বিখ্যাত ও দরিদ্র হবার বেদনা আমরা কেউ-কেউ প্রত্যক্ষভাবে

জেনেছি। দারিদ্র্য শুধু কষ্টের নয়, তা অসম্মানজনক, তা আমাদের বাধ্য করে হৃদয়ের দিক থেকেও সংকুচিত হ'তে, নানা ধরনের ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিতে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে দারিদ্র্য তাই সহজে মেলে না, প্রতিভাবানকে বিকল ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে তার। এই অবরোধ ও মালিন্যের মধ্যেই রেমব্রান্ট কাটালেন তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়, কিন্তু সাংসারিক দুর্গতি তাঁর সৃষ্টিতে ব্যাহত করতে পারলে না। পুত্র টিটুস ও বুদ্ধিমতী হেনড্রিকিয়ের প্রযত্নে কোনোরকমে সংসার চলে : যা-কিছু তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর আজীবন-সঞ্চিত শিল্প-সামগ্রী, কিছুই আর নেই এখন, উঠে এসেছেন ছোটো বাড়িতে, কিন্তু অটুটভাবে স্বধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে প্রিয়তমা হেনড্রিকিয়ে ও টিটুসেরও মৃত্যু হ'লো, তবু তিনি সৃষ্টিশীলতায় অবিচল। শুধু যে অবিরাম চিত্ররচনা করছেন তা-ই নয়, শুধু যে অবক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই তা নয়, দুর্দিনে আরো গভীর হয়েছে তাঁর শিল্প, আরো মনস্বী, হ'য়ে উঠেছে বিশ্ববেদনার চিত্ররূপ। মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তি রইলো কিছু জীর্ণ বস্ত্র, ছবি আঁকার সরঞ্জাম— আর রইলো অমরতা।

কিন্তু— শুধু শেষ জীবনে নয়, তাঁর সৌভাগ্যের উত্থানকালেও তাঁকে ঘিরে আলোর চেয়ে অন্ধকার কি বেশি ছিলো না, স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে বেশি ছিলো না গোপনতা? অদৃষ্টের এক চমৎকার খেলা দেখা যায় দুই প্রতিবেশী দেশে, প্রায় একই সময়ে, দুই শিল্পীর জীবনধারায়। রুবেন্স— ইটালির আলোকপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক, ধর্মরাজ ও পৃথ্বীরাজদের প্রিয়পাত্র, বিদগ্ধ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বশালী, য়োরোপের প্রধান বেসরকারি রাজদূত, বিপুল বিত্ত ও প্রতিপত্তি নিয়ে একাধিক অর্থে শিল্পসম্রাট। আর রেমব্রান্ট— প্রটেস্টান্ট, কিন্তু চার্চের দ্বারা নির্জিত, অনভিজাত, স্বল্পশিক্ষিত, কুলীনসমাজে প্রবেশের অধিকারহীন, সাংসারিক অর্থে অকৃতী এবং উত্তরজীবনে দরিদ্র— এমন একটি মানুষ, যাঁর সমস্ত মেধা ও উদ্যম, সমস্ত ভাবনা ও প্রয়াস একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে অনবরত ধাবিত হয়েছে। রেমব্রান্ট কখনো ইটালিতে বা ইংলণ্ডে যাননি, কোনো রাজা অথবা গুণীর সঙ্গে পত্রবিনিময় করেননি, তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো ব'লে জানা যায় না : ভ্রমণবিমুখ, অমিশুক ও উৎকেন্দ্রিক স্বভাবের জন্য লোকমুখে তাঁর ডাকনাম হয়েছিলো 'প্যাঁচা'; খৃষ্টান হ'য়েও আমস্টার্ডামের ইহুদিপাড়ায় বহু বৎসর কাটিয়েছেন, সরু গলিতে, অবহেলিত বিধর্মীদের সংসর্গে— হয়তো বা

স্পিনৎসার প্রতিবেশী ছিলেন কোনো সময়ে— যাদের ম্লান মুখাবয়ব ও অচারু বেশবাস বহুবার তাঁর চিত্রে আমরা দেখতে পাই। রুবেন্সের তুলনায় তাঁর জীবন যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনি তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুও সীমিত : গ্রীক ও রোমক পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, খৃষ্টীয় ঐতিহ্য, নারী ও পুরুষ, শিশু ও পশু, মানুষ ও দেবতা— রুবেন্স যেন সারা জগতের লুণ্ঠনকারী : আর রেমব্রাণ্ট অক্লান্তভাবে নিরীক্ষণ করেছেন শুধু মানুষের মুখ, দর্পণে তাঁর নিজের মুখ, নানা বেশে, নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাবে আবিষ্ট তাঁর নিজের মুখ। মানুষের দেহের মধ্যে যা সবচেয়ে আধ্যাত্মিক সেই অংশটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন, আর তারও মধ্যে সেই মুখের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ, যা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই নিজস্ব হ'লেও আসলে অচেনা। আমরা অবাক হই না যখন শুনি যে, ১৬৩৬ সালে হল্যাণ্ডে বেড়াতে এসে রুবেন্স সে-দেশের প্রত্যেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, যাননি শুধু রেমব্রাণ্টের কাছে। শোনা যায়, টলস্টয়ের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কির কখনো দেখা হয়নি, কিংবা দেখা হ'লেও যোগাযোগ ক্ষীণ ছিলো। টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি, গ্যেটে ও হোল্ডার্লিন, উগো ও বোদলেয়ার, টোমাস মান্ ও কাফকা— এই সব বিপরীত যুগল যেমন শিল্পীজীবনের দুই মেরুর প্রতিভূ, তেমনি রুবেন্স ও রেমব্রাণ্ট। কিন্তু কী ভাগ্যে রেমব্রাণ্ট একজন ওলন্দাজি রুবেন্স হ'য়ে জন্মাননি, কী ভাগ্যে রুবেন্স যা-কিছু নন, রেমব্রাণ্ট ছিলেন অবিকল তা-ই।

আমি কি সাহস ক'রে বলবো যে রুবেন্স, রাফায়েল, হালস, ভেলাস্কেজ়, টিৎসিয়ান, বা এমনকি মিকেলাঞ্জেলো আমার মনে কখনো তেমন প্রবল আলোড়ন তোলেননি? আমার রুচির পক্ষে রুবেন্স বড়ো বেশি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বড়ো বেশি বিলাসী। তাঁর স্থূলবপু খৃষ্টদের মুখে আমি কোনো দেবত্ব দেখতে পাই না ; তাঁর স্থূলবপু মাংসল নারীদের অরুণবর্ণ ত্বক— যার আভা সারা পটে ছড়িয়ে পড়ে— তাঁর শ্মশ্রুধারী, পেশীবহুল দৃপ্তকাম বীরবৃন্দ, তাঁর ফেনোচ্ছল ভোগস্পৃহা— এ-সব দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু কোনো চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। মিকেলাঞ্জেলোতে আমি দেখতে পাই এক অতিমানবিক ক্ষমতার প্রকাশ, কিন্তু আমার মনে তাঁর কোনো বার্তা পৌঁছয় না ; আর রাফায়েলের কেন যে এত খ্যাতি তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী য়োরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে আমার পক্ষে যাঁরা মর্মস্পর্শী, তাঁদের

মধ্যে আছেন দা ভিঞ্চি, এল গ্রেকো, ড্যুরের, গোইয়া— আর হয়তো বা সবার উপরে রেমব্রাণ্ট।

রাইক্সম্যুজিয়মের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরছি— রেমব্রাণ্টকে অনুসরণ ক'রে। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা ঝুলছে দেয়ালে-দেয়ালে। ভূদৃশ্য, বাইবেল-চিত্র, সাস্কিয়া, হেনড্রিকিয়ে ও টিটুসের প্রতিকৃতি, বিখ্যাত 'বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সংসদ'। শেষোক্ত চিত্রটিকে ভালোবাসতে পারলুম না আমি, কিন্তু টিটুসের একটি প্রতিকৃতি আমাকে মুগ্ধ করলো। রেমব্রাণ্ট ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে রমণীপ্রেমিক, কিন্তু নারীচিত্র অল্পই এঁকেছিলেন, এবং তাঁর সাস্কিয়ার নগ্নচিত্রেও ইন্দ্রলোকের উদ্ভাস নেই ; উর্বশীরা তাঁর জগৎ থেকে নির্বাসিত। কিন্তু কোনো-এক মুহূর্তে তাঁর তুলি থেকে ক্ষরিত হয়েছিলো কৈশোরের মনোহরণ কান্তি, এই কঠিন ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষের পক্ষে আশ্চর্য কোমল তাঁর পুত্রের এই প্রতিকৃতি। কিন্তু যে-সব ছবিতে অমোঘ ও গভীরতম রেমব্রাণ্টকে আমরা খুঁজে পাই— হয়তো না-বললেও চলে, তা তাঁর আত্মপ্রকৃতির পর্যায়।

আটাশ বছর বয়সে রেমব্রাণ্ট তাঁর নিজের ও সাস্কিয়ার একটি যৌথ প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন— পুস্তকে দেখা সেই ছবিটি আমার মনে পড়ছে। তাঁর সাংসারিক সৌভাগ্যের দিন বিধৃত আছে সেই চিত্রে— তাঁর এক হাত স্ত্রীর কটিতে ন্যস্ত, অন্য হাতে উঁচু ক'রে ধরেছেন সুরাপাত্র : ফ্যাশনদুরস্ত তাঁর পোশাক, গোঁফ সুচারু, মুখ হর্ষোৎফুল্ল, চোখ ঈষৎ মদির। এই সুখী রেমব্রাণ্টকেই আবার আমরা দেখতে পেয়েছি ক্রুদ্ধ স্যামসনের ছদ্মবেশে, সমকালীন অন্য একটি আত্ম-প্রতিকৃতিতে। কিন্তু সারা জীবন সুখভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিলো না, অন্য এক মহত্তর নিয়তির জন্য তিনি চিহ্নিত ছিলেন। এবং সুখী রেমব্রাণ্ট, যুবক রেমব্রাণ্ট— এ-সব কেমন অশোভন মনে হয় আমাদের, প্রায় আস্থার অযোগ্য, যে-রূপে তিনি আমাদের মনে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আছেন তা এক প্রৌঢ়ের, অকালবৃদ্ধের, দুঃখভোগীর। তাঁর বয়স বাড়ছে, অবস্থার পতন হচ্ছে, শোকের পর শোক পাচ্ছেন, নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হচ্ছেন কালক্রমে, ক্রমশ নিজের মধ্যে আরো বেশি সংবৃত ও সংহত, মগ্ন হচ্ছেন তাঁর নিভৃত ধ্যানে— এই সব কথাই আমাদের জানিয়ে দেয় তাঁর উত্তরজীবনের পরম্পর আত্ম-প্রতিকৃতি। নারী, সুরা সুখ— সব অবলুপ্ত ; ত্বক জীর্ণ ও শিথিল, ললাট কুঞ্চিত, ছায়াচ্ছন্ন বিস্রস্ত বেশবাস, বেদনাবিদ্ধ

মুখ, অন্তর্বীক্ষণে দীর্ণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গচ্ছুরিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমাশীল। আমরা লক্ষ করি, তাঁর উত্তরপর্যায়ে আত্ম-প্রতিকৃতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে— যেন উন্মাদের মতো, বোদলেয়ারীয় 'ড্যাণ্ডি'র মতো, তৃপ্তিহীন-ভাবে অবলোকন করছেন নিজেকে, সেই আত্ম-সমীক্ষাই যেন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাঁর উত্তর এবং বিজয়ঘোষণা। রেনেসাঁস-পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্টই সবচেয়ে অনুচ্চার— তিনি কোনো ডায়েরি অথবা নোটবই লেখেননি, তাঁর চিঠিপত্র উল্লেখের অযোগ্য, তাঁর কোনো সংলাপ বা বচনও লিপিবদ্ধ হয়নি, তিনি কোনো দুঃখের আঘাতে বিলাপ যদি বা ক'রে থাকেন তা অন্য কেউ জানে না— কিন্তু এই মৌন ও নিভৃত মানুষের আত্মজীবনী আমরা প'ড়ে নিতে পারছি তাঁর এই চিত্রপর্যায়েই। শুধু আত্ম-প্রতিকৃতি নয়— অন্যান্য ছবিতেও মাঝে-মাঝে তাঁকেই আমরা দেখতে পাই— কখনো তিনি অ্যাবসালম, কখনো বা তরুণ য়োসেফ, কখনো তিনি ক্রুশকাষ্ঠ থেকে যীশুকে নামাচ্ছেন— কত বিভিন্নভাবেই নিজেকে তিনি অন্বেষণ ও আবিষ্কার করেছেন! এবং যে-সব ছবি আত্ম-প্রতিকৃতি ব'লেই উল্লিখিত সেখানেও তাঁর বেশবাস বিচিত্র, বৈদেশিক, কখনো বা অদ্ভুত, যেন অভিনেতার মতো বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন; কিন্তু এর কারণ নয় কোনো নার্সিসীয় স্বপ্রীতি, কেননা আসলে তাঁর কৌতূহল সর্ব-মানবের বিষয়ে। নিজের মুখের দিকে অফুরন্ত বার তাকিয়ে অফুরন্ত বার নতুন মানুষ, অন্য মানুষ আবিষ্কার করেছেন তিনি, তাই এই বেশবাসের বৈচিত্র্য ও বৈদেশিকতা;— আমরা দেখতে পাই যে তিনি শুধু নিজের ইতিহাসই ব'লে যাননি, আমাদের সকলেরই গোপন বেদনা উদ্ঘাটন ক'রে গেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে সংলাপ চলে আমাদের, তাঁর কিছু বলার আছে আমাদের জন্য, আমাদের হৃদয়ের ঘুম ভাঙাতে জানেন তিনি। তাঁর ছবি দেখে আমাদের ইন্দ্রিয় পরিশীলিত হয় না, জগৎ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্যও পাই না তাতে, কিন্তু নিজেকেই নতুনভাবে— হয়তো আরো একটু তীব্রভাবে— আবিষ্কার করি।

বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্ট বোধহয় একমাত্র, যিনি কখনো সুন্দরের বেসাতি করেননি। নিজে তিনি সুপুরুষ ছিলেন না; তা গোপন করার তিলতম প্রয়াস নেই তাঁর চিত্রে— বরং কোনো-কোনোটিতে তাঁর অনভিজাত মুখাবয়ব ও বার্ধক্যকে যেন বাস্তবের চেয়েও বেশি ক'রে দেখানো হয়েছে। তাঁর সাস্কিয়া বা হেন্‌ড্রিকিয়ে আমাদের নয়ন হরণ করে না;— স্নানরতা সুজানা বা

বাথশিবা বা এমনকি তাঁর মাতা মেরীরাও সুন্দরী নন; তাঁর যীশুভক্তেরা সামান্য ও দরিদ্র মানুষ; তাঁর হোমর অথবা আরিস্টটলের মুখাবয়বে ক্লাসিকাল সৌষ্ঠব নেই, তাতে বরং কিছুটা ইহুদিভাব ধরা পড়ে। তিনি ভালোবাসতেন ইহুদিদের ছবি আঁকতে, দীন, বৃদ্ধ, চিন্তাকুল সেই সব মুখ আমাদের দিকে যে-অব্যক্ত আর্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, তার অর্থ হয়তো আমরা খুঁজে পাই তাঁর কোনো-কোনো আত্মপ্রতিকৃতির মুখোমুখি হ'লে। আমি ভাবছি সেই সব চিত্রের কথা, যাতে তাঁকে দেখা যায় বার্ধক্যে ও বেদনায় বিধ্বস্ত, যাতে জরাজনিত রেখাগুলি স্থূল ও নিষ্ঠুর, লালিত্য নিঃশেষে ঝ'রে গেছে, সারা মুখ ভাবনার প্রভাবে চিন্ময়। রেমব্রাণ্টকে বলা যায় বিশেষভাবে প্রৌঢ় ও নাস্তিমানের কবি, আত্মিক সৌন্দর্যের, পার্থিব বঞ্চনার। তাঁর সমকালীন চিত্রধারা থেকে এ-দিক থেকে তিনি আশ্চর্যরকম পৃথক।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। হল্যাণ্ডের তৎকালীন ঐশ্বর্যের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর রচনাবলিতে; তাঁর ছবি দেখে এমন সন্দেহ হয় না যে তাঁরই জীবৎকালে হল্যাণ্ড হ'য়ে উঠছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি দেশ, স্পেনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হ'য়ে বাণিজ্য বিস্তার করছিলো পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, ঘরে-ঘরে ঝংকৃত হচ্ছিলো স্বর্ণমুদ্রা, ধনে-মানে প্রধান হ'য়ে উঠছিলো বণিকবৃন্দ। সতেরো শতকের ওলন্দাজি বণিকেরা কী-রকম প্রাচুর্যে ও আরামে দিনযাপন করতেন, কী-রকম সুচারু ছিলো তাঁদের গৃহসজ্জা, কী-রকম পরিপুষ্ট ও সালংকার ছিলেন তাঁদের স্ত্রীরা ও দাসীরা— তা জানতে হ'লে ভেরমের আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। এই রাইক্সম্যুজ়িয়মেই দেখছি ওলন্দাজি শিল্পের অন্য এক ধারা: পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুর হরিলুঠ প'ড়ে গেছে যেন;— গৃহস্বামী শিকার থেকে ফিরলেন; ঘরের মধ্যে আসবাবের ভিড়, পোষা কুকুর, পোষা ময়না, দেয়ালে ছবি, টেবিলে মাছ মাংস সব্জি পনির ফলমূলের স্তূপ, বোতলে সুরা, শিকার-করা মৃত পাখিরা মেঝেতে প'ড়ে আছে, এক কোণে কোনো তরুণী অর্ধাবৃত স্তন এবং সুগোল বাহু নিয়ে আলিঙ্গন করছে প্রণয়ীকে, গৃহস্বামিনী সারা মুখে অভ্যর্থনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দরজার বাইরে ঘোড়া, কিছু দূরে কানন, কাননের উপরে আকাশ;— জীবিত ও মৃত, রচিত ও প্রাকৃত, নিসর্গ ও গার্হস্থ্য জীবন, যুগপৎ সব উপস্থিত। এই রকম ছবি পর-পর কয়েকটি দেখার পরে যাবতীয় সম্ভোগে কেমন বিতৃষ্ণা জন্মে, মানুষকে মনে হয় নিতান্তই

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ জীব। তখন মুক্তির আস্বাদের জন্য আবার রেমব্রাণ্টের কাছে ফিরতে হয়।

চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি প্রতিভাবান ব'লে, রেমব্রাণ্টের সঙ্গে শেক্সপীয়রের তুলনা অনেকেই ক'রে থাকেন। কিন্তু শেক্সপীয়রের সর্বমুখিতা তাঁর ছিলো না; তাঁর কল্পনার অতীত ছিলো ক্লিওপ্যাট্রা বা ফলস্টাফ, প্রস্পারো বা লেডি ম্যাকবেথ। য়ান সিকস্-এর প্রতিকৃতি সত্ত্বেও, বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সুনিপুণ চিত্রণ সত্ত্বেও, রেমব্রাণ্ট সর্বোপরি আর্তির কবি, তাঁকে বলা যায় য়োরোপীয় চিত্রকলায় বিষাদের আবিষ্কারক, প্রধানত দুঃখের পথ ধ'রেই মানবাত্মার সন্ধান পেয়েছেন তিনি। আমরা অধিকাংশ মানুষই ট্র্যাজিক নই— সক্রিয়ভাবে, প্রায় সচেতন-ভাবে, সর্বনাশের দিকে ধাবিত হই না; একটি সামাজিক প্রচ্ছদ বজায় রেখে শুধু মনে-মনে দুঃখ ভোগ করি। কিন্তু কোনো-কোনো নির্জন মুহূর্তে সেই প্রচ্ছদ খ'সে পড়ে, আমাদের মুখমণ্ডলে গাঢ় হয় রেখা, দৃষ্টি যেন কুয়াশায় ডুবে যায়— যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়, তেমনি এই সব মুহূর্তে, অত্যন্ত পরিচিতকেও হঠাৎ দেখলে হয়তো অচেনা মনে হয়। সেই অন্তরতম মানুষের দ্রষ্টা হলেন রেমব্রাণ্ট— যে-মানুষ বীর নয়, সন্ত নয়, লিয়র অথবা কর্ডেলিয়া নয়; যে-মানুষ সংঘাতের বাইরে, সংগ্রামের বাইরে একান্ত তার নিজের মধ্যে আবিষ্ট, পরবর্তী কালে রিলকের কবিতায় মাঝে-মাঝে আমরা যার দেখা পেয়েছি। মানুষের মৌল নিঃসঙ্গতাকে এমন ভাস্বর ক'রে তুলতে পারেননি আর কোনো চিত্রশিল্পী— সেই যে তাঁর পট-জোড়া অন্ধকারের মধ্যে অল্প একটু সংহত ও তীব্র উদ্ভাস, তা যেন আমাদের আত্মিক জীবনের আলেখ্য। যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি, নৈতিক অর্থে ভালো-মন্দ বলি, যে-সব সামাজিক চিহ্ন ধারণ ক'রে আমরা দৈনন্দিন জীবন কাটাই— তাঁর শিল্পের পক্ষে তা সবই অবান্তর; কিন্তু যা আমাদের সত্তার অন্তঃসার, গোপন, নামহীন, প্রচ্ছন্ন— হঠাৎ কখনো যার দেখা পেলে আমরা চমকে উঠি— রেমব্রাণ্ট আমাদের সেই অংশকে উন্মোচন করেছেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজের বেদনাকে রূপান্তরিত করেছেন অমৃতে।

'আর কী প্রমাণ আছে? ভগবান, এই তো পরম,
এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার!'

৩

পিছনে প'ড়ে রইলো ম্যুনিখের হোফগার্টেন আর বিখ্যাত বিয়ার-প্রাসাদ হোফব্রাউ— যেখানে লোকেরা কলকাতার মতোই টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে কথা বলে— রইলো ডি. এইচ. লরেন্সের স্মৃতিমুখর ইজার নদী, বাভারিয়ার হৃদয়-হরণ হ্রদ ও পর্বতমালা, হিবয়েনার 'গ্রীক সরাইখানা', ছ-শো বছরের পুরোনো, যার অসমতল, স্বল্পালোকিত, গুহার মতো প্রকোষ্ঠগুলিতে গ্যেটে, বেটোফেন, মৎসার্ট এবং আরো অনেক বিখ্যাত পুরুষ পান, আহার ও বিশ্রম্ভালাপ করেছেন— রইলো অনেক দুর্গ, প্রাসাদ, কানন ও চিত্রশালা, চোখ-ধাঁধানো বারোক-এর ঐশ্বর্য, হিবয়েনার উপকণ্ঠে কবি হোফমানস্টালের মনোমুগ্ধকর বসতবাড়ি, রইলেন কয়েকজন ক্ষণিকের বন্ধু, যাঁদের আতিথ্য ভুলতে পারবো না কোনোদিন— বিকেলের আলোয় ধবল উজ্জ্বল আল্পসের তুষারবিস্তার পেরিয়ে সন্ধেবেলা রোমে এসে নামলুম। হাতে, কাঁধে মালপত্র নিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি, প্রান্তর পেরিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে উঠে সুদীর্ঘ গলি, পথের শেষ নেই যেন ; থেমে, হোঁচট খেয়ে, নিশ্বাস নিয়ে, আবার সিঁড়ি ভেঙে নেমে, অবশেষে কাস্টমস-এর কাছে পৌছনো গেলো। আমাদের ভারি মাল আসেনি তখনো— অস্বাভাবিক দেরি হচ্ছে— কিছুটা অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে-করতে হঠাৎ চোখে পড়লো, কাচের দরজার বাইরে কে একজন ব্যাকুলভাবে হাত নাড়ছে ও মুখভঙ্গি করছে। আরো কয়েকবার তাকিয়ে আমার প্রতীতি জন্মালো যে ঐ আন্দোলিত বাহুর উদ্দেশ্য আমাদেরই দৃষ্টি-আকর্ষণ। এগিয়ে গিয়ে যাঁকে চিনতে পারলুম, তিনি আমাদের পূর্বপরিচিত পূর্ববঙ্গীয় লেখক— ধরা যাক তাঁর নাম শাহাবুদ্দিন। বহুকাল দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে, তিনি যে রোমে আছেন তাও জানতুম না, তাই আমাদের জন্য বিমানবন্দরে তাঁকে উপস্থিত দেখে যেমন বিস্মিত হলুম, তেমনি আনন্দিত। অন্যের মুখে আমাদের খবর পেয়ে, তাঁর নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছেন।

মুসোলিনির তৈরি রাস্তা চলেছে মাইলের পর মাইল, তীরের মতো ঋজু, দুই দিকে বৃক্ষশ্রেণী ডালে-ডালে আলিঙ্গন ক'রে আছে। মনে হ'লো, এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাবার এত সুন্দর পথ আর কোথাও দেখিনি। যেতে-যেতে অবশ্য সবার আগে শাহাবুদ্দিনের খবর নিলুম। তাঁর কলেজ-জীবন কলকাতায় কেটেছিলো— 'কবিতা'য় তাঁর লেখা বেরোতো তখন—

বঙ্গবিভাগের পরে পাকিস্তানে চ'লে যান। স্বাধীনতালাভের পরের বছর আমি একবার একদিনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম ; তিনি তখন নব-বিবাহিত, ঢাকায় রেডিওতে কর্ম করছেন, তাঁর তরুণী স্ত্রী রান্না ক'রে খাইয়েছিলেন আমাকে— তাঁর বাড়িতে সেদিন একটি ঘনিষ্ঠ পরিবেশ তৈরি হয়েছিলো। কয়েক বছর পরে আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'লো রেঙ্গুনের এক বাংলা সাহিত্য-সম্মেলনে। তারপর এ-ই সাক্ষাৎ। ইতিমধ্যে বিপর্যয় ঘটেছে তাঁর জীবনে, পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, দেশত্যাগী হ'য়ে রোমে আছেন আপাতত, ভবিষ্যতের জন্য কোনো স্থির পরিকল্পনা নেই। কোমল প্রকৃতির শান্তভাষী মানুষ, প্রাক্কালীন পূর্ববাংলার স্মৃতি এখনো তাঁকে ব্যথিত করে। আমরা যারা বাংলাভাষী ভারতীয়, আমাদের পক্ষে বিদেশভ্রমণের অন্য একটি সার্থকতা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে : একমাত্র বিদেশেই পূর্ব-পাকিস্তানিদের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের, আর দেখা হ'লেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জাগে, কেননা আমাদের মাতৃভাষা এক।

পরের দিন সকালে হোটেল মিলানোর জানলা থেকে রোমের সঙ্গে চোখাচোখি হ'লো। রৌদ্রে উদ্ভাসিত হলদে গোলাপি কমলারঙের বাড়ি-গুলো, সামনে পিয়াৎসা মন্তেচিতোরিওর চত্বর, পায়রা উড়ছে, পাশেই 'ইল্ টেম্পো' সংবাদপত্রের কার্যালয়, বহুযুগের ওপার থেকে স্নিগ্ধ হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে। টেলিফোন বাজলো, আরম্ভ হ'লো আমাদের কর্মসূচি। এবার রোমে আমাদের বাঙালি বন্ধু অনেক, ইগ্নাৎসিও সিলোনির বাড়িতে পার্টি আছে কাল, তাঁর আইরিশ পত্নী আমাদের ভাটিকান দেখাতে নিয়ে যাবেন। আমাদের দিন ও ঘণ্টাগুলি ভরপুর।

* * *

কিন্তু রোমে এসে সময় গুরুভার হবে, তা প্রায় অসম্ভব। এই অনাদি নগরে, যেখানে মোড়ে-মোড়ে ইতিহাস ও পথে-পথে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে, যেখানে আকাশ নীল এবং রৌদ্র প্রচুর ও মৃদু, যেখানে পাশাপাশি বাসা বেঁধে আছে খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলো, খৃষ্টান মধ্যযুগ, রেনেসাঁস, ও বিশ-শতকী আধুনিকতার চূড়ান্ত, সেখানে কারো পক্ষেই হৃদয়গ্রাহী উপাদানের অভাব হ'তে পারে না। সাত বছর আগে প্রথম যখন এসেছিলুম, একটা সপ্তাহ চোখের পলকে কেটে গিয়েছিলো। একা ছিলুম সেবার, পরিচিত কেউ

ছিলো না, নিজের চেষ্টায় ও সাধ্যে যা কুলোয়, তারই মধ্যে আমার গতিবিধি ছিলো আবদ্ধ। সকলেই যা ছাখে, এমন কিছু-কিছু দ্রষ্টব্য দেখেছিলুম, কিন্তু দৈবাৎ আবিষ্কার করেছিলুম এমন একটি জিনিশ যা সব যাত্রীর চোখে পড়ে না, যার অনুষঙ্গ বৃহৎ অর্থে য়োরোপীয় সভ্যতা নয়, ইংরেজি ভাষার কবিতা। আমেরিকান এক্সপ্রেসের দপ্তর থেকে টাকা ভাঙিয়ে বেরিয়েছি, কয়েক পা হেঁটেই থমকে দাঁড়ালুম। চোখে পড়লো একটি ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর প্রস্তরফলক, একটি বিনম্র, স্বল্পভাষী বিজ্ঞপ্তি : 'কীটস-শেলি মেমোরিয়েল'। আমার উপলব্ধি করতে দেরি হ'লো না যে এই সেই ছাব্বিশ নম্বর পিয়াৎসা দি স্পানিয়া, যেখানে কীটস তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ তিন মাস কাটিয়েছিলেন, এবং যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। স্বল্পালোকিত সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলুম।

তিনটি ঘর নিয়ে এই স্মৃতিভবন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের ঘরটি বড়ো, সেখানে আছে শেলি ও কীটসের ব্যবহৃত ও তাঁদের বিষয়ে রচিত বহু পুস্তক, দেয়ালে কয়েকটি চিত্র ;— শেলিকে দেখা যাচ্ছে বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট, কারাকাল্লার স্নানগৃহের সামনে, হাতে পালকের কলম, কোলে খাতা, 'মুক্ত প্রমিথিয়ুস' রচনা করছেন। শেলির মৃত্যুর পরে ছবিটি এঁকেছিলেন জোসেফ সেভার্ন, যাঁকে স্মরণ না-ক'রে এই ভবনে পদক্ষেপ করা যায় না। রাস্তার দিকে ছোটো ছুটি ঘর ; তারই একটিতে দিনের পর দিন ক্ষয়িত হয়েছিলো কীটস যাকে বলেছিলেন তাঁর 'মরণোত্তর জীবন'। জানলার বাইরে বের্নিনির রচিত ফোয়ারা, আর-একদিকে ধাপে-ধাপে উঠে গেছে হিস্পানি সোপানবৃন্দ, প্রান্তরের মতো উদার, রোমক আলোকে প্লাবিত, উনিশ শতক পর্যন্ত শিল্পীর মডেলদের লীলাভূমি। নিসর্গ ও শিল্পকলা, চিত্রার্পিত অতীত ও বর্ণাঢ্য বর্তমান— কিছুরই অভাব ছিলো না। কিন্তু যে-তরুণ কবি 'সংবেদনময়' জীবন চেয়েছিলেন— ভাবনার নয়— যাঁর আনন্দ ছিলো স্বাদে, সৌরভে, স্পর্শে, শিহরনে— তিনি যখন ইটালিতে এলেন, তখন কোনো অভিঘাতেই সাড়া দেবার আর ক্ষমতা ছিলো না তাঁর। তিনি আর তখন 'জগতের অধিবাসী' নন ; তিনি মুমূর্ষু।

ছোটো ঘর ছুটিতে রক্ষিত আছে কীটসের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিশ, অনেক মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন, কিছু চিঠিপত্রের ফোটোস্টাট প্রতিলিপি। শ্রীমতী লী হাণ্টকে লেখা শেলির বিখ্যাত চিঠি পড়ছি— 'তাঁর (কীটসের) ইটালিতে

আসার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি আমি ; তিনি এলে আমি তাঁর প্রতি যথাসম্ভব নিবিষ্ট হবো। আমার মতে অত্যন্ত মূল্যবান তাঁর জীবন, তাঁর স্বাস্থ্য আমার পক্ষে গভীর প্রযত্নের বিষয়। আমি চাই তাঁর দেহ ও আত্মার চিকিৎসক হ'তে : তাঁকে শারীরিকভাবে উষ্ণ রেখে, তাঁর আত্মাকে আমি উদ্বুদ্ধ করবো গ্রীক ও হিস্পানি ভাষা শিখিয়ে। আমি অবশ্য এ-বিষয়ে সচেতন যে এমনি ক'রে আমি এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে লালন করবো, যিনি আমাকে অতিক্রম ক'রে যাবেন ; আর সেটাও আমার অন্যতম অভিপ্রায়, আমার অন্য এক আনন্দ।' পড়ছি চার্লস ব্রাউনকে লেখা সেভার্নের চিঠি, কীটসের মৃত্যুর চারদিন পরে যা লেখা হয়েছিলো :— 'সে আর নেই ; সহজে, অতি সহজে সে চ'লে গেলো— মনে হ'লো ঘুমিয়ে পড়ছে। তেইশ তারিখে, তখন প্রায় চারটে বেলা, মৃত্যু এগিয়ে এলো। "সেভার্ন— আমি— আমাকে তুলে ধরো— আমি মরছি এবারে— ভয় পেয়ো না— শক্ত হও— এতদিনে এলো, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।" আমি তাকে জাপটে তুলে ধরলাম। তার গলার মধ্যে শ্লেষ্মা যেন টগবগ ক'রে ফুটছে, এগারোটা পর্যন্ত বেড়েই চললো, তারপর ধীরে-ধীরে ঢ'লে পড়লো মৃত্যুতে— এত শান্ত, আমি ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আর লিখতে পারছি না। সমানে চার রাত জেগে আমি আর আমাতে নেই, তার পর থেকেও ঘুমোইনি— আর আমার কীটস আর নেই।...'

'আমার কীটস'— 'my poor Keats'— যেন প্রেমিকার কথা, সন্তানের কথা বলছেন। কিন্তু কথাটায় একটুও অতিরঞ্জন নেই ; ইংলণ্ড ত্যাগ করার সময় থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত কীটস ছিলেন সেভার্নের একান্ত সম্পদ, তাঁর সর্বস্ব। তাঁরই চিঠিপত্রে আমরা জানতে পাই, কী অসামান্য প্রেম ও নিষ্ঠা নিয়ে, কত ত্যাগে, দুঃখে, উৎকণ্ঠায়, তিনি অবিরল ও অবিচলভাবে মুমূর্ষু কবির পরিচর্যা করেছিলেন। শেষের দিকে কীটস সারাক্ষণ আঁকড়ে থাকতেন তাঁকে, রোগী ঘুমোলে তবে তাঁর পক্ষে বেরোনো সম্ভব হ'তো— এদিকে অর্থাভাব, রয়্যাল অ্যাকাডেমির বৃত্তি আর পাচ্ছেন না, ছবি এঁকে ও বিক্রয় ক'রে উপার্জন করবেন এমনও সময় নেই, ইংরেজ ডাক্তার ক্লার্ক ভিন্ন কেউ নেই সাহায্যকারী, তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, স্বদেশের অভ্যস্ত আরামটুকুরও অভাব। দিনে-রাত্রে রোগীর সেবা করছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই প'ড়ে

শোনাচ্ছেন, কথাবার্তা ব'লে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, অর্থাভাবের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিচ্ছেন না; তিনি কখনো একটু অন্যমনস্ক হ'লেই কীটসের অভিমান হয়, তাই নিজের ক্লান্তি প্রাণপণে গোপন করছেন। একদিকে এই— অন্য দিকে চোখের সামনে কীটসের যন্ত্রণা দেখার কষ্ট, তাঁর সব ভালোবাসা ও প্রয়াসের ব্যর্থতার উপলব্ধি। ডিসেম্বর মাস থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো যে আর আশা নেই; রোগীর শরীরের ও মনের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সেভার্ন একটি চিঠিতে বলছেন, 'এই-সবের পরে কেমন ক'রে আবার "কীটস" হবে সে!' ততদিনে কবি কীটস আর নেই— প'ড়ে আছে এক মরত্বভোগী জীব, কতগুলো তীক্ষ্ণ, অসহনীয় অনুভূতির পুঞ্জ।

সেভার্ন বুঝেছিলেন, তাঁর আশ্রয়লগ্ন মুমূর্ষু মানুষটি অমরতার জন্য উদ্দিষ্ট; তাই অত অশান্তির মধ্যেও নিয়মিত চিঠি লিখে গেছেন ইংলণ্ডবাসী বন্ধুদের। সেই পত্রগুচ্ছেই কীটসের শেষ দিনগুলি চিত্রিত হ'য়ে আছে। দুর্ভাগা কবির অভাব নেই জগতে, তাঁদের দুঃখের সম্ভারও বিচিত্র, কিন্তু মৃত্যুকালে কীটসের মতো কষ্ট আর কেউ পেয়েছিলেন ব'লে জানি না। শুধু রোগের যাতনা নয়, শুধু মৃত্যুর ভয়াবহ নিশ্চয়তা নয়— তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ব্যর্থ যৌবনের মনস্তাপ, আর স্মৃতির বিষময় প্রদাহ। যা কখনো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সেই সুখের স্মৃতি, ভালোবাসার স্মৃতি— বন্ধুরা, আমেরিকায় প্রবসিত ভ্রাতা ও প্রিয় ভ্রাতৃবধূ, আর সবার উপরে— সারাক্ষণ— ফ্যানি ব্রন। কবিতাই যাঁর সর্বসময়ের ধ্যান ছিলো, যিনি নিজেও বুঝেছিলেন মৃত্যুর পরে তিনি 'ইংরেজ কবিদের অন্যতম' ব'লে বৃত হবেন, তিনি যে তাঁর মৃত্যুপূর্ব মাসগুলিতে কবিতার কথা একবারও বলেননি, এতেই বোঝা যায় অন্তিম সময়ে অন্য কোন আগুনে তিনি দগ্ধ হচ্ছিলেন। যক্ষ্মারোগ যখন ধরা পড়লো তখন কীটস নারীর প্রেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট— সেই প্রথম অথবা প্রধান প্রেম তাঁর জীবনের, অপূর্ণ, অচরিতার্থ, সর্বশেষ।

হ্রস্ব এই কাহিনী, ও মর্মান্তিক। প্রথম দেখা ১৮১৮ সালে, সেই বছরের ক্রিসমাস-দিবসে বাগ্‌দত্ত হলেন— কিন্তু ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ও জীবিকার অনিশ্চয়তার জন্য বিবাহ পেছিয়ে যেতে লাগলো। ১৮১৯ সালে, প্রেম ও মৃত্যুচেতনার যুগপৎ প্রভাবে উৎসারিত হ'লো তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ— 'নাইটিঙ্গেল', 'গ্রীশান আর্ন,' 'মেলাঙ্কলি', 'ইণ্ডোলেন্স', 'অটাম', 'লা বেল দাম'। ১৮২০-র

ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুর পরোয়ানা পেলেন, কাশির সঙ্গে রক্তক্ষরণ হ'লো। 'ঐ রক্তের রং আমার চেনা, ওটা শিরা থেকে বেরিয়েছে, আমাকে মরতেই হবে।' শরীরতত্ত্বে অভিজ্ঞ কবির এই ঘোষণা ব্যর্থ হ'লো না; কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ। এই সময়ে কয়েক সপ্তাহ ফ্যানি তাঁর পরিচর্যা করলেন; কিন্তু প্রেয়সীকে ধাত্রীরূপে পেয়ে স্বভাবতই তৃপ্তি নেই তাঁর, ফ্যানি যখন কোনো সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোন কীটস তাকিয়ে ছাখেন জানলা দিয়ে— তৃষিত তাঁর দৃষ্টি, হৃদয় দীর্ণ, ঈর্ষায় ও সংশয়ে আকুল তাঁর ভাবনা। সেকালে যক্ষ্মা রোগের কোনো বিধিবদ্ধ চিকিৎসা ছিলো না, অগত্যা ডাক্তাররা ইটালিতে শীর্শতযাপনের পরাম দিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা করলেন কীটস, উৎসর্গিত সেভার্ন তাঁর সঙ্গী। হ্যামস্টেড, সাহিত্যিক গোষ্ঠী, এমনকি কবিতা— সব ছেড়ে আসতে হ'লো, কিন্তু যার বিচ্ছেদ মর্মঘাতী সে ফ্যানি ব্রন। অক্টোবর মাসে জাহাজ থেকে — তখনও বৃটিশ তট ত্যাগ করেননি— ব্রাউনকে লিখলেন— 'যার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি বাঁচতে চাই, তা-ই হবে আমার মৃত্যুর কারণ। আমি নিরুপায়। এ-অবস্থায় কে না নিরুপায় হ'তো?··· এই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় দিনে-রাত্রে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছি, তারপর আবার মৃত্যুচিন্তাকে সরিয়ে দিই— কেননা মৃত্যুতে এই যন্ত্রণার অবসান হবে, আর শূন্যতার চেয়ে যন্ত্রণাও ভালো। মৃত্তিকা ও সমুদ্র, অশক্তি ও স্বাস্থ্যহানি— এরা বৃহৎ বিচ্ছেদকারী, কিন্তু বিরাট মৃত্যু চিরকালের মতো বিচ্ছেদ আনে। তাকে ছেড়ে যাচ্ছি এই চিন্তা সবচেয়ে ভয়াবহ আমার পক্ষে— আমাকে ঘিরে অন্ধকার নেমে আসছে— আমি নিরন্তর তাকে দেখছি নিরন্তর বিলীয়মান··· তার মুখের কথাগুলি আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে। অন্য এক জীবন কি আছে? আমি কি জেগে উঠে দেখবো যে এই সবই স্বপ্ন? তা হ'তেই হবে— এই রকম যন্ত্রণার জন্য আমাদের সৃষ্টি হ'তে পারে না।' সেই জাহাজেই— যখন স্বদেশের তট তাঁর দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, শেক্সপীয়রের কাব্যগ্রন্থের একটি শাদা পাতায় রচনা করলেন তাঁর 'ভাস্বর নক্ষত্র' সনেট— তাঁর শেষ কবিতা। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে সেটি একটি পুরোনো রচনার পুনর্লেখন, এক বিশেষজ্ঞের মতে এর আদি উদ্দিষ্টা অন্য এক নারী, কিন্তু, স্থান, কাল ও কবির অবস্থার কথা ভাবলে এ-বিষয়ে সন্দেহ

থাকে না যে শেষ লেখনটি ফ্যানির উদ্দেশেই তাঁর অন্তিম অর্ঘ্যদান। পয়লা নবেম্বর তারিখে নেপলস থেকে আবার চিঠি— কোয়ারানটাইনে অপেক্ষা করছেন তখন : 'তাকে যে আর দেখবো না এই চিন্তা আমাকে মেরে ফেলছে। ব্রাউন, শোনো— আমার যখন স্বাস্থ্য ছিলো তখনই তাকে গ্রহণ করা আমার উচিত ছিলো, তাহ'লে আমি সুস্থও থাকতাম। মৃত্যু আমি মেনে নিতে পারি, কিন্তু তাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসহ্য। ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমার তোরঙ্গে যা-কিছু আমাকে তার কথা মনে করিয়ে দেয়— সব আমাকে বর্শার মতো বিঁধছে।... আমার কল্পনা তার বিষয়ে বীভৎসভাবে জীবন্ত।— আমি তাকে দেখতে পাই— শুনতে পাই। পৃথিবীতে এমন-কিছু নেই যা মুহূর্তের জন্যও তার চিন্তা থেকে আমাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে।... তার কাছে চিঠি লেখার সাহস নেই আমার— তার চিঠি পেলে, তার হাতের লেখা দেখলে আমার বুক ভেঙে যাবে— যে-কোনোভাবে তার কথা শুনলে, তার নাম কোথাও লেখা আছে দেখতে পেলে, আমার সহ্য হবে না। ব্রাউন, ব্রাউন, আমি কী করি বলো তো? কোথায় খুঁজি আরাম বা সান্ত্বনা? যদি বা আমার সেরে ওঠার কোনো আশা থাকতো, এই আবেগ আমাকে মেরে ফেলবে।'

এই রকম আর্ত চীৎকার আর আমরা শুনতে পাই না; আসন্ন মৃত্যু চিঠি লেখার ক্ষমতাও কেড়ে নিলো, চিঠিপত্র যা আসে তাও কীটস না-খুলে ফেলে রাখেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি— যে-রাত্রে কীটস তাঁর সমাধিলিপি রচনা ক'রে সেভার্নকে লিখে নিতে বললেন— সে-দিনের ডাকে একটি চিঠি এলো— যার দিকে তাকিয়ে কীটস যেন 'টুকরো-টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে গেলেন।' সেভার্ন লিখছেন— 'চিঠিটা সে প'ড়ে দেখলো না— পারলো না পড়তে— কিন্তু আমাকে বললে ওটাকে তার কফিনের মধ্যে দিয়ে দিতে, আর সেই সঙ্গে তার বোনের একটি (না-খোলা) চিঠি, আর একটি বটুয়া। তারপর আবার বললে সেই চিঠিটা যেন না-দিই— শুধু তার বোনের বটুয়া আর চিঠি, আর কিছু চুল।' সেভার্ন বোঝেননি যে অন্য পত্রটি ফ্যানি ব্রন-এর— মনে হয় ফ্যানির সঙ্গে কীটসের সম্পর্কও তাঁর অগোচর ছিলো— কিন্তু ঐ দুটি পত্রই তিনি বিশ্বস্তভাবে কফিনে প্রোথিত করেছিলেন। কেশগুচ্ছ কার, বা তার কী গতি হয়েছিলো, সে-বিষয়ে তিনি নীরব। আমরা ভাবি : কীটস কেন ফ্যানির পত্রটি পড়লেন না,

পড়লে হয়তো মৃত্যুর আগে মুহূর্তের সান্ত্বনা পেতেন; আর ভাবি, সেভার্ন কেন বন্ধুকে অমান্য ক'রে পত্রটি রক্ষা করলেন না, উত্তরকালের তাতে দাবি ছিলো না তা তো নয়।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে মৃতপ্রায় কবির একটি ছবি এঁকেছিলেন সেভার্ন, সেটি এই স্মৃতিভবনে রক্ষিত আছে। কবিদের যত ছবি আমি দেখেছি তার মধ্যে অন্য কোনোটি নয় এমন করুণ ও মর্মস্পর্শী। শুধু মুখখানা দেখা যাচ্ছে, শয্যা ও দেহের রেখা অস্পষ্ট; বালকের মতো সরল ও সুকুমার একটি মুখ— জীবন্ত ও সুস্থ কীটসের অবয়বের সঙ্গে প্রায় কিছুই সাদৃশ্য নেই— কৃশ, পাংশু— মাথার উপরে কৃষ্ণবর্ণ বৃত্তটির জন্য আরো পাংশু— ঘর্মাক্ত চুল কপালে লেপটে আছে, ঘন ভুরুর নিচে মুদ্রিত চোখ, গালের হাড় উঁচু, নাসিকা একটু বেশি তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠ আর অধর সংলগ্ন। একটি অচেতন মুখ, প্রায় মৃত, কোনো যন্ত্রণা নেই আর, কোনো আকাঙ্ক্ষাও নেই, স্বপ্নহীন সুষুপ্তিতে লীন, অথচ যেন জীবনের স্মৃতি এখনো একেবারে ভুলে যায়নি, চিরন্তনের দুয়ারে অপেক্ষা করছে। ছবির তলায় সেভার্ন লিখে রেখেছেন: 'রাত তিনটে, জেগে থাকার জন্য আঁকলাম— সারা রাত এক মারাত্মক ঘাম ছিলো তার শরীরে।' এই লিপির সংসর্গে ছবিটি আরো যেন অবিকল হ'য়ে ওঠে, কীটসের মৃত্যুর সঠিক মুহূর্তটিকে আমরা যেন অনুভব করতে পারি। পরবর্তী এক কবি— যিনি সম্ভবত কীটসের কোনো কবিতা পড়েননি— শুধু এই ছবিটি দেখে যে-কবিতা লিখেছিলেন তার একটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত না-ক'রে পারছি না:

'কার মুখ? সেই সব অবয়বের নয়, যা এখনো
পূর্বতন বোধের মধ্যে পরস্পরে সংলগ্ন।
চোখ, যা আর কখনো পার্থিব উপাদান থেকে নিংড়ে নেবে না সৌন্দর্য,
আজ তুমি অস্ত গেলে। গানের উন্মোচিত দুয়ার,
তরুণ ঠোঁট, তরুণ ঠোঁট চিরকালের মতো সমর্পিত!'

(রাইনের মারিয়া রিলকে)

* * *

কীটস-শেলি স্মৃতিভবনের মতোই মর্মস্পর্শী আরো একটি স্থান সেবারে রোমে এসে দেখেছিলাম: সেটি প্রটেস্টান্ট সিমেট্রি। বাস্ থেকে নেমে, অনেকবার পথ ভুল ক'রে, চেষ্টিয়ুস-পিরামিডের পাশ দিয়ে একটি জনশূন্য রাস্তায়

কবরখানার দেয়াল ও দ্বার খুঁজে পেলাম। তখন আকাশে অপরাহ্ণ আনত, দরজা বন্ধ করার সময় হয়েছে— কিন্তু প্রহরীরা— বোধহয় বিদেশী দেখে— আমাকে ঢুকতে দিলে। কবরখানায় আর কোনো দর্শক ছিলো না; আমার সঙ্গী শুধু শ্রেণীবদ্ধ আঁধারবরন দীর্ঘকায় সাইপ্রেসের বীথিকা, মার্টল-এর পল্লব, নানা বর্ণের ফুল ও গুল্ম, কোমল ঘাস, বাতাসের নিশ্বাস— আর মৃতেরা, বিখ্যাত ও নগণ্য মৃতেরা, আর আমার মনে দুই ইংরেজ কবির স্মৃতি। সাইপ্রেসের ঝাপসা অন্ধকারে শুভ্রতর দেখাচ্ছে সমাধিগুলোকে, মাটির বুক থেকে উঠছে ঝাপসা ও মধুর এক সৌরভ— মাটির তলায় যারা চ'লে গেছে তাদেরই নির্যাস যেন— যেন মানবাত্মার সুবাস— আকস্মিক দু-একটি পাখির ডাক তখনই আবার স্তব্ধতায় ডুবে যাচ্ছে। আমি একটি গভীর শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য অনুভব করলাম, একটি পবিত্র ইন্দ্রিয়প্রীতি— আনন্দ নয়, বেদনাও নয়, কোনো রহস্যের কাছে বিনম্র সমর্পণ যেন। শেলি ও কীটসের সমাধি ঠিক কোথায় আছে জানি না, এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছি— হঠাৎ চোখে পড়লো একটি ফলকের উপর গ্যেটের পুত্র আউগুস্ট্‌সের নাম— তারপর, যখন পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে সূর্যাস্তের আভা ঝ'রে পড়ছে, তখন খুঁজে পেলাম শেলিকে। শেলি, তাঁর পাশে ট্রেলনি— দুটি কবরই শয়ান, ঋজু নয়, মনোযোগী না-হ'লে চোখে নাও পড়তে পারে। বহুকালের চেনা সেই লিপি আবার পড়ছি: 'Cor Cordium'— 'হৃদয়ের হৃদয়'— সেই বহুবর্ণিত দৃশ্য আবার মনে পড়ছে। ভিয়ারেজ্জিওর সৈকতে জলমগ্ন কবিকে দাহ করা হচ্ছে— সব আয়োজন করছেন ট্রেলনি; লী হান্ট ও বায়রন এসে পৌছলেন। সামনে সদ্বীপ সমুদ্র, পিছনে আপেনাইন পর্বতের চূড়া, সূর্যালোক উদার, দৃষ্টিগোচর কোনো গ্রাম বা বসতি নেই— যে-কবি নিসর্গের বিশালতা ভালোবাসতেন, তাঁরই যোগ্য যেন স্থানটি। চিতায় অর্ঘ্য দেয়া হ'লো ধূপ, লবণ ও প্রচুর সুরা— অত সুরা শেলি তাঁর সারা জীবনে পান করেননি— আর কীটসের সেই শেষ কাব্যগ্রন্থটি, যেটি মৃত শেলির পকেটে পাওয়া গিয়েছিলো। আগুনে হাত দিয়ে ট্রেলনি ছিনিয়ে আনলেন শেলির অদগ্ধ হৃৎপিণ্ড, অবশিষ্ট দেহ ভস্মীভূত হ'লো, বায়রন সমুদ্রে নেমে বহু দূরে সাঁৎরে চ'লে গেলেন, যেন নিজেরই কাছে প্রমাণ করতে চান যে অন্তত তিনি কখনো জলে ডুবে মরবেন না।

কীটসের স্মরণে লেখা 'অ্যাডোনেসে'র ভূমিকায়, এই কবরখানার উল্লেখ

ক'রে শেলি লিখেছিলেন: 'এত মধুর এই স্থান— এখানে কবর দেয়া হবে ভাবলে মৃত্যুর প্রেমে প'ড়ে যেতে হয়।' এবং ঐ কবিতারই শেষ স্তবকটিকে মনে হয় যেন শেলির নিজের মৃত্যুর অচেতন ভবিষ্যদ্বাণী— 'তীর ছাড়িয়ে দূরে চ'লে যাচ্ছে আমার আত্মার তরণী, ঝঞ্ঝায় ছিন্ন হ'লো পাল, দীর্ণ হ'লো পৃথিবী ও আকাশ— দূরে, অন্ধকারে, ভয়াবহ দূরে আমি বিলীয়মান।' কীটসও ছিলেন 'half in love with easeful death', গ্রীক ভাস্কর্য দেখে তাঁর মনের উপর 'অনিচ্ছুক নিদ্রার মতো মরত্বের ভার' নেমে আসে, আবার 'অমরতায় ভারাক্রান্ত' হ'য়ে ওঠে তাঁর হৃদয়, যখন নারীর প্রভাবে 'নিদারুণ উষ্ণতা' তাঁকে আবিষ্ট করে। এই মৃত্যুচেতনা রোমান্টিক কবিতার একটি সাধারণ লক্ষণ— শুধু শেলি ও কীটসের নয়— কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর বৈশিষ্ট্য ও সামীপ্য এই দু-জনের উক্তিগুলিকে ইঙ্গিতময় ক'রে তুলেছে। এঁরা যে একই স্থানে শেষ আশ্রয় পেয়েছিলেন, এই ঘটনা ইতিহাসের একটি মনোমুগ্ধকর সমাপতন। কীটস একবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে যেন ফ্যানি ব্রনের বাসার কাছাকাছি কবর দেয়া হয়, তা হয়নি ব'লে কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন এমন কথা কখনো শোনা যায়নি।

এই 'মধুর স্থানে' শেলি ও কীটস নিকট প্রতিবেশী নন। কীটস স্থান পেয়েছিলেন কবরখানার অন্য এক প্রান্তে— সম্ভবত বেশি প্রাচীন নয় সেটি, তরুপল্লব তেমন ঘন নয়, প্রায় পাশেই চেস্টিয়ুসের পিরামিড, যার সংলগ্ন ভূমিতে শেলি তাঁর বালক-পুত্র উইলিয়মকে প্রোথিত করেছিলেন। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। 'এইখানে শুয়ে আছে— যার নাম জলে ছিলো লেখা': এই বেদনাময় ও মিথ্যা ঘোষণা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কীটসের কবর, তার শিরোভাগে একটি ছিন্নতার বীণা ক্ষোদিত। যেমন শেলি ও ট্রেলনি, তেমনি এখানে দেখলুম পাশাপাশি কীটস ও সেভার্নকে— আর সেভার্নের পাশে, একটি ক্ষুদ্র সমাধিতে তাঁরই শিশুপুত্রের নাম উৎকীর্ণ। এই ক্ষুদ্র সমাধিটি দেখে আমার মন কেমন উদ্বেল হ'লো; আমি অনুভব করলাম যে আমি এখানে এসে যা দেখছি, তা শুধু কবিতীর্থ নয়, শুধু নয় প্রতিভার উদ্দেশে অভিনন্দন— তা বন্ধুতার বিজয়স্তম্ভ, কামগন্ধহীন হার্দ্য প্রণয়ের প্রতিচ্ছবি। ট্রেলনি ও সেভার্ন— দু-জনেই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, দু-জনেই ছিলেন নানা কর্মে ও ঘটনায় ব্যাপৃত, অথচ তাঁরা তাঁদের অকালমৃত কবি-বন্ধুদের

ভোলেননি, দীর্ঘকাল ধ'রে জীবন্ত রেখেছিলেন স্মৃতি, তাঁদের শেষ বিশ্রামস্থান বেছে নিয়েছিলেন কবিদ্বয়েরই পাশাপাশি—সেভার্ন, এমনকি, নিজের ভবিতব্য নিশ্চিত জেনে— মৃত পুত্রকে একই পুণ্য অঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন। পত্নীরা নন, কোনো প্রণয়িনী নন, যেন পরপারেও বন্ধুরাই অনুগামী। এ-রকম প্রতিভাবান মৃত্যুজয়ী বন্ধুতা ইতিহাসে সুলভ নয়। বিশেষত এই বিশ শতকে, যখন বৎসরে-বৎসরে বন্ধুতার ক্রমিক অবক্ষয় প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন এই কবরখানায় দাঁড়িয়ে একাধিক কারণে নত শিরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের। নিজেকে আমার ভাগ্যবান মনে হ'লো আজ এখানে আসতে পেরেছি ব'লে, এই নির্জন ও সান্ধ্য লগ্নে, শীতল-হ'য়ে-আসা মরকতবর্ণ আকাশের তলায়। কৃতজ্ঞ বোধ করলাম সেই মার্কিনী লেখকদের প্রতি, যাঁরা ১৯০৩ সালে প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন শেলি ও কীটসের রোমক স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য— এবং ভাগ্যের কাছে, যেহেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উন্মত্ততায় এ-সব স্মৃতি বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হয়নি।

শেলি ও কীটস— এই দুটি নাম যুক্ত হ'য়ে আছে আমাদের মনে— অবিচ্ছেদ্য, অনাক্রমণীয়— শেলি ও বায়রন নয়, শেলি ও কীটস। অথচ শেলির সঙ্গে কীটসের কতটুকুই বা দেখাশোনা হয়েছিলো, কতটুকুই বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো এঁদের মধ্যে! অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলো শেলির সঙ্গে বায়রনের সম্বন্ধ— বিশেষত তাঁদের মহিলাদের মাধ্যমে। কিন্তু যে-দুই কবি ইংরেজি ভাষার তরুণতম ও প্রবলতম রোমান্টিক, মৃত্যু তাঁদের দু-জনের পথ এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলো, যেন তাঁরা আজন্মসম্পৃক্ত, পরস্পরের নিয়তির অংশীদার। তাঁদের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে ভাগ্যকে মনে হয় অন্ধ নয়, চেতন, খামখেয়ালি নয়, বোধসম্পন্ন; কেননা কেমন সুশোভনভাবে এই কবরখানায় তাঁরা অবস্থিত, আকাশ ও আলোকের প্লাবনে, সনাতন রোমে, এক গভীর ও বার্তাবহ তমিস্রায়। এখানে অনেক-কিছুই আছে যা তাঁদের কাব্যের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা, এবং প্রায় কিছুই নেই যা তাঁদের ভালোবাসার অযোগ্য। আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে রোমে আমি যা-কিছু দেখেছিলাম এবং এবারে দেখছি, তার মধ্যে আমার পক্ষে সবচেয়ে স্মরণীয়— সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ নয়, ক্যাথলিক ধর্মের গরিমা নয়, এমনকি সিস্টিন চ্যাপেলও নয়— তা এই দুটি শান্ত ও শীতল স্থান; ক্ষুদ্র, এবং অদ্বিধভাবে গ্রহণীয়; যার উৎসস্থল ক্ষমতা নয়,

দম্ভ নয়, কবিতারই মতো গোপন একটি মাধুরী— কীটস-শেলি স্মৃতিভবন, এবং তাঁদের সমাধিক্ষেত্র। অতএব এই মহানগর বিষয়ে আর-কিছু না-ব'লে পাঠকের কাছে বিদায় নিতে চাই।

* * *

কিন্তু একটা কথা যোগ না-করলে আমার নিজেরই তৃপ্তি হবে না। আমরা যেদিন রোম থেকে ছাড়লাম সেদিন আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে এলেন আবার সেই পূর্ববঙ্গীয় কবি শাহাবুদ্দিন। কর্মচারীদের এড়িয়ে অথবা রাজি করিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চ'লে এলেন সেই সর্বশেষ আঙিনা পর্যন্ত, যেখানে যাত্রী ভিন্ন অন্য কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্লেনের ঘুলঘুলি থেকে আমরা দেখলুম তিনি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মাঝে-মাঝে রুমাল চাপছেন চোখে, আমরাও রুমাল নাড়ছি, কিন্তু তিনি তা খুব সম্ভব দেখতে পাচ্ছেন না। যতক্ষণ না প্লেন ছাড়লো, ততক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তাঁর চোখের জল দূরে ব'সেও আমরা অনুভব করলাম। মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে ভিয়েনার এয়ারপোর্টে আমাদের বিদায় দিতে এসে একটি দু-দিনের চেনা বঙ্গমহিলা শেষ মুহূর্তে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ-সব কান্না আমাদের জন্য নয়, স্বদেশের জন্য। দেশপ্রেম ব্যাপারটা বড়ো আশ্চর্য; বিশ্লেষণ করলে তা একগুচ্ছ কৈশোরস্মৃতি ভিন্ন আর-কিছু নয়, কিন্তু— যে-কোনো দেশে, যে-কোনো অবস্থায়— সেই স্মৃতির মায়াজাল অনতিক্রম্য।

না-দেখা পর্যন্ত ধারণা করা যায় না আথেন্স কী জিনিশ। ন্যুয়র্ক, প্যারিস, রোম— এমনকি রোম— এরা বর্ণনার হাতে কিছুটা ধরা দেয় ; বই প'ড়ে, ছবি দেখে, বিবরণ শুনে এদের অন্তত আঙ্গিক দিকটা অনুমান ক'রে নেয়া সম্ভব। তাছাড়া, জগৎ জুড়ে কী বিজ্ঞাপন এ-সব নগরের, নানা কারণে প্রতিপত্তি কী বিপুল! আজকের দিনে কে না দেখেছে মানহাটান আকাশলেখার ছবি, ভাটিকান বা আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ-এর গরিমার সঙ্গে কে না পরোক্ষভাবে পরিচিত! কিন্তু আথেন্স মানে শুধু একটি অস্পষ্ট ঐতিহাসিক জনশ্রুতি, আধুনিক কালে তার কোনো স্বাক্ষর নেই ; রাষ্ট্রপুঞ্জের কোনো শাখা সেখানে স্থাপিত হয়নি, হর্ম্য তোলেনি কোনো বিখ্যাত আত্মক্ষরমালা, হলিউডের বিখ্যাত যুগলের প্রণয়-লীলার ঘটনাস্থল নয় সে, ধর্ম বাণিজ্য সংস্কৃতি বা কূটনীতির কোনো কেন্দ্র ব'লেও গণ্য হ'তে পারে না ; তার কাছে আসতে হ'লে নিতান্ত তারই জন্য আসা চাই, কোনো ঐহিক বা পারমার্থিক লাভের জন্য নয়। তাই যারা ভ্রাম্যমাণ বা ভ্রমণেচ্ছু তাদের মুখে আথেন্সের নাম সবচেয়ে কম শোনা যায় ; তার এয়ারপোর্টের ক্ষুদ্র আয়তনই প্রমাণ করে সেখানে যাত্রীদের ভিড় কত কম। অথচ মানতেই হবে, তার মাটিতে দু-ঘণ্টা দাঁড়ালেও এমন-কিছু পাওয়া যাবে যা অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। যেহেতু এর বিজ্ঞাপন কম, বা কিছুই নেই, তাই প্রথম দেখার অভিঘাতও তীব্র।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরের দিকে আসতে-আসতেই এই কথাটা অনুভব করেছিলাম। অন্য সব জায়গায় দেখেছি, বাস্-এর যাত্রীরা নীরবে ও স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে, নতুন দেশ বিষয়ে মনে-মনে ঔৎসুক্য থাকলেও কারো মুখে তা প্রতিফলিত হয় না। এই সুসভ্য আচরণের একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলো আথেন্সে। তখন রৌদ্রময় বিকেল, শান্ত নীল সমুদ্র ঘেঁষে বাস্ চলেছে। সেই সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে আছি আমি, কিন্তু কানে আসছে দু-তিন ভাষায় কথাবার্তা, যাত্রীদের মধ্যে কেমন-একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ছে। রাস্তা মোড় নিলো, সমুদ্র গেলো মিলিয়ে, কাছে এলো নতুন-তৈরি শহরতলি, সদ্য-চুনকাম-করা শাদা বাড়িগুলো উজ্জ্বল রোদে চোখ-ধাঁধানো। ঢালা ছাদ, খোলা বারান্দা— রোমেও নতুন পাড়াগুলোতে এ-সব প্রাচ্য বিভাব দেখে এসেছি ; কিন্তু এখানে মাটির রঙে ধূসর গেরি মেশানো, ঘাস কম, তাপ বেশি, আর আকাশের নীলিমা

দর্পণের মতো স্বচ্ছ ;— সব মিলিয়ে হঠাৎ মনে হ'তে পারতো বুঝি আমরা য়োরোপে আর নেই। বাস্ এগিয়ে চললো নগরের দিকে, সামনে দেখা দিলো এক পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় পুরোনো এক মন্দির।

হঠাৎ একটা চীৎকার উঠলো বাস্-এর মধ্যে— 'আক্রোপলিস! পার্থেনন!' তাকিয়ে দেখি, যাত্রীদের একজন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, চারদিকে তাকিয়ে, নিশেনের মতো হাত উড়িয়ে, বাস্-এর অন্য সকলকে শোনাবার আন্দাজ গলা চড়িয়ে বলছেন— 'ঐ যে— দেখতে পাচ্ছেন আপনারা?— পার্থেনন, আক্রোপলিস! আমি আমেরিকান, আমেরিকায় থাকি, পঁয়তিরিশ বছর পরে ফিরে আসছি এখানে-- ঐ দেখুন! ঐ যে আথেনার মন্দির!' লোকটি প্রৌঢ়, স্থূলকায়, মাথায় টাক প'ড়ে গেছে, পঁয়তিরিশ বছর আমেরিকায় থেকেও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলেন; কিন্তু ভাষার অভাব তাঁর উত্তেজনার অন্তরায় হ'লো না, তাঁর উৎসাহ সকলের মধ্যে সংক্রমিত হ'লো। অন্য অনেকে তাঁর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন, আরো কেউ-কেউ উঠে দাঁড়ালেন ভালো ক'রে দেখার জন্য; একটি মুখর বাস্ টার্মিনালে থামলো।

টার্মিনালের সামনে মস্ত পার্ক, ইংরেজিতে তার নাম কনষ্টিট্যুশন স্কোয়ার। এই পার্কের এক দিকে পার্লামেণ্ট, তার পিছনে পাহাড়ের সারি। অন্য তিন দিক ঘিরে নানা এয়ার-লাইনের আপিশ, আর কয়েকটা বড়ো-বড়ো হোটেল, তারই একটাতে আমাদের জন্য ঘর ঠিক ছিলো। হোটেল গ্রঁদ-ব্রেতান তার নাম, কিন্তু ব্যবহারে কিছুমাত্র ইংরেজিয়ানা নেই। যে-ঘরটিতে আমাদের নিয়ে গেলো তার জানলা দিয়ে একটা উঠোনমাত্র দেখা যায়, আর হোটেলের এই চতুষ্কোণ উঠোনগুলোর মতো মন-খারাপ-করা জিনিশ পৃথিবীতে অল্পই আছে। আমি বললুম, 'অন্য ঘর নেই? রাস্তা দেখা যায়, এমন কোনো?' দু-মিনিটের মধ্যে ইচ্ছা পূরণ হ'লো আমার, ইচ্ছের চেয়ে বেশিও কিছু জুটলো। ঝকঝকে সুন্দর ঘর, আরামের কোনো অভাব নেই, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। ঘর পেরিয়ে বারান্দা আছে, বারান্দায় বসবার ব্যবস্থা, নিচে পার্কের বিস্তার, বাঁ দিকে পাহাড়ের পটভূমি নিয়ে পার্লামেণ্ট— কিন্তু তাও তেমন বড়ো কথা বলতে পারি না। ডান দিকে তাকালেই চোখে পড়ে আক্রোপলিসের উচ্চতা, পার্থেননের ত্রিকোণ ললাট আর সারি-সারি সরল স্তম্ভ চোখে পড়ে। এটাই আশাতীত ও আশ্চর্য।

আমাদের গ্রীক বন্ধুর নাম কোরাকাস। ছিপছিপে আধা-বয়সী মানুষ, অঙ্গভঙ্গি মেয়েদের মতো মৃদু, কথা বলেন ধীরে-ধীরে, ইংরেজির সঙ্গে ফরাশি জর্মান শব্দ মিশিয়ে কোনোরকমে মনের ভাব বুঝিয়ে দেন ; যাদের স্বাস্থ্য ভালো না, বা যারা রাত জেগে পড়াশুনো করে, তাদেরই মতো অর্ধমনস্ক কমনীয়তা তাঁর ব্যক্তিত্বে। বারান্দার চেয়ারগুলি তিনি এমনভাবে সাজালেন যাতে আমরা দু-জন পরিষ্কার পার্থেনন দেখতে পাই ; নিজে বসলেন আমাদের মুখোমুখি ; চা খেতে-খেতে— গ্রীকরা বলে 'চায়ি'— আমাদের কর্মসূচি প্রস্তাব করলেন। (আশ্চর্যের বিষয়, চা-টা ভালো, যা আমরা এডিনবরার পরে কোথাও পাইনি— আর এতেই বোধহয় হোটেলের নামকরণ সার্থক, কেননা পরে অন্যত্র দেখেছি আথেনীয় চা অপেয়।) প্রথমে ভেবেছিলেন, কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে নিমন্ত্রণসভা ডাকবেন, 'কিন্তু আপনারা তো একদিনের বেশি থাকছেন না, তাই মনে হ'লো সামাজিকতায় সময় নষ্ট করা উচিত হবে না আপনাদের, বরং যতটা পারেন আথেন্স দেখে নিন। এখন চা খেয়ে চলুন প্রথম একবার পার্থেননে, তারপর— যদি ইচ্ছে হয়— আবার দেখবেন রাত বেশি হ'লে, আজ জ্যোৎস্না আছে। জানেন হয়তো, পার্থেননে দেয়ালি জ্বলে সারা রাত, শুধু পূর্ণিমার আগে পরে কয়েক রাত্রি আলো বন্ধ থাকে। আমি দশটা অবধি আপনাদের সঙ্গে থাকবো, তারপর— আমার ছেলে আজ জর্মানি থেকে ফিরছে, তার ট্রেন পৌঁছবে সাড়ে-দশটায়, তাকে আনতে স্টেশনে যাবো। কাল সকালে ম্যুজিয়মে নিয়ে যাবো আপনাদের। ডেলফাইতে যেতে চান? কিন্তু না— সেখানে গেলে এক রাত থাকতে হয়, আর আপনারা তো কালই চ'লে যাচ্ছেন।'

* * *

আক্রোপলিসে বেশি দূর গাড়ি চলে না, অনেকটা হেঁটে উঠতে হয়। পথ এবড়োখেবড়ো, ভাঙা স্থাপত্যের পাথর মাঝে-মাঝে সিঁড়ির কাজ করছে, কোথাও-কোথাও প্র.ব.-কে সাহায্য করার প্রয়োজন ঘটলো। রুক্ষ পাহাড় ; তার ধাপে-ধাপে গাছপালা যেন করুণভাবে আঁকড়ে আছে, কিন্তু শিখরদেশ শিলাময়, সেখানে শ্যামলতা একটুও প্রশ্রয় পায়নি ;—আমাদের পায়ের তলায় প্রাকৃত পাথর কঠিন হ'য়ে আছে, আর চারদিকে রচিত পাথর জাগ্রত ; আমাদের দুই দিকে পাহাড়ের সারি আর তিনদিকে সমুদ্রের বেষ্টন ; আর এই সব-কিছুর

উপর, এক অগাধ অব্রণ নীলিমা থেকে, ঝ'রে পড়ছে সূর্যাস্তের প্রসাদ, যেন দূরের সঙ্গে দূরতরকে মিলিয়ে দিয়ে। যা প্রকৃতির দান, আর যা মানুষের সৃষ্টি, যা শাশ্বত, এবং যা মানবভাগ্যের উত্থানপতনে বিজড়িত— এই দুয়ে এমন সমন্বয় আর কোথাও অনুভব করিনি।

কিন্তু আর কোথাও কিছু কি আছে যা কোনো দিক থেকেই এর সঙ্গে তুলনীয়? গ্রীক বিদ্যায় আমার জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর; ভক্তের বা পণ্ডিতের মন নিয়ে আমি এখানে আসিনি; বরং আমি এতদিন জেনেছি যে গ্রীক শিল্পে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিতে আমি অক্ষম। কিন্তু যে-মুহূর্তে, এক জুন মাসের সূর্যাস্তের লগ্নে, আক্রোপলিসের পাথর বেয়ে আমি পার্থেননে এসে দাঁড়ালাম— মনে হ'লো, আমার জীবন ধন্য হ'লো, ইচ্ছে হ'লো আনত হ'য়ে ঐ ভূমিকে চুম্বন করি। স্বদেশের তীর্থস্থল কিছু দেখিনি তা নয়, আর এই সেদিন য়োরোপের বিখ্যাত কয়েকটি দেবালয় দেখলাম— শার্ৎ, নৎর দাম, সন্ত পিটারের মন্দির— কিন্তু আর কখনো মনে হয়নি যে দেবতার স্পর্শ পেলাম, মনে হয়নি দেবতারা বাতাসের মতো ঘিরে আছেন আমাকে। হয়তো, একবার এক মুহূর্তের জন্য, এমনি পবিত্রতার অনুভূতি আমার হয়েছিলো, যখন কোনারকে আরোহণকালে আকস্মিক ও আশাতীতভাবে আমার চোখের সামনে খুলে গিয়েছিলো সমুদ্র, বা যখন, এক শরতের দুপুরে, ভুবনেশ্বরের ছায়া-ঘেরা কুণ্ডের পাতা-ঝরা নির্জন জলে অবগাহন করেছিলাম। কিন্তু তখন আমার জীবন ছিলো নতুন, যৌবনে ছিলো আবেগ, আত্মহারা হওয়া অনেক বেশি সহজ ছিলো আমার পক্ষে। সেই সব অযাচিত স্পন্দন অতিক্রম ক'রে, এতদিন পরে পার্থেননের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তার ছাদ সম্পূর্ণ ধ্ব'সে গেছে, কোনোদিকে দেয়াল আর নেই, সব বৈভব অন্তর্হিত, তবু— অথবা সেইজন্যেই— তার সম্মোহন অপ্রতিরোধ্য। আক্রোপলিস আদিতে যা ছিলো তার প্রতিমান বিশেষজ্ঞরা গড়েছেন; ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে যে গ্রীক শিল্পের বৈশিষ্ট্যই বোধহয় এই ছিলো যে ধ্বংসের দ্বারা তার আকর্ষণশক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব-বার্লিনের ধ্বংসস্তূপ যেমন বেদনাদায়ক তেমনি অসুন্দর, আধুনিক অট্টালিকা আহত হ'লেই ম'রে যায়, কিন্তু সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও পার্থেননের ছন্দ অটুট, আত্মা অমর। মনে হয়, দেবতারা এখনো এখানে বেঁচে আছেন।

বলা কি যায়— হয়তো, বহু যুগের ওপারে, আমিও একবার আটিকায় জন্মেছিলাম, হয়তো ছিলাম সেই বন্দীদের অন্যতম, যারা ইউরিপিডিসের কবিতা-আবৃত্তির পুরস্কারস্বরূপ মুক্তিলাভ করেছিলো। কিন্তু তখন আমি নিশ্চয়ই ছিলাম মনে-মনে সংশয়ী, আমার স্ত্রী যখন অর্ঘ্য সাজিয়ে মন্দিরে নিয়ে যেতেন আমি মৃদু হেসে ভাবতুম মেয়েদের বিনোদ হিশেবে পুজো-আর্চা ভালোই; হোমর ইত্যাদি কবিদের রচনা পাঠ করার ফলে আমি অলিম্পাসকে মর্ত্যধামেরই অতিচিত্র ব'লে জেনেছিলুম— যদিও মুখে সে-কথা প্রকাশ করিনি, পাছে ছায়ালোকের পথে সক্রেটিসের অনুগামী হ'তে হয়। কিন্তু কোথায় সেই নিখিল-আথেনীর পার্বণের দিন, আর কোথায় বিশ শতকের এই মুহূর্ত! সেই দিনের যা-কিছু বিঘ্ন— আচার, সংস্কার, অনুশাসন, জনমত— সব লুপ্ত হয়েছে। কবিতায় ও ভাস্কর্যে সংকলিত হ'য়ে দেবদেবীরা আজ নির্বিষ: জ্যুসের স্বৈরাচার বা হেরার হিংসাবৃত্তি আর মানবজীবনকে আশঙ্কায় দুলিয়ে রাখে না, এমনকি সেই সব গরীয়ান মন্দির ও মূর্তিও আজ হয় অন্তর্হিত, নয় তো বিধ্বস্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে। পার্থেননের বহু অঙ্গ আজ নিশ্চিহ্ন, নীলনয়না আথেনা দেবীর যে-বিরাট মূর্তির সামনে সেদিন দলে-দলে পূজক এসে দাঁড়িয়েছে, আজ তা প্রবচনে পরিণত; নিকে অথবা বিজয়ার মন্দিরেও বিগ্রহ নেই; সিংহদ্বার ভগ্ন, এরেকথিয়নের মহিমার প্রমাণস্বরূপ ছয়টি পাষাণময়ী সজীব কুমারী দাঁড়িয়ে আছেন। আক্রোপলিসে আজ আমরা যা-কিছু দেখছি তা অনেক সংবর্তের উদ্বৃত্ত মাত্র; প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইরানিরা, প্রায় তিনশো বছর আগে তুর্কি ও তারপর ভেনেশীয় বাহিনী একে ধ্বংস ক'রে দেয়; খৃষ্টানের গির্জে স্থাপিত হয়েছিলো পার্থেননে, তুর্কি মসজিদের চিহ্ন আজও দ্রষ্টব্য। অবশেষে উনিশ শতকের আরম্ভে লর্ড এলগিন এই পীঠস্থানকে একেবারে রিক্ত ক'রে দিলেন; বহু ভাস্কর্য ও প্রাচীরমূর্তি তাঁর প্রতাপে বৃটিশ ম্যুজ়িয়মে পৌঁছলো; আজ লণ্ডনে বা প্যারিসে ব'সেও গ্রীক শিল্পকলায় অভিজ্ঞ হওয়া সম্ভব। প্রথম দেখে মনে হয় এখানে আর-কিছু নেই— শুধু ধ্বংসস্তূপ, স্খলিত মর্মর, ছড়ানো পাথরের টুকরো, আর তারই মধ্যে সারি-সারি স্তম্ভ— ঋজু, সরল, সংবৃত ও দূরত্বময় স্তম্ভের সারি শুধু।

কিন্তু সেইজন্যেই তো আক্রোপলিস তুলনাহীন। অমন রিক্ত ব'লেই, অমন ভূষণহীন ও নির্লিপ্ত ব'লেই। তার শব্দহীন মন্ত্রে, সম্পদহীনতার ঐশ্বর্যে

আমাদের মনের মধ্যে মুহূর্তে সে যা ঘটিয়ে দিতে পারে তারই নাম পুণ্য, অথবা চরাচরে পবিত্রতাবোধ। এই বোধ যেমন বিরল তেমনি উদ্বায়ী, যেমন চেষ্টাহীন তেমনি স্পর্শকাতর ; কোনো নিয়মের দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না, যে-কোনো অবান্তর তথ্যের আঘাতে তার বিনষ্টি। তার জন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেবালয়ে গেলে প্রায়ই প্রতিহত হ'তে হয়, ফিরে আসতে হয় সালংকার প্রচ্ছদকে প্রদক্ষিণ ক'রে। ...কিন্তু এখানে কোনো অন্তরায় নেই, উন্মুখ মন সম্পূর্ণ স্বাধীন এখানে। নেই দ্বার, নেই দ্বারী, নেই কোনো ক্ষমতার ঘোষণা, নেই প্রায়শ্চিত্ত বা প্রার্থনার উচ্ছ্বাস, দেবতাকে আড়াল ক'রে কোনো অনুষ্ঠান বিরাট হ'য়ে উঠছে না। এখানে আর-কিছু নেই, শুধু স্তম্ভের সারি, তার ফাঁকে-ফাঁকে অবারিত আকাশ, শুধু আলো, স্নিগ্ধ সমীরণ, আর বন্ধ্যা ভূমির বেদনাসঞ্জাত দুটি 'অমর' ক্যাকটাস, একটি বা দুটি জলপাই গাছের পবিত্র ছায়া শুধু। ক্ষমতার প্রতিযোগিতা, ঈর্ষার চক্রান্ত, জনতার ভীতি ও ভক্তি— এই সব তুচ্ছতা থেকে মুক্ত হ'য়ে দেবী আথেনী আজ চিরন্তনে লীন হয়েছেন, সত্যকার দেবী হয়েছেন এতদিনে। তাঁর, এবং তাঁর লুপ্ত জগতের প্রতিভূ হ'য়ে আজ দিগন্ত আমাদের বেষ্টন ক'রে আছে, সব দ্বন্দ্বের পরপারে অন্তরীক্ষ নির্মল ও নিস্পন্দ।

আসল কথা, আক্রোপলিসের স্বাভাবিক কয়েকটা সুবিধে আছে, যার প্রভাব অব্যবহিত ও দুর্বার। নয়তো আমি, যার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ, রোমাঞ্চিত হবার শক্তি যার ক্ষীয়মাণ, পৃথিবীর বিখ্যাত প্রাসাদ, দৃশ্য, মন্দির ও চিত্রশালা অন্তত কয়েকটা যার পরিচিত, সেই আমি এখানে আসামাত্র এমন আপ্লুত হলাম কেমন করে? এর উত্তরে প্রথম কথা এই, যে যা-কিছু প্রাচীন, যা-কিছু স্মৃতি অথবা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়ে ব্যবহারের বাইরে চ'লে গেছে তারই মধ্যে একটি সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা আমরা অনুভব করি, তা শমিত করে আমাদের জীবনযুদ্ধের উত্তাপ, মনের মধ্যে এক সবীজ স্তব্ধতা এনে দেয়। একটা ছোটো উদাহরণ মনে পড়ছে। একবার যখন দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরছি, শোনা গেলো কোনো বৈদেশিক মহামন্ত্রীর আগমনের জন্য এয়ারপোর্টের চলতি পথ বন্ধ হ'য়ে গেছে, আমাদের বাস্ অন্য রাস্তায় ঘুরে যাবে। রাজধানীর জাঁকজমক পেরিয়ে দীর্ঘ পথে চলতে-চলতে হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম ; সামনে আকাশের গায়ে কুতুব মিনার দাঁড়িয়ে,

পথের ছু-দিকে অন্য কিছু-কিছু ভাঙাচোরা পুরোনো পাথর ছড়ানো। আমার ভালো লেগেছিলো সেই মুহূর্তটি, মন যেন শান্ত ও বিনত হয়েছিলো— যা দেখছি তা ঐতিহাসিক ব'লে নয়, শিল্পকর্ম ব'লেও নয়— পুরোনো ব'লেই, নির্জন ও নিষ্ক্রিয় ব'লেই। আগে একবার এই কুতুব মিনার দেখেই নিরাশ হয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক এ-ভাবে আগে দেখতে পাইনি— এই আকাশের তলায়, দিগন্তের আবেশে, পড়ন্ত আলোর বিকেলবেলায়।

এখন আক্রোপলিসের প্রধান জয় তার ভগ্নতায়, আর তার প্রাকৃতিক পরিবেশে। এখানে যা-কিছু শিল্পিত, তার প্রায় সবই ভেঙে গিয়ে আকাশের তলায় উন্মোচিত হ'য়ে আছে। আর এমন আকাশ, এমন আলো, এমন স্বচ্ছতা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অগাধ রোদ, উজ্জ্বল কিন্তু উগ্র নয়, ছুপুরবেলাতেও চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, তার তাপ পিঠের উপর তীক্ষ্ণ মনে হ'তে পারে, কিন্তু চোখের জন্য পুলক তার উপঢৌকন। এই আলো আর দ্রষ্টব্যের, নিসর্গ ও রচিত শিল্পের এক মায়াবী সন্নিপাত হ'লো আক্রোপলিস, সমগ্র আথেন্সই তা-ই। আথেন্স বলতে যা-কিছু বোঝায় সব এই পাহাড় থেকে দেখা যায়— সমুদ্র, সমুদ্রে শিলা ও জাহাজ, পুরোনো শহর, নতুন শহর, জ্যুস-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, হাড্রিয়ানের তোরণ, আরো অসংখ্য কালদষ্ট ও কালজয়ী স্থাপত্যচিহ্ন— আর সারি-সারি পুরাণবিশ্রুত পর্বত, একদিকে প্রায় দিগন্ত জুড়ে হিমেটাসের উচ্চতা— মধু ও মর্মরের উৎস হিমেটাস, যার চূড়ায় সন্ধ্যারাগ অবলোকন ক'রে, তবে সক্রেটিস বিষপান করেছিলেন। এই সব দৃশ্য চারদিকে, আর তার সঙ্গে আক্রোপলিসের আপন অঙ্গসমূহ— ডিয়নিসসের নাট্যশালা, পাহাড়ের গা কেটে-কেটে কোন অতীতে রচিত ; অডেয়ন, সম্প্রতি নতুন ক'রে নির্মিত হ'য়ে ব্যবহার্য হয়েছে, ক্ষুদ্র ও মনোমুগ্ধকর বিজয়ার মন্দির, যা নিতান্তই ধ্বংস হয়নি বা কেউ হরণ করেননি, এমনি কিছু ভাস্কর্য ও প্রাচীরমূর্তি, আর সেই ছয়টি বিখ্যাত তরুণী, এরেকথিয়নের বারান্দায় ছাদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন— আহত, তবু দৃপ্ত ও সাবলীল। আর অবশ্য, সবার উপরে, সকলের আগে— পার্থেনন।

এমন নয় যে শুধু প্রাচীনতা ও নিসর্গের জন্যই আক্রোপলিসের আবেদন। রোমেও ধ্বংসস্তূপ আছে, প্রকৃতির আনুকূল্য আছে, কিন্তু কলোসিয়ম বা কারা-কাল্লার স্নানঘর দেখে প্রথম কথা এই মনে হয়— কী বিরাট! কী শক্তিশালী!

— হয়তো শেষ কথাও তা-ই মনে হয়। অবশ্য শক্তি বিনা কিছুই রচিত হ'তে পারে না, কিন্তু শক্তি কী-ভাবে বিশুদ্ধ মাধুরীতে রূপান্তরিত হ'তে পারে, তারই উদাহরণ আক্রোপলিস। যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি তা এখানে মূর্ত, যা-কিছু চোখে পড়ছে তাকে তখনই সুন্দর ব'লে চিনতে পারছি। কিন্তু সৌন্দর্যেরও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকরণ আছে; কখনো-কখনো প্রকরণভেদে মূল্যভেদও ক'রে থাকি আমরা। এখানে যা দেখতে পাচ্ছি তা আমার পরিচিত অন্য কোনো সৌন্দর্যের মতো নয়, অন্য কিছু মনে পড়ছে না এখন, মন্তব্যের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এই সৌন্দর্য যেন চরম সরলতার, উচ্ছ্বাসহীন, আত্ম-অচেতন, এক অলজ্জিত সম্পূর্ণ উন্মোচনের। আড়ম্বর নেই, মনে হয় যেন উপকরণও নেই, এক নগ্ন ও বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনা নীলিমার আলিঙ্গনে সমর্পিত। যেখানে কোনো তথ্য বা ঘটনার চিত্রণ আছে, আছে কোনো মানবের বা দেবতার মূর্তি, সেখানে আমাদের আনন্দিত হবার অন্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু পার্থেননে এই স্তম্ভের সারি— যার দিকে অন্তহীনভাবে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কী তার রহস্য, কী মোহ আছে তার গঠনে, তার শুদ্ধ জ্যামিতির মধ্যে কেমন ক'রে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হ'লো? কাছে থেকে, দূর থেকে, নানা দিক থেকে, ঐ স্তম্ভগুলির স্বর্গীয় সুষমা একবার দেখার জন্যই আথেন্সে আসা সার্থক।

শুধু যে আক্রোপলিসের উপর থেকে সমস্ত শহর দেখা যায় তা নয়, শহরেরও প্রায় যে-কোনো অংশ থেকে আক্রোপলিস চোখে পড়ে। সারা আথেন্স যেন পার্থেননের দ্বারা অধিকৃত, তাকে না-দেখে কেউ বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, তার সান্নিধ্য থেকে স'রে যাওয়া যেন অসম্ভব। এই প্রকাশ্যতা পার্থেননের একটি মহাগুণ। অনুপস্থিতির পারম্পর্য গেঁথে সে যেন এক আশ্চর্য উপস্থিতি রচনা করেছে, যেন তাকে তুলে দেখাবার জন্যই এই নগর স্মৃতি ও রৌদ্রের প্লাবনে তন্ময়। এখানেও ট্রাম-বাস্ চলে, আপিশে যায় লোকেরা, কিন্তু ও-সব ব্যাপার যেন ভারি হ'য়ে উঠতে পারে না কখনো, আকাশ যেন তাদের মধ্যেও প্রবেশ ক'রে তাদের আয়তন হরণ করেছে। অবাক লাগে ভাবতে যে এই শহরের সমস্ত লোক সব সময় পার্থেননের দিকে তাকিয়ে থাকে না, তারাও বক্তৃতা দেয়, কবিতা লেখে, ব্যাঙ্ক দোকান খবর-কাগজ পার্লামেণ্ট চালায়। চোখের উপর এই সৌন্দর্য কেমন ক'রে নিরন্তর সহ্য করে তারা? এই অতীত— প্রত্যক্ষ, প্রাণময়, চিরকালের মতো প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে, এবং যাকে ফিরে

পাওয়া অসম্ভব, তার চাপ আধুনিক গ্রীসের পক্ষে ভালো না মন্দ তা জানি না, কিন্তু এ-কথা আমি বলবো যে যদি কখনো পার্থেনন লুপ্ত হ'য়ে যায় আর অন্য সব টিকে থাকে, তাহলে আথেন্স আর আথেন্স থাকবে না, কিন্তু যদি সব চ'লে গিয়ে পার্থেনন দাঁড়িয়ে থাকে শুধু, তাহ'লেও মানুষের প্রেম ও প্রণাম যুগে-যুগে এই নগরে পৌছবে।

* * *

আক্রোপলিস মানে 'উঁচু শহর'— পুরাকালে তাকে 'দুর্গ' ও 'পুণ্য শিলা'ও বলা হ'তো ; পার্থেনন— 'কুমারীর মন্দির'। কুমারী আথেনা বা আথেনী, যিনি বৃদ্ধ সিন্ধুদেবতা পসেইডনকে পরাজিত ক'রে এই নগরের রক্ষয়িত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাঁর মন্দির ঘিরেই গ'ড়ে উঠেছিলো আজকের দিনে যাকে আমরা বলি গ্রীক বা আথেনীয় সভ্যতা। 'পুণ্য শিলা'র সংলগ্ন হ'য়ে অভিজাতবর্গ বাস করতেন, আরো নিচে জনসাধারণের স্থান ; সেখানে পথ সংকীর্ণ, ও আঁকাবাঁকা, রোদে পোড়া ইটের তৈরি বাসাগুলোর রাস্তার দিকে পিঠ ফেরানো। সেই প্লাকা, অতি পুরোনো পল্লী, মৌলিক আথেন্সের অন্য এক অবশিষ্ট— আমরা সূর্যাস্তের পরে নেমে এলাম সেখানে। বাড়িগুলো ধাপে-ধাপে সাজানো, তাদের মধ্যে প্রতিবেশিতা ঘনিষ্ঠ, কোথাও সিঁড়ি আর কোথাও বা পথ বেয়ে নামছি— সেই পথ কাশীর গলির মতোই অপরিসর, কখনো মনে হয় কোনো গৃহস্থের আঙিনা পেরিয়ে চলেছি, গলি ও বাসার মধ্যে ভেদরেখা খুব স্পষ্ট নয়। অধিবাসীরা দরিদ্র, কিন্তু দীন ব'লে মনে হ'লো না, আবহাওয়ায় মালিন্য নেই, বাতাসে গান ভেসে আসছে, আঙিনায় বা ছাদে বা পথের ধারে লোকেদের ব'সে থাকার ভঙ্গিটা বিশ্রান্ত। তাদের অনেকে বোধহয় এই প্রথম চোখে দেখলো কোনো শাড়ি-পরা মহিলা ; কৌতূহল গোপন করার কোনো চেষ্টা করলে না কেউ, কয়েকটি শিশু তো উত্তেজিত হ'য়ে কলরব তুলে ছুটে গেলো ভিতরে— একটু পরে অনেক জানলা থেকে অনেক ললনাচক্ষু আমাদের উপর নিবদ্ধ হ'লো। এই ঘরোয়া আচরণে আমরা যেন ভারতবর্ষীয় স্পর্শ পেলুম।

ছাদের উপর রেস্তোরাঁ অনেক শহরেই দেখেছি, কিন্তু অন্যান্য দেশে যা বিশেষভাবে আয়োজিত, আথেন্সে তা সাধারণ ঘটনা, প্রকৃতির দাবি থেকেই তার উদ্ভব। শীতের দেশে, বা কম-শীতের দেশেও নামজাদা হোটেলে, ছাদ

ব্যাপারটা নামেমাত্র থাকে, কাচে পর্দায় ঘেরাও ক'রে দেয় চারদিক, আসবাবের ভিড়ে চলার পথ থাকে না, আর বিলাসের বাহুল্য বাইরের সঙ্গে অন্দরের ভেদ লোপ ক'রে দেয়। কিন্তু প্লাকার অলিগলি বেয়ে আমরা যেখানে এসে দাঁড়ালুম, সেই বাড়িটাকে বাইরে থেকে রেস্তোরাঁ ব'লে চেনাই যায় না, আমাদের গ্রীক বন্ধু সঙ্গে না-থাকলে আমরা হয়তো বসতবাড়ি ভেবে দরজা থেকেই ফিরে যেতুম। ঢুকেই একটি যুবকের অভিবাদন পেলাম, তার অভ্যর্থনার ভাষা আমাদের অবোধ্য হ'লেও নিষ্কুণ্ঠ হাসিটিকে ঠিক চেনা গেলো ; স্বল্পালোকিত সরু সিঁড়ি বেয়ে তার সঙ্গে তেতলার ছাদে উঠে এলাম। তখনও অন্ধকার হয়নি, আর এখানে লোকেরা কলকাতার মতোই রাত্রে দেরি ক'রে খায়, সেই সন্ধ্যায় আমরাই সেখানে প্রথম অতিথি মনে হ'লো। ব'সে দেখি, আমাদের সামনেই আক্রোপলিস, তার গা ঘেঁষে পূর্ণ চাঁদ ঝুলে আছে, ধাপে-ধাপে ছোটো-বড়ো অনেক ছাদ দূর পর্যন্ত ছড়ানো। বসেছি আকাশের তলায়, ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়, বাতাস শীতল ও আর্দ্রতাহীন, চোরা হিম বা হঠাৎ বৃষ্টির ভয় নেই। বন্ধুর পরামর্শ নিয়ে আমরা খাঁটি গ্রীক খাদ্য-পানীয় আনতে বললুম, ধীরে-ধীরে রাত্রি নামলো, ভ'রে উঠলো রেস্তোরাঁ, শোনা গেলো নানা দেশের হাসির টুকরো আর কথাবার্তা— এখানে এসে হয়তো ইংরেজরাও শ্রুতিগম্যভাবে কথা বলেন। আমাদের আহার যখন প্রায় শেষ তখন দেখি এক কোণে ছটি যুবক যন্ত্র বাজিয়ে নৃত্যগীত করছে ; নিশ্চয়ই তারা রেস্তোরাঁ থেকে মাইনে পায়, কিন্তু তাদের ভাবটা পেশাদারি নয়, ঘুরে-ঘুরে বা চাউনি হেনে প্রশংসা কুড়োচ্ছে না, মনে হয় তারা নিজের আনন্দেই মাতোয়ারা। — কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমার মনে হ'লো না আমাদের নিভৃতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

লিখতে-লিখতে মনে পড়ছে কয়েক বছর আগেকার কথা, যে-রাতে নেপলস-এ ছিলুম। এবার যেমন আথেন্সে আজ, তেমনি সেবার নেপলস-এ আমার শেষ য়োরোপীয় রাত্রি কেটেছিলো। হোটেল পেয়েছিলাম উপ-সাগরের কূলে, আমার জানলা থেকে সমুদ্র পেরিয়ে আবছা দেখা যায় কাপ্রি ; দিনের বেলা বারান্দায় ব'সে ভেবেছি, এর চেয়ে সুন্দর আর কী হ'তে পারে। কিন্তু সন্ধের পরে হোটেলের অনেক উঁচু ছাদের রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে আমার প্রায় নিশ্বাস পড়ে না। নিচে দেখা যাচ্ছে আধো চাঁদের মতো উপসাগর, তার গা ঘেঁষে পাহাড় উঠেছে, পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ভিলা, উঁচুতে

নিচুতে সারি-সারি কাফে, নৃত্যশালা, আলোর মালা, বেহালার স্থর উঠে আসছে আমার কানে, দেখতে পাচ্ছি ঘূর্ণ্যমান যুগল— যেন আনন্দের স্রোত ব'য়ে চলেছে চারদিকে। সেদিনও মনোরম লেগেছিলো, আজও লাগছে। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ।

পশ্চিমী দেশের বড়ো-বড়ো রেস্তোরাঁগুলোয় কিছু লাঞ্ছনাও সইতে হয়। প্রথম লাঞ্ছনা ভিড়, দ্বিতীয় লাঞ্ছনা পরিচারকদের ঔদ্ধত্য, তৃতীয় লাঞ্ছনা পরিবেষণে বিলম্ব, চতুর্থ লাঞ্ছনা পারিতোষিক বিষয়ে পরিচারকদের অগুপ্ত গৃধ্নুতা। যদি বসতে গিয়ে অচেনা লোকের সঙ্গে হাঁটু ঠেকে যায়, যদি চোখ তুলতে ভয় করে পাছে প্রতিবেশী কেউ ভাবে আমি অভব্যভাবে তার দিকে তাকাচ্ছি, যদি কুড়ি মিনিট ধ'রে চেষ্টা ক'রেও মহাপুরুষ পরিচারকটির চোখে চোখ ফেলতে না-পারা যায়, যদি বিল পরিশোধের সময় সর্বদাই ভীত হ'তে হয় পাছে পারিতোষিক যথেষ্ট না দিই বা বড্ড বেশি দিয়ে ফেলি— তা হ'লে, মানতেই হবে, সুন্দর পরিবেশ সম্পূর্ণ উপভোগ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, যত নামজাদা ও দামি জায়গা, সাধারণত ততই তার রান্না খারাপ, আমোদ-প্রমোদও জমকালো হ'লেও বিরক্তিকর। ন্যুয়র্কে বা প্যারিসে যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরা বেছে নেন গলির মধ্যে ছোটো-ছোটো রেস্তোরাঁ— কোনো বেসমেণ্টে হয়তো, বা প্রাক্তন কোনো গুদোমে বা গোলাঘরে; কিন্তু খাদ্য সেখানে স্বাদু এবং পরিচারকদের হাসতে মানা নেই। অবশ্য ভিড় সেখানেও এড়ানো যায় না, কেননা বিনা বিজ্ঞাপনেও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সে-সব জায়গার; তবে আগন্তুকদের ধরনটা ভিন্ন ব'লে মনে হয় না অসহ ভিড়।

আমার নেপলস-এর সেই রেস্তোরাঁয় ভিড় ছিলো, এখানেও প্রায় একটি টেবিলও খালি নেই, অথচ কোনো ঘেঁষাঘেঁষির অপ্রীতি একেবারেই অনুভব করছি না। তার কারণ এই খোলা হাওয়া, মাথার উপর নগ্ন এই আকাশ। একমাত্র আথেনীয়রাই জানে, কেমন ক'রে আকাশকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে টেনে আনতে হয়; আকাশের প্রভাব এখানে সর্বত্র অনুভূতিগোচর; রোদের তাপ, রাস্তার ধুলো— তাতেও যেন নীলিমার কণা লিপ্ত হ'য়ে আছে। আক্রোপলিসেও ঠিক তা-ই মনে হয়েছিলো আমার, লোক যদিও অনেক এসেছে, এসেছে সালামিস থেকে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মস্ত এক দল স্কুলের ছেলে, তবু স্থানটির নির্জনতা যেন ব্যাহত হচ্ছে না, কোনো লোকই অত্যন্ত বেশি

উপস্থিত নেই, আকাশের তলায়, দূরত্বের স্পর্শে সবাই যেন খুব মৃদু হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমী বড়ো-বড়ো ম্যুজ়িয়মে অনেক সময় ছবি ছাপিয়ে ভিড় ফেনিয়ে ওঠে, কিন্তু আক্রোপলিস এমন অবারিত যে এক সঙ্গে হাজার লোক এলেও প্রত্যেকেই নিজেকে একা ব'লে ভাবতে পারে। এ-ও একটা কারণ, যার জন্য এখানে এসে নিরাশ হওয়া অসম্ভব।

* * *

একটা কথা ভেবে এখন আমার মনস্তাপ মেটে না; সে-রাত্রে আমরা আক্রোপলিসে ফিরে যাইনি, তারই পাদদেশ থেকে ফিরে গিয়েছিলাম আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল। তার কারণটা হাস্যকর; আমার খুব ইচ্ছে করছিলো কয়েকজনকে আথেন্সের কথা চিঠিতে লিখতে, হয়তো কাল সময় পাবো না, আমাদের বন্ধুটি বেশ সকালে আসবেন। চিঠি লিখে, বারান্দায় ব'সে সিগারেট খেয়ে, ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিলুম। তখনও চাঁদ পশ্চিমে হেলেনি, তখনও হয়তো ফিরে যাওয়ার সময় ছিলো, কিন্তু মানুষের জীবনে ভাগ্যের হাত আছেই, জাড্যের সুযোগও অফুরন্ত; তাই এই বহুবাঞ্ছিত রাত্রিটিকে আবছা ঘুমে ভ্রষ্ট হ'তে দিলাম। পরদিন সকালে দেখা হ'লো আথেন্সের ম্যুজ়িয়ম, এক চৌরাস্তার মোড়ে বায়রনের মূর্তি, প্রখর তাপে পুরোনো শহরের বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে, লাঞ্চের পরে আক্রোপলিসের ম্যুজ়িয়ম। সন্ধের আগে আমাদের প্লেন উড়লো কাইরোর দিকে। আমার দুর্ভাগ্যবশত এক ভদ্রলোক আমার পাশে ব'সে অনবরত উচ্চস্বরে তুচ্ছ কথা ব'লে যাচ্ছিলেন; তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে আমার চোখ ছিলো সূর্যাস্তের আকাশে, আর মন প'ড়ে ছিলো 'পুণ্যশিলা'য়। ভাবছিলাম, এতক্ষণে চাঁদের আলো কী-মায়াজাল রচনা করেছে আক্রোপলিসে, কী অলৌকিক ছায়া ফেলেছে পার্থেননের স্তম্ভের সারি, কেমন স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে ছড়িয়ে আছে নগরী ও সমুদ্র, বাতাস কেমন প্রেমিকার চুম্বনের মতো ব'য়ে যাচ্ছে— আর আমি এই সব থেকে প্রত্যেক মিনিটে আরো— আরো দূরে স'রে যাচ্ছি।

৫

'পুরাতন স্ফিঙ্কস এক, সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে।
মানচিত্রে নাম নেই, পাশবিক ভঙ্গিমায় তার
ক্ষণিক সূর্যাস্তরাগ গান গায় শুধু একবার।'

—শার্ল বোদলেয়ার

যখন পৌছলাম তখন অনেক রাত। ছ-মাস পরে এই প্রথম ইলেকট্রিক পাখা, ছ-মাস পরে মাছি এই প্রথম। আমাদের ভূপ্রদক্ষিণের শেষ ধাপ এইটে।

বাইরে ছড়িয়ে আছে প্রান্তর, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোয় ঝাপসা। নির্বিকার নিসর্গ দেখে বোঝা যায় না এটা কোন দেশ, আর আমার মন তখনও পার্থেননে ভরপুর। কিন্তু ক্রমে এগিয়ে এলো আধুনিক হেলিওপলিস—নব্য ধনীদের শহরতলি, বহু ব্যয়ে তরুপল্লবে শ্যামল। কোনো-এক দিন ছিলো যখন সূর্য-দেবতা রা ছিলেন জীবন্ত ও মহাশক্তিমান, তাঁর পূজার জন্য যেখানে মন্দির উঠেছিলো, তার নাম গ্রীকরা দিয়েছিলো হেলিওপলিস, সূর্যনগর। এমন শ্রবণসুভগ জনপদের নাম বেশি পাওয়া যায় না।

আমরা আশ্রয় পেয়েছি নাইল-হিল্টন হোটেলে। প্রাচীন কাইরোতে অর্বাচীন এই হোটেলটি, আকারে বিরাট, স্থাপত্যে অত্যাধুনিক ; যেখানে গাড়ি এসে দাঁড়ালো সেখান থেকে এর আসল শোভা বোঝা গেলো না। ঘরে গিয়ে দেখি, সংলগ্ন একটি আসবাব-শোভিত খোলা বারান্দা আছে, আর তার ঠিক তলা দিয়েই নীল নদী প্রবহমাণ। আলো, ইমারত, সেতু, যন্ত্র, আধুনিক কাল— সব নিয়েও সেই নীল নদী, যার স্রোতে বুদ্বুদের মতো ভেসে উঠে মিলিয়ে গেছে মানবসভ্যতার এক-একটি অধ্যায়, আর যার তীরে-তীরে বিশ্বপুরাণের স্বাক্ষর বিকীর্ণ। সেই নদী, যার বন্দনা গেয়েছিলেন তেত্রিশ শতাব্দী আগে সম্রাট-কবি ইখনাটন, যেখানে কোনো-এক দ্বীপে শিশু মুশা আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, যার বারিসঞ্চিত ভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে আদি-দেবতা ওসিরিসের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চিরন্তন প্রাকৃত লীলাবৃত্ত— সেই নদী, যা নিখিলমানবের প্রাচীনতম স্মৃতির উদ্বোধক।

কিন্তু মিশরে এসে ইতিহাস ভুলে যাওয়া ভালো। গ্রীসে, বা এমনকি

ইটালিতে, ইতিহাস সহনীয়, কিন্তু মিশরে তা বড্ড বেশি মনে হয়, আমাদের ধারণাশক্তি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। একবার ভাবতে আরম্ভ করলে শেষ কোথায়? ফারায়ো, পিরামিড, মরণতন্ত্র; ইহুদি পুরাণ, খৃষ্টীয় পুরাণ, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস; আলেকজাণ্ডার, সীজার, ইসলাম, ধর্মযুদ্ধ, নেপোলিয়ন; সেমিরেমিস, ক্লিওপ্যাট্রা, সালোমে;— যেন পঙ্গপালের মতো স্মৃতিরা উড়ে আসে, আমাদের সময়, ক্ষমতা ও হৃদয়কে একেবারে গ্রাস ক'রে নিতে উদ্যত হয়। সেইজন্যে সতর্কতা চাই, স্বপ্নের হাতে ধরা দিলে চলবে না। আমাদের হাতে একদিন মাত্র সময় আছে, আমরা পিরামিড দেখতে এসেছি।

উঠে এলাম হোটেলের ছাদে, আকাশের তলায় একটা স্নিগ্ধ পানীয় নিয়ে বসলাম। ভালো লাগলো কৃষ্ণবর্ণ পরিচারক দেখে (তারা এথিয়পীয়, মিশরী নয়), কিন্তু মনে হ'লো তারা সকলেই যেন স্থূলবপু, পরনের মস্ত ঢোলা পাজামা আর আলখাল্লার জন্য চলন কেমন নড়বড়ে, অঙ্গভঙ্গিতে চারুতা নেই। প্রমোদ ব'লে যা পরিবেশিত হচ্ছে, তা তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীচ্য ও নিতান্তই গতানুগতিক; একটি কোর্তা-আঁটা যুবক কোনো সাত-বাসি ম্যুজিক-হলের গান গাইছে, কেউ কর্ণপাত করছে না, এবং গায়কটিও দৃষ্টিপাতের অযোগ্য। একশো বছর আগে ফ্লোবেয়র যে-কাইরো দেখেছিলেন, তার চিহ্ন কি এখনো আছে কোথাও? সেই অদ্ভুত, আত্ম-বিহ্বল, উন্মাদনা- ও ন্যক্কার-জাগানো নর্তক ও নর্তকীরা, সেই সাত-লহরী স্বর্ণমুদ্রার মাল্যধারিণী কাফ্রি রমণী, সেই নগ্ন কপ্‌টিক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীরা, যারা নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতার কেটে জলযাত্রীদের কাছে ভিক্ষে চেয়ে নিতেন— সেই যা-কিছু আশ্চর্য ও স্থানীয় এবং বিশেষ, তার কিছুই কি অবশিষ্ট নেই? হয়তো আছে, বিখ্যাত 'উদর-নৃত্য' এখনো নাকি লুপ্ত হ'য়ে যায়নি: কিন্তু সময়ের ও সম্ভবের সীমা অনতিক্রম্য।

বরং আমাদের ঘরের বাইরে বারান্দায় আরো কিছুক্ষণ ব'সে থাকা যাক। কোনো অজানা শহরে ক্ষণিকের জন্য আসা, কোনো অজানা শহরে অনেক রাতে পৌঁছনো, কোনো-এক নতুন ঘরে নতুন পরিবেশে ঐকাহিক আত্ম-নিঃসরণ— এই সব অভিজ্ঞতায় বিশেষ একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। দু-দিন পরেই চ'লে যাবো, হয়তো আর ফিরবো না কখনো— এই চেতনাতেই তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে ইন্দ্রিয়; স্থানীয় সমাজ বা লৌকিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয়ের

কোনো সুযোগ হবে না জেনে, মন চায় দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তকে শোষণ ক'রে নিতে। আমি ব'সে আছি; সামনে নদী আধো অন্ধকার, ওপারে অন্ধকার গভীরতর, সারি-সারি ইলেকট্রিক আলো নাগরিক অবয়বের আভাস দিচ্ছে না, রাত্রিটাকে মনে হচ্ছে এক চিত্রিত যবনিকা, যার পিছনে ঘটনাময় রঙ্গমঞ্চ লুকিয়ে আছে। আমি লক্ষ করছি কাইরোর বাতাস কেমন শুকনো অথচ গরম নয়, মরুভূমির সামীপ্য সত্ত্বেও এই জুন মাস দিল্লির মতো প্রখর হ'য়ে ওঠেনি, কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত আথেন্সের রাত্রিকে যেমন কোমল ও লঘু মনে হয়, এখানে ঠিক সেই ভাবটিও পাচ্ছি না।

ভোরবেলা যবনিকা উঠলো। দেখলাম, নদীর বুকে 'দিশি' নৌকো চলেছে, তার গড়ন অনেকটা পূর্ববঙ্গের নৌকোর মতো, মাঝিটিকেও দূর থেকে ভারতীয় ব'লে ভুল করা অসম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হ'তে পারতো যেন ভারতবর্ষটাই কেমন একটু বেঁকে-চুরে বদলে গেছে; যেমন কোনো আত্মীয় বহুকাল প্রবাসে কাটিয়ে ফিরে এলে তাকে কিছুটা অন্য রকম লাগে, হয়তো তার উচ্চারণ বা ধরন-ধারনে বৈদেশিক প্রভাব পাওয়া যায়, এও যেন তেমনি। কিন্তু আমাদের দেখাশোনার জন্য যে-পরিচারিকাটি ঘরে এলো, তার কালো চোখের ঋজু চাহনি আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে এই দেশ অন্য এক জগৎ।

প্রাতরাশ প্রায় শেষ ক'রে এনেছি, এমন সময় টেলিফোন বাজলো। এক আর্মানি বণিকের কাছে পরিচয়পত্র ছিলো আমাদের; আমি ধ'রে নিয়েছিলাম তিনিই হবেন, কিন্তু টেলিফোন তুলে অবাক হ'তে হ'লো। শোনা গেলো পরিষ্কার বাংলা ভাষার কথা— 'নমস্কার। আমার নাম অমুক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি···' স্থির হ'লো, তিনি আমাদের কাইরোর দ্রষ্টব্যগুলো দেখাবেন— অর্থাৎ একদিনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব। আমাদের আনন্দ অনুমেয়। বণিক বন্ধুটির সৌজন্যে একখানা গাড়ি পাওয়া গেলো, কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে পড়লাম।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় য়ুনেস্কোতে কর্ম করেন, আপাতত কাইরোতে প্রবাসী। আমার খুব ভালো লাগলো যে তিনি মিশরী তত্ত্বে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেছেন, এ-বিষয়ে তাঁর উৎসাহ চোখে-মুখে প্রতিফলিত। তাঁর দ্বারা উপদিষ্ট হ'য়ে আমরা জগৎবিখ্যাত কাইরো ম্যুজিয়মে প্রবেশ করলুম— তাঁকে ফিরে

বিরুদ্ধে অনড় অজর অনাক্রমণীয় পিরামিডস্তম্ভ, শবদেহকে রচনা করেছে শাশ্বতের প্রতিভাসরূপে। যারা মৃতদেহকেও স্থায়িত্ব দিতে চায় তারা জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সুকঠিনরূপে রক্ষণশীল হ'তে বাধ্য; তার পরিচয় আছে তাদের ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহপ্রথায়, প্রতিকৃতিগুলির ঋজু-কঠিন ভঙ্গিতে, পিরামিডের কঠোর জ্যামিতিক স্থাপত্যে;— মিশরী সভ্যতা, ন্যূনতম পরিবর্তিত হ'য়ে, যে-ভাবে অন্তত তিন সহস্র বৎসর ধ'রে সজীব ছিলো, তা ভাবলে মনে হয় বুঝি মহাকালেরও করুণা সম্ভব। তুলনায় কত স্বল্পায়ু গ্রীস, পরাক্রান্ত রোমক সাম্রাজ্য কত ক্ষণজীবী। কিন্তু তবু ধ্বংস এড়ানো গেলো না, সেই বাদামবর্ণ ক্ষীণতনু সুদর্শন ও শুদ্ধাচারী মানুষগুলোর আজ আর কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, তাদের সাধনা বর্তমানে নিতান্তই মৃত, তা কোনো উত্তরাধিকার রেখে গেলো না আধুনিক জীবনে, আদিগন্ত শুধু প্রত্নতত্ত্বের পীঠস্থান ছড়িয়ে রইলো। মহাকাল কুটিল প্রতিশোধ নিলেন; যারা চেয়েছিলো শবদেহকে অমরতা দিতে, তারাই ঠিক অমর শবে পরিণত হ'লো— পিরামিডের দ্বারের মতোই রুদ্ধ হ'য়ে গেলো প্রবাহ; যে-অর্থে বৈদিক সভ্যতা আজও ভারতে ব্যবহৃত, যে-অর্থে গ্রীস-রোম আধুনিক য়োরোপে সঞ্চরণশীল, সে-অর্থে প্রাচীন মিশর পৃথিবীতে অস্তিত্বহীন।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুর কাছে মিশরী সভ্যতা প্রায় প্রহেলিকার মতো। যারা মৃতদেহ দগ্ধ ক'রে ভস্ম ভাসিয়ে দেয় নদীতে, সৎকারস্থলে স্তম্ভরচনা করে না, কল্পনা করে না মহাপ্রয়াণে কোনো সহযাত্রীর, যাদের মনে ইতিহাস ও পুরাণে প্রভেদ খুব স্পষ্ট নয়, যারা ক্ষোদিত প্রস্তরে চিরায়মানতার সম্মান দিয়েছে শুধু দেবতাকে— কোনো বীর অথবা সম্রাটকে নয়, তাদের পক্ষে মিশরের মতো সুদূর ও বৈদেশিক আর কী হ'তে পারে? মৃত্যু যে ঐহিক জীবনের অবসান— অন্ততপক্ষে একটি জন্মের পরম অবসান, এ-কথা মেনে নিতে হিন্দুর কখনো বাধেনি; মৃত্যুর প্রতি তার মনোভাব বিনয়ের ও শ্রদ্ধার— প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়; সমর্পণের, বিদ্রোহের নয়; মৃতের জন্য তার শুধু প্রার্থনা আছে, কোনো দাবি নেই; মৃত্যু যে-মুক্তি এনে দেয় সেটিকে সে নমস্য ব'লে জেনেছে। আর মিশর চেয়েছিলো মর্ত্যের বন্ধনে মৃতকে বেঁধে রাখতে; কফিনের মধ্যে কফিন, আর পাথরের পরে পাথর গেঁথে-গেঁথে যেন সহস্র পার্থিব বাহুতে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলো সেই তাকে, যে কিছুতেই আর থাকবে না; একটি

জড় আবরণের জন্য দিগ্বিজয়ের সমারোহকে উদ্ধত ক'রে তুলেছিলো। এ-দিক থেকে দেখলে মনে হয়, মিশরী সভ্যতা মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে দর্পিত ও মোহান্ধ, যেন মৃত্যু অথবা ভগবানের কাছেও সে নত হ'তে শেখেনি। কিন্তু সেইজন্যেই প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে এরই ইতিহাস সবচেয়ে পরিপূর্ণ; লিপি, মূর্তি, চিত্র ও স্থাপত্যের মধ্যে সে রেখে গেছে ভাবীকালের জন্য নিজের সবিস্তার পরিচয়পত্র। এই জাদুঘরে যে-সব স্বর্ণময় ও রত্নখচিত কফিন দেখছি, তার প্রত্যেকটির ডালায় শোভা পাচ্ছে অন্তঃস্থ মৃতের মুখাবয়ব, পার্শ্বফলকে তাঁর কীর্তি-কাহিনী উৎকীর্ণ। সেগুলোর আকৃতির সঙ্গে মানবদেহের সৌষম্য আছে; পায়ের দিকটা মাছের পুচ্ছের মতো উঁচু, অন্য প্রান্তে ধাতু-নির্মিত মস্তক— গঠন এমন সুদক্ষ ও বাস্তবধর্মী যে মনে হয় বুঝি কোনো বিরাট পুরুষ, কোনো বিশাল আচ্ছাদনে দেহ ঢেকে, পা উঁচু ক'রে চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছেন। যেমন স্বর্ণ ও রত্নব্যবহারে, তেমনি বর্ণলেপনেও কার্পণ্য ছিলো না; চোখ, ভুরু, ওষ্ঠাধর নিখুঁতভাবে ক্ষোদিত ও চিত্রিত— কিন্তু সমস্তটাই ভঙ্গিনির্ভর, অর্থাৎ প্রকরণে বৈচিত্র্য নেই— তা থাকতেও পারে না— তবু মুখশ্রীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না তাও নয়। টুটানখামেন যখন মামিতে পরিণত হলেন তাঁর মুখ ঢেকে দেয়া হ'লো একটি স্বর্ণময় মুখোশে, সেই মুখোশ তাঁরই প্রতিকৃতি; তাঁর প্রতিকৃতি প্রতিটি কফিনের গাত্রে; যে-সিন্দুকে তাঁর অন্ত্রতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে প্রোথিত হ'লো, তার ডালায় রইলো তাঁর তিনটি মনোহরণ মূর্তি;— আমাদের না-জেনে উপায় নেই যে তিন হাজার বছর আগেকার এই বালক-সম্রাট দেখতে ঠিক কেমন ছিলেন। তরুণ একটি মুখ দেখছি আমরা— কোনো-কোনো মূর্তি দেখে তরুণী ব'লে ভুল হয়— আয়ত চোখ, নিবিড় ভুরু, শিরস্ত্রাণের জন্য চুল অথবা কপাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঋজু ও ক্ষীণ নাসিকার নিচে ওষ্ঠাধর মৃদু ও স্পর্শকাতর। এই রূপবান কিশোরটিকে সম্রাট ব'লে কল্পনা করা সহজ নয়; শিল্পীদের সম্ভবপর অতিরঞ্জনের কথা মনে রেখেও বলা যেতে পারে যে মিশরী রাজবংশীয়রা অসামান্য কান্তিমান ছিলেন।

—কিন্তু শুধু প্রতিকৃতি নয়, একেবারে বাস্তব দেহ নিয়ে তাঁরা উপস্থিত। আমরা এসেছি মামি-কক্ষে; দাঁড়িয়ে আছি, চলছি, দেখছি, ভাবছি। কাচের আধারে সারি-সারি শুয়ে আছেন তাঁরা— রাজা, রানী, ধর্মগুরু, রাজন্য, কেউ পরমেশ্বর রা-এর সন্তান, কেউ পুণ্যময় সিংহ-দেবতার বরপুত্র, কেউ বা তাঁর

যেতে হ'লো কর্মস্থলে। 'প্রবেশ করলুম' বলাটা যত সহজ হ'লো, কাজটি ঠিক তা হয়নি ; পেশাদার গাইডদের সরব ও সনির্বন্ধ ব্যূহ ভেদ করতে প্রায় কিঞ্চিৎ রূঢ়তার প্রয়োজন হয়েছিলো।

ম্যুজিয়মের বাংলা প্রতিশব্দ হয়েছে জাদুঘর। শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন, বা কী-ভাবে তা প্রচলিত হয় তা আমি জানি না, কিন্তু এটি যে যথোচিত নয় তা বোধহয় বলা বাহুল্য। ম্যুজিয়মের মূলে আছে Muse, অর্থাৎ এটি কলালক্ষ্মীদের নিকেতন ; খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দ্বিতীয় টলেমি আলেকজাণ্ড্রিয়ায় যে-'ম্যুজিয়ম' স্থাপন করেন তা আসলে ছিলো একটি বিদ্যায়তন বা সারস্বত সমাজ, এবং এই নামধারী প্রতিষ্ঠান বোধহয় সেটিই প্রথম। সেই আদি অর্থের বাহনরূপে 'জাদুঘর' যেমন অসংগত, তেমনি কোনো চিত্রশালার পক্ষেও শব্দটি অব্যবহার্য। হয়তো কলকাতার ম্যুজিয়মে প্রত্নতত্ত্বীয় প্রদর্শনী বেশি প্রত্যক্ষ ব'লেই প্রাকৃত বাংলায় ঐ শব্দটি উদ্ভূত হয়েছিলো। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও যদি একটি ম্যুজিয়ম থাকে, যার প্রতি 'জাদুঘর' শব্দ প্রায় আক্ষরিক অর্থে প্রয়োজ্য, তা, সন্দেহ নেই, এই কাইরো শহরে। এর ভিতরে এলে সরস্বতীকে মনে পড়ে না, মিনার্ভা বা আফ্রোডিটিকেও নয়, মনে হয় যেন সশরীরে পার্সিফোনির পাতালে এসেছি, বা মহাভারতের প্রেতলোকে ; যা-কিছু দেখছি তা-ই অদ্ভুত, আশ্চর্য, ঐন্দ্রজালিক, আমাদের কোনো সহজ সংস্কার বা পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না ; যা-কিছু দেখছি তা-ই মৃত্যুর দ্বারা অনুরঞ্জিত, কক্ষের পর কক্ষ পরিপূর্ণ ক'রে যেন মৃত্যুই একমাত্র উপস্থিতি। পৃথিবীর আর কোথায় দেখা যাবে মৃত্যুপূজার এমন অসংখ্য উপচার, এমন ঋদ্ধ, জটিল, পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান পরলোকপ্রেম, মৃত্যুর জন্য এমন মনোমুগ্ধকর, ঐশ্বর্যময় ও ভয়াবহ প্রস্তুতি? আর কোথায় দেখা যাবে এমন পিণ্ড-পিণ্ড সোনা, রাশি-রাশি রত্নমণি, এমন দক্ষতা ও বুদ্ধি ও কারুকার্য— সবই নিয়োজিত মৃত্যুর সেবায়, পরলোকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ?

তাও তো টুটানখামেন মাত্র এগারো বছর সম্রাট ছিলেন। ন-বছর বয়সে সম্রাট, কুড়ি বছর বয়সে মৃত ; এই অল্প সময়ে তিনি পরলোকের জন্য যে-পরিমাণ আয়োজন করেছিলেন, তা আধুনিক মানুষের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য ; অনেক বিনষ্টি ও লুণ্ঠনের পরেও, শুধু এই ম্যাজ়য়মে টুটানখামেনের ধনরত্ন যা

রক্ষিত আছে তা দিয়ে বোধহয় দুটো-তিনটে রাজত্ব কিনে নেয়া যেতো! সবই তাঁর কবর থেকে উদ্ধার হয়েছিলো, সবই তাঁর অমরতার পাথেয়। মনে হয়, অমরতা বিষয়ে মিশরীদের ধারণা ছিলো কিছুটা আক্ষরিক ও জড়বাদী; তার অর্থ প্রথমেই ছিলো দেহের অমরতা, আর তাই, মিশরের অনার্দ্র বাতাসের সহযোগে, তারা এমন একটি ভেষজ আবিষ্কার করলে, যার দ্বারা চর্চিত হ'লে শটিত হবে না শব, মামিরূপে চিরস্থায়ী হবে। এই গেলো প্রথম ধাপ, তারপর মামিটিকে একটি আঁটো মাপের কফিনে ঢোকানো হ'লো, সেটিকে ঈষৎ বড়ো আর-একটিতে, সেটিকে আবার অন্য একটিতে;— এমনি পর্যায়ক্রমে শবাধারের আকার বড়ো হ'তে-হ'তে শেষেরটি একটি প্রকোষ্ঠের সমান আয়তন পেলো। এবং সেই প্রকোষ্ঠটি স্থাপন করা হ'লো পিরামিডের এমন একটি গূঢ় কক্ষে, যেখানে, খাপের মধ্যে তলোয়ার ঢোকালে যেমন হয়, তেমনি আর তিলধারণের স্থান রইলো না, বাইরে থেকে অমোঘভাবে রুদ্ধ হ'য়ে গেল পাষাণের দ্বার। পিরামিডের অন্যান্য কক্ষে রইলো ভূরিপরিমাণ বস্ত্র, ভূষণ, খাদ্য, পানীয়, বিলাসদ্রব্য; রইলেন পুত্তলিকা বা প্রতিমূর্তিরূপে মহিষী ও অন্যান্য পত্নীরা, দাসদাসী, পোষা জন্তু ইত্যাদি। এক বিশাল ও অভেদ্য দুর্গে, চিরকালের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে, যে-কোনো প্রকার অবমাননা বা ইতর কৌতূহলের অতীত, পার্থিব সম্ভোগের সমগ্র উপকরণ দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে, সম্রাট তাঁর অনন্তজীবন আরম্ভ করলেন।

মিশরীরা কি কখনো অনুভব করেনি যে মানুষের জীবন, ঐশ্বর্য এমনকি তার কীর্তিও নশ্বর? কখনো ভাবেনি যে অনন্তকাল মানুষের পক্ষে ধারণাতীত, আমাদের শত-সহস্র শতাব্দীও 'ব্রহ্মার পলকপাত' মাত্র? কোনো মানুষ তা না-ভেবে পারে না এবং মিশরেও যে এই চিন্তা পরিচিত ছিলো, তার প্রমাণ আছে খৃষ্টপূর্ব উনিশ শতকের একটি কবিতায়, যেখানে, মরণশীলতার অনাদি আক্ষেপ ধ্বনিত ক'রে কবি স্মরণ করছেন সেই 'অতীত দেবতাদের, যাঁরা পিরামিডের তলায় বিশ্রান্ত, সেই বীর ও গরীয়ানদের, যাঁরা পিরামিডের তলায় বিশ্রান্ত', যাঁরা কখনো ফিরে আসেন না সেই 'স্তব্ধতার মহাদেশ' থেকে, যেখানে আমাদেরও একদিন যেতে হবে। কে জানে, হয়তো বা এ-বিষয়ে মিশরীদের চেতনা বা অচেতন বোধ অত্যন্ত বেশি তীব্র ছিলো, আর তাই তারা মৃত্যুর সঙ্গে এক বিপুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালিয়ে গেছে— গ'ড়ে তুলেছে মৃত্যুর

সহোদরা-প্রিয়ার 'ভাস্বর স্তনচূড়া'য় সম্মোহিত। নিবিড় আচ্ছাদনের বাইরে দেখা যাচ্ছে শুধু এক-একটি মুখ— বিকৃত নয়, কোনো বিকট ভঙ্গি নেই, প্রায় স্বাভাবিক, করোটির উপরে আঁটো হ'য়ে আছে ত্বক, রুগ্ন অথবা অত্যন্ত বেশি ক্ষয়িত মনে হচ্ছে না ; নারী না পুরুষ, যুবক না বৃদ্ধ, তা পর্যন্ত অনুমান করা সম্ভব। কত দীর্ঘ শতাব্দী ধ'রে মৃত এরা, এদের মাংসমেদ কোন সুদূরে লুপ্ত হ'য়ে গেছে, কোনো-এক কালে যা-কিছু এঁরা ছিলেন তার উপর দিয়ে স্তরে-স্তরে মরুবালুকা পরিকীর্ণ— অথচ, কোনো পাতা-খোলা পুঁথির মতো ক'রে, আমরা এঁদের মুখাবয়ব অধ্যয়ন করছি। চুল আছে অনেকেরই মাথায়, দাঁত অক্ষত, গাত্রবর্ণে প্রেতোচিত পাংশুতা নেই। একটি মামিকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলাম আমি, প্রায় মুগ্ধ হ'য়ে— তাকে রমণীয় বলা নিশ্চয়ই অনুচিত হবে, কিন্তু আকর্ষণে সে প্রবল। এক তরুণী, পিঙ্গলবর্ণ চুল তার মাথায়, কপাল নাক ঠোঁট সবই সুগঠিত, ঘুমের মধ্যে হাসলে যেমন হয় তেমনি কয়েকটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। আমার মনে পড়লো বোদলেয়ারের সেই পঙক্তি, যেখানে তিনি 'প্রেমিকের দাঁতের শীতল এনামেলে'র কথা বলছেন, মনে পড়লো তাঁর 'মরণের নৃত্য' কবিতায় রতি ও মৃত্যুর মর্মভেদী সমন্বয়। কে এই মহিলা? কাকে ইনি ভালোবেসেছিলেন? কোনো গোপন দুঃখ কি দগ্ধ করেছিলো এঁকে? কোনো কবি এঁর স্তবগান লিখেছিলেন? এমন কোনো কথা কি ছিলো না, যা মৃত্যুর মুহূর্তে এঁর ওষ্ঠাগ্রে এসে মিলিয়ে গিয়েছিলো? ···কোনো উত্তর নেই, উত্তর পাবার চেষ্টা করাটাও অর্থহীন, কিংবা হয়তো 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কোনো-কোনো স্তবকেই এর উত্তর আছে। এই মামি-কক্ষ, যেখানে মৃত্যুর মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, মৃত্যুর মদিরা যেখানে পাত্র ছাপিয়ে উচ্ছল, যেখানে মহত্তম রহস্য ও আতঙ্ক প্রায় একটি 'শিল্পকর্মে' পরিণত, এবং বলতে গেলে জীবিত ও মৃতেরা সহবাসী, সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোদলেয়ারের আরো একটু গভীরে যেন প্রবেশ করলাম।

* * *

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্লাবে আমাদের লাঞ্চ খাওয়ালেন, তারপর নিয়ে গেলেন 'সিটাডেল' দেখাতে। এই কেল্লা ইসলামের অবদান ; মকাট্টাম পাহাড়ের উপর এটি নির্মাণ করেন বিখ্যাত সালাদিন বাদশা, যাঁর নামে ধর্ম-যুদ্ধের সময়ে খৃষ্টান জগৎ কম্পিত হয়েছে। কেল্লার মধ্যে যে-মসজিদ আছে

সেটি উনিশ শতকের, কিন্তু তার সংলগ্ন কূপটি প্রাচীন ; প্রবাদ, এই কুয়োর মধ্যেই ইহুদি পুরাণের য়োসেফ তাঁর 'পাতালবাস' করেছিলেন। পাহাড়টি ধূসর, মসজিদটিকেও স্থাপত্যের দিক থেকে অত্যন্ত বেশি উল্লেখযোগ্য মনে হলো না ; কিন্তু এই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে অন্য একটি জিনিশ দেখলাম যা আশাতীত, অবিস্মরণীয়, প্রায় অলৌকিক। দক্ষিণ দিগন্তের দিকে তাকানোমাত্র ভেসে উঠলো সারিসারি পিরামিড— একটি, ছুটি, চারটি— ঠিক ক-টি বলতে পারবো না, কিন্তু মনে হ'লো আরো আছে, অস্পষ্ট, যেন পটে আঁকা, যেন স্বপ্ন, বিকেলের উজ্জ্বল আলোয় যেন কাঁপছে, হলদে-ধূসর বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে এক অবিশ্বাস্য উদ্ভাস, এক কল্পনাতীত, বাস্তব মরীচিকা। এই মেম্ফিস, মিশরের প্রাচীন রাজধানী, সাম্প্রতিক ইতিহাসে মৃত্যুপুরী নামে কীর্তিত। মৃত্যুপুরী— কেননা কাইরোর নিকটবর্তী গিজ়ার পিরামিডকে মেম্ফিসেরই সম্প্রসারণ ব'লে ধরা হয় ; এই দশ-বারো মাইলের মধ্যে, রুক্ষ বালু-বিস্তারে পরিবৃত, দাঁড়িয়ে আছে দূরে কাছে সব ক-টি মিশরী পিরামিড— স্মৃতি নিয়ে, জীবিতের প্রতি অনুনয় ও অনুজ্ঞা নিয়ে, অতীতের বহুবিচিত্র বিশাল দলিলে সগর্ভ। মেম্ফিসের বালুর তলা থেকে যে-সব মন্দির, ভবন ও মূর্তি বেরিয়ে এসেছে, তাদের কথা কারোরই অজানা নেই ; কিন্তু কে জানে আরো কত রাজা ও রূপসী রানী ঘুমিয়ে আছেন এখানে, আরো কত রত্নরাশি এখনো লুক্কায়িত, আরো কত সাংকেতিক ভাষায় এই স্তব্ধতা পরিপূর্ণ!

পার্থেননে দেবতারা আছেন, কোনারক আজও অপ্সরাদের লীলাভূমি, জীবনের দম্ভ ও ক্ষমতার বিজয়স্তম্ভ হ'লো রোম, আর কাইরোতে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে মৃত্যু। প্রত্ন মিশরের মুখোমুখি হ'লে আমরা যা অনুভব করি তা পুণ্যের স্পর্শ নয়, গভীর অর্থে সৌন্দর্য বা আনন্দও তাকে বলা যাবে না ; কোনো প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের সামনে যে-নশ্বরতাবোধ আমাদের ব্যথিত ও আবিষ্ট করে, ঠিক তাও পাওয়া যাবে না এখানে ;— না, বেদনা নয়, বিষাদ নয়, বরং এক গম্ভীর ও গুরুভার মৃত্যুচেতনা, মৃত্যু যেন নানা প্রতিমায় আবদ্ধ, ঐ চিরন্তন ও চিরপলাতক রহস্যকে যেন বিরাটভাবে ধ'রে ফেলা হয়েছে এই মরুমাটিতে— তাকে দেয়া হয়েছে রেখা, ঘনতা, অবয়ব ; মৃত্যু এখানে বিচিত্র রূপে মূর্ত ও দর্শনীয়। মামি থেকে পিরামিড পর্যন্ত চিন্তা ক'রে দেখলে মনে হয় বুঝি প্রাচীন মিশরে মৃত্যুই ছিলো প্রধান ধ্যান ; বুদ্ধি ও প্রতিভা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনশক্তি,

আজকের দিনে আমরা যাকে বলি শিল্পকলা, এবং যাকে বলি যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞান— সব, সব উৎসর্গিত হয়েছে মৃত্যুর মন্দিরে, তারই সেবায় কর্ম ক'রে গেছেন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিল্পীরা, রাজকোষ উদারভাবে উন্মুক্ত হয়েছে। সেই ধরনের উন্নত বুদ্ধি ও উপায়নৈপুণ্য, যার দ্বারা এ-কালে অতি দুরূহ অস্ত্রোপচার সাধিত হয়, মিশরীরা তা ব্যবহার করেছেন— মানুষের প্রাণ বাঁচাতে নয়, শবের প্রসাধনে ; তাঁদের তুলনায় হলিউডের শবশিল্পীরা কী অকিঞ্চিৎকর! যে-প্রতিভা ও ধ্যানদৃষ্টি, এবং সেই সঙ্গে যে-পরিমাণ ধন ও পরিশ্রম যুক্ত হ'লে, তবে গ'ড়ে তোলা যায় একটি মহাবলীপুরম বা নৎর দাম, মিশরীরা তা প্রয়োগ করেছেন— দেবালয় রচনার জন্য নয়, মৃতের স্তম্ভনির্মাণে। যারা রচনা করেছে সূক্ষ্ম বস্ত্র বা সুন্দর পুতুল, আসন, ভূষণ বা অন্য যে-কোনো মূল্যবান সামগ্রী— তারা সকলেই জেনেছে যে তাদের উৎকৃষ্টতম কৃতিসমূহ অবশেষে মৃত্যুর উদ্দেশেই নিবেদিত হবে। একটি বৃহৎ সভ্যতা মৃত্যুপূজক হ'য়ে ইতিহাসে দীর্ঘতম স্থায়িত্ব পেয়েছিলো, এই ঘটনাটি আশ্চর্য কিন্তু অসংযত নয়। দেবতারা স্তুতি ভালোবাসেন, এবং মৃত্যুও দেবতা।

এখন বিকেল, রোদের রং শাদা থেকে গোলাপি হ'য়ে এলো, নীল নদীর সেতু পেরিয়ে আমরা এসেছি গিজাতে, পিরামিডের সামনে। যদিও এখানেই মরুভূমির আরম্ভ, দূরে তাকালে ধূ-ধূ করে চোখ, তবু জায়গাটা একেবারে রুক্ষ নয়, কিছুটা সতৃণ, কাইরোর বিরামহীন বাতাসে খেজুরগাছগুলোর ডালপালা দুলছে। আমাদের সামনে পঙক্তিবদ্ধ তিনটি পিরামিড, চতুর্থ বংশের তিন সম্রাটের গোরস্থান— তাঁদের মিশরী নাম খুফু, খাফ্রে ও মেঙ্কুরে। মাঝেরটি সবচেয়ে বৃহদায়তন, এত বড়ো মরণ-স্তম্ভ সারা মিশরে, অতএব সারা জগতে, আর একটিও নেই ; মিশরী পিরামিড বলতে জগতের লোক এটিকেই বোঝে, এরই জন্যে যুগে-যুগে মিশরদেশে যাত্রীদের আনাগোনা। এই মহাপিরামিডের তলায় যিনি সমাহিত তিনিই খুফু বা কেয়পস্‌, চতুর্থ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ; তাঁর জীবৎকালের পরে প্রায় ষাট শতাব্দী কেটে গেলো। এই স্তম্ভরচনার ব্যয় ও শ্রম জোগাবার জন্য তিনি তাঁর রাজত্বে সমস্ত মন্দির ও অর্চনাক্রিয়া বন্ধ ক'রে দেন ; বহু বৎসর ধ'রে লক্ষ-লক্ষ মানুষের দাসশ্রম নিংড়ে নিয়ে-নিয়ে নির্মাণ করেন— কোনো নগর নয়, কোনো মন্দির নয়, কোনো যুদ্ধোপযোগী কেল্লাও নয়, শুধুমাত্র নিজের অন্ত্যেষ্টির জন্য এক অতিকায় অট্টালিকা। তেমনি

দাঁড়িয়ে আছে আজও, বৃষ্টিহীন আকাশের তলায় প্রায় অনাহত; অতি মৃদুভাবে তাকে স্পর্শ ক'রে গেছে কাল, শুধু অল্প একটু আঁচড় কাটতে পেরেছে, হরণ করতে পেরেছে শুধু মসৃণতার প্রলেপটুকু, হয়তো বা দু-চার মুঠো পাথর খসিয়ে নিয়েছে— কিন্তু ছয় সহস্র বৎসরের অত্যাচারও তার বেশি আর-কিছু পারেনি। কী দুরন্ত আয়ু এই পাষাণপিণ্ডের, কী প্রকাণ্ড ও দর্পিত এই মৃত্যুর আত্মঘোষণা! আমার মনে পড়লো তাজমহলও মৃতের স্তম্ভ, কিন্তু তাজমহলের যা প্রধান লক্ষণ তা লালিত্য ও শ্রী, তার মর্মরগাত্রে বেদনার নিঃসরণ আছে;— কিন্তু পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা অসম্ভব; তার মেরুলগ্ন উষ্ট্রবর্ণ পৌরুষের ঋজুরেখ কঠিন আকৃতির মধ্যে করুণার কোনো প্রশ্রয় নেই, আমাদের মানবিক হৃদয়ের পক্ষে তা যেন এক ক্ষমাহীন নিষেধ, এক অপ্রতিহত ভৎর্সনা। মৃত্যুর যে-রূপটি একেবারেই নির্মম ও নিশ্চল ও বিশুষ্ক, যা শোচনা, করুণা বা এমনকি আতঙ্কেরও অতীত, এই পিরামিড যেন তারই প্রতিমূর্তি; এর গহ্বরে নেই অর্ফিয়ুসের প্রেম অথবা নচিকেতার জিজ্ঞাসা, নেই খৃষ্টীয় শিল্পের কঙ্কালরূপী ত্রাসের শিহরন; পাঁচশো ফুট উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ধ্বংসের স্মরণলিপি— প্রস্তরীভূত, ঘনসংহত, ধ্বংসহীন।

বেদুইনবেশে উটের পিঠে চ'ড়ে ছবি তোলানোর আহ্বান আমরা উপেক্ষা করলুম, কিন্তু অন্য একটি গাইড যখন বললে সে আমাদের একটি গোপন মামি দেখাতে চায় তখন লুব্ধ হ'তে হ'লো। তাকে অনুসরণ ক'রে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-স্তূপের সামনে দাঁড়ালুম আমরা। পৃথিবীর সমস্ত গাইডের মতোই, অনবরত কথা বলছে লোকটি; তার ভাঙা ইংরেজির ফাঁকে-ফাঁকে উর্দু শব্দ কখনো বা চেনা যাচ্ছে। গাইড পুরোবর্তী হ'য়ে মোমবাতি জেলে হাতে নিলে, অতি ক্ষুদ্র দ্বারপথে আনত হ'য়ে আমরা একটি গুহার মতো কক্ষে প্রবেশ করলাম। ভিতরে অমাবস্যার মতো অন্ধকার; ক্ষীণ আলোয় ভেসে উঠলো এক প্রস্তরময় বেদী, তা প্রায় পুরো কামরাটি জুড়ে আছে, কোনোমতে আমাদের দাঁড়াবার মতো একটু জাগয়া হ'লো। যাকে বেদী বলছি সেটি আসলে শবাধার, অটুট নেই, বিধ্বস্তও হয়নি; কিন্তু এতটাই উঁচু যে অভ্যন্তরে উঁকি দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় গাইড তার পা মুড়ে দিলে 'দ' অক্ষরের মতো আকৃতিতে, তারপর আমাদের বললে তার জানুতে দাঁড়িয়ে মামি দর্শন করতে। কোনো মানুষের গাত্রে আরোহণ করার অনিচ্ছা

অতিক্রম করলো তার পিড়াপিড়ি ও আমাদের কৌতূহল ; ঐ উপায়েই গূঢ় বিবরে দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু মামি নয়, এ-অবস্থায় থাকতেও পারে না, কেননা বাতাসের সংস্পর্শে এলেই তা পঞ্চভূতে লীন হ'য়ে যাবে। দেখলাম একটি করোটি— সেই বহুবর্ণিত দন্তহীন হাস্যময় ব্যঙ্গচিত্র— কার ? নিশ্চয়ই কোনো মধ্যবিত্ত সাধারণ লোক, রাজপ্রথার অনুকরণে এও চেয়েছিলো মামিরূপে অমর হ'তে ; হিন্দুরা যেমন মেয়ের বিয়েতে, বা দরিদ্র ক্যাথলিক পরিবার কন্যার প্রথম কম্যুনিয়নে, তেমনি এও হয়তো ঐহিক জীবনে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো পারলৌকিক সদ্গতির চেষ্টায়। আজ তার করোটি দেখিয়ে একজন মানুষ কিঞ্চিৎ উপার্জন করছে, তা কি তার আত্মার পক্ষে কোনো সান্ত্বনা ?

সূর্য অস্ত যায়, আমরা স্ফিঙ্কস-এর সামনে দাঁড়িয়েছি। বিরাট মূর্তি, কত বিরাট তা কোনো ছবি দেখে ধারণা করা অসম্ভব, এবং তার দানবিক আকারেই এর বৈশিষ্ট্য, ক্ষুদ্রতর হ'লে অভিঘাত এমন প্রবল হ'তো না। আস্ত একটি পাহাড় কেটে-কেটে তৈরি হয়েছে এই মহামূর্তি, এই নরসিংহ, এই ভীষণ রহস্যময় অবতার ; গঠনে সূক্ষ্মতা বা বৈদগ্ধ্য নেই ব'লে মনে হয় যেন একটি প্রাকৃত পর্বতেই অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে সিংহের শরীর ও নরমুণ্ড। স্ফিঙ্কস শব্দটি গ্রীক, তার অর্থ উদ্বন্ধক (যে গলা টিপে হত্যা করে) ; কিন্তু থীবজের উপকণ্ঠে ঈডিপাস যার কূটপ্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, তার মুণ্ড ও বক্ষ ছিলো পক্ষবান সিংহের, হেসিয়ডের মতে সে অগ্নিশ্বাসিনী কিমীরার কন্যা— আমরা আবহমান তাকে দানবী বলেই জেনেছি। পরবর্তী য়োরোপীয় বারোক-শিল্পেও স্ফিঙ্কস মূর্তির ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু সেই রূপমুগ্ধ জীবন-প্রেমিক বিলাসী যুগ তার ভয়াবহতার চিহ্নমাত্র রাখেনি। বাভারিয়ার নিম্ফেনবুর্গ বা ললনাপুর প্রাসাদের প্রাঙ্গণে যে-স্তনবতী রমণীয়াদের দেখেছিলাম, সিংহের দেহ সত্ত্বেও তাদের স্ফিঙ্কস ব'লে কল্পনা করা দুরূহ ; আকারেও তারা মানুষীর অনুরূপ ব'লে হঠাৎ তাদের অস্বাভাবিকতা যেন ধরাই পড়ে না। যে-ভয়াল কল্পনা দূর অতীতে মানুষের স্বপ্নে হানা দিয়েছিলো— যা দৈত্য রাক্ষস ড্র্যাগন স্ফিঙ্কস মেডুসা ইত্যাদি নানা নামে ও বিকট রূপে মানবসন্তানকে বহুযুগ ধ'রে কণ্টকিত করেছে— তার কোনো যথাযথ মূর্তি আজকের দিনে কোথাও যদি থেকে থাকে, তা এই মিশরের মরুতে। এক অপরাজেয় প্রহরীর মতো, লুপ্ত মিশরের নিদ্রাহীন অভিভাবকের মতো, এই নৃমুণ্ডধারী মহাসিংহ দীপ্ত

চোখে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে, দিগন্তের দিকে, যেন অনন্ত অতৃপ্তি নিয়ে পরম্পর শতাব্দীগুলোর শবযাত্রা দেখছে। ভগ্ন এর নাসিকা, ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিক্ষত (প্রাকৃত কারণে নয়, প্রতিমাদ্বেষী কামানের আঘাতে), কিন্তু এই ক্ষতিটুকুর ফলে তার ভঙ্গি হয়েছে আরো দৃপ্ত, আরো অটল ; তার বিরাট দুই থাবার বিস্তার থেকে ললাট-ফলক পর্যন্ত সর্বাঙ্গে যেন লিপিবদ্ধ আছে জগতের প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতা ;— এ যদি কোনো দেবমূর্তি হয় তাহ'লে বলবো পৃথিবীর আর কোনো দেবতা নন এমন অনুকম্পাহীন, এমন নিঃসীমভাবে নিঃসঙ্গ। সূর্যাস্তের আভায় রক্তিম হ'য়ে উঠলেন এই দেবতা, ধীরে আবার ধূসর হ'য়ে এলেন— ধূসরতর— শেষ রশ্মির আগ্নেয় রাগে দুই বিশাল পাথরের চোখ জ্ব'লে উঠলো। আরো একটি মুহূর্ত আমরা অতীতের মুখোমুখি, তারপর সন্ধ্যা নামলো ; স্ফিঙ্কস ও পিরামিডের দিকে পিঠ ফেরাতে হ'লো আমাদের ; আটটাতে আছে সেমিরেমিস হোটেলে ডিনারের নিয়োগ, আছে আরো একবার বাক্স গুছোনো ; ভোরে প্লেন ; ছ-মাস আগে যেখান থেকে যাত্রা করেছিলুম, কাল আবার সেই কলকাতা।

১৯৬১-৬৫

